হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি।

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষোড়শ ভাগ।

১৩১৫ সালের বৈশাখ হইতে ১৩১৫ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত
দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে
সত্ত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

CALCUTTA.

Printed by N. Dutt.

at the Janma Bhumi Press.

39, Manick Bose's Ghat Street.

1909

বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।] [ডাঃ মাঃ ।৶০ স্বতন্ত্র।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৫৬। Marmaid Tavern	,, নগেন্দ্রনাথ সোম	১৫৩
৫৭। মিস লুসিয়া	... ...	২৪৫
৫৮। মহারাজ কর্ণ	শ্রীমদ্ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	৫
৫৯। যাত্রা	... ...	১৯২
৬০। যোগেন্দ্রনাথ	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	৩২৪
৬১। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব		২৬৫, ২৯৭, ৩২৯, ৩৬১, ৩৯৪
৬২। মিলন সঙ্গীত	নাট্যাচার্য্য ,, গিরীশচন্দ্র ঘোষ	৩৬৩
৬৩। রোগের মুষ্টিযোগ	,, আশুতোষ ধন্বন্তরী	২৮০
৬৪। রজনীর-অভিসার (পদ্য)	শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবী	৫৪
৬৫। রাঁচি ভ্রমণ	,, মন্মথনাথ জ্যোতিষী	২৮৯
৬৬। লীলাখেলা	,, বিধুভূষণ ঘোষ	১৪৭
৬৭। শত্রু কে ? পুত্রই পরম শত্রু	ডাঃ শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় নন্দী	১৫৯
৬৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	... ...	৮৫
৬৯। শোকচ্ছ্বাস	,, কৃষ্ণগোপাল ভক্ত	২৪৯
৭০। শোক সংগীত	সংগীতাচার্য্য ,, দেবকণ্ঠ বাগচী	১৭৮
৭১। শ্মশান-সৈকতে	,, বীরেন্দ্রনাথ মিত্র	২৩০
৭২। শান্তি	ঐ	২৯৩
৭৩। সাবিত্রী	,, অম্বিকাচরণ গুপ্ত	৩৪৭, ৩৮১
৭৪। সাগর সঙ্গমে	শ্রীমদ্ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	৩৪৩
৭৫। সব তুমি (পদ্য)		১৫১
৭৬। সমালোচনা		৩৮, ৭৯, ১৯৩, ২৬৪, ২৯৪, ৩২৮ ৩৯২,
৭৭। স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর		১৬৯
৭৮। স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		৩০৮
৭৯। ক্ষমা প্রার্থনা	সম্পাদক	৩৬

জন্মভূমির ষোড়শ বর্ষের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি।

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষোড়শ ভাগ।

১৩১৫ সালের বৈশাখ হইতে ১৩১৫ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত
দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে
সত্ত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

CALCUTTA.

Printed by N. Dutt.

at the Janma Bhumi Press.

39, Manick Bose's Ghat Street.

1909

বার্ষিক মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।] [ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা।

জন্মভূমির ষোড়শ বর্ষের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৬শ বর্ষ। | ১৩১৫ সাল, বৈশাখ। | ১ম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণ।

"যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈঃ নমঃ॥"

যাঁহাকে ব্রহ্মাদি দেবগণ নিরন্তর স্তব করেন, বেদবিৎগণ ষড়ঙ্গ বেদোপনিষদ মন্ত্রের দ্বারা গান করেন, যোগীগণ ধ্যানাবলম্বী হইয়া মানসচক্ষে যাঁহার অতুল জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক বিপুল আনন্দ উপভোগ করেন, সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত নিরূপণে অসমর্থ, সেই পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করি। যাঁহার করুণায় "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং" তাঁহার সেই অপার করুণায়—জন্মভূমি মাসিকপত্রিকা আজ পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল, এজন্য সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলবিধাতার শ্রীচরণে একান্ত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করি।

পরম কল্যাণ গীতা।

লেখক— শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী।

ক্রিয়া যোগাঙ্গের কল্পিত সিদ্ধতা।

উড্যক্ কুম্ভক প্রভৃতি যোগাঙ্গের ক্রিয়া সকলের যে সিদ্ধতা লক্ষণ লিখিত আছে, অর্থাৎ উহাতে যোগী আসনবদ্ধ হইয়া ২।৪ হাত শূন্যে অবস্থিতি করে তাহা শুনিয়া রাজা প্রজা সকলে শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান্‌ হইতে বিমুখ হইয়া সেইরূপ সাধনে বিব্রত হয়, কিন্তু ইহাতে আধ্যাত্মিক বিষয়ের কি উন্নতি হইতে পারে, তাহা কেহই বিচার করিয়া দেখেন না। যদ্যপি ২।৪ হাত শূন্যে অবস্থিতি করিলেই পরমপদ প্রাপ্ত হয়, তবে পক্ষীগণ শত শত হস্ত শূন্যে সহজেই উঠিয়া অবস্থিতি করিতেছে, তাহা হইলে তাহাদের তুল্য মহাত্মা বিরল। জল তেজশক্তি সহকারে বিনা তপস্যায় মেঘরূপে শূন্যে-বিচরণ করিতেছে, তাহা হইলে মেঘকেও সিদ্ধপুরুষ বলা যায়। জ্ঞানবান মহাত্মাগণ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে উড়িয়া বেড়ান। ব্রহ্মের কি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে যে তথায় যাইয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে? এখানে কি তিনি নাই? তিনি সদা সর্ব্বদা সকল স্থানে নিরাকার সাকারভাবে তোমাদিগের ভিতরে বাহিরে পূর্ণরূপে আছেন। কোন কোন ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস আছে যে, মহাত্মাগণের শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, হইলেও কষ্ট অনুভবে আইসে না। এইরূপ ভ্রমে বদ্ধ হইয়া অবোধ ব্যক্তিগণ সাধু মহাত্মাদিগের শরীরে অগ্নি-দগ্ধ করিয়া পরীক্ষা লয়। ইহা বিবেচক ব্যক্তির কার্য্য নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা স্থূল শরীরের সহিত মিশ্রিত থাকেন, ততক্ষণ কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী শরীরের কষ্টে উভয়েরই দুঃখ সুখ সমানভাবে বোধ হইয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি সহ্য করেন, অবোধ ব্যক্তির সহ্য হয় না। মূর্খের যেরূপ, সেইরূপ হয়। মূর্খের শরীর অগ্নিতে যেরূপ দগ্ধ হয়, মুনি ঋষির শরীরও সেইরূপ দগ্ধ হয়। যেমন রাত্রে অন্ধকারে মূর্খেরা চক্ষে অন্ধকার দেখে, সেইরূপ জ্ঞানী মহাত্মা-দিগেরও চক্ষে অন্ধকার লাগিয়া থাকে। অবোধ ব্যক্তিরা বোধ করে যে, আলোক ও অন্ধকার পৃথক্ পদার্থ। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন,- যদি আলোক অন্ধকার ব্যতীত কোন পৃথক্ পদার্থ হইত, তাহা হইলে আলোক

আর অন্ধকার একসঙ্গেই দৃষ্টিগোচর হইত, কিন্তু তাহা হয় না। উহা একই পদার্থ। একের অভাবে বা প্রকাশে, ধর যেমন জাগ্রতের অভাবেই নিদ্রা ও নিদ্রার অভাবে জাগ্রত, দুই অবস্থাতে যেমন একই ব্যক্তি। অগ্নির স্বভাবই যে স্থূল পদার্থকে ভস্ম করিয়া আপন স্বরূপ করেন, তাহার জন্য যে স্থূল শরীরে মাহাত্ম্য যায় এবং অগ্নির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় এরূপ নহে, এবং যদ্যপি বায়ু অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়া আপন স্বরূপ করেন, তাহার জন্য যে অগ্নির মাহাত্ম্য যায় আর বায়ুর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় এরূপ নহে। স্বরূপে সকলই একই পরমাত্মার স্বরূপ; কেবল রূপান্তর ভেদে সকলে গুণক্রিয়ার পৃথক্ পৃথক্ ভাব আছে। এক গুণ হইতে অপর অপরকে স্থূল কিম্বা আপনার স্বরূপে মিশাইয়া সূক্ষ্ম করিয়া লন; তাহাতে মাহাত্ম্য বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। এইরূপ সকলেই সমান। জীব আকাশে উঠিলে কিম্বা মাটিতে বেড়াইলে মহৎ বা নীচ হয় না। যাহার যে স্বাভাবিক রীতি তাহার তাহা হইয়া থাকে। সমস্তই পরমাত্মার স্বরূপ এবং সকল কার্য্যই পরমাত্মার দ্বারা হইতেছে। অন্য কাহারও বাহাদুরী নাই। উড্যাক কুম্ভক প্রভৃতি যোগাঙ্গের ক্রিয়া সকলের যে সিদ্ধতা লক্ষণ কথিত আছে তাহা অতীব অসার। পরমাত্মাই সার তাহাতে নিষ্ঠা রাখিয়া পরমানন্দে থাক।

অষ্টসিদ্ধি।

অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং কামাবশায়িতা, এই আট প্রকার সিদ্ধি কল্পিত আছে। অণিমা—অণুতুল্য ক্ষুদ্র দেহ ধারণ ক্ষমতা। লঘিমা লঘুত্ব হেতু উর্দ্ধগমন ক্ষমতা। মহিমা বৃহৎ এবং মাহাত্ম্যযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা। প্রাপ্তি—বিশ্বের তাবৎ দ্রব্য করতলস্থ হওয়া। প্রকাম্য—যথেচ্ছা করিত্ব। ঈশিত্ব—প্রভুত্ব। বশিত্ব—সকলকে বশে রাখিবার ক্ষমতা। কামাবশায়িতা—সকল প্রকার কামের পরিপূরণ করিয়া শেষে নিষ্কাম হওয়া। এই প্রকারে এই অষ্টসিদ্ধির নানাপ্রকার অর্থ শাস্ত্রে উক্ত আছে। কিন্তু এই অষ্টপ্রকার মহাসিদ্ধি প্রাপ্তির সার মর্ম্ম এই, বিরাট পরব্রহ্মের অনাদি অষ্ট প্রত্যক্ষ মহা অঙ্গ যথা,—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ এবং অহঙ্কার রূপ সৃষ্টি ইচ্ছা সংযুক্ত যে পূর্ণ পরব্রহ্ম, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে উক্ত অষ্টপ্রকার মহাসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিছুই বাকি থাকে না। কিন্তু তাঁহাকে পূর্ণভাবে প্রাপ্ত না হইলে কেবলমাত্র তাহার এক একটী

ভিন্ন অঙ্গের প্রাপ্তি সাধন করিয়া কোন ফললাভ হয় না। যেমন কথিত আছে যে, অণিমা প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মতারূপে অন্য শরীরে প্রবেশ ক্ষমতা হয়। যেমন বায়ু দ্বারা সুগন্ধ আসে কিন্তু তাহার রূপ নাই গন্ধে অনুভব হয় তদ্রূপ যখন মন বৃত্তি রহিত হইয়া সূক্ষ্ম হয়, তখন সকল চরাচর মধ্যে প্রবৃষ্ট হইয়া সকলকেই আত্মস্বরূপ দেখিবে। যেমন, কোটী মণ পর্ব্বতাকার বারুদ যৎকিঞ্চিৎ অগ্নি সংযোগ হইলে ভস্ম হইয়া আকাশে লয় হইয়া যায় তদ্রূপ পর্ব্বতরূপী মায়া জ্ঞানরূপী অগ্নির সংযোগে লয় হইয়া মন আকাশ পরমাত্মার স্বরূপ স্থির হইয়া থাকে অর্থাৎ আত্মাকে আকাশময় পরিপূর্ণ দেখেন। মহিমা অর্থাৎ আত্মবোধ (সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ, কেবল আত্মাই প্রকাশমান হন।) প্রাপ্তি অর্থাৎ পরব্রহ্মকে পূর্ণরূপে পাইলে, অর্থাৎ আত্মস্বরূপে নিষ্ঠা হইলে তাহার আর পাইবার কিছুই বাকি থাকে না। প্রাকাম্য অর্থাৎ যে ব্যক্তির স্বরূপে নিষ্ঠা হইয়াছে তাহার উঠিবার বসিবার ইত্যাদি কোন বিষয়ে নিষেধ বিধি নাই, যেরূপ তাহার ইচ্ছা সেইরূপ সেইস্থানে থাকিতে পারে। ঈশিত্ব অর্থাৎ যাহা কিছু গুণ ক্রিয়া তেজ শক্তি অশক্তি দেখিতেছ, তাহা সকলই আত্মারই। ইহা জানিয়া পূর্ণ তেজ ও শক্তিরূপে অবস্থান কর। বশিত্ব অর্থাৎ নিজ অন্তর বাহ্য ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সহিত সমস্ত জগৎ বশীভূত করিয়াছেন। অর্থাৎ দৃঢ়রূপে আত্মস্বরূপ দেখিয়া নির্ভ্রম অবিরোধ থাকা। কামাবশায়িতা অর্থাৎ শুভাশুভ সকল কর্ম্মে জয়ী ও সকাম নিষ্কাম ভাবের অতীত হইয়া আপন স্বরূপে আনন্দরূপে স্থিত হওয়ায় সকল কার্য্য করিতেছেন বোধ হইতেছে কিন্তু তিনি কিছুই করিতেছেন না; কেবল একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাকে ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপাসনা করিলেই নানাপ্রকার পরমার্থ কার্য্য এবং তাহার ফলস্বরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ ষট্‌চক্রভেদ, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি সিদ্ধি সকল সহজেই প্রাপ্ত হয়, নচেৎ হয় না। সিদ্ধতা অন্য কিছুই নহে, ভাবের পরিবর্ত্তনতা। যেমন স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রত অবস্থা। স্বপ্নে ভ্রম এবং জাগ্রতে নিশ্চয় জ্ঞান।

মহারাজা কর্ণ।

লেখক—শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

দানবীর মহারাজা কর্ণের চরিত্র কি সুন্দর! তাঁহার জ্ঞানগর্ভ-উপদেশসমূহ কি মধুর! মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্রে কর্ণের কীর্ত্তি ও চরিত্র এবং বিশেষতঃ তাঁহার বদান্যতা অতীব সুন্দররূপে চিত্রিত ও বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি একখানি সুখপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া মহারাজা কর্ণের বদান্যতা গুণ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। "গোবিন্দমঙ্গল" প্রণেতা পণ্ডিত কবিচন্দ্র মহাশয় সুললিত পয়ারাদি ছন্দে দানবীর মহারাজা কর্ণের অসাধারণ বদান্যতা, ধর্ম্মপরায়ণতা, গুরুজন-ভক্তি, প্রতিজ্ঞা-পালন ও উদার চরিত্রের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাহাই অবলম্বনপূর্ব্বক আমি এই হিন্দুকুলগৌরব নরপতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণ করিয়া মানবের দানশক্তি ও সত্য-রক্ষা সম্পর্কে কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করিতে অভিলাষ করিয়াছি। কবিবর কবিচন্দ্রের বর্ণিত কর্ণচরিত্রে শিক্ষা করিবার ও চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে, এই বিমল চরিত্রের সুখময় ইতিবৃত্তের অভ্যন্তরে অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ নিহিত আছে, কিন্তু এস্থলে আমি কেবল সাধারণতঃ বদান্যতা ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কর্ণের ইতিবৃত্ত কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছি।

মহারাজা কর্ণ জ্ঞানী ও ধনী এবং পরোপকারী ও বদান্য বলিয়া বিখ্যাত। এই মায়াময় সংসারক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, যাহার ধন থাকে, সে ব্যক্তি কৃপণ হয় এবং যাহার ধন নাই তাহার মনে পর-কল্যাণকামনা-হেতু বদান্যতা-বিষয়িনী চিন্তার উদয় হইয়া থাকে। মহারাজা কর্ণ যেমন ধনী তেমনি দাতা ছিলেন। তাঁহার বদান্যতা গুণের তুলনা করা যাইতে পারে-এমন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল। বস্তুতঃ তাঁহার সমসাময়িক নরপতিদিগের মধ্যে তাঁহার সমতুল্য বদান্য পুরুষ আর কেহ ছিল না। বদান্যতাগুণের জন্য বহুপুরুষ প্রখ্যাত ও প্রশংসিত হইয়াছিলেন, এ কথা সত্য, কিন্তু বদান্যতার সঙ্গে ধর্ম্মপরায়ণতা ও অসাধারণ মানসিক বল এবং সত্যরক্ষাকারী সামর্থ্য অপর কাহারও মধ্যে প্রায় এরূপভাবে দেখা যায় না। প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তাঁহার দ্বারা অদেয় কিছুই ছিল না।

যখন মহারাজা কর্ণের অবর্ণনীয় বদান্ততার প্রসঙ্গ লইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল-বাসীগণ মধ্যে নিত্য আলোচনা হইতে আরম্ভ হইল, যখন সমস্ত পৃথিবী কর্ণের দানশক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইয়া গেলেন, তখন ভক্তের পরীক্ষাকারী ভগবান ভাবিলেন, "আমি একবার ছদ্মবেশে মর্ত্তে গিয়া কর্ণের দানশক্তির পরীক্ষা করিতে অভিলাষ করি।" এই ভাবিয়া ভগবান বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বেশে প্রাসাদদ্বারে উপনীত হইলেন। দ্বারবান রাজাকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আগমনবার্ত্তা যথারীতি নিবেদন করিল। কবিচন্দ্র লিখিতেছেন,—

ব্রাহ্মণ দেখিয়া কর্ণ পরম সাদরে।
গলায় বসন দিয়া দণ্ডবৎ করে॥
বসিতে আসন দিয়া যোড়হস্তে কয়।
কোন্ কার্য্যে দ্বিজ আইলা কিবা আজ্ঞা হয়॥

ইহাতে রাজা কর্ণের ব্রাহ্মণভক্তি স্পষ্টতঃ বুঝা গেল। ব্রাহ্মণ কেবল বর্ণশ্রেষ্ঠ নহেন, পরন্তু তিনি ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের গুরু বা আচার্য্য। এইজন্য ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্র সম্মান ও আদরের পাত্র; যে তাহা না করে, সে ব্যক্তি সামাজিক নিয়মের বৈপরীত্য করণাপরাধে দুষ্ট হয়। ইহাতে আরও বুঝা গেল, যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি গুরুজন-সমতুল্য অতএব তিনি অবশ্য মাননীয়। ক্ষত্রিয় নরপতি কর্ণ ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে যথোচিত সম্মান করিয়া দেখাইলেন, ব্রাহ্মণজাতি এবং গুরুজন (বিশেষতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ) অবশ্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। মহতেরা যাহা করেন, সর্ব্বসাধারণ তাহা অনুকরণ করে; রাজারা যাহা করে, প্রজাসাধারণ তাহা পালন করে; সুতরাং কর্ণের এই ব্যবহার যথার্থ শিক্ষাপ্রদ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে রাজন্! গত কল্য একাদশী তিথি উপলক্ষে উপবাসী ছিলাম। অদ্য দ্বাদশী, মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, এখনও আমার আহারাদি হয় নাই। আমি ক্ষুধিত, তুমি আমাকে অন্নদান করিয়া আমার বিষম ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন কর।" রাজা বলিলেন, "হে দেব! ইহা ত সামান্য কথা! আপনি যে কোন প্রকারের ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়েন, আমি তাহাই আপনাকে দিয়া পরিতুষ্ট করিব।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে রাজন্! আমি নিরামিষাশী নহি, মাংস বিনা আহার করি না। অদ্য মাংস না পাইলে আমার দ্বাদশী তিথির পারণা হইবে না। রাজা উত্তর দিলেন "হে মহানুভব! তজ্জন্য চিন্তা কি! আপনি যে কোন প্রকারের মাংস ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন

তাহাই প্রচুর পরিমাণে দিব। ছাগ, মৃগ, শশক, হংস, পারাবত প্রভৃতি নানাবিধ মাংস প্রস্তুত করাইয়া দিব ইহাতে সন্দেহ নাই।" বিপ্র বলিলেন "মহারাজ কর্ণ! আমি নরমাংসের অভিলাষী।" রাজা উত্তর করিলেন "তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে আনিয়া দিব। চিন্তা কি !!" তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে রাজা! আমি যে মনুষ্যের মাংস খাইব তাহা যদি তুমি দিতে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি তাহা ব্যক্ত করিতে পারি। যদি তুমি প্রতিজ্ঞা না কর, তাহা হইলে আমি এস্থলে আদৌ ভোজন না করিয়া চলিয়া যাইব।

ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ কিবা দিতে পার।
তবে সে কহিব আগে অঙ্গীকার কর॥
কর্ণ বলে অঙ্গীকারে অন্যথা না হব।
যে মাংস খাইতে চাহ তাহা আমি দিব॥

মহারাজা কর্ণ ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিলে পর, ব্রাহ্মণ দেবতা কহিলেন,—

বৃষকেতু নামে আছে তোমার নন্দন।
তারে কাটি দেহ মাংস করিব ভোজন॥
স্ত্রী-পুরুষে দুইজনে কাটিবে করাতে।
রন্ধন করিয়া দেহ আমার সাক্ষাতে॥
হাসিয়া কাটিবে পুত্র না হবে কাতর।
এ যশ থাকিবে তব ভুবন ভিতর॥

কি সর্ব্বনাশ কথা!! রাজা ও রাণী শাণিত করাত হস্তে লইয়া হাসিতে হাসিতে একমাত্র পুত্র—একমাত্র বংশধর—একমাত্র রাজকুমার বৃষকেতুর গলা কাটিতে থাকিবেন এবং তদনন্তর স্বহস্তে ঐ মাংস পাক করিয়া ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবেন এবং অণুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করিবেন না!! কি আশ্চর্য্য প্রার্থনা!!

কবিচন্দ্র বলে কর্ণ হও সাবধান।
দাতা বুঝিবারে আইল প্রভু ভগবান॥

মহারাণী সমীপে মহারাজা গমন করিয়া এই লোমহর্ষণকর সম্বাদ প্রদান করায় মহারাণী শ্রীমতী পদ্মাবতী অবশ্য নারীজাতিসুলভ-কাতরতায় প্রথমে কাঁদিয়া উঠিলেন, কিন্তু যখন কর্ণ কহিলেন "অঙ্গীকার করিয়া তাহা পালন না করিলে ঘোরতর অধর্ম্ম হয়; সত্যের রক্ষা না করা ঘোরতর নরকবাসের কারণ। অতএব ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেই হইবে। বিশেষতঃ তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং

হেনকালে দ্বিজবর ডাক দিয়া কয়।
শীঘ্র করি আইস কর্ণ বিলম্ব না সয়॥
অঙ্গীকার করিয়াছ শুন কর্ণ ভাই।
বল "পারিলাম না" গৃহে ফিরি যাই॥
এত শুনি পদ্মাবতী সকাতরে কয়।
অঙ্গীকার করিয়াছ না দিলে কি হয়॥
পুত্র কাটি দিব আমি খাইবে ব্রাহ্মণে।
এ যশ তোমার যেন থাকে ত্রিভুবনে॥
অনুমতি পায়ে কর্ণ হাসে খল খল।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় গোবিন্দমঙ্গল॥

ধর্ম্মবীর, দানবীর, বিদ্যাবীর ও কর্ম্মবীর কর্ণের উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী কি কখন স্বামীর ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সম্যক্ সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারেন? ক্ষত্রিয় পুরুষের পক্ষে এইরূপ ক্ষত্রিয়া রমণীই শোভা পায়। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা পৃথিবীর সমুদয় জাতি মধ্যে অতি পুরাকাল হইতে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। প্রতিজ্ঞা পালনের নাম সত্যরক্ষা। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রজাপুঞ্জকে পরমসুখে প্রতিপালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছিলেন,—

"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকী মপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥"

সত্যরক্ষার জন্য রামচন্দ্র বাস্তবিক তাহাই করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ক্রীড়াশীল বালক বৃষকেতুকে ডাকাইয়া আনাইয়া রাণী পদ্মাবতী ক্রোড়ে লইলেন এবং ক্রন্দন করিয়া এই মহা বিপদজনক ঘটনার কথা সকাতরে রাজকুমারকে জানাইলেন! এস্থলে কবিবর রাজকুমারের মুখে কি শুনিলেন তাহাই এখন পাঠ করুন,—

বৃষকেতু বলে মাগো নিবেদি চরণে।
ইহার লাগিয়া তুমি কান্দ কি কারণে॥
পিতা মাতা দুইজনে মম বাক্য লহ।
ব্রাহ্মণে সন্তুষ্ট কর মোরে কাটি দেহ॥
এতদিনে হৈল মোর সার্থক জীবন।

ব্যাধিতে মরণ হৈলে কৃমি ভস্ম হয়।
গোবিন্দ ভকতি দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়॥

বৃষকেতু বলে শুন, আজি মোর শুভদিন,
রাত্রি পোহাইল শুভক্ষণে।
কি কব ভাগ্যের কথা, শুন গো জননী মাতা,
মোর মাংস খাইবে ব্রাহ্মণে॥
ব্রাহ্মণে যে জন মানে, সেই পায় নারায়ণে,
শুন মাতা কহি তব ঠাঁই।
ব্রাহ্মণ বর্ণের রাজা, সকলেতে করে পূজা,
ব্রাহ্মণে গোবিন্দে ভেদ নাই॥
গঙ্গাদি তীর্থ যত, দ্বিজ অঙ্গে অবিরত,
বৈসে বৃদ্ধ অঙ্গুলি উপরে।
যেবা পাদোদক খায়, সর্ব্বতীর্থের ফল পায়,
সেইজন যায় স্বর্গপুরে॥
এক চিত্ত হয়ে যারে, ব্রাহ্মণে আশীষ করে,
সেইজন সবার পূজিত।
এই কথা জান দৃঢ়, ব্রাহ্মণের ক্রোধ বড়,
ব্রহ্মশাপে মৈল পরীক্ষিত॥
এমন ব্রাহ্মণ যারে, খাইতে অঙ্গীকার করে,
তার হয় সার্থক জীবন।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়, বিলম্ব উচিত নয়,
দ্বিজরূপে আইল নারায়ণ॥

পুত্রের মুখে এই সকল সুমধুর বাণী, এই সকল ভক্তিময়ী কথা শ্রবণ করিয়া রাজা ও রাণী নিরুত্তর হইয়া গেলেন। বৃষকেতু পুনরায় বলিতে লাগিল,—

বৃষকেতু বলে মাতা এত ভাগ্য হবে।
আমা অভাগার মাংস ব্রাহ্মণে খাইবে॥
করাত লইয়া মাথা কাট দুইজনে।
বিলম্ব হইলে উঠে যাইবে ব্রাহ্মণে॥

দান ও ধর্ম্মবীর ক্ষত্রিয়-স্বজনের মুখে এই মধুময়ী বাণী, ক্ষত্রিয় জাতির

অসাধারণ মহত্ত্বের নিদর্শন। দানবীর কর্ণের পুত্রের মুখে এই কথা আরও সুন্দর, আরও মনোহর।

যাহা হউক, অতঃপর কুমার বৃষকেতু ব্রাহ্মণের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া ভগবানের স্তুতিগান করিতে করিতে পিতাকে কহিল "আমাকে হত্যা কর।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্ণ ও কর্ণ-পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, যদি তোমরা কাতরতা প্রকাশ কর এবং হাসিতে হাসিতে করাত দ্বারা পুত্রমুণ্ড ছেদন করিতে না পার তাহা হইলে আমি বিমুখ হইয়া চলিয়া যাইব।" সুতরাং রাজা ও রাণী অকাতরে করাত দ্বারা পুত্রমুণ্ড ছেদন করিলেন। কুমারের মস্তক ভূমিতলে পতিত হইয়াও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম সুমধুর স্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বর্গ হইতে দুন্দুভি বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল, অনন্ত আকাশ হইতে রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবতাগণ ধন্য ধন্য বলিয়া কর্ণের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা ও রাণী উভয়ে তাঁহাদের পুত্রের মাংস স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে আনয়ন করিয়া দিলেন। রন্ধনের পূর্ব্বে রাণী মহাশয়া বৃষ-কেতুর ছিন্নমস্তক স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বৃষকেতুর মুণ্ড কোথায়? ঐ মুণ্ডের অম্বল তৈয়ার করিয়া সত্বরে আমার ক্ষুধা পরিতৃপ্ত কর" রাজা তাহাও করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন "হে রাজন্! তুমি, আমি, তোমার স্ত্রী এবং পথিমধ্য হইতে আনীত এক শিশু এই চারি জনে একত্রে ভোজন করিব।" রাজা স্বয়ং রাজপথে গিয়া একজন শিশুর অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, একদল বালকের মধ্যে তাঁহার পুত্র বৃষকেতু সহাস্যে ক্রীড়া করিতেছে। রাজকুমারকে কোলে পাইয়া মহা-রাজা কর্ণ তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হারাধনকে কোলে পাইয়া মহারাণী পদ্মাবতী যেন মৃতদেহে পুনরায় প্রাণপ্রাপ্ত হইলেন। কবি কহিতেছেন,—

বিস্মিত হইয়া কর্ণ ভাবে মনে মন।
দ্বিজ বেশে ছলিবারে আইল ভগবন্॥
পুত্র লয়ে আইল কর্ণ পুলকিত কায়।
লোটায়ে পড়িল কর্ণ ব্রাহ্মণের পায়॥
কর্ণ পদ্মাবতী দোঁহে করযোড়ে কয়।
অপরাধ ক্ষমা কর দেহ পরিচয়॥

ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ না চিন আমারে।
আপনি আইনু কৃষ্ণ ছলিবার তরে॥
গোবিন্দ বলেন ধন্য কর্ণ মহাশয়।
তোমার সমান দাতা কেহ নাহি হয়॥
কর্ণ বলে কৃষ্ণ তুমি ব্রহ্ম সনাতন।
কৃপা করি নিজ মূর্ত্তি করাও দর্শন॥
কর্ণকে করিয়া দয়া দৈবকীনন্দন।
নিজমূর্ত্তি দেখাইল প্রভু নারায়ণ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কর্ণ দেখিয়া নয়নে।
প্রেমে গদ্‌গদ হয়ে পড়িল চরণে॥
যে পদ করেন ধ্যান সুরপতিগণে।
হেন কৃষ্ণ আইলেন আমার ভবনে॥
ধন্য ধন্য কর্ণ তুমি বলে ভগবান।
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী হরি হৈল অন্তর্ধান॥

ব্রাহ্মণ কবি শ্রীমৎ কবিচন্দ্র এই স্থানে তাঁহার গল্প শেষ করিয়াছেন। আমি কিন্তু এস্থলে আমার প্রবন্ধ শেষ করিতে পারিব না। যে উদ্দেশে এই প্রবন্ধের সূচনা করিয়াছি তাহা এখনও কহি নাই। প্রতিজ্ঞা ও বদান্যতা এই দুইটি গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে যথাশক্তি আলোচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিব। (ক্রমশঃ)

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

লেখক—শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

কামিনীর শাশুড়ী বামা ঠাকরুণের সঙ্গে আদৌ সমপ্রীতি নাই। শাশুড়ীও কিছু প্রখরা বধূ-ঠাকুরাণীও তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। সুতরাং বিবাদ-বিসম্বাদ হইবে না ত কি? আজ কালিকার গৃহলক্ষ্মীগণ একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়া প্রায়ই কিঞ্চিৎ গরবিনী হইয়া উঠেন; অপরের কথা দূরে যাউক, যে স্বামীগণের উপর তাঁহাদিগের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে; অনেক

স্থলে তাঁহাদের সেই স্বামীকুলের উপরই কর্তৃত্ব করিতে চাহেন, এরূপাবস্থায় সংসারের কর্তৃপক্ষগণ যদি একটু উগ্রপ্রকৃতি হয়েন, একটু প্রভুত্বস্থাপনের প্রয়াস পান, তাহা হইলেই ত সোণায় সোহাগা ;—তাহা হইলেই তাঁহাদিগের সংসারে কলহ বিবাদের মানসিক বিষাদের একটী রম্য নিকেতন হইল।

কামিনী বোধ করি, পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিরই কামিনী ছিল, না হ'লে পাড়াগাঁয়ের অবগুণ্ঠনাবৃতা লজ্জাশীলা অবলা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর বিরুদ্ধে নিয়ত সজ্জিত থাকিবে কেন। বেশী কিছু না হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয়টা পর্য্যন্ত অন্ততঃ তাঁহার পড়া হইয়াছিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বোধ করি দুই চারিখানি নাটক নভেল পড়িতেও তিনি বিরত হন নাই। একে পল্লীগ্রাম, তাহাতে গৃহস্থ পরিবার, তাহার উপর স্বামীও তত সুশিক্ষিত নহেন, কাজেই কামিনী অহঙ্কারে অস্থির হইয়াছিলেন, ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছিলেন। শিক্ষা—দুই দশখানি নাটক নভেল মাত্র পর্য্যবসিত হইলে এই রকমই ঘটিয়া থাকে। কথাতেই ত আছে "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।"

যাহা হউক, কামিনীর শাশুড়ীর সঙ্গে মিল হইল না। শাশুড়ীও বধূর বাক্যবাণে সময়ে সময়ে আত্মঘাতী হইতে উদ্যত হন, বধূও কখনও কখনও মৃত্যুকামনা করিয়া থাকেন। এখন দেখা যাউক, শাশুড়ী বধূর লীলা-খেলাটা কেমন হয়।

দিনের পর দিন যাইল, বৎসরের পর বৎসর ফিরিল, বয়সের পর বয়স বাড়িতে লাগিল, কিন্তু শ্রীমতীর মনোভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না। তাঁহার সে অহঙ্কারীতা—সে সর্ব্বে-সর্ব্বা হইবার সাধ—সে বাক্যাস্ত্র-নিক্ষেপ-কুশলতা এবং সে কপটহৃদয়তা কিছুতেই নিবৃত্তি পাইল না।

সংসারে শাশুড়ী রহিয়াছেন ; তিনিই গৃহিণীপনা করিবার অধিকারি। বধূ কিন্তু তাহাতে নারাজ। গুণময়ীর ইচ্ছা, বুড়ীটাকে—বিধবাটাকে—সেকালের অসভ্য স্ত্রীলোকটাকে চাকরাণীর কার্য্য আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পাচিকার ক্রিয়াটী দিয়া [illegible] বুদ্ধের পরিচয় দেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী যে এখনও সে দুই কার্য্য না করিতেছেন তাহা নহে, তবে তিনি সম্পূর্ণরূপে বধূর হাত-তোলায় থাকিতে অনিচ্ছুক ; তাই বিবাদের কল্লোল সংসারে ভাদ্র মাসের গঙ্গার একটানা স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত। তাই শাশুড়ী বধূর বিবাদের দারুণাপরাধে পাড়ার লোক ব্যতিব্যস্ত। নিদানের বিধান আছে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে—অপরাধের দণ্ড আছে—কিন্তু ইহার কোন প্রতীকার নাই ; এমন কি কোন

উপায় হইতে পারে না, যাহার প্রভাবে এ ভাবটী ঘুরিয়া গিয়া সংসারের দুঃখের ভাত সুখে সকলে খাইতে পায়। উপায় অবশ্য আছে, কিন্তু তদনুসারে চলিবে কে?

আজ কামিনীর শ্বশ্রূর সঙ্গে ঘোরতর কলহ হইয়াছে, এমন হইয়াছে যে লিখিয়া বুঝান দুরূহ; পাঠককে সম্মুখে পাইলে কথঞ্চিৎ বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম।

যাহা হউক, আজিকার বিবাদে বধূরই পরাজয় হইয়াছে। তাই আজ কামিনী প্রাণত্যাগপ্রয়াসিনী হইয়া বাটীর বাহির হইল। বাহির হইয়া যে দিকে ইচ্ছা চলিল। ইচ্ছা—আত্মঘাতিনী হইবে,—মরিবে;—আর এ পোড়া সংসারে থাকিবে না। শোক—ক্ষোভে বিহ্বলা—আত্মাভিমানিনী—ক্রোধবশা ললনা একবারও ভাবিল না।

অনায়াসেনৈবাত্মা দুঃখাভিহতৈঃ পরিত্যজ্যতে।
মহীয়সা তু যত্নেন গরীয়সি ক্লেশে ন নিক্ষিপ্যতে॥

(পূর্ব্বকাদম্বরী।)

দুঃখাভিহতজনেরা দুঃখের জ্বালায় কেবল আত্মপরিত্যাগ করিয়া থাকে (মরিয়া যায়) কিন্তু মহৎ—যত্ন দ্বারা গুরুতর ক্লেশে আপনাকে নিক্ষিপ্ত করে না (অর্থাৎ দুঃখ ভোগ করে না)।

কামিনী বহির্গত হইয়া যেদিকে চক্ষু যায় সেই দিকেই চলিল। সঙ্গে আহার কেহ নাই; আছে কেবল গহণার বাক্সটী। কামিনী আজ মরিবে, যেমন করিয়াই হউক যমরাজার শ্রীচরণ দর্শন করিবে। এ পোড়া সংসারে আর থাকিবে না; এত যন্ত্রণা ভোগ আর করিবে না। কামিনী অনেকবার তাহার প্রাণকান্তের নিকট নালিশ করিয়াছে; অনেকবার বলিয়াছে আমার একটা বিলি কর। কিন্তু সেই হতভাগ্য স্বামী এমনই বর্ব্বর, এমনই বে-রসিক যে প্রেমময়ীর অনুরোধে পড়িয়া হতভাগিনী মাতার কিছু শাস্তিবিধান করিল না। বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতার স্রোতে এই কলিকালের পত্নীপূজার দিনে ইহা এক বিচিত্র ব্যাপার নয় কি?

শ্রীমতি যখন দেখিলেন, বেণাবনে মুক্তা ছড়ান হইল—ঊষারক্ষেত্রে বীজবপন হইল—তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল, শাশুড়ী শাসনের একটা সুব্যবস্থা হইল না, তখন অগত্যা মানময়ী প্রাণত্যাগ করাই স্থির করিলেন। ধন্য মান! ধন্য কর্তৃত্বাভিমান! ধন্য আত্মাবজ্ঞান! ধন্য ক্রোধ! তোমরা সব করিতে পার।

যোগীকে ভোগী করিতে পার, ভোগীকে যোগী সাজাইতে পার। জীবিতকে কৃতান্তের অতিথি করিতে পার। তোমাদের অসাধ্য কাজ নাই।

কামিনী বাহির হইয়া বরাবর চলিয়াছে—এমন ভাবে চলিয়াছে, কেহ না দেখিতে পায়। মধ্যাহ্নের সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ময়ূখমালা ভোগ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে এই মানময়ী একেবারে একটী প্রান্তরপ্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইল। গণ্ডগোল ঝগড়ায় উত্ত্যক্ত হইয়া স্বামী বলিয়াছেন, তুমি মর, তা হ'লেই সকল জ্বালার অবসান হয়। সেইজন্য কামিনী মরিতে আসিতেছে। জীবনে শ্রীমতি স্বামীর আজ্ঞা বোধ হয় খুব অল্পই পালন করিয়াছে, কিন্তু আজ তাঁহার আদেশ পালন করা তাহার অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। "মর ত—মর"।

কামিনী মরিবার জন্য বাহির হইয়াছে। শোকে ক্ষোভে অভিমানে অপমানে সে উন্মাদিনীপ্রায়। সে একমনে প্রায় এক ক্রোশ চলিয়া আসিয়াছে। লোকে দেখ দেখ করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে পারে নাই। কেন পারে নাই, কি জন্য পারে নাই, না পারিবার কারণ কি? তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

যাহা হউক, কামিনী অনেকটা হাঁটিয়া আসিয়া একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তখন সে একটী বৃক্ষছায়ায় বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, কেমন করিয়া মরিব। কুলের কুলবধূ মৃত্যুর জন্য বিষাদি সংগ্রহ করিয়া আমার ও তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এক্ষণে উপায় কি? কেমন করিয়া মরা হইবে কামিনী ভাবিতেছে, কোন্ উপায়ে মৃত্যুর আলিঙ্গন পাইবে। ইত্যবসরে ঢাক পৃষ্ঠে লইয়া একজন ঢাকী তথায় উপস্থিত; ঢাকী কোথাও বাজাইতে গিয়াছিল বা যাইতেছিল। সে পুরোবর্ত্তী বৃক্ষতলে অসীম রূপ-লাবণ্যময়ী একটী স্ত্রীমূর্ত্তিকে একাকিনী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিল এবং দ্রুতপদসঞ্চারে ঈষদগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"মা ঠাকরুণ আপনি কোথায় যাবেন"

"আমি যমের বাড়ী যাব। পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না, কোন্ দিক দিয়া যাই।"

ঢাকী অনুভবে বুঝিয়া লইল, মা ঠাকরুণের সুখের সংসারে বিবাদরূপ আগুন লাগিয়াছে; তাই তিনি তথায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়াছেন। ঢাকী পুনরায় বিনয়-বিনম্রস্বরে বলিল, "ছি মা ঠাকরুণ অমন কথা বলতে আছে কি?" এই কথা বলিয়া ঢাকী (বাদ্যকর) সেই স্থানে ঢাক নামাইল এবং বিবিধপ্রকারে প্রবোধবাক্যে কামিনীকে সান্ত্বনা

করিতে লাগিল, কিন্তু সে কিছুতেই শুনিল না, অবশেষে সে ক্রন্দনের সুরে বলিয়া উঠিল, ওগো তুমি যে হও সে হও আমার এই উপকারটী ক'রে যাও; তোমার স্বহস্তে মারিতে হইবে না, আমাকে বলিয়া দিয়া যাও কেমন করিয়া জীবনান্ত করি। যে আমাকে সে উপায় বলিয়া দিতে পারিবে, আমি তাহাকে এই গহনা-পূর্ণ বাক্সটী দিব। এই কথা বলিয়া এই অভিমানরতা চতুরা কামিনী তাহাকে বাক্স খুলিয়া অলঙ্কারগুলি দেখাইল।

ঢাকী আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, আজ্ঞে তবে যদি একান্তই মরবেন তবে আর কি করতে পারি; আর ও রকম সংসারে না থাকাই ভাল।

কামিনী বলিল, বাবা তুমি আমার আর জন্মে কে ছিলে। এক্ষণে বল কিরূপে কার্য্য সিদ্ধি হয়। যদি এই সকল কথা বলিবার কালে কোপ-কষায়িত চক্ষে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দেখা দিতেছিল, তবুও কিন্তু লোভাক্রান্ত বাস্তকর তাহাতে করুণপ্রবণ হইয়া কামিনীকে বাটীতে ফিরাইবার চেষ্টা করিল না। অম্লান-বদনে নিজের ঢাক হইতে রজ্জু খুলিয়া তখনই সেই বৃক্ষশাখায় সংযোজিত করিল এবং বলিল, ঢাকের উপর পা দিয়া এই দড়ির ফাঁস গলায় দিন। এক দিন ত মরিতে হইবে। এখন যদি এই উপায়ে মরেন তা হ'লে সংসারের সকলে সায়েস্তা হইবে। আর কখনও কেহ বউ ঝির মনে কষ্ট দিবে না।

কামিনী বলিল, আমি ঢাকে উঠিব কেমন করিয়া? ঢাকে উঠিলে চামড়া ছিঁড়িয়া যাইবে, আর গলায় দড়ি দেওয়া হইবে না; ঢাক হইতে পড়িয়া যাইব। যদি কোন লোক আসিয়া দেখিয়া ফেলে ত মুখ দেখান ভার হইবে।

ঢাকী এ কথায় সন্তুষ্ট হইল না, এবং দম্ভে বলিয়া উঠিল, চামড়া ছিঁড়িবে এমন ঢাক আমি কাঁধেই করি না, বলেন কি? এই বলিয়া সেই বর্ব্বর ঢাকের উপর দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সেই রোরুদ্যমান কুলবধূকে কেমন করিয়া মরিতে হইবে তাহার প্রক্রিয়া দেখাইতে লাগিল। সেই লোভী বাস্তকর গলায় ফাঁস লাগাইয়া যেমন কামিনীকে ফাঁস লাগাইবার ব্যাপার শিখাইতে যাইবে অমনি পদতল হইতে ঢাক গড়াইয়া গেল, বাস্তকর আর সামলাইতে পারিল না; গলায় দড়ির ফাঁস পড়িয়া গেল। তখন সে চীৎকারপূর্ব্বক হাত পা ছুড়িতে লাগিল কামিনীর শোক গিয়া ভয় দেখা দিল; সে আর সে স্থানে না দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। লোভাপন্ন বাস্তকর তখন হাত পা ছুড়িতে ছুড়িতে

প্রাণত্যাগ করিল। ক্রমে লোকজন আসিয়া উপস্থিত হইয়া সকল ব্যাপার জানিতে পারিল। ইহারই নাম অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

প্রবৃটে।

লেখক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম।

নেহার লো ললনে ললিত বরিষায়!
প্রফুল্ল প্রকৃতি মুখ গম্ভীর কেমন!
তুমি এ বিজনে বালা বিষাদিনী হায়!
সহিছ কি বিরহের নিষ্ঠুর বেদন!
শুনিয়ে মেঘের কণ্ঠে গভীর গর্জ্জন,
অবিরাম ঝর ঝর বর্ষণ বিপিনে,
চঞ্চলা দামিনী হেরি অন্ধকার দিনে,
কেমনে রহে লো স্থির যুবতী-জীবন?
শোভিতা শ্যামলা ধরা! প্রাণ বিমোহন
কদম্ব, কেতকী, যূথী, সেঁউতি, বিম্বিকা
ফুটিছে সরস প্রাণে!—বেলা সেফালিকা,
সুবাসে করিছে ভোর নিকুঞ্জ-কানন!
হে সুন্দরি কেন একা নিভৃত নিবাসে!
নহে কি প্রেমিক বঁধূ তৃষিত প্রবাসে?

গুরুশিষ্যসংবাদ।

লেখক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

শিষ্য ;—মত ভেদ রূপ ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গসমাকীর্ণ দুষ্পার শাস্ত্র সাগরে নিমগ্ন হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ মহাগ্রাহ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ আকৃষ্ট হইতেছি! সারতত্ত্ব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। অতএব আমার প্রতি যদি কৃপা হয়, তবে কি উপায় দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিব, সেই ভবভয়নিবারক সারাৎসার যে জ্ঞান তাহা আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু ;—এক্ষণে তুমি সৎশাস্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা শুদ্ধ বুদ্ধি হইয়াছ। অতি গোপনীয় যে সারাৎসার তত্ত্ব জ্ঞান, যাহা জ্ঞাত হইয়া সাধকগণ মুক্তির উচ্চ সোপানে আরূঢ় হন। তাহা তোমাকে বলিব।

তুমি যদি সকল শাস্ত্র জানিতে ইচ্ছা কর, তবে সহস্র সহস্র বৎসর আয়ুঃ প্রাপ্ত হইলেও শাস্ত্রের শেষ সীমা প্রাপ্ত হইবে না। যেহেতু শাস্ত্র অনন্ত।

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞাতব্য বিষয়ও অনেক, কিন্তু আয়ুর পরিমাণ অতি অল্প অথচ ঐ অল্পায়ুর মধ্যে আবার অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সুতরাং সকল জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব,। অতএব হংস যেরূপ জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে কেবল দুগ্ধ মাত্র পান করে,তদ্রূপ শাস্ত্রের সার অংশ জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।১

দেখ প্রকৃতিবাদ বিষয়ে সাংখ্যগণ, শূন্যবাদ বিষয়ে বৌদ্ধগণ, অস্তি নাস্তি বিষয়ে চার্ব্বাকগণ, শিক্ষাভেদ বিষয়ে বৈষ্ণবগণ নিরত হন এবং অগ্নিহোত্রযাগ বিষয়ে মীমাংসকগণ, সুষুম্না পথ দ্বারা ষট্‌চক্রভেদ বিষয়ে চতুরাশ্রমী (ব্রহ্মচারী, গৃহী. বাণপ্রস্থী ও ভিক্ষু) গণ ও শৈবাচারে শিবভক্তগণ নিরত হন। পরন্তু কেহ কাপাল ব্রতে (বামাচারে) ওকেহ শক্তি ভেদে দীক্ষা বিষয়ে আসক্ত হন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন লোক বিভিন্ন সাধন পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু সকল উপাসনারই চরম ফল ব্রহ্ম সদ্ভাব।

মায়ামুগ্ধতা হেতু যাঁহারা সেই অদ্বৈত ব্রহ্মকে যতদিনে আশ্রয় করিতে না

১। অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং॥ (উত্তর গীতা)

পারেন,তাঁহারা ততদিন বা চিরকালই সাংসারিক স্রোতে ভাসমান হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকেন এবং যাহারা ভক্তিহীন ও সাংসারিক ব্যাপারে ব্যাপৃত অথচ সামাজিক নিয়মের বাধ্য হইয়া পুষ্প বিল্বপত্র দ্বারা লোক প্রদর্শনার্থ পূজা করেন, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মনঃসংযমাদির চেষ্টা করেন না, তাঁহারা খণ্ডজ্ঞান পরায়ণ হইয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না।

যোগাদি যত ক্রিয়াই থাকুক,ভক্তি সকলের মূল। ভক্তিহীন ব্যক্তি প্রাণায়ামাদি দ্বারা মনঃ সংযমের চেষ্টা করিয়াও বাসনা হীন বা মোক্ষভাগী হইতে পারেন না। তাঁহারা ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ বা বিষয়াভিলাষী হইয়া ভোগমার্গে পতিত হইয়া থাকেন। ১।

যেরূপ অন্তঃকাণহীন তুষে আঘাত করিলে তণ্ডুল লাভ হয় না, শ্রম বিফল হয়, তদ্রূপ অভ্যুদয়ের বা মুক্তির উপায় স্বরূপ ভক্তিবিরহিত ব্যক্তি জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য তপঃ ক্লেশ করিলে, তাঁহার ক্লেশ মাত্র সার হয়, জ্ঞান লাভ হয় না। ২। ভক্ত সাধককে ভগবান্ মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু ভক্তি প্রদান করেন না। ৩। কেননা, পরম পুরুষার্থের উপায় স্বরূপ ভক্তি জীবের অনুগত।

শিষ্য ;—কেহ তান্ত্রিক ক্রিয়ান্বিত, কেহ বৈদিক ক্রিয়ান্বিত, কেহ স্মার্ত্ত কর্ম্মান্বিত ; শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্যাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপাসক দেখা যায়। ইহার মধ্যে কোন উপাসনার ফল কি প্রকার ?

গুরু ;—"ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ," মানব সকল ভিন্ন ভিন্ন রুচি বিশিষ্ট, এই জন্যই উপাস্য দেবতা অনেক প্রকার প্রকটিত হইয়াছে। শিব বলিয়াছেন যে, জীবগণের প্রবৃত্তি অনুসারে তদনুরূপ সাধনার বিধান করিয়াছি এবং ভিন্ন ভিন্ন

১। যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতঃ॥
(ভাগবত)

২। শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং॥ (ভাগবত)

৩। অস্ত্যেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দঃ।
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ ন ভক্তি যোগং॥ (ভাগবত)

অধিকারীর নিমিত্ত বিবিধ দেব ও দেবীর সাধন প্রণালীও প্রকাশ করিয়াছি। ১। যেরূপ অধিকারী যে সময়ে যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছে, আমি সেই সময়ে তাঁহাদের উপকারের নিমিত্ত তদনুরূপই বলিয়াছি। ২।

বাস্তবিক এক ভিন্ন দ্বিতীয় দেবতা নাই। ৩। অজ্ঞানাধ্যাস তিরোহিত না হওয়া পর্য্যন্ত মত ভেদ ও দেবতার পার্থক্য বোধ হয়। জ্ঞান চৈতন্য হইলে আর পৃথক ভাব থাকে না।

যেমন এক সূর্য্য ব্যতীত অন্য সূর্য্য জগতে নাই, তদ্রূপ এক দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। বহু পাত্রস্থ জলে যেরূপ বহু সূর্য্য বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক সূর্য্য এক, বহুভাবে বহুরূপে তদ্রূপ একদেবই দৃশ্যমান হন। ৪।

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ, সেই নিরঞ্জন জগদীশ্বর স্বীয় মায়া দ্বারা সৃজন করিয়াছেন। ৫। সেই সর্ব্বব্যাপী আদ্যন্তশূন্য পরমাত্মা সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন। ৬।

শিব বলিয়াছেন যে, আমি মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সহযোগে স্বয়ম্ভু নামে সৃষ্টিকর্ত্তা, স্বাধিষ্ঠানে মহাবিষ্ণু নামে ত্রিলোকের পালনকর্ত্তা, মণিপুরে মহারুদ্র নামে সর্ব্বসংহার কর্ত্তা, এবং অনাহতে সকল দেবগণের পূজিত ঈশ্বর, বিশুদ্ধ চক্রে

১। জীবপ্রবৃত্তিকারিণি কানি চিৎ কথিতান্যপি।
দেবা নানাবিধাঃ প্রোক্তা দেব্যোঽপি বহুধা প্রিয়ে

২। যথা যথা কৃতাঃ প্রশ্না যেন যেন যদা যদা।
তদা তস্যোপকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে ॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

৩। একমেবাদ্বিতীয়মিতি শ্রুতিঃ।

৪। একদেবং বিনা দেবি নাস্তি দেবো মহীতলে।
একসূর্য্যং বিনা সূর্য্যো নাস্তীহ জগতি যথা।
বহুপাত্রে স্থিতে তোয়ে বহুসূর্য্যং যথা প্রিয়ে।
বহুভাবে তথা দেবো বহু রূপেণ দৃশ্যতে ॥

সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণীধৃত,পিচ্ছিলাবচন

৫। ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ। (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

৬। গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ ॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

ষোড়শদলে সদাশিব, আজ্ঞা চক্রে দ্বাদশ দল পদ্মে চিদ্রূপে সাক্ষাৎ শিব ও সহস্রারে ত্রিকোণ মণ্ডলে বিন্দুরূপে পরমেশ্বর নামে অবস্থান করিতেছি। ১। *

এই সহস্রার স্থিত পরমেশ্বর বা পরম শিবই পরমাত্মা এবং সকল সম্প্রদায়ের সকল সাধকের উপাস্য দেবতা।

ষট্‌চক্রে উক্ত আছে যে, মস্তকস্থ চিদ্রূপাত্মার নিলয়স্থান সহস্রারকে শৈবগণ শিবস্থান, বৈষ্ণবগণ পরম পুরুষ বিষ্ণুর স্থান, অপর কোন সাধক হরিহরের স্থান এবং শাক্তগণ দেবীপদস্থান বলেন ও মুনি শ্রেষ্ঠগণ প্রকৃতি পুরুষের নির্ম্মল স্থান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ২। প্রকৃত পক্ষে সকলের মস্তকেই এক নিরঞ্জন পরমাত্মা দেব অবস্থান করিতেছেন ; সেই পরমাত্মাকেই বিভিন্ন প্রণালীর উপাসকগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

আরও দেখ লিঙ্গপুরাণ ও ষট্‌চক্রাদি গ্রন্থে উক্ত আছে যে, হৃদয়ে অনাহত চক্রে ঈশ্বর অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন যে, হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন। ৩। এই ঈশ্বরই যে পরমাত্মা ও সকল সম্প্রদায়ের মুমুক্ষুগণের উপাস্য দেবতা তাহা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন একটী অদ্ভুত আনন্দোৎপাদক রোমহর্ষণ ব্যাপার শ্রবণ কর, ইহা দ্বারা, সহজে বুঝিতে পারিবে। মোহার দেশে।

১। মূলাধারে স্বয়ম্ভুশ্চ কুণ্ডলী শক্তিসংযুতঃ।
স্বাধিষ্ঠানে মহাবিষ্ণু স্ত্রৈলোক্যপালকঃ সদা।
মণিপুরে মহারুদ্রঃ সর্ব্বসংহারকারকঃ।
অনাহতে ঈশ্বরোহহং সর্ব্বদেবনিষেবিতঃ।
বিশুদ্ধাখ্যে ষোড়শাব্জে সদাশিব ইতি স্থিতঃ।
আজ্ঞাচক্রে শিবঃ সাক্ষাচ্চিত্তরূপেণ সংস্থিতঃ।
সহস্রারে মহাপদ্মে ত্রিকোণনিলয়ান্তরে।
বিন্দুরূপে মহেশানি পরমেশ্বর ইরিতঃ॥ (লিঙ্গপুরাণে)

(* ষট্‌চক্রে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।)

২। শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণাঃ
লপন্তীতৎ প্রায়ো হরিহরস্থানং কেচিদপরে
পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দরসিকাঃ।
মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতিপুরুষস্থানমমলং॥ (ষট্‌চক্র)

৩। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। (ভাগবদ্‌গীতা)

মাতঙ্গ মুনি সংস্থাপিত লিঙ্গের উপরিভাগে, নিশ্চিন্ত ও ভীতি শূন্য মহাত্মা সর্ব্বানন্দ ঠাকুর শবারোহণ পূর্ব্বক স্বাপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। ১। অনন্তর নিশিথ সময়ে স্বকীয় হৃৎপদ্ম হইতে চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি সদৃশ পরম তেজঃ বিনির্গত হইয়া, প্রজ্জলিত লৌহ পিণ্ডের ন্যায় সেই বনকে ব্যাপ্ত করিল। পরে ঐ তেজঃ গাঢ় হইলে সুনির্ম্মল, ইষ্ট দেবীর প্রতিবিম্ব বলিয়া প্রতীয়মান হইল এবং ক্রমে অবলোকন করিতে করিতে ইষ্ট দেবী দৃষ্টি গোচর হইলেন। তখন পূর্ণকাম মহাত্মা সর্ব্বানন্দ দেব আনন্দের সহিত গুরূপদিষ্ট ধ্যান মনোদ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২।

রাজকুমার ধ্রুব নিশ্চয় দৃঢ় যোগপ্রভাবে হৃৎপদ্মে যে বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করিতে ছিলেন। হঠাৎ সেই প্রভা তিরোহিত হওয়াতে, নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক দৃষ্টি বিস্তার করিলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ বহির্দ্দেশে অবস্থিত গরুড়োপরিস্থ সেই মদন মোহন মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ৩।

ইহা দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, যখন মহাত্মা সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের হৃদয়ের জ্যোতিঃ ইষ্টদেবী রূপে এবং রাজকুমার ধ্রুবের হৃদয়ের জ্যোতিঃ বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হইলেন, তখন হৃদয়স্থ সেই জ্যোতিঃ স্বরূপ এক ঈশ্বরই সাধকের রুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীরূপে আবির্ভূত হইয়া অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া

১। লিঙ্গোপরি শবারূঢ়ঃ সর্ব্বানন্দো মহামতিঃ।
প্রজপেৎ স্বমনুং ভক্ত্যা নিশ্চিন্তো নির্ভয়ো যতঃ॥

(সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী)

২। অথ তন্নিশিথে কালে স্বকীয়হৃদয়াম্বুজাৎ।
নিঃসৃত্য তেজঃ পরমং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভিঃ প্লুতম্।
ব্যাপিতং তদ্বনং সর্ব্বময়ঃপিণ্ডাগ্নিবত্তদা।
অপশ্যত্তেজসো গাঢ়াৎ স্বেষ্টবিম্বং সুনির্ম্মলং।
শনৈরালোকনাত্তত্র প্রাপশ্যদ্দৃষ্টিগোচরে।
গুরূপদিষ্টং যদ্ধ্যানং চিন্তিতং চেতসা মুদা॥ (সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী)

৩। স বৈ ধিয়া যোগবিপাকতীব্রয়া,
হৃৎপদ্মকোষে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভম্।
তিরোহিতং সহসৈবোপলক্ষ্য
বহিঃস্থিতং তদবস্থং দদর্শ॥ (ভাগবত)

থাকেন। সুতরাং পৃথক্ ভাব অজ্ঞানতার কার্য্য। শাস্ত্রে আছে যে, সৌর, শাক্ত উক্ত গাণপত্য,শৈব ও বৈষ্ণব,এই সকল নামভেদ মাত্র। এক হরি নাম বা অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সকলের উপাস্য। ১।

প্রসিদ্ধ মহিম্ন স্তোত্রেও প্রকাশ আছে যে, সরল ও বক্রগামিনী নদী সকল যেরূপ কালক্রমে একমাত্র সাগরকেই প্রাপ্ত হয়। রুচির বিচিত্রতা হেতু সরল ও কুটীল নানা ধর্ম্মপথগামী মানবগণও সেইরূপ একমাত্র পরমেশ্বরকে লাভ করেন। ২।

প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম একই, কেবল সাম্প্রদায়িক ভাবই তাহাকে বহুবিধরূপে প্রতীত করে। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি যে কোন দেবতারই উপাসনা করুন, সকলই সেই চিদাত্মা পরংব্রহ্মে অর্পিত হয় এবং মুক্তিপদ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের গন্তব্য স্থানও একই।

শিষ্য ;—এক ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ হন। স্ত্রী পুরুষের কোনও প্রভেদ নাই কি ?

গুরু ;—ওরে! সমস্ত জগৎ স্ত্রীময়। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতিক সমুদয়ই স্ত্রী মধ্যে গণ্য বলা যাইতে পারে। শিব বলিয়াছেন যে শক্তিই শিব, এবং শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, অন্য গ্রহগণ ও সমস্ত জগৎ শক্তিস্বরূপ। নারকী লোক তাহা বুঝিতে পারে না। ৩।

পুংলিঙ্গ যাহাকে বলা যায় তাহাও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন! মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন যে,সত্ব,রজ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব, মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও উভয় ইন্দ্রিয়

১। সৌরশাক্তগাণপত্যশৈববৈষ্ণবসঙ্গিনঃ।
নাম ভেদেন গায়ন্তি হরের্নামৈব কেবলম্॥

২। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকোগম্য স্তমসিপয়সামর্ণব ইব॥ (মহিম্নস্তোত্র)

৩। শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তিব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ।
শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহা ধ্রুবম্।
শক্তিরূপং জগৎ সর্ব্বং যো ন জানাতি নারকী॥
(তন্ত্রসার)

(দশ ইন্দ্রিয়ওউভয়াত্মক মনঃ) এবংপঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে।১। অতএব যাহা দ্বারা পুরুষ নির্বাচিত হয়, সেই পুং জননেন্দ্রিয়ও প্রাকৃতিক, সমাধিস্থ যোগিগণের যে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক কোন উপাধি নাই। তিনি অনুপহিত চৈতন্য ও কর্ত্তৃত্ব হীন, সুতরাং সৃষ্টি পালন ও সংহারের কর্ত্তা তিনি নহেন। কিন্তু তিনিও প্রকৃতি হইতে পৃথক্ নহেন, পরস্পরের অবিনা-ভাব সম্বন্ধ।

মূল প্রকৃতিতে উপহিত তুরীয় ব্রহ্মকে * পুরুষ দেব এবং ব্রহ্মযুক্তা মূল প্রকৃতিকে স্ত্রী দেবতা বলা যায়। পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে ব্রহ্ম প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব এবং প্রকৃতি ব্রহ্মের চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরস্পর পৃথক হইলে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব ও প্রকৃতির চৈতন্য থাকিত না।

সুতরাং ব্রহ্ম যুক্তা প্রকৃতিকে দেবী এবং প্রকৃতি যুক্ত ব্রহ্মকে দেব বলা যায়। উভয়ই এক ঈশ্বর পদ বাচ্য। ঈশ্বর পুংবাচক শব্দ বলিয়া দেবী ঈশ্বর নহেন, এরূপ ধারণা অজ্ঞানতার কার্য্য। ঈশ্বর না বলিয়া বরং ঈশ্বরী বলিবে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন পার্থক্য নাই।

হরগৌরী এক আত্মা এবং হরিহর এক আত্মা, এই প্রসিদ্ধ বাক্য দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, এক জগদীশ্বরই নানা রূপে ভক্ত সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। ব্রহ্ম স্বরূপ যে ওঁ কার, তাহাও প্রকৃতির গুণত্রয় হইতে উৎপন্ন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, হে ধনঞ্জয়, অকার, উকার ও মকার অর্দ্ধ মাত্রাতে সংযুক্ত হইয়া জ্যোতিঃ (ব্রহ্ম) স্বরূপ, ওঁ হইয়াছে। এই অকার পীত বর্ণ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, উকার শুক্লবর্ণ সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন ও মকার কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

এক নিরঞ্জন ব্রহ্মই শুক্লবর্ণ সত্ত্ব স্বরূপ উকার, তিনিই পীতবর্ণ রজঃস্বরূপ

১। সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্
মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়,
তন্মাত্রেভ্যো মহাভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।
(সাংখ্যদর্শন)

* নিষ্কল নির্গুণ ব্রহ্ম এবং তটস্থ লক্ষণ যুক্ত ব্রহ্ম অভিন্ন ও এক হইলেও স্বরূপগত ভেদ আছে। উপহিত চৈতন্য সৃষ্টি পালন ও সংহারের কর্ত্তা। সুতরাং আবশ্যক মতে নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন।

অকার এবং তিনিই কৃষ্ণবর্ণ তমঃ স্বরূপ মকার। বেদ সমূহ, দেবতা সকল এবং ত্রিলোকের চরাচর সমুদয় বা বিশ্ব সংসার এক প্রণব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ।১।

শিবও দেবীকে বলিয়াছেন যে, হে শিবে তুমি পরম ব্রহ্মের পরমা প্রকৃতি। কেবল তোমার সহিতই তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তোমা হইতে সকল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং তুমিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জননী। মহত্তত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এই চরাচর জগৎ তোমা কর্ত্তৃক সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই জগৎ প্রপঞ্চ তোমারই অধীন। তুমি সকলের আদ্যা; সমস্ত মহাবিদ্যা, সিদ্ধ বিদ্যা, বিদ্যা ও উপবিদ্যা তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ এবং আমিও তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। তুমি জগতের সকল বিষয় অবগত আছ। কিন্তু তোমাকে কেহই জানিতে সক্ষম হয় না।২। ইহা দ্বারা বুঝিতে পার যে, সকলই যখন প্রকৃতি দেবী হইতে উৎপন্ন, তখন সেই আদ্যা ভগবতীই প্রকৃত ঈশ্বর পদ বাচ্য। অন্য সকল তাঁহার কৃপায় ঈশ্বর পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ত্রিগুণাত্মক প্রণবের অকার বিষ্ণু, উকার মহেশ্বর ও মকার ব্রহ্মা।২। ইচ্ছা শক্তি (গৌরি), ক্রিয়া শক্তি (ব্রাহ্মী) ও জ্ঞান শক্তি (বৈষ্ণবী), এই ত্রিবিধ শক্তি জ্যোতিঃ স্বরূপ প্রণবে বিদ্যমান আছেন।৩। অতএব বলা বাহুল্য যে ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপিনী আদ্যা শক্তি হইতে উৎপন্ন প্রণব, সশক্তিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি স্থল।

১। অকারশ্চ উকারশ্চ মকারশ্চ ধনঞ্জয়।
অর্দ্ধ-মাত্রা সমাযুক্ত-মোমিতি-জ্যোতি রূপকম্।
অকারঃ পীত-বর্ণশ্চ রজগুণ-সমুদ্ভবঃ।
উকারঃ সাত্বিকঃ শুক্লো মকারঃ-কৃষ্ণতামসঃ।
উকারঃ শুক্ল-বর্ণাভঃ সত্ব-রূপো নিরঞ্জনঃ।
অকারো রাজসঃ পীতো মকারঃ কৃষ্ণ-তামসঃ।
ওঁকার-প্রভবা বেদা ওঁকার-প্রভবাঃ সুরাঃ।
ওঁকার-প্রভবং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ গীতা সার।

২। ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে।
মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়েবোৎ-পাদিতং ভদ্রে ত্বদধীন-মিদং জগৎ।
ত্বমাদ্যা সর্ব্ব-বিদ্যা-নামাস্মাক মপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং নত্বাং জানাসিকশ্চন। মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্র

২। অকারো বিষ্ণু-রুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারে গোচ্যহস্ত প্রণবেণ ত্রয়ো মতাঃ॥

৩। ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মীচ বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎ পরং জ্যোতি-রোমিতি।
গোরক্ষ নাথ কৃত—বিমুক্তি-সোপান

ক্রিয়া শক্তি (মহাসরস্বতী) ব্রহ্মার সহিত সঙ্গতা হইয়া রজো গুণানুসারে সৃষ্টি করিতেছেন। জ্ঞান শক্তি (মহালক্ষ্মী) বিষ্ণুর সহিত সঙ্গতা হইয়া সত্ত্ব গুণানুসারে পালন করিতেছেন। ইচ্ছা শক্তি (মহা কালী) মহেশ্বরের সহিত সঙ্গতা হইয়া তমোগুণানুসারে সংহার করিতেছেন। আদ্যাশক্তিই চৈতন্য সহযোগে তিনগুণানুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী হইয়াছেন এবং আদ্যাশক্তিতে উপস্থিত চৈতন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হইয়াছেন। সুতরাং গৌরী ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী, এক আদ্যাশক্তির (ব্রহ্মযুক্তা প্রকৃতির) অংশ মাত্র এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর আদ্যাশক্তিতে উপহিত তুরীয় ব্রহ্মের অংশ মাত্র। এইহেতু ইহাদিগকে সৃষ্টি, স্থিতি সংহারের কর্ত্তা বলা যাইতেছে।

অন্যান্য দেব হইতে সমস্ত জীব গুণত্রয়ের তারতম্য অনুসারে উৎপন্ন হইয়াছেন। সাত্ত্বিক জীব দেবাদি উত্তম, রাজসজীব মানবাদি মধ্যম এবং তামসজীব পশু প্রভৃতি অধমজীব রূপে উৎপন্ন হইয়াছে।১

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

লেখক শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

গার্হস্থ্যাশ্রম।

স্রোত ফিরিয়াছে। শিক্ষিত নব্য যুবকেরাও আপনাকে হিন্দুসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে আর কুণ্ঠা বোধ করেন না। অনেকে শাস্ত্রালোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। সংবাদপত্র, সভা, সমিতি, থিয়েটারাদিতে সর্ব্বত্রই হিন্দুধর্ম্মের বক্তৃতা—হিন্দু ধর্ম্মেরই আলোচনা হইতেছে। সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশেও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ও ধর্ম্ম প্রচারেরও চেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে ইহা শুভলক্ষণ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতই কি তাহাই? কথাটা ধীরভাবে একবার চিন্তা করিয়া দেখা হিন্দুসন্তান মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ফলকথা আজি কালি যে ভাবে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা চলিতেছে। তাহাতে তাহাকে শুভলক্ষণ না বলিয়া, অবনতি বা অধঃপতনের পূর্ব্ব

১। ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যং গচ্ছন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণ বৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

লক্ষণ বলিয়াই আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে। এখনকার নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেরই সমগ্র শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস নাই। বাছিয়া গুছিয়া লেজা মুড়া বাদ দিয়া আপনাদের অনুকূল মত যাহাতে দেখিতে পান, কেবল সেই সকল শাস্ত্রই তাঁহারা মানিয়া থাকেন। ভগবানের অবতার স্বরূপ পূজ্যপাদ ঋষিগণকে সর্ব্বজ্ঞ অভ্রান্ত পুরুষ বলিয়াও তাঁহারা মনে করেন না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক আবার সংস্কার প্রয়াসী। হিন্দুধর্ম্মের কোন কোন অংশকে সুসংস্কৃত ও বর্ত্তমান কালের অবস্থাপযোগীরূপে গঠন করিয়া লইতেও তাঁহারা কৃতসংকল্প। কতকগুলি লোক হিন্দুর জাতিভেদ প্রথাটা এককালীন উঠাইয়া দিয়া, সমাজকে একাকার করণে বদ্ধপরিকর। কেহ কেহ বা শাস্ত্রমতে সংস্রব দোষ বা খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিবার আবশ্যকতাই অনুভব করেন না। বলা বাহুল্য যে, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কেবলই যথেচ্ছাচার চলিতেছে।

আমাদের বেদমূলক সনাতনধর্ম্ম নিত্য পদার্থ। যাহা নিত্য, কোনকালেই তাহার সংস্কার বা পরিবর্ত্তন সম্ভবে না। পুরাণাদি পাঠেই বুঝা যায় যে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কত যুগযুগান্তর ধরিয়া, ইহা একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে; এই ধর্ম্মের সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের কোন কথাও কখন উঠে নাই। সুতরাং যাহারা ইহার সংস্কার প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে বাতুল ভিন্ন আর কি বলিব? ফলকথা হিন্দুর সমগ্র শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস এবং শাস্ত্রোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও আচার নিয়মাদি সম্যক্‌রূপে পালন না করিয়া, কেবল বাক্যে আপনাকে 'হিন্দু' নামে পরিচিত করিলেই হিন্দু হওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে;—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তু মিহার্হসি॥"

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে কোন কালেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এবং তাহার সুখ ও পরাগতিও লাভ হয় না। অতএব হে অর্জ্জুন! শাস্ত্রবিধি দৃষ্টে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া তদনুসারেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

এখন শাস্ত্র কাহাকে বলে এবং কোন্ কোন ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, সেই কথাটা বলিতেছি।

শব্দব্রহ্মরূপ অনাদি অপৌরুষের বেদই আর্য্যধর্ম্মের মূল। এই বেদ শাস্ত্রই ভারতীয় আর্য্যজাতির নিখিল কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ডের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ। বেদাঙ্গ, বেদান্ত স্মৃতি, আগম, ও পুরাণাদি যাবতীয় শাস্ত্রই বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভেদ মাত্র। বেদবিরুদ্ধ কোন শাস্ত্রই হিন্দুরগ্রাহ্য নহে। কোন ব্যক্তি ঈশ্বরকে না মানিলে, তাহাকে নাস্তিক বলে না; কিন্তু বেদ না মানিলে বা বেদের নিন্দা করিলে, সে ব্যক্তি নাস্তিক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। জ্ঞানার্থ বিদ্‌ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয় করিয়া বেদ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বেদের অর্থই জ্ঞান—সংসার জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিয়াই ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করণে সমর্থ হইয়া থাকেন। বেদের কেহ কর্ত্তা নাই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে তপস্যা দ্বারা অগ্রে বেদা স্মরণ করিয়া তাহার পর সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। শাস্ত্রে আছে,—

"ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ বেদ-স্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।"

বেদের এত মাহাত্ম্য বলিয়াই হিন্দু সমাজে তিনি চিরপূজিত হইয়া আসিতেছেন। এই বেদজ্ঞানা সম্পন্ন পশ্চাল্লিখিত ঋষিগণই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক। যথা,—

মন্বত্রিবিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী।
পরাশরব্যাসশঙ্খ-লিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপবশিষ্টশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ॥

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতাম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ, এই বিংশতি জন ঋষিই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক। অর্থাৎ ইহাঁদের বাক্যই বেদবৎ মাননীয়। বস্তুতঃ এই সমস্ত ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রই স্মৃতিশাস্ত্র নামে কথিত হইয়া থাকে।

দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহাদের কৃপাবলে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম অদ্যাপি জগতে অটলভাবে দণ্ডায়মান, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা, প্রাণ ও ভিত্তি স্বরূপ, আজি ভারতের এমনি দুর্দ্দিন পড়িয়াছে, সেই সমস্ত জগৎপূজ্য ঋষিগণের প্রকৃত স্বরূপ অনেকেই পরিজ্ঞাত নহেন। বিশেষতঃ শিক্ষার মোহে অভিভূত বিকৃতমস্তিষ্ক নব্য সম্প্রদায় মনে করেন, বর্ত্তমান কালের শাস্ত্র ব্যবসায়ী সংস্কৃতজ্ঞ-ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যেমন রহিয়াছেন, ঋষিরাও বুঝি প্রাচীন কালে সেই আকারের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন; তবে তাঁহারা ইহাঁদের অপেক্ষা অধিক বিদ্বান, অধিক বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, এই মাত্র বিশেষ। বস্তুতঃ কেবল এইরূপ ভ্রান্ত

বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা বর্ত্তমান কালের দুই একজন সদাশয় ব্যক্তির প্রতিও ঋষি শব্দের প্রয়োগ করিতে লজ্জা বোধ করেন না। যাহা হউক আর্য্য ঋষিগণ কি গুণে ও কিরূপ অলৌকিক শক্তিবলে জগৎপূজ্য হইয়া রহিয়াছেন, ও ঋষি শব্দের প্রকৃত অর্থই বা কি ইত্যাদি কথা আমাদের শাস্ত্রেই বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। পাঠকগণের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার কিয়দংশ এই স্থলেই উদ্ধৃত হইতেছে। যজুর্ব্বেদ তৈত্তিরীয় আরন্যকে কথিত হইয়াছে, —

"অজান্ হবৈ পৃশ্নীংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ং।
স্বয়ম্ভ্বভ্যা নর্ষৎ তদৃষয়োঽভবন্তদৃষীণামৃষিত্ব্ম॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, কল্পের আদিতে যে মুনিগণ প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বরূপতঃ নির্ম্মল হইলেও পুনঃ পুনঃ তপস্যা করিয়াছিলেন। জগৎকারণ স্বতঃসিদ্ধ পরমব্রহ্ম তাঁহাদের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া, কোন প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক ঐ তপস্যমান্ ঋষিগণের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন। সেই কারণেই তাঁহারা ঋষি ধাতুর অর্থানুসারে ঋষিশব্দ বাচ্য হইয়াছেন। অনন্তরজাত অন্য ঋষিগণেরও এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ঋষিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এই বেদোক্ত আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া নিরুক্তকারগণও ঋষিশব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। ভগবান্ যাস্ক তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থে ঋষিশব্দের নিম্নলিখিতরূপ অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, —

"ঋষিদর্শনাৎ স্তোমান্ দদর্শেতি ঔপমন্যবঃ তদ্যদেনাং
তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষৎ তৎঋষীণাং ঋষিত্ব
মিতি বিজ্ঞায়তে।"

অর্থাৎ সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়ার্থ যিনি দর্শন করেন, তিনিই ঋষি। উপমন্যব আচার্য্য বলেন, বেদ মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহারা ঋষি। যথা "তদ্যদেনাং" ইত্যাদি।

প্রথমোদ্ধৃত ব্রাহ্মণাংশের সায়ণ ভাষ্যানুসারে পরব্রহ্ম ঋষিগণের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা ঋষি; যাস্কের মতে তাঁহারা সূক্ষ্মার্থ দর্শন করেন বলিয়া ঋষি এবং ঔপমন্যবাচার্য্যের মতে তাঁহারা বেদ দর্শন করিতেন বলিয়াই, ঋষি। বস্তুতঃ এই তিন মতের এক বাক্যতা করিলে, ইহাই-প্রতিপন্ন হয় যে, ঋষিগণ অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থ দর্শন করিতেন। কেননা ব্রহ্মও অতীন্দ্রিয়, বেদও

অতীন্দ্রিয়। অর্থাৎ বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় দুই, ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম; এই দুই বিষয়ই অতীন্দ্রিয়।

"প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা তু যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা॥"

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যে উপায় (ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের উপায়) বুঝিতে পারা যায়না, সেই উপায় বেদ হইতে জানা যায় বলিয়াই, উহার নাম বেদ।

বস্তুতঃ ঋষিগণ যে বেদ দর্শন করিতেন, তাহা শাস্ত্রের অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্যই তাঁহারা কোন স্থলে মন্ত্র দ্রষ্টা, আবার কোন স্থলে মন্ত্রকৃৎ নামে অভিহিত হইয়াছেন। সায়নাচার্য্য যজুর্ব্বেদ ভাষ্যের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"অতীন্দ্রিয়ার্থ দ্রষ্টারঃ ঋষয়স্তেষাং বেদদ্রষ্টৃত্বং স্মর্য্যতে।"
যুগান্তে তর্হি তান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা॥"

অর্থাৎ প্রলয় কালে ইতিহাস সহিত বেদ অন্তর্হিত ছিল। ঋষিগণ তপস্যা দ্বারা স্বয়ম্ভুর অনুগ্রহেই তাহা লাভ করিয়াছিলেন। আবার শ্রুতি অন্যস্থলে বলিতেছেন,—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীমায়মন্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্।"

যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞ দ্বারা বেদলাভ যোগ্য হইয়া, ঋষিস্থিত সেই বেদ লাভ করিয়াছিলেন।

ভগবান যাস্ক তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থের অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মাণঃ ঋষয়ো বভুবুঃ। তেহবরেভ্যো,
সাক্ষাৎ কৃতহ-ধর্ম্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সমপ্রাদুঃ।"

পূর্ব্বে ঋষিগণ নির্ম্মল সত্ত্ব হেতু ধর্ম্মাদি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও বেদ মন্ত্রাদি স্বয় অনুভব করিতেন এবং পরবর্ত্তী ঋষিগণকেও উপদেশাদি দ্বারা ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দিতেন। পরিশেষে এই শেষোক্ত ঋষিগণও তাঁহাদের ন্যায় সূক্ষ্মার্থদর্শী হইতেন। শাস্ত্রে আর্ষ জ্ঞানের নিম্ন লিখিত রূপ লক্ষণ কথিত হইয়াছে। যথা,—

"আম্নায়বিধাতৃণামৃষীণামতীতানাগতবর্ত্তমানেষতীন্দ্রিয়ার্থেষু
ধর্ম্মাদিষুগ্রন্থোপনিবদ্ধেষু বা লিঙ্গাদানপেক্ষ নাদাত্ম-
মনসোঃ সংযোগাদ্ধর্ম্ম বিশেষাচ্চ প্রাতিভং জ্ঞানং
যদুৎপদ্যতে তদার্ষম্।*"

*এই পরিচ্ছেদে ঋষি মাহাত্ম্য সূচক যে সমস্ত বৈদিক প্রমাণ বচনাদি উদ্ধৃত হইল, তৎসমস্তই পূর্ব্বতন বেদব্যাস পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ বিশেষ হইতে পরিগৃহীত।

মর্ম্মার্থ এই যে, বেদবিধাতা ঋষিগণের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের অতীন্দ্রিয় বিষয়ে, ও গ্রন্থোপনিবদ্ধ ধর্ম্মাদিতে প্রমাণাদির অপেক্ষা না করিয়া, আত্মমনঃ সংযোগে ও ধর্ম্ম বিশেষ দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম আর্ষ জ্ঞান।

যাহা দর্শিত হইল, ঋষি মাহাত্ম্য বুঝিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ আমাদের আর্য্য ঋষিগণ যে যোগবলে সর্ব্বজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী, অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য ও ঐশীক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন, সকল শাস্ত্রেই তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই জন্যই তাঁহারা হিন্দু সমাজে দেববৎ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের বাক্য কখন মিথ্যা হইতে পারেনা, ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস। তবে আপাত দৃষ্টিতে ঋষি প্রণীত শাস্ত্র সকলের মধ্যে যে স্থান বিশেষে মতবিরোধ লক্ষিত হইয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে তাহা মতবিরোধ নহে; অধিকারী ভেদ, রুচিভেদ ও ক্রিয়া ভেদাদিই সেই সমস্ত মত-বৈচিত্রের এক মাত্র হেতু। নতুবা পরস্পর বিরুদ্ধ শাস্ত্র সকলের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্যই রক্ষিত হইয়াছে। গন্ধর্ব্ব রাজ পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন,

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি মতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল-নানাপথজুষাং,
নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সার্ণব ইব॥ মহিম্ন স্তব।

মর্ম্মার্থ এই যে, বেদমত, সাংখ্যমত, যোগশাস্ত্র, তন্ত্রমত ও বৈষ্ণব মত প্রভৃতি নানামত প্রচলিত থাকায়, মানবগণ উপাসনা কার্য্যে রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন পথই অবলম্বন করিতেছে বটে, কিন্তু ঋজু, কুটিল যে পথেই যিনি গমন করুন, সকলেরই গম্যস্থান একমাত্র তুমি (ভগবান)।

ফলকথা বিচার মীমাংসার সময় পণ্ডিতগণ "সম্ভবত্যেক বাক্যত্বে বাক্য ভেদো ন যুজ্যতে" এই বচনানুসারে পরস্পর বিরুদ্ধ মতকে একবাক্য করিয়াই লইয়া থাকেন।

শাস্ত্রের কথায় প্রয়োজন বোধে প্রসঙ্গাধীন অনেকগুলি অবান্তর কথারও আলোচনা করিতে হইল। যাউক সে কথা। অতঃপর প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে। ক্রমশঃ

অর্থের মহিমা।

একটি জনাকীর্ণ সহরের এক গলির মধ্যে, একটি আগন্তুক ভদ্রলোক আসিয়া বাসা লইয়াছিল। ভদ্র লোকটির নাম কেনারাম, বয়স অনুমাণ ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বৎসর, চীন দেশের মনুষ্যের ন্যায় বর্ণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মুখখানি চক্রাকার; চাকা মুখ সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিযুক্ত, হাসি হাসি।

কেহ বলে লোকটি ধীবর, চাষী কৈবর্ত্ত নহে, মাছধরা জেলে, কেহ বলে, নমঃশূদ্র মফঃস্বলে জাতীয় ব্যবসায়ে কেনারামের দিনগুজরাণ হইত, সম্প্রতি কয়েক বৎসর পাটের কারবার করিয়া তাহার হস্তে অনেকগুলি টাকা হইয়াছে। মফঃস্বলের পল্লীগ্রামে ধীবরের টাকায় ভদ্র লোকের দৃষ্টি পড়েনা, টাকার জোরে কেনারাম সমাজের মধ্যে একজন বড়লোক হইতে পারিল না। সেই জন্য সহরে "বড় বাবু" হইতে আসিয়াছে।

কেনারামের বাসাবাড়ীটি সুবৃহৎ দুই মহল, দ্বিতল, উপর নিচে অনেকগুলি ঘর, সদর বাড়ীর উঠানে অনেক জায়গা, বাড়ীতে কেনারাম, কেনারামের স্ত্রী, একটি বিধবাভগ্নী, আর চতুর্দ্দশ বর্ষীয় একটি ভ্রাতুষ্পুত্র এই পর্য্যন্তনিজ পরিবার। তাহা ছাড়া দুইজন মুহুরি, পাঁচজন চাকর, পাঁচজন দাসী, একজন পাচক ব্রাহ্মণ, একজন ব্রাহ্মণী, দ্বারে একজন ব্রজবাসী দরোয়ান।

সহরের কতকগুলি লোকের স্বভাব এইরূপ যে নূতন একটা বড়লোক আসিলে, পাড়ার অনেকলোক তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে যায়। কেহ কেহ খোসামোদ করে; এমন কি, দুই একজন টিকিওয়ালা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও এই প্রকারে সেই লোকের মোসাহেব হয়। পাড়ার বিশ পঁচিশজনভদ্রলোকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কেনারাম একজন স্বধর্ম্মপরায়ণ মিষ্টভাষী সর্ব্বজন প্রিয় সামাজিক ভদ্রলোক, বলিয়া পাড়ার সকলের মধ্যে সুপরিচিত হইয়াছিল। লোকগুলির মধ্যে দুইজন ভট্টাচার্য, একজনের নাম হরিনারায়ণ শিরোমণি, আর এক জনের নাম দামোদর তর্কভূষণ।

কেনারামের ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহ। উক্ত শিরোমণি, আর তর্কভূষণ মহাশয় সেই বিবাহে অধ্যক্ষ হইলেন, আরও পাঁচ সাত জন ভদ্র নামধারী প্রতিবাসী তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। শুভ বিবাহের খরচের ফর্দ্দ হইল, জিনিষ পত্র আয়োজন হইতে লাগিল। সমারোহ ব্যাপার। কেনারামের অর্থ প্রচুর।

কেনারামের বাড়ীতে উচ্চ তোরণের উপর কাড়া নাগরা বাজিতেছে। সেই

পথদিয়া হরিনারায়ণ শিরোমণির দুই জন ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী ছাত্র সেইপথদিয়া যাইতেছিল। একজন অপরকে বলিল, "বল দেখি ভাই, বাদ্য কি বোল বলিতেছে,?" অপর বন্ধু উত্তর করিলেন, এই বোল বলিতেছে—

"ধনৈর্নিষ্ক-লীনাঃ কুলীনাঃ ক্রিয়ন্তে
ধনৈরাপদো মানুষানিস্তরন্তি।
ধনে ভ্যোন কশ্চিৎ সুহৃদ্ বিদ্যাতেহন্যো
ধনাগুর্জ্জয় ধবং ধনাগুর্জ্জ ধবম্"

আজ কালকার লোক সমাজের ইহাই বোল। এই বোলের উপরই জাতি, ধর্ম্ম, মান, মনুষ্যত্ব সমস্তই নির্ভর করিতেছে।

কেনারামের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, কায়স্থ ব্রাহ্মণগণকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া জলপান করাইবে; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, সুতরাং কর্ম্ম-কর্ত্তা সেই ইচ্ছা অফলবতি থাকিল না; একসঙ্গে কায়স্থ ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হইল, বিবাহের তিনদিন পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত লোকগণের বাড়ী বাড়ী সামাজিক বিতরণ করা হইল। একটি পিতলের ঘড়া, একখানি সাড়ী, অর্দ্ধসের তৈল, এক থালা সন্দেশ এক হাঁড়ী দধি সামাজিক—বরাদ্দ।

কেনারাম দাস—অনেক জাতি দাস হয়; কেনারাম কি জাতি কি বৃত্তান্ত, যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন আর আর সকলে তাহা জানিতেন না; তথাপি যাহারা দাসের বাড়ীর সামাজিক লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহারা সামাজিক ফিরাইয়া দিলেন, যাঁহারা লোভি, অথবা ধনী লোকের মান মর্য্যদা রাখিতে সর্ব্বদা তৎপর, তাঁহারা ততটা ভেদা-ভেদ বিচার করেন নাই, তাঁহারা সামাজিক গ্রহণ করিলেন।

তৎপরদিবস নিমন্ত্রিতগণের বাটীতে এক একটি সিদা গেল। যাঁহারা সামাজিক গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদিগকে সিদা দেওয়া হইল না। তৎপর দিবস জল পানের ব্যাপার। এক দিনেই ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণের জলপান, লুচি তরকারি, দধি, সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রচুর; কেনারামের বাড়ী জলপান করিতে যাঁহারা দ্বিধা রাখেন না, ফলারের উল্লাসে তাঁহারা পৌত্র দৌহিত্র পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া পরম পরিতোষ রূপে ফলার করিলেন, ব্রাহ্মণেরা লুচির উপর দাক্ষিণা পাইলেন, দক্ষিণার হার দুই দুই আনা, যে সকল বালকের পৈতা হয় নাই, তাহারা এক এক আনা, বালিকার দুই পয়সা।

জলপানের পরদিন শুভবিবাহ। সেই দিন দিবাভাগে স্বজাতির ভোজন স্বজাতীয় লোকেরা পল্লীগ্রাম হইতে হঠাৎ আসিয়াছিল, সহরের নয়, সহরের নিকটেই কন্যাকর্ত্তার বাড়ী, ভোজনান্তে বর লইয়া বরযাত্রেরা বিবাহ দিতে গেল, পাড়ার গুটি কতক কায়স্থ ব্রাহ্মণও সে সুবিধা পরিত্যাগ করিলেন না। বাজী বাজনা, রোসনাই ইত্যাদি সহরের পদ্ধতি মতেই হইয়াছিল।

বিবাহের পরেও তিনদিন ধরিয়া কেনারামের বাড়ীতে উৎসব হইয়া গেল। ঘটার কথাটা ক্রমে ক্রমে সহরের অনেকস্থানে প্রচার হইয়া পড়িল। সর্ব্বত্রেই সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি লোক থাকে; একজন সামান্য লেখাপড়া জানা কুটিল লোক সংবাদ পত্রের কার্য্যালয়ে গিয়া নানা অলঙ্কার চড়াইয়া সেই সংবাদটা জানাইয়া আসিল, কেনারাম ধীবর (মাছধরা জেলে) সেই সংবাদ দাতার সে পরিচয় জানিয়া, খবরের কাগজে ছাপাইবার ভয় দেখাইলে দাসের কাছে কিছু আদায়করা যাইতে পারিবে, এই তার মতলব। তাহার দুর্ভাগ্য যাহার কাছে সংবাদ দিবে সে একজন বাহিরের লোক, সংবাদ পত্রের সহিত তাহার কোন সংশ্রব ছিল না; লোকটা কিন্তু সুচতুর শীকারী, ইচ্ছা তার মনের ভিতর চাপিয়া রাখিয়া সেই ব্যক্তি সেই সংবাদ দাতাকে বলিল "অবশ্য ছাপা হইবে, এখন আপনি কোন গোলমাল করিবেন না, আট দিন পরে আমরা ছাপিয়া দিব, সমাজে ব্রাহ্মণ কায়স্থের মাথা হেঁট হইবে, শাস্তি পাইবার ভয়ে, কর্ম্ম কর্ত্তাও পলাইয়া যাইবে।" যে লোক উক্ত কথা বলিল, তাহার নাম অবতার চন্দ্র।

এই গেল সে দিনের কথা, পরদিন প্রাতঃকালে অবতারচন্দ্র একটার। সময় সামলামাথায় দিয়া, চোগা চাপকান পরিয়া কেনারামের বাসায় গিয়া উপস্থিত। নূতন উপস্থিত হইলেই একটা পরিচয় দিতে হয়, কেনারামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুচতুর অবতার চন্দ্র নিজের মনের মত একটা পরিচয় দিল, কেনারামের অনেক সুখ্যাতি করিল, অন্য প্রকারের পাঁচ কথা তুলিয়া শেষ কালে বলিল, আপনি একটা অকার্য্য করিয়াছেন, আপনি যে জাতি তাহা আমি আপনারই প্রতিবর্গের নিকট শুনিয়াছি, জাতি ভাঁড়াইয়া আপনি ব্রাহ্মণ কায়স্থের জাতি মারিয়াছেন, একজন রিপোর্টার জানিতে পারিয়াছে, খবরের কাগজে ছাপিয়া দিবে, আপনি বড় ফ্যাসাদে পড়িবেন, ব্রাহ্মণ কায়স্থেরাও মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইবেন।

বিবাহে আপনি কমবেশ পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়াছেন, গোপনে সেই সম্পাদককে একহাজার টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করিলেই সব গোল চুকিয়া যায়; আপনি তাহাই করুন। ধর্ম্মতঃ বলিতেছি, আমি এক পয়সাও গ্রহণ করিব না, কেবল আপনাদের মঙ্গলের জন্যই আমি আসিয়াছি।

গম্ভীর বদনে শুনিয়া কেনারাম বলিল, আমার কি দোষ? ব্রাহ্মণেরা অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, আমার উঠানের আধ খানা ঘেরিয়া আপনারা ব্রাহ্মণ আনিয়া জিনিস পত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আপনারাই পরিবেশন করিয়াছিলেন, টাকা ব্যতীত আমাদের সহিত কোন সংশ্রব ছিল না। বিনা অপরাধে আমি কেন জরিমানা দিব?

চিন্তা করিয়া অবতারচন্দ্র বলিল, হইলে কি হয়, টাকা আপনার বাড়ী, আপনার, মতলব আপনার, বরকর্ত্তা আপনি, জানিয়া শুনিয়া ভদ্র লোকের জাতি মারিতে আপনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, জ্ঞান-কৃত অপরাধ, তবে আর বিনা অপরাধ কেমন করিয়া বলি। হরি হে! তুমিই সত্য! তুমিই সত্য! দেখুন দাস মহাশয়, গোলমাল করিবেন না, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! হাজার টাকা না দিতে চান পাঁচশত টাকা প্রদান করুন; আমার হস্তেই প্রদান করুন, আপনার জন্য বলিয়া কহিয়া সম্পাদককে আমি রাজি করিব। গোপনে কার্য্য চুকিয়া যাইবে। কেহই কিছু জানিতে পারিবে না।

কোন একটা সমাজবিরুদ্ধ কাজ করিলে, সেই কার্য্যে ভদ্র লোককে আকর্ষণ করিলে, মনে মনে একটা ভয় থাকে, কেনারামের সেই ভয়টা তখন জাগিয়া উঠিল। সে তখন অবতার চন্দ্রের দুই হাত ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দুই শত টাকায় রফা করিল, কথায় রফা নহে, অবতারচন্দ্রের হস্তে নগদ দুই শত টাকা প্রদান করিল, অবতার মনে মনে হাসিয়া, মাভৈঃ মাভৈঃ বলিয়া, চাপ কানের পকেটে টাকাগুলি লুকাইয়া সচ্ছন্দে বাহির হইয়া আসিল। দশ টাকার নোট কুড়ি খানা।

হরি নারায়ণ শিরোমণি আর দামোদর তর্ক ভূষণ উভয়ে কেনারামের নিকট হইতে আটশতটাকা ঘুষ লইয়া ছিলেন; তাঁহারা পণ্ডিতলোক, কথাটা প্রকাশ হইলে, অন্যত্র তাহাদের নিমন্ত্রণ বন্ধ হইবে, সেই জন্য তাহারা ধীবরের বাসায় দধি তরকারি প্রভৃতি আহার করেন নাই, শুষ্ক শুষ্ক লুচি সন্দেশ ধীবর গৃহ হইতে আপনাদের গৃহে লইয়া গিয়া ভোজন করিয়া ছিলেন, নগদ আট শত টাকার খাতির!

অবতার চন্দ্র দুই শত টাকা লইয়া গৃহে চলিয়া গেল। কোথায় বা সম্পাদক, আর কোথায় বা খবরের কাগজ, কোথায় বা রিপোর্টার, কোথায় বা কি, সমস্তই ভোজ বাজী! কত জায়গায় কত রকম টাকার ভেল্‌কী হয়, কত জায়গায় ছোট বড় হইতে চায়, কত জায়গায় অজ্ঞাত কুলশীল কমলার কৃপায় টাকার মহিমায় কুলীনকায়স্থ হইয়া যায়, কে তাহার সংবাদ রাখে? আজি কালিকার বাজারে টাকার আবরণে কুৎসিৎ সুন্দর হয়, ইতর ভদ্র হয়, অসাধু সাধু হয়, মুর্খ পণ্ডিত হয়, অনেক বহুরূপী অনেক প্রকারে উচ্চ খেলা খেলে? অবতার চন্দ্র সেই দুই শত টাকা লইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। অবতার চন্দ্রের পাকা বাড়ী নাই, তাহার রক্ষিতার খোলার ঘরে প্রবেশ করিয়া, আহ্লাদে ভক্তি গদ্ গদ্ কণ্ঠে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হরি হে, এ সংসারে সমস্তই পয়সার খেলা।

গীত।

বিভাস—একতাল।

অনাথ শরণ বিপদ ভঞ্জন,
দুখ নিবারণ সন্তাপ হারী।
পাপে পরিত্রাতা সর্ব্ব সুখদাতা,
দয়ার সাগর বিপত্ত কাণ্ডারী॥
ভজন সাধন হীন আমি দুরাচার-
দেখা দাও প্রভু তুমি একবার।
দুর্ব্বলের বল, জীবন সম্বল,
অনন্ত মঙ্গল তুমিহে মুরারি॥
দয়াময় আর কে আছে এমন,
পাপী তাপী দুখ করিতে মোচন॥
দয়াকর হরি পতিত পাবন
আমি হে তোমার শ্রীপদ ভিকারী॥

ক্ষমা প্রার্থনা।

পাঠক মহাশয়! আজ আমরা আপনাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। জন্মভূমির সেবা ব্রতে দীক্ষিত হইয়া অবধি কদাচ আমরা সেব্রত পালনে সামর্থ্য-পক্ষে অবহেলা অথবা অযত্ন করি নাই, তাহা আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন; আপনাদের অনুগ্রহ ও উৎসাহে আমরা সানন্দে যথানিয়মে জন্মভূমির সেবা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু দৈবের উপর মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব নাই, বিবিধ প্রতিকুল ঘটনায় আমাদিগকে মহা বিপদগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে।

শ্রাবণ মাসের জন্মভূমি বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইল, সুখের শরৎ ও সুখের বসন্ত উভয় ঋতুই বঙ্গবাসীর হৃদয়ে বিমলানন্দ বিতরণ করে; এ বৎসরের শারদীয় মহা মহোৎসবটি যে, আমাদের অজ্ঞাতসারে কোথা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, দয়াময়ী, মহামায়া যে, কখন বঙ্গে আগমন করিয়া কখন অন্তর্ধান করিয়াছেন, কিছুই আমরা জানিতে পারি নাই; মানুষেরা প্রতিকূলাচরণে যে সকল বিঘ্ন ঘটায়, সে প্রকার কোন বিঘ্নে আমরা অভিভূত হই নাই, তাদৃশ বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও কদাচ আমরা অভিভূত হইতাম না। আমাদের বিষাদের কারণ এই যে, অকস্মাৎ অপ্রতিবিধেয় দৈব বিপত্তি। বিগত ২৫শে কার্ত্তিক সোমবার মধ্যাহ্ন বেলা ১২টা ১০ মিনিটের সময় পতি, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, দৌহিত্রী ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয় পরিজন মণ্ডলীকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া সংসারের পরম ভক্তিপাত্রী পরমা রাধ্যা পরমপূজনীয়া স্নেহময়ী জননীর স্বর্গধামে যাত্রা; তৎভিন্ন এক পক্ষকাল পরেই গত ৯ই অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় জন্মভূমির বর্ত্তমান ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ দত্তের একটি স্নেহাস্পদ নবীন শিশুর অকাল মৃত্যু, এবং তদানুসঙ্গিক আরও নানা প্রকার দৈব বিপদে আমরা শোকাভিভূত ও দৈব, দুর্ব্বিপাকে পরিবেষ্টিত হইয়াছিলাম।

মা! নাম কি সুধাময় মধুর নাম। সন্তান একবার ভক্তিভরে উচ্চৈস্বরে মা—মা! বলিয়া ডাকিলে, তাহার সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না, শোক তাপ দূর হয়, সংসার সুখময় হয়। এই পার্থিব সংসারে মায়ের অপেক্ষা শান্তিময় স্বর্গীয় বিমলানন্দ আর কিছুই নাই। "জননী স্বর্গাদপি গরীয়সী" আমরা ভাগ্য দোষে জননীকে ইহজন্মের মত বিদায় দিয়া, কোন প্রকার সাংসারিক অথবা বৈষয়িক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারি নাই। সেই কারণেই যথানিয়মে "জন্মভূমি" প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম, বর্ত্তমান বৈশাখমাসে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী জগদম্বাকে স্মরণ করিয়া আবার কর্ম্মক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারিব, এইরূপ আমাদের প্রত্যাশা। শ্রাবণ মাসে জন্মভূমির নূতন বৎসর আরম্ভ হয়, এবার ১৩১৫ সাল শুভ বৈশাখমাস হইতে জন্মভূমির নববর্ষ আরম্ভ হইল, এই অসম্ভব ব্যাপার দর্শন করিয়া আপনারা বিস্ময়াপন্ন হইবেন না, আশা করি, উপরিউক্ত হেতুবাদ পাঠ করিয়া আমাদের উপর বিরক্ত হইবেন না। এখন অবাধ মাসে মাসে যথানিয়মে আপনাদের আদরিণী জন্মভূমিপত্রিকা আপনাদের করকমলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপহার প্রদান করিব।

জননী আমার।

স্বর্গধামে পশিয়াছ জননী আমার।
উদ্দেশে তোমার পদে নমি শতবার॥
স্বর্গাদপি গরীয়সী তুমি মা জননী।
তোমার প্রসাদে দেবি দেখেছি অবনী॥
শৈশবে তোমার কোলে লালিত হয়েছি।
ধরাতলে তব পুণ্যে বাঁচিয়া রয়েছি॥
কদাচিৎ কোন পীড়া হইলে আমার।
কাতরে ত্যজিতে নিদ্রা, ত্যজিতে আহার॥
মা তুমি প্রাণের মায়া করি পরিহার।
প্রাণ সঁপি প্রাণ রক্ষা করেছ আমার॥
গিয়াছে সে দিন দেবি ফুরায়েছে সব।
ত্যজিয়াছি ভুলিয়াছি আনন্দ উৎসব॥
তুমি নাই, সব শূন্য নিরীক্ষণ করি।
হৃদাকাশ অন্ধকার দিবা বিভাবরী॥
গিয়াছ মা, পুণ্যধামে নিজ পুণ্যফলে।
মাতৃহারা হয়ে মোরা আছি ধরাতলে॥
সাবিত্রী জানকী আদি সতী লক্ষ্মীগণে।
যে লোকেতে বিরাজিতা রত্ন সিংহাসনে॥
সেই লোকে তুমি মা গো তাঁহাদের সনে।
উজলো পবিত্রলোক পবিত্র কিরণে॥
স্বর্গে থাকি কৃপাদৃষ্টি কর বরিষণ।
শিরে ধরি আশীর্ব্বাদ এই আকিঞ্চন॥
তব আশীর্ব্বাদে মাগো ইহমায়াধামে।
সুখে যেন যায় দিন মা, তোমার নামে॥
খেলা ধুলা সাঙ্গ করি যবে যাব চলে।
স্থান যেন পাই তব চরণ কমলে॥
নতি করি দীননাথে যুড়িদুটী হাত।
মা তোমার শ্রীচরণে করি প্রণিপাত॥

সমালোচনা

১। সদৃশ বিধান চিকিৎসা; হোমিওপ্যাথিক মতে প্রাক্‌টিস্ অব্ মেডিসিন।— ভৈষজ্য তত্ত্ব চিকিৎসা কল্পদ্রুম প্রণেতা, সুপ্রসিদ্ধ লাহিড়ী কোম্পানির ঔষধালয়ের সুবিজ্ঞ চিকিৎসক, হোমিওপ্যাথিক স্কুলের অধ্যাপক ও হোমিওপ্যাথিক সোসাইটির সহকারীসম্পাদক, শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত; ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কি, কিরূপে উহা আবিষ্কার হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে কি প্রকারে অন্যান্য ঔষধ আবিষ্কৃত হইতে পারে, এই পুস্তকে তাহা বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় জ্ঞানার্জ্জন করিতে অভিলাষী, তাঁহারা রাইমোহন বাবু প্রণীত ভৈষজ্য-তত্ত্ব পাঠ করিয়া, এই পুস্তকখানি আলোচনা করিলে, গৃহস্থ ও চিকিৎসক সকলেই বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

২। প্রদক্ষিণ।—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত, মূল্য একটাকা; বঙ্গোপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দুর্গাচরণ বাবু অন্যপথ দিয়া পুনর্ব্বার ঐ বঙ্গসাগর উপকূলে উপনীত হইয়াছিলেন। দেশ প্রদক্ষিণের বৃত্তান্ত জানিতে যাঁহাদের অনুরাগ, তাঁহারা এই "প্রদক্ষিণ"খানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

৩। চিন্তা-নির্ঝরিণী।—শ্রীযুক্ত কুমার বিক্রম মজুমদার প্রণীত। দীপকলিকা, শ্মশানের শান্তি, অশ্রু, বউকথাকও, ফটিকজল, বিভূতি দর্শন, অতৃপ্তসংসার, বীর পরাজয় ও জীবনাহুতি প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয়ের নৈসর্গিক বর্ণনা এই পুস্তকে গদ্যছন্দে লিখিত আছে। পিপাসাতুর পাঠকেরা এই নির্ঝরিণীর সুশীতল জলপানে পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন।

৪। গিরীশ গীতাবলী।—বঙ্গের নাট্যগুরু শ্রীযুক্ত কবিবর গিরীশচন্দ্র ঘোষ বিরচিত, মধুর মধুর গীতগুলি একত্র করিয়া শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই গীতাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহার সহিত কবিবরের জীবনী ও ক্ষুদ্র একখানি সুন্দর চিত্র মূর্ত্তি নিবদ্ধ আছে। গিরীশচন্দ্রের গীতের মধুরতার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য, সঙ্গীত প্রিয় পাঠক পাঠিকারা এতৎ পাঠে বিশুদ্ধানন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। মূল্য এক টাকা মাত্র।

৫। সেবক সঙ্গীত।—প্রথম বর্ষ শাখুয়াই সেবক-সমিতি হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই পয়সা মাত্র। মাতৃভূমির মহিমা কীর্তন প্রসঙ্গে প্রথম বর্ষে যে, কয়টি গীত বিরচিত হইয়াছিল, তাহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সঙ্কলিত হইয়াছে। গীতগুলি করুণ রস পূর্ণ, মাতৃভক্তের কর্ণে অবশ্যই সুশ্রাব্য রচনাও উত্তম।

৬। আহিরীটোলা ইউনাইটেট্ রিডং রুম্।— নামক পুস্তকাগারের ১৯০৬ সালের বার্ষিক রিপোর্ট। এই পুস্তকাগারে ঐ বৎসর অনেকগুলি ভাল ভাল পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর ইহার পৃষ্ঠপোষক। আমরা আশা করি বর্ষে বর্ষে এই পুস্তকাগারের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

৭। ছেলে-খেলা।—শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। 'কুন্তলীন' প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ছয় আনা। বনের পাখী, সাপ, বাঘ, ময়না, চই চই বেঙের টাকা, নাতি ঠাকুরদাদা, খোকাবাবুর পড়া, দাও সন্দেশ, ইত্যাদিতে এই ছেলে-খেলায় খেলার অঙ্গপূর্ণ। ছেলেরা এই ছেলে-খেলা পাইয়া নিশ্চয়ই সুখী হইবে। ছেলেদের উপহার দিবার উপাদেয় পুস্তক।

৮। সাহিত্য-চিন্তা।—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। গ্রন্থকার আমাদের সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত। "নিবেদন" শিরোনামে যে কথাগুলি তিনি সমাপ্তিকা করিয়াছেন, তাহা অতি উপাদেয়। বিলাতী সাহিত্যের বহু বিস্তারে ও সমালোচকগণের সমালোচনার প্রভাবে বিলাতী সাহিত্য এখন জগতের তিনখণ্ডে বিশেষ গৌরবে সমাদৃত ও উপযুক্ত আলোচনা অভাবে আর্য্য সাহিত্যের গৌরব এখন প্রায় নির্ব্বাপিত দীপের ন্যায় অনুজ্জ্বল। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের সমালোচনা প্রায়ই এখন দৃষ্টিগোচর হয় না; উপযুক্ত সমালোচকের হস্তে তাহার উপযুক্ত সমালোচনা হইলে, বিলাতী সাহিত্যের দীপ্তি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে, শ্লাঘা করিয়া একথা আমরা বলিতে পারি। কাব্য সাহিত্যের সুবিজ্ঞ সমালোচক বাবু পূর্ণচন্দ্র গুটিকতক নিরপেক্ষ সমালোচনার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর হইয়াছে; অমানিশার পর পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ পাইয়াছে। আমরা সাগ্রহে অনুরোধ করি সাহিত্য প্রিয় পাঠক মহাশয়েরা এই পুস্তক খানি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন; বিশেষতঃ "নিবেদনের" চারিটি পৃষ্ঠা আরও অধিক মনোযোগের সহিত দর্শন করিবেন। সাহিত্য-চিন্তার মূল্য এক টাকা মাত্র; বাস্তবিক ইহার প্রকৃত মূল্য অনেক।

৯। ফলশ্রুতি।—এখানিও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য এক টাকা। যেরূপ যোগ্যতার সহিত "সাহিত্য-চিন্তা" লিখিত হইয়াছে, এই ফলশ্রুতিতেও সেইরূপ যোগ্যতার সম্পূর্ণ সদ্ভাব। আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে যেরূপ সুকৌশলে বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব পরিপূরিত হইয়াছে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য তাহার ছায়া মাত্র নাই, বস্তুতঃ বর্ত্তমান প্রণালীতে "সাহিত্য" নাম কলঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। কেহ যদি যত্ন করিয়া পৌরাণিক সাহিত্যের দৃষ্টান্তে বঙ্গসাহিত্যকে সাজাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সাহিত্যের মহিমা দিন দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। বাবু পূর্ণচন্দ্রকে ধন্যবাদ, তিনি আমাদের সাহিত্য সংসারের যথেষ্ঠ উপকার সাধন করিতেছেন।

১০। শ্মশান-সন্ধ্যা।—গ্রন্থকারের নাম নাই; পুস্তকখানি কবিতায় বিরচিত। পরলোকগত ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোমের চিকিৎসানৈপুণ্য ও সামাজিক সৎগুণাবলি এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। দয়াল বাবুর সুচিকিৎসার খ্যাতি ও জনসমাজে সৌজন্য আমাদের অবিদিত নাই, সকলেই তাঁহাকে সমাদর করিতেন; গবর্ণমেণ্টের নিকটেও তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। এই পুস্তকখানি যিনিই লিখুন ডাক্তার দয়ালচন্দ্রের গুণের কথা অবশ্যই প্রকৃত, কবিতাগুলিও সুন্দর।

১১। উত্তর পশ্চিম ভ্রমণ।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপ্রদেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থ ও প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর বিবরণও ইহাতে আছে। পাঠ করিয়া আমোদ অনুভব করা যায়। মূল্য এক টাকা চারি আনা।



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৬শ বর্ষ। | ১৩১৫ সাল জ্যৈষ্ঠ। | ২য় সংখ্যা।

বিশ্বাস।

নাট্যাচার্য্য—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

যত প্রকার অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি পৃথিবীতে আছে, সাধারণের চক্ষে বিশ্বাসী ব্যক্তির তুল্য অকর্ম্মণ্য আর কেহই নয়। অশিক্ষিত স্ত্রীলোক ও বালকের ন্যায় তাহার তুলনা হয় না, হীনবুদ্ধি বলিয়া সে গণ্য। বিশ্বাসকে লোকে দুর্ব্বলতা বলিয়া জানে। কিন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তি যতদূর অসঙ্গত বিষয় বিশ্বাস করুগ, তাহারা তাহাদের নিন্দুকের ন্যায় অসঙ্গত বিষয় বিশ্বাস করে না। মনুষ্যের দুইটীমাত্র চক্ষু আছে, পশ্চাতে সর্প আসিয়া দংশনকরিলে জানিতে পারেন না, একটু বুদ্ধিআছে, যাহাতে ৫ আর ৪ এ ৯ বুঝিতে পারেন। সেই বুদ্ধি আর চক্ষুরবলে তাঁহার বিশ্বাস যে, জগতের সমস্ত বস্তু তিনি অবগত হইবেন। অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া কথা নাই, কথাটার

অর্থ নাই, যদি থাকে, তাহা হইলে সে অন্ধ বিশ্বাস আত্মম্ভরী বুদ্ধিমান ব্যক্তির, অতদূর অন্ধবিশ্বাস আর কাহারও নাই। আপনাকে সারবান জানিয়া,-তাঁহার সেই অন্ধ বিশ্বাসের অনুমোদন যে না করেন, তাহাকেই তিনি অসার বলিয়া জ্ঞান করেন। মহাপুরুষের বাক্য হৃদয়ের সরল ভাষা, অভিমান শূণ্য ধীরবুদ্ধি তিনি তাচ্ছিল্য করেন। মানব জীবনে বিশ্বাস অপেক্ষা বলপ্রদ বৃত্তি আর নাই। তাহা তাঁহার বোধগম্য হয় না; জগতে যত মহৎ কার্য্য হইয়াছে সমস্তই বিশ্বাসবলে। অবিশ্বাসী গণনায় জয়লাভের কোনও আশাছিলনা। সমস্ত ইয়ুরোপীয় রাজা বিরূপ কোটী কোটী বিপক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের লক্ষ সৈন্য মাত্র। গণনায় জয়লাভের কোনও আশা ছিল না, বিশ্বাস-বলে জয়লাভ হইল। তিনি অদৃষ্টবাদী অদৃষ্টে বিশ্বাস করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ইতিহাসে ভূয়োভূয়ঃ বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বাসবল শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নহে, যতপ্রকার বৈজ্ঞানিক আবিস্কার জগতে হইয়াছে, বিশ্বাস তাহার মূল, শক্তির ভাববর্দ্ধন (Conserveetion of Energy.) যাহার তুল্য আবিষ্কার আর ইদানিং হয় নাই, ইহা বিশ্বাস মূলক। যিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শক্তির কখনও ক্ষয় হইতে পারে না। এই বিশ্বাস মূলক আবিষ্কারবলে মানব কর্তৃক নয়গ্রার জলপ্রপাত সংসার কার্য্যে দাসরূপে নিযুক্ত হইয়াছে। যতপ্রকার উচ্চকার্য্য সংসারে হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে সমস্তই বিশ্বাসবলে। কিন্তু তর্কের নিমিত্ত ধরিয়া লইতেছি, বিশ্বাস অতি দুর্ব্বলতা, হীনতা। আত্মম্ভরী বুদ্ধিমান যতপ্রকার বিশ্বাস-বিরুদ্ধ নাম দিতে চাহেন, সে সকলই বিশ্বাস বিরুদ্ধে আখ্যা করিলাম। কিন্তু মানন জীবনে চাই কি? মহা তিতিক্ষায়প্রিয়, মহাকার্য্য কৌশলী, কান্তারপ্রিয় বিপদাকাঙ্খী যতপ্রকার লোক সংসারে থাকুন, একথা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি নিজ সুখ অন্বেষণ করিতেছেন। বিলাসীর বিলাসে সুখ এবং তাঁহার তিতিক্ষায় সুখ-এইমাত্র প্রভেদ। কিন্তু তিনি যে সুখ-আশায় মুগ্ধ আছেন, এপক্ষে সন্দেহ নাই। যিনি ইহা অস্বীকার করেন, হয় তিনি কপটী নচেৎ তিনি তাঁহার নিজের হৃদয় বুঝেন না। তাঁহার সুখ এবং বিশ্বাস সুখ একবার তুলনা করিয়া দেখুন। বিশ্বাসী মনে করেন,- "তাঁহার অনন্ত জীবন; এই অনন্ত জীবনে সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার অনন্ত সহায়। সংসারে ক্ষানিক দুঃখ হয়, কিন্তু সে দুঃখ তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত!" মানব শরীরে তিনি দেবদেহধারী। তাঁহার আনন্দের সহিত হে বিজ্ঞ! তোমার আনন্দ একবার তুলনা কর। হে গণনাবিদ, তোমার গননায় তুমি জাননা তুমি কি ছিলে?

তোমার গণনায় তুমি জাননা তুমি পরে কি হইবে? বর্ত্তমানে, যদি তুমি যথার্থ গণিত শাস্ত্রপ্রিয় হও,-বর্ত্তমানে পর মুহূর্ত্তে কি হইবে,-তাহা তোমার গণিতশাস্ত্র স্থির করিয়া দিতে পারিবে না। জ্যোতির্ব্বিদ হইলেও তাহারও মূলে বিশ্বাস। কিন্তু তর্কের নিমিত্ত ধরিয়া লইলাম, শাস্ত্র বিশ্বাস মূলক নয় যুক্তিমূলক। জ্যোতির্ব্বিদ হইলেও ধর,-গণনায় দেখিয়াছ যে কল্য উত্তম যান চড়িবে, কিন্তু ট্রামওয়ে হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া কোন দ্রয়ার্দ্র ব্যক্তির যুড়ি চড়িয়া ঘরে আসিবে, কি তোমার প্রকৃত উত্তম যান হইবে, তাহার নিশ্চয় নাই। সচরাচর লোকে জ্যোতিষ গণনা সম্বন্ধে বলিয়া থাকে,-"লাভের বেলা ব্যাং লোকসানের বেলা ঠ্যাং।" যত-প্রকার শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়া থাক, বর্ত্তমানের পর মুহূর্ত্তের মঙ্গলামঙ্গল স্থির করিতে পার না। কিন্তু বিশ্বাসী (অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া গালি দেন-) কিন্তু বিশ্বাসী নিশ্চত করিয়াছে,-আগে কি ছিল, পরে কি হইবে। বর্ত্তমান অমঙ্গল সে অমঙ্গল বলিয়াই গণনা করে না। অমঙ্গল-দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত প্রেমময় পিতা তাহাকে তাড়না করিতেছেন। এই আমীরের সহিত সংসারের কি সম্পত্তি লইয়া কি মান লইয়া, কোন্ সিংহাসনে বসিয়া আপনার তুলনা করিবে? তুমি জগত দুঃখপূর্ণ জান এই দুঃখময় জগত বিশ্বাসীর পিতৃরাজ্য।

এ পর্য্যন্ত বিশ্বাস লইয়া দুইটা হৃদয়ের কথা কহিয়াছি। যুক্তি করিয়া দেখি প্রথমতঃ তোমাকে অন্ধ বিশ্বাসের কথা বলিয়াছি। আমরা অন্ধ বিশ্বাস বিশ্বাস করি না,-বিশ্বাস অন্ধ হয় না। মহাযুক্তিবান, একবার যুক্তি করিয়া দেখ যুক্তি বা যে কারণেই হউক, তুমি যাহা বিশ্বাস কর, তাহার নাম সত্য। যুক্তি, করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ? যেমন চুণ হলুদ মিশিলে আর এক প্রকার রং হয় বিশ্বাস কর। যাহা তোমার পঞ্চেন্দ্রিয়ে দেখিয়াছে, তাহাই তোমার বিশ্বাস অর্থাৎ তোমার বিশ্বাসই সত্য। অতদূর বিশ্বাস করিও না, তোমার শাস্ত্রেই তাহা নিষেধ করিবে। আপাততঃ প্রধান আবিষ্কার (অন্যান্য আবিষ্কারের ওলট পালট কথা এখন রাখিলাম)। আপাততঃ প্রধান আবিষ্কার এই যে কতক পরিমাণে তাড়িৎ গমনে মৃত্যু হইতে নিস্তার নাই। কিন্তু শত সহস্র বা কোটী কোটী যে তাড়িৎ প্রবাহ পৃথিবীতে সম্ভব, সে তাড়িৎ প্রবাহে মানুষ মরে নাই। বিজ্ঞানবিদ্ টেস্‌লা তাহার প্রধান আবিষ্কারক। (Gravi tation.) যে নিয়মে কথিত আছে—বিশ্ব চলিতেছে তাহা আপাততঃ তাড়িৎ ক্রিয়া কিনা-ইহা অনেক বৈজ্ঞানিকের সন্দেহ হয়। মাংসপিণ্ডে কীট জন্মায়। বৈজ্ঞানিক ধারণা করিয়াছিলেন, যে জড় হইতে চৈতন্য উদ্ভব হইয়াছে; এই মতের নাম এসপণটেনিয়স জেনেরেশন।

সে মতের বিপ্লব ঘটিয়াছে, এক্নসটিক টিণ্ডেল উক্ত মতের বিরোধী, তিনি ইন্দ্রিয়-সম্ভূত যুক্তিঅনুসারে স্থির করিয়াছেন যে, জীব জীব হইতে উৎপন্ন। যত প্রকার বৈজ্ঞানিক মত বিপ্লব হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে গেলে, আমাদের প্রবন্ধ শেষ হইবে না। কাল একমত চলিতেছিল, আজ তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী মত স্থাপিত। কে জানে, আগামী কাল আবার কি হইবে। পীড়িত অবস্থায় চিকিৎসা বিদ্যার উপর আমরা জীবন অর্পণ করি। চিকিৎসকের বিজ্ঞতা অভিজ্ঞতার কথা আপাততঃ দূরে থাকুক। বিবিধ প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্রের পরস্পর মতবিরোধের কথা দূরে থাকুক, এক শ্রেণীর শাস্ত্র দিন দিন উল্টাইতেছে, যথা পূর্ব্বে য়্যালোপেথেরা জানিতেন, জ্বররোগে রক্তমোক্ষণ করা উচিত। এক্ষণে রক্তমোক্ষণ করিলে, নিশ্চয় মৃত্যু, সমস্ত য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের ধারণা। দুইজন চিকিৎসকের মত প্রায়ই ঠিক হয় না। এইরূপ বিপ্লবস্থলে কোন যুক্তি অনুসারে বিশ্বাস-দ্বেষী বুদ্ধিমান চিকিৎসক হস্তে তাঁহার জীবন অর্পণ করেন।

আইনজ্ঞের মধ্যেও দুইব্যক্তি একমত নন। আবার প্রত্যেক আইনজ্ঞই বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের পক্ষেই এককালে মত দিয়া থাকেন। কোন যুক্তিবলে বিশ্বাস-দ্বেষী ঐ সকল ব্যক্তির উপর তাঁহার সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন! উত্তর করিবেন, আর উপায় কি?

সকলের মতে গণিত শাস্ত্রের ন্যায় নিশ্চিত শাস্ত্র আর নাই। সেই গণিত শাস্ত্রে ২ কাহাকে বলে? যদি এইটীকে ১ বলিয়া কল্পনা করি, তাহাহইলে ঐটীর নাম ২। প্রস্থ হীন দৈর্ঘ্যের নাম রেখা। পরিসরহীন স্থানের নাম বিন্দু, এই সকল লইয়া গণিত শাস্ত্র। এই শাস্ত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখ? এই সকল সত্য বলিয়া জান কেন? বুঝিয়া দেখ, তাহার অপর কোনও কারণ নাই, তুমি বিশ্বাস কর এইমাত্র কারণ। এপর্য্যন্ত তোমারই মত অনুসারে চলিতেছিলাম; এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, "হে বিশ্বাস-দ্বেষী, সত্য জানিবার তোমার কোনও অধিকার নাই। হে বিদ্যাভিমানী, তুমি যদি কিছুজান, জানা উচিত যে তুমি অন্ধ। তোমার কোন কথা জানিবার অধিকার নাই। জানিবার অভিমান রাখিলে, অতি তীব্র ভাষায় তোমারই যুক্তি তোমাকে তিরস্কার করিবে। তোমারই যুক্তি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, কিরূপে জানিয়াছ, যে যুক্তিদ্বারা কোনও প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছ, সে যুক্তি ভ্রান্তিমূলক নয়। যে সকল সিদ্ধান্তের উপর তোমার যুক্তি স্থাপিত, সেই সিদ্ধান্ত ভ্রমশূন্য কি প্রকারে জানিলে? সমস্ত সিদ্ধান্ত যাহার উপর তোমার যুক্তি স্থাপিত-তুমি কি পরীক্ষা করিয়াছ? যদি করিয়া থাক,-অসম্ভব

কথা-যদি করিয়া থাক, পরীক্ষা কালীন তোমার ভ্রম হয় নাই, কিরূপে নিশ্চিত করিলে? যতই পরীক্ষা কর, যতই যুক্তিকর, বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তোমায় চলিতে হইবে। বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে, এইটী সত্য, তাহার পরে যুক্তি চলিবে। যত যুক্তি, মূল বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের নিন্দা কর। তুমিই যথার্থ অন্ধকূপে পতিত।

নির্ম্মলা।

লেখক শ্রীসুরেশ চন্দ্র নন্দী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ নির্ম্মলার বিবাহ। নির্ম্মলা প্রকাশ বাবুর এক মাত্র আদরের কন্যা। অষ্টম বর্ষায় কন্যাদানে গৌরী-দানের ফল তাই পিতা ও আত্মীয় স্বজনের বদন মণ্ডল আজ হর্ষ বিকসিত! প্রকাশবাবুর সংসারে লোক জন বড়বেশী নাই; প্রকাশ বাবু শরৎ বাবু, শরৎ বাবুর সহধর্ম্মিনী, দুইটী শিশু পুত্র আর প্রকাশ বাবুর ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো—নির্ম্মলা। প্রকাশবাবুর সহধর্ম্মিনী অনেক দিন হইল সুখের সংসার আঁধার করিয়া একটী সোনার প্রদীপ রাখিয়া গিয়াছেন! মৃত্যু কালে জননী কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া, শরৎ বাবুর সহধর্ম্মিণীর হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক বলিয়া গিয়াছিলেন দিদি! নির্ম্মলা আমার কত সাধের মেয়ে; পরমেশ্বরের নিকট কত প্রার্থনা করিয়া ছিলাম, তাই নির্ম্মলাকে পাইয়াছি; কিন্তু দিদি! মনের সাধ মনেই রয়ে গেল; নির্ম্মলাকে তোমার হস্তে দিয়া চলিলাম তুমি নিজের মেয়ের মত নির্ম্মলাকে দেখো।"

সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। প্রকাশ বাবু আর দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন নাই। নির্ম্মলা শরৎ বাবুর স্ত্রীর আন্তরিক স্নেহ যত্নে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। জেঠাইমার ভাল বাসার ঘন আবরণ সুমধুর মাতৃ-প্রেম-স্মৃতি আবৃত করিয়া ফেলিল। কালের অনন্ত স্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল। নির্ম্মলা অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিল। তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্য তাদৃশ মনোহর না হইলেও তাহার ক্ষুদ্র মুখ খানিতে জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য একত্রিত ছিল।

প্রভাত না হইতে হইতে আজ নির্ম্মলা শয্যা হইতে উঠিয়া খেলা ঘরের দিকে ছুটিয়াছে। ক্ষণ কাল পরে একটী বালিকা ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বালিকা গম্ভীর স্বরে বলিল, হাঁ ভাই! তোমার না আজ বিয়ে? নির্ম্মলা চঞ্চলা বালিকা; কথা শ্রবণ করিয়া একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিতে যাইয়া হাসিয়া ফেলিল—অপদস্থা হইয়া বলিল, ভাই তোমার মুখ খানা আজ মলিন কেন! বালিকার নাম বিমলা, বিমলা, নির্ম্মলার দূর সম্পর্কীয়া এক আত্মীয়ার কন্যা, বিমলা অভিমান ভরে বলিল-না ভাই! আমি বাড়ী যাই।

নির্ম্মলা কহিল, কেন ভাই তুমি আমার উপর রাগ করেছ?" বিমলা কহিল না ভাই! তুমি থাক, তোমার আজ বিয়ে। নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল, তোমার ও ত ভাই বিয়ে হবে। এইবার বিমলার অভিমান দূর হইল। নেত্র কোণে এক বিন্দু জল দেখা দিল "আমার যে, ভাই মা নাই। সে কথা শুনিয়া নির্ম্মলার মনে কি এক পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। বালিকার চক্ষে মুক্তা ফলবৎ দুই এক ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল, সে কোন কথা কহিল না। এই অবসরে বিমলা পলাইল।

প্রকাশ বাবুর উপাধি মজুমদার-সম্পূর্ণ নাম প্রকাশ চন্দ্র মজুমদার। তিনি হাওড়া জেলার অন্তর্গত কোন এক গ্রামে বাস করেন। প্রকাশ বাবুর বাটিটী ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বিতল। চারি দিকে ফল ফুল সুশোভিত একটী বাগান, মধ্যস্থলে একটী স্বচ্ছসলিলা সরসী। সরসীতটে একটী ক্ষুদ্র তাল পাতার গৃহ। ইহাই নির্ম্মলার খেলার ঘর! বিমলা চলিয়া গেলে, নির্ম্মলা পুষ্করিণীরতটে আসিয়া বসিল। এমন সময়ে শরৎ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রটী আসিয়া বলিল- দিদি! মা তোমায় ডাকছেন। বালিকা কথা কহিল না। বালক গৃহাভিমুখে দৌড়াইল। কিছুক্ষণ পরে মাতাকে সঙ্গে লইয়া আবার সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মাতা নির্ম্মলার হস্ত ধরিয়া বলিলেন এখানে কেন মা? কি হয়েছে? নির্ম্মলা বলিল হাঁ জেঠাইমা! মা, না থাকিলে বিয়ে হয় না? জেঠাইমা স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, পাগল মেয়ে কে তোমায় বল্লে? নির্ম্মলা কহিল, আমাদের বিমলার কি বিয়ে হবে? তার যে মা নাই, জেঠাইমা বলিতে বলিতে নির্ম্মলার চক্ষে জল আসিল, জেঠাইমারও নয়ন যুগল অশ্রু ভারা ক্রান্ত হইল। তিনি বলিলেন পাগল মেয়ে, আমোদের দিন কি কাঁদতে আছে?"

বালক এতক্ষণ উভয়ের দিকে চাহিয়া ছিল। দুজনের চক্ষে জল দেখিয়া বালকের চক্ষে জল আসিল, বালক জননীর অঞ্চল ধরিয়া বলিল, মা কাঁদচ কেন? জননী সস্নেহে পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, না বাবা কাঁদিনীত। বালক তখন নির্ম্মলাকে বলিল, দিদি! তুমি কাঁদচ কেন? এই দে মা রয়েছে। বালক নির্ম্মলার সকল ভাবনা দূর করিয়া দিল। নির্ম্মলাও পূর্ব্ব স্মৃতি ভুলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

রাধিকা নারায়ণ ঘোষ ২৪ পরগণা অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামের এক জন প্রথিত-নামা ধনী ব্যক্তি। তিনি ইঞ্জিনিয়ারি করিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন ; এক্ষণে অবসর প্রাপ্ত হইয়া শান্তিতে কালাতি পাত করিতেছেন, তাহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্র কুমার, কনিষ্ঠ নরেন্দ্র কুমার উভয়েরই পাঠদ্দশা সমাপ্ত হয় নাই। রাধিকা বাবু স্ব গ্রামের একজন পদস্থ ও গণ্য মান্য ব্যক্তি ; তদুপরি আবার দুই শিক্ষিত গুণবান পুত্রের পিতা, তবুও তিনি সম্পূর্ণ রূপে আত্মাভিমান বিবর্জ্জিত ছিলেন। শিক্ষিত পুত্রের পিতা বলিয়া কখনও অহঙ্কার করিতেন না। অতুল ঐশ্বর্য্য শালী হইয়াও কখনও অহমিকা প্রদর্শন করিতেন না। তাইমধ্য ব্যক্ত ও সম্রান্ত ঘরের কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিবেন।

আমাদের পাঠকের নিকট কন্যার পিতা ও কন্যা অপরিচিতা নহে। কন্যার পিতার নাম প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এবং কন্যার নাম নির্ম্মলা। প্রকাশ বাবু এরূপ ধনী গৃহের সুশিক্ষিত পুত্রের সহিত কেমন করিয়া বিবাহ দিবেন, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না। সে জন্য প্রথমতঃ একটু ইতঃস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাধিকা বাবু প্রকাশ বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাশ বাবু যেন হাতে চাঁদ ধরিলেন। পত্র খানিতে এইরূপ লিখিত ছিল—

"প্রকাশ বাবু! আপনি কন্যার বিবাহ দিতে ইতঃস্ততঃ করিতেছেন কেন? যাঁহার সহিত আমার চির সম্বন্ধ—যাঁহাকে লইয়া আমার ঘর সংসার তাঁহার তুলনায় ছারঅর্থ আমার প্রিয় নহে, আমি পুত্রের বিবাহ দিতেছি, আমার নয়নে আজ আনন্দের অশ্রু-কিন্তু আপনি কন্যাদিতেছেন, আপনার নয়নে বিষাদের অশ্রু! তুচ্ছ অর্থের জন্য এই শুভ কর্ম্মে এরূপ অশুভ লক্ষণ আমি ভাই ভাল বাসি না।"

শুভ দিনে, শুভক্ষণে, শুভলগ্নে দ্বিজেন্দ্র কুমারের সহিত নির্ম্মলার বিবাহ হইয়া গেল। হস্তে হস্তে পুষ্পের বাঁধন পড়িল-উভয় পক্ষের নয়নে আনন্দ অশ্রু প্রবাহিত হইল। যখন বিবাহ হইয়া গেল, তখন দ্বিজেন্দ্র কুমার বি এ পড়িতে-ছিল। ইংরাজী শিক্ষিত নব্য যুবকের উন্মত্ত প্রাণ বিবাহের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চায় না। যাঁহারা সেক্স পীয়রের বিচার করিতে শিখিয়াছেন রোমীয়ো জুলিয়াডের প্রগাঢ় প্রেম-উচ্ছাস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহারা কি অষ্টম বর্ষীয় বালিকা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন?

দ্বিজেন্দ্র কুমার ধনীর সন্তান সুশিক্ষিত। আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত নব্য যুবক-

গণের মন যাতে সন্তুষ্ট হয়। তাঁহাদের আশার আর সীমা নাই। তাই, তাঁহারা কবির কাব্যকাননের প্রস্ফুটিত ফুলগুলি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখেন। তাই উপন্যাস বর্ণিত নারী চরিত্র গুলি সযত্নে মানস পটে অঙ্কিত করিয়া রাখেন। আর ভাবেন যথার্থ স্বর্গীয়প্রেম বুঝি কেবল সেইগুলিতেই বিদ্যমান! তাই দ্বিজেন্দ্র কুমার ভাবিতেন, সেই আত্মত্যাগ পরায়ণা মরু ভূমির নিকুঞ্জ কানন স্বরূপা চির সরলতাময়ী লাবণ্যবতী ললনা আয়েসাকে; কখন বা অকপট-হৃদয়া প্রেমোৎসর্গ কারিণী জুলিয়েট ও ওডেলার মধুর মোহন ছবি! কল্পনা রাজ্যের এতগুলি সুন্দর ছবির স্তর তাহার মানস পটে একে একে গঠিত হইতে লাগিল, কিন্তু তবুও অষ্টম বর্ষীয় বালিকার চির হাস্যময়ী ক্ষুদ্রমুখ-স্মৃতি সে স্তর ভেদ করিয়া উঠিত; দ্বিজেন্দ্র কুমারের মন তমসা বৃত হৃদয়-বক্ষে মহূর্ত্তের জন্য বালিকার পবিত্র মুখের উজ্জ্বল জ্যোতিতে আলোকিত হইত! দ্বিজেন্দ্র কুমার সুখ দুঃখ সকলি ভুলিতেন। আর নির্ম্মলা নন্দন কানন বিচ্যুতা পারিজাত কুসুম কলিকা। তাহা তার স্ফুটোন্মুখ এত হাস্যময়া, এত মনো হারিণী! তাহার হৃদয়ে শৈশবের সরলতা মাখা, চপলতার বুদ্বুদ গুলি অন্ত প্রবাহিত নব স্রোতের সহিত এক একটী করিয়া মিশিয়া যাইতে লাগিল! আর ভাবি জীবনের নব নব আশা-সমীর-হিল্লোল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচী মালার ন্যায় ধীরে ধীরে অন্তরের এক পার্শ্বে আসিয়া জমিতে লাগিল!

ভবিষ্যৎ জীবনের প্রাণ-মন বিমোহিনী কল্পনার কত অস্ফুট সুখ-স্মৃতি বালিকার অন্তরে জাগিতে ছিল। আহা! বালিকার কোমল হৃদয়ে সেই স্মৃতি যতটুকু সুখকরী, স্বর্গও বুঝি তাহার পক্ষে তত তৃপ্তি কর নহে। বালিকার ক্ষুদ্র অন্তরে সেই সুখ স্রোত যত টুকু প্রেম সঞ্চার করে, ত্রিদিবের পবিত্র প্রেম বুঝি তাহার তুলনায় ক্ষুদ্র! বালিকা এখন আপন সুখে আপনি সুখী; আপন আশায় আপনি আশান্বিত। সে এখন আপন মনে কত কি গড়ে কত কি ভাঙ্গে! তাই বালিকা এত আনন্দময়ী! তাই বালিকার মুখ পঙ্কজ এত প্রফুল্লতাময়ী তাই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় এত প্রেমময়!

নির্ম্মলা শৈশবেই মাতৃ হারা। স্নেহময়ী জননীর স্নেহ বিজড়িত সুন্দর মুখ খানি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় আকাশে উঠে উঠে অথচ উঠে না! বুঝি বহু দিন দৃষ্ট সুখস্বপ্নের ন্যায় মাতার দুর্ল্লভ স্নেহের মৃদু মধুর ধ্বনি তাহার হৃদয় কন্দরে বাজে বাজে অথচ বাজে না, শৈশবে পিতার আদরে জেঠাইমার স্নেহে বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে একটী স্তর পড়িয়া ছিল। সে এখন আপন কল্পনায়, সেই স্তরের পার্শ্বে আর

একটি স্তরের কল্পনা করিল। আজি সে স্তর তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম মাল্যে ভূষিত হইল।—আর তাহার মধ্যস্থলে রহিল, রমণীর ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এক মাত্র স্বামী বালিকা বুঝি এত বুঝে না, তাহার উপাস্য দ্বিজেন্দ্র কুমার!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনন্ত সময় চক্রের দ্রুত আবর্ত্তনে বিশাল জগতে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল! ইচ্ছাপুরের সেই সংসারটীর উপরদিয়া সে পরিবর্ত্তন-স্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল! রাধিকাবাবু ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, পুণ্যাত্মার পবিত্র মূর্ত্তি সকলের অন্তর পটে চিরাঙ্কিত রহিল!

দ্বিজেন্দ্র কুমার অতুল পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও সাংসারিক উন্নতির জন্য অর্থোপার্জ্জন মানসে কলিকাতায় আগমন করিলেন।

আর নির্ম্মলা সেই পতি—প্রেম-রঞ্জিতা চতুর্দ্দশ বর্ষিয়া বালিকা স্বামীর সংসারে থাকিয়া কায়মনো বাক্যে আত্মীয় স্বজনের প্রীতি সম্পাদনে নিজেকে উৎসর্গীকৃতা করিল।

কলিকাতায় অবস্থান কালে দ্বিজেন্দ্রকুমারের সহিত সুবোধ কুমার বাবুর পরিচয় হইয়া ছিল, সুবোধ কুমার ধনীর সন্তান। পিতার এক মাত্র পুত্র বলিয়া তিনি পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইয়া ছিলেন। সুবোধ কুমার বিবাহিত। কিন্তু বিবাহের দুই বৎসর পরেই কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে পাঁচজনে পাঁচকথা "কাঁণাঘুঁসা" করিত।

এক দিন দ্বিজেন্দ্র কুমার ও সুবোধ কুমার উভয়ে সান্ধ্যসমীরণ সেবন মানসে বহির্গত হইলেন। কথা বার্ত্তায় অনেক রাত্রি হইল, দ্বিজেন্দ্র কুমার মন্ত্রমুগ্ধবৎ সুবোধকুমারের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, বলিল, সুবোধ বাবু কোথায় যাচ্ছেন? সুবোধ কুমার হাসিয়া কোন উত্তর না, দিয়া একটী দ্বিতল বাটীতে প্রবেশ করিলেন। দ্বিজেন্দ্র কুমারের বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল মস্তিষ্ক আলোড়িত হইল। চতুর্দ্দিক তমসাচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। দ্বিজেন্দ্র কুমারের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কম্পমান কলেবরে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। যখন সংজ্ঞা হইল, দ্বিজেন্দ্র কুমার চক্ষু-রুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটী যুবতী স্ত্রীমূর্ত্তি! দ্বিজেন্দ্র কুমার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। পূর্ব্ব ঘটনাবলী অন্তরে তাঁহার জাগরূক হইল। হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহার স্মৃতি-পটে কাহার যেন চির হাস্যময়ী পবিত্র মুখের সরল শুভ্র

জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল!—দ্বিজেন্দ্রকুমার নির্ব্বাক হইলেন! চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সেই স্ত্রীলোকটী গৃহান্তরে গমন করিলে দ্বিজেন্দ্রকুমার বাটী হইতে বহির্গত হইয়া উদ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। কোথায় যাইতেছেন তাহার লক্ষ্য মাত্র নাই। ক্রমাগত দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাহার গতিরোধ হইল। বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে সম্মুখে দেখিলেন, পবন-হিল্লোল-হিল্লোলিতা অনন্ত প্রবাহিনী কল কল নাদিনী স্বচ্ছ সলিলা স্রোতঃ স্বতী ভাগীরথী! উৰ্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, অসংখ্য স্তিমিত-তারকা-রাজি-খচিত বিস্তৃত তমসাচ্ছন্ন নৈশ গগনোপরি অস্তাচল চূড়াবলম্বী ক্ষণপ্রভ সুধা-করের ক্ষণ হাসি।

পশ্চাতে দেখিল, তরুণ অরুণ কিরণোজ্জ্বল রক্তিমাভ পূর্ব্ব গগনোপরি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শ্বেত-রক্ত-বস্ত্র-পরিহিতা কাদম্বিনীতে উষার বিকাশ! সুন্দর ললাটে যেন সিন্দূরের ফোঁটা! শ্রবণে শুনিল, বহু দূরস্থিত বিহগকুলের অব্যক্ত মধুর কথা, কল ধ্বনি! ভাবিল নিশা পোহাইল উষা আসিল! রজনীর অন্ধকার দূর হইল। অন্তরের ভাবনা দূর হইল কি? প্রকৃতির শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া দ্বিজেন্দ্রকুমারের হৃদয় ক্ষণেকের নিমিত্ত স্থির হইল। আবার কি ভাবিল, আবার ছুটিল। প্রকৃতির প্রাণ-মন-বিমোহিনী স্বর্গীয়শোভা বুঝি তাহার হৃদয়কে বিমোহিত করিতে পারিল না। নব প্রস্ফুটিত কুসুম সৌরভ-বহিতেছে। প্রভাত সমীর বুঝি তার প্রাণে শান্তি দিতে পারিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দ্বিজেন্দ্রকুমারের অন্তরের মোহ দূর হইল। সে এখন নির্ম্মলার গুণে মুগ্ধ, নির্ম্মলার সেই সরল ব্যবহারে সেই হাসি হাসি কথায় প্রাণ মন ঢালা ভাল বাসায় দ্বিজেন্দ্রকুমার বিমোহিত! তাঁহার অন্তর হইতে অতীতের স্মৃতি গুলি একে একে বিস্মৃতির শান্তিময় কক্ষে ধীরে ধীরে মিশাইয়া গিয়াছে! তাঁহার অন্তরস্থিত কল্পনা, কুসুমের অস্ফুটছায়া একে একে শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। লাবণ্যবতী ললনা আয়েসার সেই অদ্ভুত আত্মত্যাগ পরায়ণতা, কোমল হৃদয়া ডেস্‌ডিমোনার সেই অদ্ভুত প্রেমোৎসর্গ কারিতা সমস্ত গুলিই আজ একধারে সরলা নির্ম্মলার প্রতি মূর্ত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে! তাই দ্বিজেন্দ্রকুমার ভাবিলেন, "এ যে দেবের রত্ন এরত্ন কি আমার যোগ্য?"

কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিজেন্দ্রকুমার দেশে আসিয়াছেন। সেই রজনার ঘটনাবলী তাহার সম্মুখে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

ভাবিলেন, তিনি যেন কত অপরাধী! প্রত্যহ ইচ্ছাপুর হইতে কলিকাতায় চাকুরি করিতে আসেন। প্রত্যহই বাটী গমন করেন। সুবোধকুমারের সহিত কোন সংশ্রব রাখেন না। গৃহে নির্ম্মলা প্রাণপনে স্বামীর পরিচর্য্যা করেন। ক্রমে তাহার গুণে, তাহার ব্যবহারে তাহার প্রত্যেক কথায়, দ্বিজেন্দ্র কুমার এরূপ বিমোহিত হইতেন যে, সর্ব্বদাই ভাবিতেন, এ রত্ন কি আমার যোগ্য? একদিন কথায় কথায় নির্ম্মলা বলিল, তুমি দিন রাত কি ভাব বল দেখি? দ্বিজেন্দ্র কুমার প্রথমতঃ সে কথার উত্তর দিতে পারিল না। পরে বলিল, কৈ কিছুই ভাবিনা ক্ষণকাল উভয়েরই মুখে কোন কথা নাই। কিছুক্ষণ পরে নির্ম্মলা বলিল, "না বল নেই-নেই, আর আমাকেই বা বলিবে কেন, আমি তোমার দাসী বইত নই, তবে তোমার পদ সেবা করিতে পাই তা আমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল।"

দ্বিজেন্দ্রকুমার নির্ম্মলার হাত ধরিয়া বলিল, "নির্ম্মলা! নির্ম্মলা! তুমি কি আমায় বিশ্বাস কর" নির্ম্মলা বলিল, স্বামীকে অবিশ্বাস করিতে আজ পর্য্যন্ত শিখি নাই, ভগবান করুন, যেন শিখিতেও না হয়, দ্বিজেন্দ্রকুমার তখন নত মুখে কহিল, নির্ম্মলা! তোমার মত রমণী রত্ন কি আমার যোগ্য? আমি চক্ষুষ্মান হইয়াও অন্ধ হইয়াছিলাম, তাই তোমাকে চিনিতে পারি নাই" নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল, "যোগ্য কিসে দেখিলে, আর অন্ধই বা কবে হলে?

দ্বিজেন্দ্র। আজ তোমাকে সব মনের কথা বলিব, আজ আট বৎসর তোমাকে বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু কখনও শান্তি পাই নাই! এমন কি তোমাকে দেখিলে আমার মনে ঘৃণার উদয়হইত, কেন হইত তা বলিতে পারি না। তাই চাকুরির ছলে কলিকাতায় গিয়েছিলাম। তার পর কি করেছিলাম জান, আজ তোমায় সব বলবো, শোন সংসার ছারখার করিতে! সোনার-সংসার অতল জলে ডুবাইতে! আর তোমাকে চির অনাথিনী করিয়া আজীবন মর্ম্ম যাতনা দিতে! কিন্তু কি জানি তা পারিলাম না, পাপের পথ হইতে কে যেন আমায় তোমার কাছে টেনে নিয়ে এল! ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি আমায় ঘৃণা করিবে নির্ম্মলা দ্বিজেন্দ্র কুমারের কথায় বাধা দিয়া বলিল, যেদিন স্বামীকে অবিশ্বাস করিব, যে দিন স্বামীকে ঘৃণা করিব, সে দিন আমার মত মহা পাতকিনীকে যেন ইহ সংসারে না থাকিতে হয় নির্ম্মলা ছুটিয়া পলাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একদিন শনিবারে আফিসের কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া দ্বিজেন্দ্র কুমার শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া

গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া বলিল, মহাশয় আমাদের বাবু কোথায় থাকেন বলিতে পারেন? দ্বিজেন্দ্র—তোমাদের বাবু কোথায় থাকেন তা আমি কেমন করে বলিব? পশ্চাতে একজন প্রৌঢ়া বলিল, বল সুবোধ কুমার বসু বসন্তপুর বাড়ী বাক্যটী শ্রবণ করিয়া বলিল "সুবোধ কুমার বসু এখানে অনেক আছে এটা কলিকাতা সহর, পুনরায় লোকটী বলিল, আমাদের বাবুকে চেনেন না? দ্বিজেন্দ্র কুমার বিরক্ত সহকারে উত্তর করিল যাও বাবু অনত্র জিজ্ঞাসা কর আমি জানি না। চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে পশ্চাতে দেখিলেন, লোকটীর পশ্চাতে দুইটী স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক দুইটীকে দেখিলে ভদ্রবংশীয়া বলিয়া বোধ হয়, এরূপ চিন্তা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা কোথা থেকে আসচেন বল্‌বেন? লোকটী কহিল বসন্তপুর হইতে।

দ্বিজেন্দ্রকুমার একে একে তাহাদিগকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রৌঢ়াও তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিল। বলিতে বলিতে তাহার নয়ন যুগল হইতে অনন্ত সলিলা জাহ্নবীর প্রবাহের ন্যায় অশ্রু অবিরল ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। পরিচয়ে জানিলেন, সুবোধকুমার তাঁহারই সেই পূর্ব্বপরিচিত বিধবা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটী তাহার অভাগিনী জননী, অপরাটির বয়স অনুমান সপ্তদশ বৎসর, তাহার স্ত্রী। প্রৌঢ়ার কথা শুনিয়া দ্বিজেন্দ্র কুমারের নয়ন যুগল অশ্রুপূর্ণ হইল।

উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ধনীর সন্তান সুবোধ কুমারের আজ ভীষণ অধঃ পতন পিশাচ কর্ম্ম সম্পাদন হেতু তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য বৎসরের মধ্যে নিঃশেষ হইয়াছে ঋণের দায়ে ভদ্রাসন বাটী খানিও বিক্রয় হইয়াছে। এইবার সব গেল! জমীদার গৃহিনী, জমীদার পুত্রবধূ পথে বসিল। এক মুষ্টি অন্নের জন্য আত্মীয়গণের শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু হায়! সকলেই বিমুখ!! তৎপরে আর কোন স্থানে না গিয়া গ্রামস্থ একজন লোক সমভিব্যবহারে কলিকাতায় সুবোধ কুমারের অনুসন্ধানার্থে আসিয়াছেন। হায়! ঐশ্বর্য্য! তুমিই মানব চরিত্রের যথার্থ পরিচায়ক তুমিই মানব জীবনের সদসদের এক মাত্র নিদান!

তাহাদের অবস্থা দর্শন করিয়া দ্বিজেন্দ্র কুমার, অনেক অনুরোধে তাঁহাদিগকে নিজ বাটীতে আশ্রয় দিলেন। বাটীর সকলে তাহাদিগকে দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইল। নির্ম্মলা সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইল, কারণ সে একজন সমবয়সী সখী পাইল। উভয়েই সমবয়সী কিন্তু উভয়েই অপরিচিতা, তাই কেমন কেমন ঠেকিতে লাগিল। বিশেষতঃ একজন অপরিচিতের শরণাপন্ন তাই নির্ম্ম-

লাকে আড়াল হইতে দেখিয়া সে অবগুণ্ঠনটী বেশ করিয়া টানিয়া দিল, নির্ম্মলা রমণী-সুলভ-চাপল্য বশতঃ বলিল, আমায় দেখে ঘোমটা দিলে কেন ভাই, তোমার মুখ খানা দেখি ! এই বলিয়া তাহার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিল, দেখিল প্রফুল্ল নলিনী রবি-কর-স্পর্শে ম্লান হইয়া গিয়াছে ! সেই হর্ষবিষাদ মাখা মুখখানি যেন তাহার পরিচিত, যেন তাহার হৃদয়ের কোন এক নিভৃত কক্ষে সেমূর্ত্তি প্রতি ফলিত ! নির্ম্মলা সবিস্ময়ে বলিল কে, বিমলা ! তুমি ! পাঠক ! বিমলা আপনাদের পূর্ব্ব পরিচিতা, নির্ম্মলার পূর্ব্বসহচরী। বহুদিন দৃষ্ট মুখখানি নির্ম্মলা প্রথমতঃ চিনিতে পারে নাই ।

দ্বিজেন্দ্রকুমার অনেক অনুসন্ধানের পর সুবোধকুমারের সাক্ষাৎ পাইলেন । সুবোধকুমারের অবস্থা অতি শোচনীয় ! তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । তাহার অবস্থা দর্শন করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয় ।

হায় ! গৃহের উজ্জ্বল হীরক খণ্ডের অনাদর করিয়া কাচের আদর করিয়াছিলেন, সতীকে মনস্তাপ দিয়া অসতীর সাধনা করিয়াছিলেন, সতীর নয়নের অশ্রু-প্রবাহ দীর্ঘনিশ্বাস অবহেলা করিয়া আপনার ক্ষণিক সুখে উন্মত্ত ছিলেন, আজ তাহার উপযুক্ত ফল ফলিতেছে সতীর মনস্তাপ, দীর্ঘনিশ্বাস মিথ্যা হইবার নহে, সেই দীর্ঘ নিশ্বাস ও মনস্তাপের পরিণাম জীবনের দাবাগ্নি ।

দ্বিজেন্দ্রকুমার সুবোধকুমারকে লইয়া বাটী আসিলেন পূর্ব্বেই তাহার জননীকে তাহার পুত্রের জন্য উদ্বিগ হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সুবোধ কুমারকে তাঁহার জননী সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, সুবোধ কুমার বলিল ভাই ! আমাকে একটী নির্জ্জন কক্ষে থাকিতে দাও, দ্বিজেন্দ্রকুমার চলিয়া গেলেন। সুবোধ কুমার অন্য নির্জ্জন কক্ষে অবস্থান করিয়া, হৃদয়ের সহিত অনেক দ্বন্দ্ব করিল। স্মৃতিপটে অতীত জীবনের বিভিষিকাময়ী ঘটনাবলী একে একে উদিত হইতে লাগিল। অবশেষে ক্লান্তদেহ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জীবনের শোক, তাপ, হর্ষ, বিষাদ, সমস্তই বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত হইল। কিন্তু তাহাকে সুপ্তিসুখ অধিক্ষণ অনুভব করিতে হইল না। তাহার চরণ যুগলের উপর যেন একবিন্দু বারি পতিত হইল, তাহার পর আরও একবিন্দু। সহসা চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পদপ্রান্তে একটী রমণী। রমণী ? হাঁ, রমণীই বটে ! সে রমণী তাঁহারি অনাদৃতা পদদলিতা স্বামী সোহাগ বঞ্চিতা ; শোক-দুঃখ নিপীড়িতা মূর্ত্তিমতী বিষাদপ্রতিমা বিমলা ! অশ্রুরাশে

কারযেন আর একটী সুন্দর মুখছবি! ওটী যে পরিচিত! ওটী যে বিমলার সুখে সুখিনী বিমলার দুঃখে দুঃখিনী আশ্রিতার আশ্রয় দায়িনী নির্ম্মলা!

রজনীর অভিসার।

লেখিকা—শ্রীমতী মৃণ্ময়ী দেবী।

দিনান্তের শেষে যবে সন্ধ্যানেমে আসে,
সোণার কিরণ-জাল্ ছড়ায়ে আকাশে,
সুনীল বসন পরি রূপে করি আলা,
চাঁদের কিরিট মাথে হৃদে তারা মালা,
যেন কারে ভুলাইতে সুমোহিনী সাজে,
আসে এক দেব বালা গোধুলীর সাঁঝে।
ফুটন্ত কুসুম রাশি গাঁথিয়া যতনে,
কার গলে দিতে যেন নিতি নিতি আনে;
সুদূর স্বরগ হ'তে পৃথিবীর পারে,
চেয়ে দেখে দীপ্ত চোক্ষে খোঁজে যেন কারে।
না পেয়ে তাহার দেখা, নয়ন অসারে,
শিক্ত করি ফুল মালা, ফেলে দিয়ে দূরে,
হতাশ চরণে ধীরে সরমে মরিয়া,
মরমে লইয়া ব্যথা যায় সে চলিয়া।
আবার গোধূলি আসে পশ্চিম গগনে,
আশা ভরা হৃদি লয়ে চঞ্চল চরণে,
সেও আসে খুজিবারে যদি পায় দেখা,
চির অভিসার তার কপালের লেখা।
হতাশ আশয়ে চির জীবন সঁপিয়া,
যুগন্তের শেষা-বধি এ ব্যথা বহিয়া,
যাপিতে হইবে তার বিধির বিচার,
স্বরগে মরতে বিধি একই তাঁহার।

বর্ষা-বর্ণনা।

লেখক শ্রীগোপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

—:(*):—

অবিরাম শ্রাবণের ধারা
তরুরাজি নীরবে তিতিছে
ধ্যানমগ্ন মহাযোগী প্রায়;
কালমেঘে ত্রিভুবন ভরা,
হুহুরবে পবন ছুটিছে
কাঁপাইয়া লতায় পাতায়।
তৃণ ঢাকা এক বন্যপথ দিয়া
জলের প্রবাহ চলেছে বহিয়া,
ভেকদল যত আনন্দে মাতিয়া
করিছে চীৎকার ধ্বনি;
অদূরে বায়স বসি বৃক্ষপরে
নয়ন মুদিয়া তিতিছে আসারে
মাঝে মাঝে শুধু কর্কশ স্বরে
ডাকিছে প্রমাদ গণি।
একা আমি মুক্ত গবাক্ষের পাশে
আমার পর্ণ কুটির আবাসে
কর্ম্মশূন্য এক দিবসের শেষে
বসে আছি আনমনে;
জীর্ণ চালের ছিদ্র বহিয়া
টপ্ টপ্ করি বহিয়া বহিয়া
বরষার জল ঝরিয়া ঝরিয়া
পড়িছে ঘরের কোনে।
স্ফীত যৌবন হৃদয়ে ধরিয়া
আবর্ত্তে ছুটিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া
তটিনী চলেছে কাহার লাগিয়া
ডুবায়ে আপন কুল,
ধীবর বালিকা ধরিয়া বুকেতে
তরণী চলেছে নাচিতে নাচিতে
(যেন) কাল নদীতে হাসিতে হাসিতে
ভাসিছে জীবন কুল।
চমকি চপলা যেতেছে লুকায়ে
আঁধার মেঘের আঁধার হৃদয়ে,
জিমূতমন্দ্রে তাই সে কাঁদিয়ে
ফেলিছে নয়ন জল;
মনে হয় যেন একদিন কবে
বিষাদ পূর্ণ এ আঁধার ভবে
এতটুকু হাসি যেন কি সৌরভে
হৃদয়ে করেছে বিহ্বল।
সে মোর ক্ষুদ্র কুটীর ঘেরিয়া
চারিদিকে জল চলেছে ছুটিয়া
জল বিম্ব কত জলেতে ফুটিয়া
জলেতে মিশায়ে যায়,
ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান কথা,
কত আশা, ভয়, সুখ, দুঃখ, ব্যাথা
হৃদয়ে উঠিয়া জলবিম্ব যথা
হৃদয়ে মিশায়ে যায়।
সহসা দেখিনু বিস্ময়ে চাহিয়া
চালের একটি তৃণ প্রবাহিয়া
বরষার জল পড়িছে ঝরিয়া
অদ্ভুত আকার ধরি,
একটির পর আর একটি করি
বিন্দু বিন্দু বারি, সারি সারি সারি
নামিয়া আসিছে তর তর করি
কি সুন্দর আহা মরি।

প্রত্যেক বিন্দুটি তৃণ প্রান্তে এসে
একটু দাঁড়ায়ে একটুকু হেসে
খসিয়া পড়িছে হায় অবশেষে
কঠিণ মাটির গায়,
কালসূত্র ধরি জীবনের স্রোত,
ঠিক ওরিমত চির প্রবাহিত,
অনন্ত, অসংখ্য অপ্রতিহত,
ধরায় বহিয়া যায়।
ঠিক ওরিমত এ জগতে এসে
একটু দাঁড়ায়ে একটুকু হেসে
চলেযায় জীব কোথা কোন দেশে
কে জানে সন্ধান তার
রেখে যায় শুধু জগতের পরে,
কীর্ত্তি অকীর্ত্তি জীবনে যাকরে
আপনার যারা তাহাদের তরে
এক বিন্দু অশ্রুধার।
ঝুপ ঝুপ ঝুপ বরষা ঝরিছে
ঘন কালমেঘে আকাশ ভরিছে
তমসা বসনে সন্ধ্যা নামিছে
একলাটি বসে আমি,
যেন কি মন্ত্র মুগ্ধ মরমে
চাহিতে চাহিতে আঁধার গগনে
আঁখি মুদেএল কি যেন স্বপনে
কখন নাহিক জানি।

—:০:—

গীত।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ তাল মধ্যমান।

যা তোমার মনে আছে, তাই কর গো মা তারা।
তবুনা ছাড়িব পদ জেন মনে ভবদারা॥
মা যদি সন্তানে মারে,
তবে কে রাখিবে তারে ?
(কিন্তু) ছেলে কি তবু মাবোল ছাড়ে,
সে যে মা মা রবে হয় মা সারা॥
তারে যদি দূরে ফেলে-
তবু সে যায় উঠতে কোলে-
"নেই আঁকড়া" ছেলে হলে সে মা বলে হয় আপন হারা॥
যতই ঠেলে ফেলবে তুমি
ততই কসে ধরবো আমি,
দেখ বে কেমন নয়নজলে গলাবে প্রাণ আজ পাষাণ পারা॥

নারী-শিক্ষা।

লেখক,-শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায়।

এতদ্দেশীয় অন্তঃপুর মহিলাগণের সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষতঃ তাঁহাদের গৃহস্থালী শিক্ষা, শিল্পকার্য্যাদি শিক্ষা এবং সাহিত্য চর্চ্চার উন্নতি সম্বন্ধে উপায় নির্ণয়।*—

১। মানব যত দিন সংসারে বাঁচিয়া থাকে তত দিন সে শিখে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া শিখিতে আরম্ভ করে এবং প্রাণবায়ু বহির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত শিক্ষা-লাভ করে। জ্ঞানের দ্বার ইন্দ্রিয়গণ যতক্ষণ উন্মুক্ত থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান প্রবাহ তাহাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। জ্ঞান মাত্রই বেদ "বিদজ্ঞানে" লোক পিতা-মহ ব্রহ্মা বেদ-শিক্ষা দিয়াছিলেন, অনেকে এই কথার প্রকৃত মর্ম্ম অন্যরূপ করেন। কিন্তু আমার মতে এ কথার অর্থ এই যে, জ্ঞান মাত্রই ভগবানের দ্বারা উৎপন্ন হয়। তিনিই প্রকৃত শিক্ষক। তাই সমস্ত লোক-শিক্ষকগণ ভগবানের নিকট হইতে তত্ত্বলাভ করিয়াছেন, বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ আছে। বেদের অধ্যাপক যেমন ব্রহ্মা, তেমনি ঈষামুশা, মহম্মদ প্রভৃতিও ভগবানের নিকট হইতে সত্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কৃতন্নহি লোকোবুদ্ধি মতাচার্য্যঃ। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব অবগত হওয়াই শিক্ষা এবং বিশ্বকে জানাই ভগবানকে জানা। তিনিই সর্ব্বত্র বিচ্চরিত। তিনিই শিক্ষনীয়, তিনিই শিক্ষক, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তিনি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহাতেই গ্রস্ত। নিতান্ত "অজ্ঞ" লোকও প্রভূত শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং করিতেছে। জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত ও নিরক্ষর ব্যক্তির মধ্যে যতটা পার্থক্য আছে, আমরা মনে করি ততটা প্রকৃত পক্ষে নাই। বিশ্বগ্রন্থ পাঠ করাই জ্ঞানলাভের উপায় এবং সকলেই এই গ্রন্থ কিছু পাঠ করিতেছে। আমাদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত শিক্ষার উদ্দেশ্য এই বিশ্বগ্রন্থ পাঠের জন্য লোককে অধিক সামর্থ্য প্রদান করা-জ্ঞানের দ্বার ইন্দ্রিয় সমূহকে অধিক কার্য্য-পটু করা। পরীক্ষা পাশ করাইয়া জীবন সংগ্রামে সমর্থ করা শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য। আমরা গৌণ ও মুখ্য উভয় উদ্দেশ্যকেই এক আদর্শের অন্তর্ভূক্ত মনে করি। প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ণয় না হইলে উপায়ও নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। আমরা স্ত্রী জাতির শিক্ষার উপায় নির্দ্ধারিত করিবার পূর্ব্বে তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

---

* চৈতন্য লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে "হরেন্দ্র নারায়ণ" পদক প্রাপ্ত রচনা।

২। আদর্শ সকলেরই এক। স্ত্রীলোকের যেমন ভগবানকে জানার আকাঙ্খাই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী, পুরুষের যে তাহাদের হইতে অধিক ইহা বলা যায় না। বরং স্ত্রীজাতিকেই ধর্ম্মের জন্য অধিক উদ্বিগ্না ও চেষ্টমানা দেখা যায়। আমরা যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদিগের শিক্ষা বিধানের জন্য এই প্রবন্ধের অবতারনা করিলাম, তাঁহাদের কাহারো যে জীবিকা সংগ্রহোপযোগী শিক্ষা লাভ করা উচিৎ নহে, এমত নহে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষার আলোচনা করিবেন। অতএব পুরুষগণ অপেক্ষা স্ত্রীলোকগণই উচ্চতর আদর্শের সেবা করিতে সক্ষম্। আমরা তাঁহাদের নিমিত্ত এইরূপ শ্রেষ্ঠতর আদর্শই কামনা করি, কেননা ইহাতে সমস্ত মানব জাতিই উপকৃত হইবে। পুরুষেরা অর্থ খ্যাতি ইত্যাদির প্রয়োজনায় জর্জ্জরিত তাঁহাদের জ্ঞানান্বেষণে রত হইতে যতটা বাধা অতিক্রম করিতে হয়, মহিলাগণের তত প্রলোভনে পড়িতে হয় না। তাহাদের জীবন যে অত্যধিক পরিমাণে পর সেবায় নিযুক্ত সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই।

৩। সমাজ ন্যায়ানুসারেই হউক বা তদ্বিপরীত উপায়েই হউক, তাহাদিগকে সেবা ধর্ম্মে নিযুক্তা করিয়াছে। পুরুষও যখন এই আদর্শে জীবন পরিচালিত করেন, তখনই তিনি মহতো-মহিয়ান্। বিশু, নানক প্রভৃতি মহাত্মাগণ সকলেই জীবনে এই পরোপকার ও পরসেবারূপ মহাব্রত উদযাপন করিয়াছেন। স্বকীয় আত্মার মঙ্গল কামনাও কামনা। যাহারা প্রকৃত সাধু তাহারা সর্ব্বতো ভাবে পরার্থপর। বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলে যে 'মুক্তি" ভক্তির দাসী। পরকে ভগবান রূপে ভজনা করাই ভক্তি। সেই ভক্তি যাহাতে প্রাণে জাগে, পরসেবা প্রবৃত্তি যাহাতে হৃদয়ে জাগরুক হয়, যাহাতে আমরা নিজ সুখ ভুলিয়া পরিবারের, সমাজের দেশের ও মানব জাতির কাজে লাগিতে পারি, সেই রূপ শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়। এরূপ শিক্ষাই শিক্ষা। যে শিক্ষাতে এই ভ্রম ভঙ্গ হইয়া যায়, যে শিক্ষা পারিবারিক জীবনে স্বার্থ-পরতা সমাজ ও দেশের প্রতি শত্রুতা প্রবল করিয়া দেয়, তাহা শিক্ষাই নহে। পক্ষান্তরে যে শিক্ষা কেবল এই পর্য্যন্ত যাইয়াই আর অগ্রসর হয় না, তাহা পরিত্যাজ্য তাহাতে বিভিন্ন বিবাদ অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

ইয়ুরোপ বা আমেরিকা যে শিক্ষা দিতেছে, তাহাতে এইরূপ পরস্পর দ্বেষ ভাব তিরোহিত হইতেছে। স্বার্থপরতা যেরূপ লোককে দাম্ভিক করিয়া ফেলে ও উন্নত হইতে দেয় না, জাতীয় স্বার্থান্ধতা সেইরূপ হৃদয়কে সঙ্কোচিত করে ও চরম উন্নতি লাভ করিতে বাধা জন্মায়। প্রকৃত শিক্ষা জাতীয় স্বার্থরক্ষাকে মানব জাতির স্বার্থের সহিত মিলিত করিয়া অপর প্রপীড়নে পরাঙ্মুখ করিয়া দেয়।

৪। আমরা অর্থকরী বিদ্যার পক্ষপাতি, কেন না বর্ত্তমান সময়ে জঠর জ্বালাতে ভারতবর্ষ লোকশূণ্য হইতে চলিয়াছে। এই মহামারী গ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভারতে স্বার্থপরতা অর্থাৎ নিজেকে ও নিজ দেশকে রক্ষা করার ইচ্ছা ভিন্ন অন্য ইচ্ছা বড় স্থান পায়না। বর্ত্তমান "স্বদেশী" আন্দোলন যে আপামর সর্ব্ব সাধারণের নিকট এত আদর পাইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ ভারতের দারিদ্র। পুরুষগণ দারিদ্র নিবারণ প্রশ্নের মীমাংসাতেই ব্যস্ত থাকিবে। অন্ততঃ ভারতে বর্ত্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষগণ যে উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিবে বোধ হয় না। বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষার কালেজ হইতে আরম্ভ করিয়া আদর্শ মাদ্রাসা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ছাত্রগণ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অতএব যাঁহারা সামাজিক অথবা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জীবিকা সংগ্রহরূপ স্বার্থপরতা হইতে দূরে থাকেন, যাঁহারা পিতা বা স্বামীর অর্জ্জিত অর্থে প্রতিপালিতা হইতেছেন ও যাঁহারা বাল্যকাল হইতেই সেবাধর্ম্মে দীক্ষিতা ও ব্রতী, তাঁহারাই নিঃস্বার্থভাবে সাহিত্য ও কলাবিদ্যার অনুশীলনে সমধিক সময় ও যত্ন প্রয়োগ করিবেন। ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এখন অনেক কুল ললনাগণ সাহিত্য বিজ্ঞান চর্চ্চায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। উপন্যাসে বোধ হয় লেখিকাগণের সংখ্যাই বেশী এবং তাঁহারা পুরুষের অপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ দেখাইতেছেন। তাঁহাদের হৃদয়ের জোর বেশী। অতএব সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় তাঁহারা যে সমধিক উন্নতি করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৫। পৃথিবীতে জ্ঞান চর্চ্চার প্রারম্ভাবধি যদি স্ত্রীলোকগণ পুরুষের ন্যায় শিক্ষা লাভ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় পৃথিবীর অবস্থা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্টতর হইত। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে বোধ হয় অধিক সংখ্যক কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি দৃষ্ট হইত; পৃথিবীর পাপ তাপ অনেক কমিয়া যাইত! পৃথিবী স্বর্গরাজ্যের অধিক সমতুল্য হইত। কিন্তু হায় দুরন্ত স্বার্থপরতা মানুষের হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সমাজে স্বার্থপর ব্যক্তি সর্ব্বদাই দুর্ব্বলকে উৎপীড়িত করিতেছে ও নিজের স্বার্থপর বৃত্তি চরিতার্থের জন্য দুর্ব্বলকে দুর্ব্বল রাখিয়া দিতেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সকল সমাজেই দুর্ব্বলকে পীড়া দেওয়া হইতেছে। স্ত্রীলোককে সর্ব্বদাই নিকৃষ্ট বস্তু রূপে ব্যবহার করা হইতেছে। নিগ্রো সকলের হেয় অধম এখন শ্রমজীবগণ টাকাওয়ালাদের ভোগ্য। স্বার্থপরতার উৎপীড়নেই স্ত্রীলোক হীন দশাপন্ন ও মুর্খ। পুরুষ দুশ্চরিত্র

হইলে পণ্ডিত হয় না জাতি যায় না। দুশ্চরিত্রা স্ত্রী সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য এই পক্ষপাতিতা কেন? হতে পারে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এ নিয়ম স্বাস্থ্য জনক। কিন্তু এই দুর্দ্দশার জন্য স্বার্থপর পুরুষগণ যে দায়ী, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আমরা যে আমাদের মা ভগিনীর অজ্ঞতার জন্য দায়ী তাহা অস্বীকার করা উচিৎ নহে। পুরাতন শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বতো ভাবে সর্ব্ব শক্তিমান ছিলেন. অতএব তাহাদের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান হইতে যাওয়া ধৃষ্টতা ইত্যাদি রূপ স্ত্রী শিক্ষা বিরোধী মিথ্যাযুক্তি অনেকের মুখে শুনা যায়।

৬। আমরা মানুষের সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকার করিনা, এবং ঋষিগণও যে হাজার হাজার বৎসর পরে কি ভাবে সমাজ চলিবে, তাহারও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া শাস্ত্র করিয়াছিলেন, বিশ্বাস করি না। প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষে কেবল ঋষিই জন্মাইতেন, স্বার্থপরতা মানুষকে ছাড়িয়া কেবল অন্য জীব আশ্রয় করিয়াছিল, ইহাও বিশ্বাস করিনা। আমরা বিশ্বাস করি, মানুষ সকল সময়েই স্বার্থপর; সকল সময়েই দুর্ব্বল বলবান, কর্ত্তৃক উৎপীড়িত। "ঋষিগণই অনার্য্যগণকে উৎপীড়িত অশেষ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঋষিগণও রক্ত মাংসের জীব ছিলেন। পৃথিবী চরম উন্নতির অবস্থা তখনই প্রাপ্ত হইয়াছিল, আর এখন কলির প্রভাবে মানুষ অবনত হইতেছে এ কথাও বিশ্বাস করিনা। পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সমস্ত মানব জাতির উন্নতি বোধ হয় ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যাদি সুখী ও উন্নত জীবন যাপনে অধিকারী হয়, এই অধিকার ভবিষ্যতেই লাভ করিবে। এখন যেমন পৃথিবীস্থ সকল লোকেই উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে, অতীতে সেইরূপ সর্ব্বজনীন চেষ্টা হয় নাই। "স্ত্রী শূদ্রহন শবরাঃহপি পাপ জীবার" ইত্যাদি বাক্য ও সর্ব্বজন বিদিত "স্ত্রীশূদ্র দ্বিজ বন্ধনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা" ইত্যাদি শ্রুতি যাঁহারা প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সময়েই সমাজ সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সামাজিক উন্নতি কল্পে যত্ন বিমুখ হওয়া স্বার্থপরতা ভিন্ন অন্য নামে অভিহিত হইতে পারেনা। স্বার্থ পরতাই ভ্রান্ত মতের পোষক ও স্বার্থ পরতাই ভাগ্যবাদী। যাহারা স্বার্থপর জন্য স্বাধীনতা কামনা করেন এবং যদি সেই ক্ষুদ্র জনৈক স্বার্থটুকু আঘাত পায় তবে তাহারা স্বাধীনতার ও বিরোধী হইয়া উঠে। স্ত্রীজাতিও অন্যান্য উৎপীড়িত গণের ন্যায় ভবিষ্যতেই পুরুষ জাতির প্রাপ্য সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিবেন। যে বিষয়ে অত্যন্ত অভাব বোধ মানুষের নাই, মানুষ তাহার লাভে যত্নচেষ্ট হয়না।

৭। পুরুষগণ নিজে ইচ্ছা করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে নানা বিদ্যা শিক্ষা দিয়া বাধিত করিবে এটা আমাদের নিকট ভ্রান্ত ধারণা বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীলোকগণ নিজেরা যদি শিক্ষার জন্য ব্যস্ত না হন এবং পুরুষদিগকে এই বিষয় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য না করেন, তবে নারী জাতির সম্পুর্ণ কল্যাণ হইতে পারেনা। স্বাধীনতার প্রবল পক্ষপাতী ইউরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের কি অবস্থা? তাঁহারা এখনও বোধ হয় তথায় যেরূপ উৎপীড়িত সেরূপ আমাদের সমাজে নহেন! কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগকে ডিগ্রী দেওয়া হয় না। স্ত্রীলোকেরা কোন দেশেই পুরুষের ন্যায় স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন না। কিন্তু সেই সব দেশে যে সব মনস্বিনীগণ উন্নত হইয়াছেন, তাহারা স্ত্রীজাতির উন্নতি কল্পে জীবনপাত করিতেছেন। আমাদের দেশেরও শিক্ষিতা রমণীগণের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য প্রাণপাত করা, তাঁহারা যদি এ বিষয়ে চেষ্টা না করেন তবে বিশেষ কিছু হইবে না। শিক্ষিত ভারত বাসীর যেমন প্রধান কর্ত্তব্য ভারতের আপামরকে শিক্ষিত করা, তদ্রূপ শিক্ষিতা নারীগণের প্রধান কর্ত্তব্য স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করা। পুরুষদিগের স্ত্রী শিক্ষার অভাব বোধ জন্মাইয়া দেওয়া আবশ্যক। আধুনিক যুবকগণ একটু চিঠি পত্র লিখিতে সক্ষম হওয়ার মত তৃতীয়ভাগ পড়া বিদ্যা হইলেই স্ত্রীলোকের হইল মনে করেন। তৃতীয় ভাগ বা বোধোদয় পড়া বিদ্যায় গৃহস্থালীর কার্য্য বিশেষ কিছু সাহার্য্য হয়, আমি মনে করি না। স্ত্রী শিক্ষার অভাব বোধ স্ত্রীজাতির নিজের মধ্যেও নাই এবং পুরুষগণও তাহাদের মাতা বা ভগিনীর শিক্ষার আবশ্যক আছে বোধ করেন না। ভারতবর্ষে শিক্ষার অভাব চিরকালই রহিয়া গিয়াছে, অতীতেও জন কয়েক লোক টোলে অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত খ্যাতি লাভ করিতেন। ঠিক সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার কোন বিশেষ বন্দোবস্ত ছিলনা। কথকতা প্রভৃতি দ্বারা লোক শিক্ষা হইত বটে, কিন্তু আমরা বর্ত্তমান সময়ে কেবল সেইরূপ কথকতা যাত্রা প্রভৃতির শিক্ষায় সন্তুষ্ট হইতে পারি না। বর্ণজ্ঞান বিশিষ্ট না হইলে আমরা আর লিটারেট বা শিক্ষিত বলিতে চাহিনা। মৌখিক শিক্ষা আমাদের দেশে ছিল এবং সেই শিক্ষার পুনরভ্যুত্থান হওয়া আবশ্যক। কিন্তু মৌখিক শিক্ষাতেই শিক্ষা শেষ করা যুক্তি যুক্ত নহে। শিক্ষার অভাব বোধ হইলেই কতকটা শিক্ষা হইবে। আত্যন্তিক ইচ্ছা না হইলে কোন বাঞ্ছিত দ্রব্যই লাভ হয় না, আত্যন্তিক ইচ্ছার অভাব নিবন্ধনই স্ত্রীশিক্ষার উপায় নির্দ্ধারিত হইতেছে না। আধুনিক শিক্ষিতা রমণীগণের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া

উচিৎ স্ত্রী জাতির মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তার করা, স্ত্রী শিক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন করা। দাসত্ব বা সেবা অতি উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম, কিন্তু তাহা জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও স্বাধীনতার রসে সঞ্জীবিত না হইলে তাহা "দাসত্বই" বটে। স্ত্রীলোক-গণ "জগদ্ধাত্রী" বটেন কিন্তু জগতে "ধাত্রী" হইতে সবিশেষ জ্ঞানের আবশ্যক। "ধাত্রী" জ্ঞান বিশিষ্ট ও বুদ্ধিমতী না হইলে জগতের সেবা করিতে পারিবেন না। আমাদের মা ভগিনী যদি ভাল "ধাত্রী" হইতেন তাহা হইলে আমরা আরও অনেক পরিমাণে জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও সাহসী হইতাম স্বার্থপর না হইয়া পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়া ধন্য হইতাম।

৮। বঙ্গদেশের শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণ ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সহানুভূতি বিশিষ্ট পুরুষগণ মিলিত হইয়া "জাতীয় স্ত্রীশিক্ষা বিষোয়িনী সভা" প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিৎ। স্ত্রী শিক্ষার সর্ব্ব প্রধান উপায়—শিক্ষিতা স্ত্রীগণের ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সহানুভূতি বিশিষ্ট পুরুষগণ মিলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজের আদর্শোপযোগী শিক্ষার বিধান করা। আমাদের প্রধান রোগ পাশ্চাত্য হাব ভাবের অন্ধ অনু-করন। আমাদের মেয়েরা যদি মেম সাহেব সাজেন তবে সমাজের সহানুভূতি পাইবেন না। নীচ স্বার্থপরতা ত্যাগ না করিতে পারিলে জনহিতৈষনী কার্য্যে ব্রতী হওয়া উচিৎ নহে। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে স্ত্রীলোকগণকেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে! তাঁহাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, শিক্ষাভিমান ত্যাগ করিয়া "অশিক্ষিতা" দের ন্যায় পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইবে ও তাহাদিগের হইতে নিজেদের বাহ্যিক পার্থক্যটী দূর করিতে হইবে। শিক্ষিতা হিন্দু রমণীগণ হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবেন, শিক্ষিতা মুসলমান রমনী মুসলমান রমণীগণের শিক্ষয়িত্রী হইবেন। মেম সাহেবগণ স্বদেশীই হউন বা বিদেশীই হউন, ভারত ললনার শিক্ষাদানে নিতান্ত অনুপযুক্ত। তাঁহার নিকটে লোক ঘেঁসিবেনা। মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী পুণ্য কীর্ত্তি পবিত্র স্মৃতি ৺মাতাজী তপস্বিনীর ন্যায় তপস্বিনী না হইলে প্রকৃত স্ত্রী শিক্ষার উপায় নির্দ্ধারিত হইবে না। আমি একথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে এই মহৎ কার্য্যে শিক্ষিতা স্ত্রীলোক দিগকে অগ্রসর হইতে হইবে. আত্মসুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে হইবে। আত্মনির্ভরতা ভিন্ন উন্নতির অন্য কোন উপায় নাই। "সর্ব্বত্রই আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ" নীতি সত্য। স্ত্রীলোকের চেষ্টা ও ত্যাগ ভিন্ন স্ত্রী শিক্ষার অন্য কোনও উপায় নাই। আমি শিক্ষিতা ভগিনীগণের ইংলণ্ডে যাওয়ার কোন আবশ্যকতা দেখি না। দেশে এত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে যে ইংলণ্ডে যাওয়ার অবসর নাই। কিরূপে অর্থ ও

শিক্ষক সংগ্রহ করিতে হইবে, ক্রমে তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ বলিব। কিন্তু আমার প্রধান কথা এই যে স্ত্রী শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিগড় হইতে মুক্ত করিতে হইবে, স্ত্রী শিক্ষাকে দেশী ছাঁচে ঢালিতে হইবে, পরীক্ষা পাশ করা রূপ নীচ আদর্শ হইতে উপরে টানিয়া উঠাইতে হইবে এবং স্বায়ত্তশাসনের ও স্বাবলম্বনের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

৯। জাতীয় ভাবে স্ত্রী শিক্ষার প্রধান অন্তরায় শিক্ষক ও অর্থের অভাব। আমার বোধ হয় প্রকৃত ইচ্ছা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা কার্য্যে ব্রতী হইলে এই সকল অভাব দূরীভূত হইবে। অনেক হিন্দু স্ত্রীলোক জমিদার আছেন তাঁহাদের সহানুভূতি লাভ করিতে পারিলে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করা যায়। "বঙ্গদেশীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদে" ছাত্রের অভাব এখনও রহিয়াছে কিন্তু ছাত্রীর অভাব হইবে না। চাকুরীর বা জীবিকা সংগ্রহের চিন্তা ছাত্রীর শিক্ষাতে মোটেই আসিবে না। এখানে গভর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিযোগিতার ভয়ও তত নাই। বৃদ্ধ পণ্ডিত ও পেন্সন প্রাপ্ত শিক্ষকগণ সম্প্রতি শিক্ষকের অভাব দূর করিতে পারিবেন। আমার আর একটী প্রস্তাব এই যে, অনেক বিধবা স্ত্রীলোকগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে শিক্ষকতা করিতে পারিতেন। তজ্জন্য সাধারণের ব্যয়ে একটী বিধবা আশ্রম স্থাপিত হওয়া উচিৎ। তথায় তাঁহারা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শিক্ষা লাভ করিবেন। গৃহস্থালীর কার্য্য, পুস্তক অধ্যয়ন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য তাঁহারা শিক্ষা করিবেন। ভবিষ্যতে ইহারাই খাঁটী শিক্ষয়িত্রী হইবেন। এই "বিধবা আশ্রমের" তত্ত্বাবধানের ভার হিন্দু সমাজের নেতৃ স্থানীয় লোকের উপর অর্পিত হওয়া উচিৎ। এই "বিধবা আশ্রমে" গৃহস্থালীর কার্য্য, শিল্প কার্য্য ও সাহিত্য চর্চ্চা প্রভৃতি সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হইবে। আশ্রম বাসিনীগণ নিজেদের সমস্ত কার্য্য নিজেরা করিবেন, পাক করিয়া পাক প্রণালী শিক্ষা করিবেন। নিজেদের কাপড়ের জন্য সুতা কাটা শিখিবেন। আমার বোধ হয় বুদ্ধি পূর্ব্বক কাজ করাইলে তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের জীবিকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। সাধারণ লোক এই সব কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। ৺মাতজী তপস্বিনীর ন্যায় কাজের লোক দাঁড়াইলে অর্থের অভাব হইবে না। খবরের কাগজে সাহায্য ভিক্ষা করিলে ফল হইবে না। লোকের কাছে যাইতে হইবে, লোককে বুঝাইতে হইবে। জাতীয় ভাবে স্ত্রী শিক্ষা হইবে শুনিলে, অনেকে টাকা পয়সা দিবে। বর্ত্তমান বিশ্ব বিদ্যালয়ের মতানুযায়ী শিক্ষা অনেকের অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছে। শিক্ষা দ্বারা উপকার বই অপকার সম্ভাবিত হইবেনা এই কথা লোককে কার্য্য দ্বারা বুঝাইতে হইবে।

১০। শিক্ষনীয় বিষয় সমূহ, শিক্ষা প্রদানের সময়, শিক্ষা প্রণালী প্রভৃতি "জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ" নির্দ্ধারিত করিবেন। যদি আমার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় এবং শিক্ষিতা ভগিনীগণ আমাদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করেন তখন আমরা এ সব বিষয়ে মতামত প্রদান করিব, বাসনা রহিল। আমি এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, তাঁহাদের সকলের ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা অনাবশ্যক। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করাই নিতান্ত উচিৎ হইবে। পুরুষের ন্যায় আহারের অব্যবহিত পরেই দৌড়াইয়া তাহাদিগকে স্কুলে না যাইয়া, ঘরে বসিয়া স্বাবলম্বন অবলম্বন পূর্ব্বক যাহাতে শিক্ষা লাভ করা যায়, তাহার বিধান করা কর্ত্তব্য। এজন্য শিক্ষয়িত্রী গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া শিক্ষা দিবেন। গ্রামে তিনটী পাড়া থাকিলে তিনি হয়ত সপ্তাহে দুই দিন করিয়া এক এক পাড়ায় যাইবেন এবং তথায় সম্মিলীতা বিবাহিতা কুল ললনাগণকে পাঠে ও অন্যান্য শিক্ষনীয় বিষয়ে উপদেশ দিবেন। অবিবাহিতা বালিকাগণের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিৎ কিন্তু তথায়ও ১১ টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অধ্যাপনার আবশ্যক নাই। আহারের পর বিশ্রামই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের প্রকৃতিক নিয়ম। বর্ত্তমান প্রবর্ত্তিত "১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত" নিয়ম আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতি-জনক। অন্ততঃ বালিকাগণকে স্বাস্থ্য নাশের এ দুর্নীতি হইতে রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। পিতা মাতা উভয়ের শরীর ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে ক্রমে বংশ লোপের নিতান্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমাদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতার এক প্রধান কারণ উপযুক্ত সময়ে বিশ্রামাভাব, "অজীর্ণ" রোগ জাতীয় রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয়ে টোলের ন্যায় প্রাতে ও বৈকালে অধ্যয়নাদি হওয়া উচিৎ। বৈকালে শিল্প কার্য্যাদি শিক্ষা ও প্রাতে পুস্তক পাঠ এরূপ নিয়ম বোধ হয় মন্দ হইবে না। দুবেলা যাতায়াত অসুবিধা জনক হইলে প্রাতঃকালেই সব বিষয় কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। গৃহস্থালীর কার্য্য বালিকার মাতা ও শ্বশ্রূই ভাল শিক্ষা দিবেন। এ বিষয় অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহারাই শিক্ষা দিতেছেন। বিবাহের সময় যদি বরপক্ষ বালিকার গৃহস্থালীর কার্য্যের প্রতি আদর প্রকাশ করেন তবেই বালিকাগণের এই সব বিষয়ে শিক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি হইবে। স্ত্রী শিক্ষার উপায় নানারূপ কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের সমাজে কোন উপায়ই সহজে কার্য্যকর হয় না। কেন না স্ত্রীলোকের প্রধান বন্ধু হইয়াছেন তাঁহারা স্বয়ং, তাঁহাদের স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়গণ। কিন্তু শিক্ষার অভাব তাঁহারা নিজেও অনুভূতি করেন না এবং বন্ধুগণও করেন নাই। কুল ললনাগণ যদি

যন্ত্রের ন্যায় বাদা হন, ছবির ন্যায় সুন্দরী হন, তবেই হইল। তাঁহাদের জীবনের একটা "উন্নতি" হওয়া উচিত এ সব কথা আমাদের সমাজে বড় উঠে না। যাহারা এ সব বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহারা "খৃষ্টান" অথবা "ব্রাহ্ম"। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ সব রাখিতে যাইয়াই সকলের মূল উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। ভাল মন্দ সবই রাখিব, কিছুই ছাড়িব না। এই মূর্খতা বশতঃই এত দিন সমাজ দেহ অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। হিন্দু ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব "আচার" বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানব জাতির জন্য কতকগুলি "সদাচার" প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। সেই গুলি যাহাতে সমাজে প্রচলিত হয় তাহারা চেষ্টা করা উচিত। যে সেই আচার আচরণ করিবে সেই হিন্দু হইবে। তাহাকেই আদর করিতে হইবে। "অস্পৃশ্য" "অন্ত্যজ" জাতি এবম্বিধ কথা গুলি না উঠিয়া গেলে জীবনী সঞ্চার হইবে না। এই "সব রাখিব" ভাব বশতঃই স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি বড় আয়াস সাধ্য। এজন্য দেশের উপাধি ধারিণী শিক্ষিতা ভগিনীগণের সন্ন্যাসিনী ব্রহ্মচারিণী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তাহারা যদি লেডী সু পায় দিয়া গাউন কামিজ পরিয়া লেডী সাজিয়া, পাক করা প্রভৃতি কার্য্যকে অবহেলা করিয়া বসিয়া থাকেন, তবে স্ত্রী শিক্ষা উঠিয়া গেলে দেশের ক্ষতি হইবে না। যাহাতে আমাদের স্ত্রীলোকগণকে সীতা সাবিত্রীর আদর্শ ভুলাইয়া দেয়, এমন শিক্ষা চাইনা। মেরী কার্পেণ্টার বা ফ্লরেন্স নাইটেঙ্গেল দেশীয় আদর্শ নহে। দেশের আদর্শ না হইলে চরিত্রে তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে না। ভারতে যে আদর্শ ছিল, আবার আদর্শের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক; পৃথিবীতে ছিল কিনা জানিনা। তবে স্পার্টা প্রভৃতি বীরভূমিতে এই আদর্শ পূজিত হইয়াছে। এই আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেই জাতীয় ভাবে স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্ম নীতিকে মূল উদ্দেশ্য করিয়া, জাতীয় ভাব রক্ষা পূর্ব্বক, শিক্ষা দিতে হইবে। ত্যাগীলোক ভিন্ন প্রকৃতশিক্ষক কেহ হইতে পারে না। ভারতে প্রাচীন সময়ে ত্যাগী ব্রাহ্মণগণ শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই ভারত জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইয়াছিল। "জাতীয় স্ত্রী শিক্ষা পরিষদ" অচিরে স্থাপিত হওয়া উচিত এবং শিক্ষিতা ভারত ললনাগণের জাতীয় ভাবে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। সর্ব্বদা এই কথাটী মনে রাখিতে হইবে যে অপরে কাহাকেও উন্নত করিতে পারেনা, কিছু সাহায্য মাত্র করিতে পারে। শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণের ত্যাগ স্বীকার ভিন্ন স্ত্রী-শিক্ষার অন্য প্রশস্ত উপায় নাই।

বিমলা।

লেখক,—শ্রী যতীশচন্দ্র বসু এম, এ,

শারীরিক মানসিক এবং পারত্রিক উৎকর্ষ সাধন মনুষ্য জীবনের প্রধান লক্ষ্য। নীরোগ শরীরে, সুস্থ শান্তমনে স্থিরচিত্তে স্বকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই মানব ধর্ম্ম। আত্মীয় বন্ধুজনের মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল চিন্তা করা আমাদিগের সকলেরই কর্ত্তব্য। গৃহমধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করা, ছোট বড় যাবতীয় গৃহকার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করা শ্রেষ্ঠ নারীধর্ম্ম। পুরুষেরা যথায় তথায় বিচরণ করিতে পারে, তাহাদিগের কর্ত্তব্য বহির্জগতেও আছে কিন্তু নারী অন্তঃপুরচারিণী, গৃহই তাহার সমগ্র জগৎ, গৃহই তাহার একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র। সুতরাং স্বগৃহকে সমুন্নত পরিশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করা, নিজ অন্তঃপুরকে সুখ শান্তি সৌন্দর্য্যের আধার করা, নারী-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে—গৃহিণীকেই গৃহ বলে; অর্থাৎ যে গৃহে গৃহিণী নাই, তাহাকে যথার্থ গৃহ বলা যায় না। যাহাকে ইংরাজিতে হোমকম্ফর্টস্ (গৃহ-সুখ) বলে, তাহা একমাত্র গৃহিণী দ্বারাই লভ্য। গৃহিণী-ব্যতীত গৃহে সুখ লাভ হয় না। তুফানের সময়ে সমুদ্রে সুচতুর কর্ণধার থাকিলে, জল যাত্রীর যেরূপ আশঙ্কার লাঘব হয়, সেইরূপ সংসারার্ণবে সুগৃহিণীর বর্ত্তমানে পরিবার-বর্গের বহু বিপদের হ্রাস হয়।

বিমলা সুগৃহিণী। বীরেন্দ্রসিংহের গৃহে বিমলা সামান্য পরিচারিকা বলিয়াই পরিচিত ছিল, কিন্তু তুচ্ছ পরিচারিকা হইয়াও সে সমুদায় গৃহকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত। তাহার গুণে সকলেই মুগ্ধ। তিলোত্তমা হইতে সামান্য দৌবারিক পর্য্যন্ত সকলেই তাহার বাধ্য। কেহ কখন তাহার অবাধ্যাচরণ করে নাই। ঘোর নিশাকালে বিমলা যখন অস্ত্ররক্ষকের নিকট দুইটী বর্ম ভিক্ষা করিল, তখন সে বিনা বাক্যব্যয়ে বিমলাকে বর্ম প্রদান করিয়াছিল। কেহ কখন সামান্য পরিচারিকাকে এতদূর বিশ্বাস করিতে পারে? বিমলার গৃহিণীপনা যে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা কি এই একমাত্র উদাহরণ হইতেই সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হয় না।

বিমলার বুদ্ধি অতীব প্রখর, তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও অলৌকিক। স্ত্রীলোকে সেরূপ বুদ্ধি কদাপি সম্ভবে না। বিমলা কেবল মাত্র সুগৃহিণী ছিলেন এমন নহে, বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও কূটবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। পাঠক একবার সেখজীর সহিত বিমলার কথোপকথন পাঠকরু। ওসমান কর্ত্তৃক দৃঢ়বদ্ধ বিমলা কিরূপে সেখজীর হস্ত হইতে বন্ধন মুক্ত হইল, এবং অবশেষে অপূর্ব্ব বুদ্ধি

কৌশলে পলায়ন করিল এবং পাঠানাক্রান্ত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া বীরেন্দ্রসিংহের কক্ষে গমন করিল, বীরেন্দ্রসিংহকে বন্দী দেখিয়া দ্রুতগতিতে জগৎসিংহের কক্ষে যাইতে মানস করিল। পথে সেখজীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। রহিমসেখ বলিয়া উঠিল 'তবে পলাতকা! আর কোথায় পলাবে?' দ্বিতীয়বার রহিমের করকবলিত হওয়াতে বিমলার মুখ শুকাইয়া গেল কিন্তু সে ক্ষণকাল মাত্র, তেজস্বিনী বুদ্ধির প্রভাবে তখনই মুখ আবার হর্ষোৎফুল্ল হইল। বিমলা মনে মনে কহিলেন, ইহার দ্বারা স্বকর্ম্ম উদ্ধার করিব,—ইত্যাদি।

ধন্য বিমলার বুদ্ধি, ইংলণ্ডসম্রাজ্ঞী হইলে বিমলা দ্বিতীয় এলিজাবেথ হইতে পারিত, মোগল সম্রাটপত্নী হইলে, দ্বিতীয় নুরজাহান হইত। কিন্তু বুদ্ধিমতী হইয়াও বিমলা স্বার্থপর ছিল না। স্বীয় স্বার্থের প্রতি সে কদাপি দৃষ্টি রাখিত না। তিলোত্তমা ও আয়েষা নিজচিন্তা লইয়াই ব্যস্ত, কিন্তু বিমলা সর্ব্বদা পরের মঙ্গল চিন্তা লইয়াই পাগল। পুরুষের ন্যায় বুদ্ধি সত্বেও বিমলা স্নেহশীলা, কোমলা দয়াবতী নারী, তাহার কোমল মধুরভাবপূর্ণ সস্নেহ হৃদয়ে সকলেরই স্থান হইত। কেহ বিপদে পড়িলে বিমলার নিকট ছুটিয়া আসিত, কেহ পীড়িত হইলে বিমলা তাহার সাহায্যে ছুটিত। নিজ বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, নিজ মুক্তপথ রোধ করিয়া ওসমান-কর্ত্তৃক প্রাপ্ত অঙ্গুরীয় বিমলা তিলোত্তমাকে প্রদান করিল। তিলোত্তমাকে সে কন্যাধিক স্নেহ করিত, কণ্টকাকীর্ণ সংসারারণ্যের সমুদয় কষ্ট ও যন্ত্রণা হইতে তাহাকে রক্ষা করিত। তিলোত্তমার পীড়ার সময়ে বিমলা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিল। বিপদে সম্পদে বিমলা, মাতৃহীন সংসারানভিজ্ঞ বালিকার একমাত্র সহচরী।

বিমলা যেরূপ বুদ্ধিমতী সেইরূপ রসিকা। জগৎসিংহের সহিত কথোপকথন তাহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। বিমলা কলকণ্ঠনাদী পক্ষীর ন্যায় যাহার নিকট যাইত, তাহাকেই আমোদিত করিত। আমোদপ্রিয়া বলিয়া সকলেই তাহাকে স্নেহ করিত, সকলেই ভাল বাসিত।

বিমলার অতুল্য পতিভক্তি। নুরজাহানের ন্যায় প্রখরা বুদ্ধিশালিনী হইয়াও বিমলা তাহার ন্যায় ব্যভিচারিণী ছিল না। জারজ-কন্যা হইয়াও তাহার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। পতির জন্য সে সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিল। দাসীবেশে, পরিচারিকার ন্যায় সে স্বামীগৃহে বাস করিতে সম্মত হইল। কেন? বিমলার কিসের অভাব? তাহার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকাল, মনোরম সৌন্দর্য্য, অতুলনীয় রূপ; তাহার উপর— সর্ব্ববিদ্যাভূষিতা বিদুষী, নৃত্যগীত শিল্প কার্য্যাদি সকলই তাহার করতলগত;

আবার সেনাপতি মানসিংহের প্রিয়তমা পত্নী উর্ম্মিলাদেবীর সহচরী-তিনি বিমলাকে সহোদরাপেক্ষা স্নেহ করিতেন। তাহার সৎপাত্রের অভাব কি? কত শ্রেষ্ঠ রাজপুত্র যুবক তাহার ন্যায় পত্নী লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিবে. কত ধনশালী রাজপুরুষ তাহার করপ্রার্থী। কেন বিমলা বৃদ্ধ বীরেন্দ্রসিংহকে পতিত্বে বরণ করিল?—বিমলা অবিশ্বাসিনী নহে, একবার যাহাকে হৃদয়ে সঁপিয়াছে, একবার যাহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, বিমলা তাহারই—বিমলা বিচারিণী নহে। সেই কারণে পিতা কর্তৃক ভৎসিত হইয়া ও পতির দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াও বিমলা পরিচারিকা বেশে স্বামী গৃহে পদার্পণ করিল। এই দৃঢ় অনুরাগের, এই অপূর্ব্ব প্রেমের পুরস্কার স্বরূপ বিমলা কালে স্বামীপ্রণয়ভাগিণী হইয়াছিল। কিন্তু হায়! অকালে তাহার সুখ রবি মেঘাচ্ছন্ন হইল।

বিমলা রাজপুতরমণী। সতেজ বীররক্ত তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে। তাহার হৃদয়ে প্রেম যেরূপ সবেগ প্রতিহিংসাস্পৃহাও সেরূপ তেজস্বিনী। শত্রুহস্তে, যখন তাহার স্বামী, নিহত হইল, তখন বিমলা হৃদয়ে জিঘাংসাবৃত্তি প্রবলতর হইয়া উঠিল। পাঠক! বধ্যমঞ্চে বিমলা ও বীরেন্দ্রসিংহের কথোপকথন পাঠ কর। বীরেন্দ্রসিংহ কহিলেন "বিমলা! আমি যাই, তোমরা আমার পশ্চাৎ আসিও।" বিমলা কহিলেন, "যাইব. কিন্তু আগে এ যন্ত্রণার প্রতিশোধ লইব।" বীরেন্দ্র বিমলাকে কহিলেন, "আর কি! তুমি এখন যাও।" বিমলা কহিলেন, "না আমার সম্মুখেই বৈধব্য ঘটুক! তোমার রুধিরে মনের সঙ্কোচ বিসর্জ্জন করিব।" বিমলার স্বর ভয়ঙ্কর স্থির বিমলা প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। মস্তকের একটী কেশ বাতাসে দুলিতেছে না, এক বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে না. চক্ষুর পলক নাই, একদৃষ্টে ছিন্নশির-প্রতি চাহিয়া আছেন।"

রাজপুত বালা মরণে ভীতা নহে। সেই অবধি বিমলার সুখশান্তির অবসান হইল, সেই অবধি বিমলা প্রতিহিংসা ব্রত ধারণ করিল। চঞ্চলা, রসিকা- বিমলা মুহূর্ত্ত মধ্যে গম্ভীরা মলিনা বিধবায় পরিবর্ত্তিত হইল; তদুপরি সে বন্দিনী,-নবাবের উপপত্নী স্বরূপ নবাবের বিলাস গৃহে বাস করিতেছে—কোথায় বীরেন্দ্রসিংহের প্রিয়তমা ভার্য্যা. কোথায় নবাবের উপপত্নী! হায়! কি নিদারুন আবর্ত্তন, অদৃষ্টের কি কঠোর উপহাস! কিন্তু এ দুঃসময়ে বিমলা তাহার স্বামীহন্তাকে বিস্মৃত হয় নাই, তাহার প্রতিজ্ঞা চঞ্চল হয় নাই। অবশেষে বহু চিন্তার পর প্রতিশোধের উপায় স্থিরীকৃত হইল।

বিধবা আবার সধবা বেশ ধারণ করিল। তাহার সুগোল প্রকোষ্ঠে আবার রত্নাবলয় উঠিল, বাহুতে পুনরায় হীরকমণ্ডিত তাড় শোভিত হইল। উরুতে মেখলা, অংশোপরে স্বর্ণহার, কণ্ঠে রত্নকণ্ঠী সুন্দর সুচারু অবয়ব স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত হইল। তবে কি বিমলা অবিশ্বাসিনী! তবে কি বিমলা বীরেন্দ্রসিংহকে বিস্মৃত হইয়াছে? তাহা না হইলে কতলুখাঁর জন্মদিনে এত সাজ সজ্জা কেন? পাঠক! সকল আভরণ এখনও দেখ নাই-বস্ত্রমধ্যে এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকালুক্কায়িত রহিয়াছে। বৈধব্য যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিমিত্তই বীরবালা আজ এ বেশ ধারণ করিয়াছে, আজ সাধ্বী রুদ্রা হইয়াছে। হতভাগ্য কতলুখাঁর আজ শেষ দিন! সতীর হস্ত হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে?

আজ কতলুখাঁর জন্মদিন এস পাঠক! একবার ইন্দ্রিয়াসক্ত কতলুখাঁর বিলাস গৃহে প্রবেশ করি; নবাবের চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিতা অপ্সরামণ্ডলী বিরাজ করিতেছে। কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ হাস্য করিতেছে। বিমলা কি করিতেছে? "তুমি কে সুন্দরি, যে কতলুখাঁর পার্শ্বে বসিয়া হেমপাত্রে সুধা ঢালিতেছ? কে তুমি যে সকল রাখিয়া তোমার পূর্ণলাবণ্য দেহ প্রতি কতলুখাঁ ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে? কে তুমি অব্যর্থ কটাক্ষে কতলুখাঁর হৃদয় ভেদ করিতেছ? ও মধুর কটাক্ষ-চিনি, তুমি বিমলা। অত সুরা ঢালিতেছ কেন? ঢাল, ঢাল, আরও ঢাল, বসন মধ্যে ছুরিকা আছে ত? আছে বই কি? তবে অত হাসিতেছ কিরূপে? কতলুখাঁ তোমার মুখপানে চাহিতেছে। ও কি? কটাক্ষ ও কি আবার কি! ঐ দেখ, সুরাস্বাদ প্রমত্ত যবনকে ক্ষিপ্ত করিলে এই কৌশলেই বুঝি সকলকে বর্জ্জিত করিয়া কতলুখাঁর প্রেয়সী হইয়া বসিয়াছ? না হবে কেন, যে হাসি, যে অঙ্গভঙ্গী, যে সরস কথা রহস্য, যে কটাক্ষ! আবার সরাব! কতলুখাঁ সাবধান! কতলুখাঁ কি করিবে। যে চাহনি চাহিয়া বিমলা হাতে সুরাপাত্র দিতেছে। ও কি ধ্বনি! এ কে গায়! একি মানুষের গান, না, সুররমণী গায়? বিমলা গায়িকাদিগের সহিত গান গাহিতেছে। কি সুর! কি ধ্বনি! কি লয়! কতলুখাঁ, একি! মন কোথায় তোমার, কি দেখিতেছ? সমে সমে হাসিয়া কটাক্ষ করিতেছে, ছুরি অধিক তোমার হৃদয়ে বসাইতেছে, তাহাই দেখিতেছ? অমনি কটাক্ষে প্রাণ হরণ করে, আবার সঙ্গীতের সন্ধি সম্বন্ধ কটাক্ষ! আরও দেখিয়াছ, কটাক্ষের সঙ্গে আবার অল্প মস্তক-দোলন! দেখিয়াছ সঙ্গে সঙ্গে কেমন কর্ণাভরণ দুলিতেছে? হাঁ। আবার সুরা ঢাল, দে মদ দে, একি! একি! বিমলা উঠিয়া নাচিতেছে। কি

সুন্দর! কিবা ভঙ্গী! সে মদ! কি অঙ্গ! কি গঠন! কতলুখাঁ! জাঁহাপণা! স্থির হও! স্থির! উঃ! কতলুর শরীর অমনি জ্বলিতে লাগিল। পিয়ালা! আহা! সে পিয়ালা! মেরি পিয়ারী আবার কি? এর উপর হাসি, এর উপর কটাক্ষ? সরাব! সে সরাব!

কতলুখাঁ উন্মত্ত হইল। বিমলাকে ডাকিয়া কহিল, "তুমি কোথা, প্রিয়তমে! বিমলা কতলুখাঁর স্কন্ধে এক বাহু দিয়া কহিলেন, "দাসী শ্রীচরণে"—অপর করে ছুরিকা—

তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর চীৎকার ধ্বনি করিয়া বিমলাকে কতলুখাঁ দূরে নিক্ষেপ করিল। বিমলা তাহার বক্ষঃস্থলে আমূল ছুরিকা বসাইয়া দিয়াছিলেন!

পিশাচী শয়তানী কতলুখাঁ এই কথা বলিয়া চীৎকার করিল। পিশাচী নহি, শয়তানী নহি-বীরেন্দ্রসিংহের স্ত্রী।

ধন্য রাজপুতবালা! ধন্য তোমার সাহস, ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা, ধন্য তোমার অধ্যবসায়।

বিমলার অসহ্য ক্লেশ এতদিনে উপশম হইল, এতদিনে বিমলার প্রতিহিংসা স্পৃহা নির্ব্বাপিত হইল, এতদিনে বিমলার বৈধব্যের প্রতিশোধ হইল। কিন্তু হায় যা যায়, সে ত আর আসে না, যাহা ভাঙ্গে, তাহা ত আর গড়ে না বিমলার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, শত প্রতিশোধেও তাহার ভগ্ন কপাল আর ত ফিরিবে না।

বীরেন্দ্রসিংহের নিহত, শত কতলুখাঁর মৃত্যুতেও বিমলার বৈধব্য দশা আর ত ঘুচিবে না। বিমলার সুখপ্রভাত অস্তে গিয়াছে, সুখ রবি অস্তের মত ডুবিয়াছে সকল আকাঙ্খা, সকল আশার শেষ হইয়াছে। কিন্তু বিমলার নিঃস্বার্থ হৃদয় স্বকীয় দুঃখে বিচলিত হয় নাই। বিমলা যথার্থ সন্ন্যাসিনী তাহার কাতর হৃদয় পর লইয়াই ব্যস্ত তিলোত্তমার সুখে বিমলা কিয়ৎ পরিমাণসুখী হইয়াছিল, তিলোত্তমার পুত্রগণ স্থান ক্রোড়ে করিয়া বিমলা শান্তিলাভ করিয়াছিল।

গাঁদাফুলের উপকারিতা।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, ডি,।

বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে, গাঁদাফুল অনেক রোগের মহোপকারী ঔষধ। ইহার ন্যায় সুলভ অথচ এরূপ উপকারী ঔষধ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। গাঁদার পত্র ও পুষ্প উভয়ই যার পর নাই উপকারী। এই সুলভ মহৌষধের ব্যবহার সকলেরই জানা বিশেষ আবশ্যক। গাঁদাফুলের বীচ (ফুলের যে কৃষ্ণাংশ পুঁতিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়) যাবতীয় শুক্র দোষ দূর করে। আকবর বাদসাহ আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্র মিলাইয়া এক অপূর্ব্ব পুস্তক রচনা করাইয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে গাঁদাফুলের বীচ শুক্রস্তম্ভনের জন্য ব্যবহার বিধি আছে। একটী গাঁদাফুলের সমুদয় বীচগুলি চিনির সহিত প্রতি দিন সেবন করিলে শুক্রমেহের (অজ্ঞাতসারে শুক্রস্খলন রোগের, বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায়) আশ্চর্য্য উপকার হয়।

দেহের সার শুক্র ধাতু। এই ধাতু যে পরিমাণে দেহে রক্ষিত হইবে, মানবের সেই পরিমাণে দেহ ও মন সুস্থ এবং সতেজ থাকিবে। শুক্র ধাতুতে জীবনী শক্তি বিশেষ রূপে নিহিত থাকে বলিয়া, শাস্ত্রে বলিয়াছেন "শুক্র ধাতু র্ভবেৎ প্রাণঃ।" তাহার অর্থ শুক্র ধাতুই প্রাণ স্বরূপ। আজ কাল মার্কিন দেশে এক অদ্ভুত ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম (Robert hewly LeymphCo.) রবার্ট হিউলি লিম্ফকো। এই ঔষধ দেহাভ্যন্তরে রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া (Injection.) দিলে, রাজযক্ষ্মা (ক্ষয়কাশ) পক্ষাঘাত, মৃগী, শূল, জরা প্রভৃতি রোগে সমধিক ফল হয়। শুক্র ধাতু ত্বগভ্যন্তরে প্রবেশ (Inject.) করাইলে এ সকল দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

উপকার ব্যতীত কোন দোষের হইতে পারে না বিবেচনায় এই প্রসঙ্গে দুই একটী জন্তুর কথাও উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। আয়ুর্ব্বেদে এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর মুষ্কের ভূয়ঃ ভূয়ঃ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত, ডাক্তার ব্রাউন সেকার্ড সাহেব শশকের মুষ্কের নির্য্যাস ব্যবহার করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় যুবকের ন্যায় বলশালী হইয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদের মতেও পাঁঠার মুস্ক দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ ঘৃতে ভাজিয়া ব্যবহার করিলে উক্ত রূপ সুফল লাভ করা যায়। এতদ্ব্যতীত গন্ধমার্জ্জার অর্থাৎ খটাস্ প্রভৃতি জন্তুর মুস্কেও সমফল দর্শে। এইরূপ অনেক জন্তুর শুক্র ধাতুও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিধি চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে।

এক্ষণে ফল কথা এই, যাঁহারা শুক্রধাতু রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা এই গাঁদা বীচে অশেষ ফল পাইবেন। মেধা, আয়ু বল-সমস্তই এই শুক্র ধাতুর উপর নির্ভর করে। অনিচ্ছা সত্ত্বে শুক্রক্ষরণ বন্ধ করিতে ইহা একটী বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

দেখিয়া দুঃখ হয়, আজকাল অনেক যুবা পুরুষ ক্ষয় রোগগ্রস্ত হইতেছেন, তাহার প্রধান কারণ, আর কিছু নহে, অত্যাধিক শুক্রক্ষয়। পক্ষান্তরে আবার ইহাও দেখা যায়, অনেকেরই বীর হইবার চেষ্টা হইতেছে, ইহা অতি সুখের বিষয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, "ধীরো জিতেন্দ্রিয় বীরঃ।" ধীর ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষই বীর। অতএব এস্থলে দেখা উচিৎ যে, সেই বীর ভাবরূপ কঠোর ব্রত পালন করিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে শুক্রধাতু রক্ষা একান্ত আবশ্যক। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই সামান্য ও সুলভ গাঁদাফুলের বীচ ঐ মহাব্রতের অনেক সহায়তা করিতে পারে।

মুত্র যন্ত্রের উপর গাঁদাফুলের ক্রিয়া, কোন কারণে মুত্র পরিষ্কার না হইলে, চারিটি বা পাঁচটি গাঁদাফুল বিশেষতঃ লাল ছোট গাঁদা পাঁচনের ন্যায় জলে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে প্রস্রাব পরিষ্কার এবং যন্ত্রনা দূর হয়। শোধিত শিলাজতুর সহিত গাঁদাফুলের রস সেবন করিলে প্রস্রাব রোধ অর্থাৎ মুত্রকৃচ্ছ রোগ অচিরেই আরোগ্য হয়। ক্ষত রোগে গাঁদা পাতা পৃষ্ঠ ব্রণ (Corbuncle.) এবং অন্যান্য দুষ্টক্ষতে গাঁদাপাতা বাটিয়া অল্প ময়দা বা সুজির সহিত মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করতঃ পুলটিস্ (Poultice.) দিলে ব্রণের সমস্ত দোষ দূর হয়। এই পুলটিস্ দিতে দিতে পৃষ্ঠব্রণ ক্রমশঃ নরম হইয়া আসে এবং পরে উহা হইতে সমস্ত দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া গিয়া শীঘ্রই আরাম হয়। ছোট গোয়ালে পাতার প্রলেপে বিশেষ উপকার দর্শে বটে, কিন্তু উহাতে ব্রণস্থান চুলকায়, গাঁদাপাতার তাহা হয় না। যে কারবঙ্কলে অর্থাৎ পৃষ্ঠব্রণে পিত্ত প্রকোপ অধিক থাকে তাহাতে গুলঞ্চ বাটিয়া, তাহার পুলটিস্ দিয়া পরে গাঁদাপাতার পুলটিস্ দিলে অতি চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

এইরূপ দেহের কোন স্থানে, কোন কারণ বশতঃ বিশেষ আঘাত লাগিয়া যদি ঐ স্থান অতিশয় ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, কিম্বা ক্ষত হইয়া শোথ হয়, সহজে আরাম হওয়া অসম্ভব বোধ হয়, এমন কি উহা সন্ধি স্থল Joint হইলেও কতিপয় গাঁদাপাতা সিদ্ধির ন্যায় জলে উত্তম রূপ বাটিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ

ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করতঃ সেই ক্ষতে অথবা বেদনাযুক্ত স্থলে প্রলেপ দিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্রই আশাতীত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষত না হইলে ঘৃতের প্রয়োজন হয় না। প্রতিদিন প্রাতঃ ও সন্ধ্যা দুই বার প্রলেপ দিলেই যথেষ্ট হয়।

ক্ষতের জন্য গাঁদাপাতা জলে সিদ্ধ করিয়া বা উহার (Tincture.) টিংচার জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষত ধৌত করিলে অতি শীঘ্র উপকার দর্শে। যাঁহাদের ডাক্তারি আইওডোফরম্ প্রভৃতি উগ্র ঔষধ সহ্য হয় না, তাঁহাদের পক্ষে এই গাঁদাপাতা প্রয়োগ অতীব হিতকর।

অনেক দীন হীন ক্ষতরোগী এই সুলভ ঔষধের উপকারিতা ও ব্যবহার জানিতে পারিলে উপকৃত হইবেন, এই আশায়, আমি এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। অনেক ব্যয়সাধ্য Dressing. ড্রেসিং যাঁহাদের ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহাদের এই ঔষধের গুণ জানাইয়া দিয়া উপকার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে ক্ষত শীঘ্র সারিয়া যায়, এবং পুঁযাদি জন্মিতে পায় না।

প্রেমবিজ্ঞান।

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী।

প্রেম কি?—স্বার্থের উৎকট উত্তাপে যাহার প্রাণের উন্নত আশা-ভরসা—সুপবিত্র সরসতা শুকাইয়া গিয়াছে, সে কেমন করিয়া বলিবে, প্রেম কি? তাই আমরা প্রেমের তত্ত্ব বুঝাইতে বসিয়া, কোন-এক মহাপুরুষের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি করিবার চেষ্টা করিতেছি।

প্রেম কি?—যাহার জীবন আছে, সে-ই বুঝাইতে পারে, জীবন কি? ভগবান্ কি, তিনিই বলিতে পারেন, যিনি উপাসক—যিনি সেই ভগবানের অনুপম মুখচ্ছবি দেখিয়া তাঁহারই চরণপ্রান্তে নিজের যথাসর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়াছেন। প্রেম কি? —হৃদয়ের শক্তিশালী প্রাণবান্ প্রেমিককে জিজ্ঞাসা কর।

অপরের ভিতরের গঠন কি, কেমন করিয়া জানিব। তবে দেখিতে পাই, বাহিরের কতকটা অভিব্যক্তি, আমারও যেমন, অপরেরও সেইরূপ। কিন্তু বাহিরের এই আকারে ভুলিয়া আমি বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। আমার প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, আমার সহিত অপরের বাহিরের আকারে যখন এমন মিল, তখন আমার মধ্যে এই যে কেমন-একটা-কি, ইহা যেমন আমার আছে, তেমনই অপরেরও আছে; একের তারে ঘা দিলেই, অমনি অপরের তারও সমানে ঝঙ্কার

করিয়া উঠিবে। কিন্তু প্রথমে যাহা মনে হইত, এখন আর তাহা মনে হয় না। কেন না, আমি যখনই ঐরূপ মনে করিয়াছি; যখনই আমার তারে ঘা দিয়া অপরের তারে ঝঙ্কার তুলিতে গিয়াছি,—যখনই আমার দুঃখবেদনা জানাইয়া কাহারও কাছে আমার প্রাণের বোঝা নামাইতে গিয়াছি; তখনই দেখিয়াছি, সে ঝঙ্কার উঠে নাই,—সে প্রাণের ভাষা কেহ বুঝিতে পারে নাই,—বিপরীত বুঝিয়াছে। আর মনে করিয়াছে, আমি যেন একটা খুব দূরদেশ হইতে আসিয়াছি,—আমি যেন অজ্ঞতার ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন একটা খুব অসভ্যদেশের লোক!

এইরূপে মানুষ আমাকে তাহার অন্তঃপ্রকৃতি বুঝিবার যতই সুযোগ দিয়াছে, আমার ও অপরের মধ্যে একটা ব্যবধান ততই যেন বাড়িয়া গিয়াছে,—সহানুভূতির দিক্‌টা ততই যেন দূরবর্ত্তিনী হইয়াছে। কিন্তু এ ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা,—অভিজ্ঞতার এ প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে পারে, আমার প্রাণের সে যোগ্যতা,—সে শক্তি,—সে সামর্থ্য কই। সে যে তাহার মাধুর্য্যবর্ষী অনুরাগ ও স্নেহকরুণার শান্তশীতল কোমলতায় সদা-কম্পমান,—সততই অবশ ও অবসন্ন। তাই সেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য, তাহার সাধের সামগ্রী আমি যেখানে-সেখানে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু সে সাধের সামগ্রী খুঁজিয়া পাই নাই। পাইয়াছি কেবল উপেক্ষা ও বিরক্তির কর্কশ কশাঘাত, অন্তঃপ্রকৃতির কঠোর তাড়না, আর নৈরাশ্যের নিদারুণ শূন্যতা।

প্রেম কি?—এমন সময় আইসে, যখন আমরা আমাদের বাহিরের বস্তুর ভিতরে কত-কি দেখিতে পাই,—তাহার উপর কত-কি গড়িয়া তুলি, আর অমনি আমরা কত-কিসের আশায়—কত-কিসের আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলিত হইতে থাকি; আবার সেই সঙ্গে—

"সদাই মনে হারাই হারাই,
কি আছে কপালে ভাবি তাই।"

এমনই কেমন-একটা আশঙ্কার ভাবও আসিয়া পড়ে। বাহিরের যে সকল বস্তুর উপরে আশা ও আশঙ্কার এই আন্দোলন,—সহানুভূতির এই সুমধুর প্রবাহ আমাদের হৃদয় হইতে উত্থিত হয়, তাহারা আমাদিগকে বলপূর্ব্বক তাহাদিগের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, আর আমরাও যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের ন্যায় তাহাদিগের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকি। বহিঃপ্রকৃতির দিকে অন্তঃপ্রকৃতির এই যে শক্তিপূর্ণ অপূর্ব্ব আকর্ষণ,—ইহাই প্রেম।

কিন্তু বহিঃপ্রকৃতি কই কখন আমাদিগকে আপনারি দিকে টানিয়া লইতে চায়? যখন দেখি, সুখে-দুঃখে বিজড়িত কি-এক উদার শূন্যতায়, কালের আঘাতে

প্রকৃতির সাম্যভঙ্গের ন্যায়, প্রাণের ভরাটভাব খানিকটা যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে; যখন দেখি, সে শূন্যতা একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা নয়, তবুও সে শূন্যতা কিছুতেই ঘুচাইতে পারিতেছি না; যখন দেখি, কি-এক অবসাদ ও উদাস্তের শ্যামচ্ছায়া প্রাণের উপর পতিত হইয়াছে; যখন দেখি, কেমন-একটা বিষাদের হা-হুতাশে প্রাণের ভিতর হইতে হুহু করিয়া উঠিতেছে; যখন দেখি, নয়নপ্রান্ত হইতে—জানি না, সুখের কি দুঃখের—এক অকারণ নির্ঝরধারার সৃষ্টি হইয়াছে; যখন দেখি, প্রাণ প্রাণের নিকট এই প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতেছে—

"এ কি লো বুঝ্‌তে নারি সই।
হয়েছি কেমন-কেমন তেমন যেন নই॥"

যখন দেখি, আমরা আমাদের ভিতরে প্রজ্ঞাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও ভাবশক্তির যখন যে বিভিন্ন বিকাশ বা অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিতেছি, তখন সেই বিভিন্ন বিকাশ বা অভিব্যক্তির সহিত, জগতে যাহা-কিছু দেখিতেছি, সকলের তুল্যানুভূতি জাগাইয়া তুলিতে তৎপর হইয়াছি; তখনই বুঝিয়া লইতে হইবে যে, বহিঃপ্রকৃতি চৈতন্যরূপিণী হইয়া আমাদিগকে তাঁহার নিজের দিকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। যদি আমরা প্রজ্ঞাশক্তির পরিচালনা করিয়া অতীত, অনাগত ও আগতের গূঢ়রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার-বিতর্ক উত্থাপন করি, অমনই ইচ্ছা হয় যে, যেন আর কেহ একজন সে বিচার-বিতর্কের গতি অনুধাবন করিতে পারিয়াছে; যদি আমরা কল্পনার কোমলাঙ্কে শয়ন করিয়া আকাশশরীরী শিশুসন্তানের সৃষ্টি করি, অমনই ইচ্ছা হয়, যেন আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত সেই আকাশশরীরী শিশুসন্তানগুলি নূতন করিয়া আর একজনের মস্তিষ্কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যদি আমরা ভাবশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া ভাবের সমুদ্রে ডুবিয়া যাই, ইচ্ছা হয়, আর একজনের ভাবতন্ত্রও যেন আমাদের ভাবতন্ত্রর সহিত সমানে স্পন্দিত হইতে থাকে; যেন আর একজনের নির্ম্মল নয়নজ্যোতি আমাদের ভাবোদ্দীপ্ত নয়নজ্যোতির সহিত যুগপৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে,—আর পরস্পরের নয়নজ্যোতি বিগলিত হইয়া পরস্পরের নয়নজ্যোতির মধ্যে মিশাইয়া যায়; বিশুদ্ধ হৃদয়রক্তের দ্রুত-সঞ্চালনে আমাদের কম্পনশীল সুতপ্ত ওষ্ঠাধর নীরবভাষায় যে প্রাণের কথা সুধাইতে চায়, যেন একটা তুষার-শীতল নিস্পন্দ-নিশ্চল ওষ্ঠাধর সে কথার উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আমাদের ওষ্ঠাধরের সহিত মিলিত হইতে না আইসে! এই ইচ্ছা—এই আকাঙ্ক্ষা, প্রেমেরই মূর্ত্তি। এই বন্ধনে—সমবেদনার এই আদান-প্রদানে আবদ্ধ হইয়া মানুষ কেবল যে মানুষের সহিত, তাহা নহে, বিশ্ব

রাজ্যের যাহা-কিছু সকলের সহিত এক হইয়া যায়।

আমরা জগতে আসি, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিতর এমন-কিছু আইসে, যাহা, যে মুহূর্ত্ত হইতে আমরা বাঁচিতে আরম্ভ করি, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই, আপনার অনুরূপ কোথায় পাইবে, এই তৃষ্ণায় অনুদিন অধিক হইতে অধিকতর আকুল হইতে থাকে। বোধ হয়, এই বিশ্ববিধানের বশবর্ত্তী হইয়া শিরীষসুকুমার শিশু জননীর বক্ষ হইতে ক্ষীরধারা আকর্ষণ করে। শিশুর মাধুর্য্যপূরিত দেবদুর্লভ কোমলতা, আর মাতার স্নেহরসার্দ্র হৃদয় হইতে উচ্ছলিত তরল মুক্তাশুভ্র সুমিষ্ট পীযূষ প্রবাহ,—উভয়ে উভয়ের অনুরূপ নহে কি? আমাদের শরীর এবং সংস্কার ও স্বভাবের উপচয়, পুষ্টি বা বিকাশের সহিত, এই অনুরূপের প্রতি আসক্তি বা প্রবণতা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

আমাদের প্রজ্ঞানময়ী অন্তঃপ্রকৃতির অভ্যন্তরে আমাদের সমগ্র নিজত্বের যেন একটা ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি নিহিত আছে,—তাহার অস্ফুট আভাস, কিসের একটা অস্পষ্ট আলোকে, মাঝে মাঝে আমরা দেখিতে পাই। আমাদের নিজত্বের মধ্যে নিন্দা ও তিরস্কার,—প্রশংসা ও পুরস্কার, ঘৃণা ও বিরক্তি,—আদর ও আসক্তি, দুঃখ ও রোষ,—সুখ ও সন্তোষ, এইরূপে দোষ-গুণ, দুয়েরই উপাদান আছে; কিন্তু নিজত্বের এই প্রতিকৃতি, নিজত্বের গুণাংশেই গঠিত,—দোষের অংশ তাহার ভিতর একেবারেই নাই। মনুষ্যপ্রকৃতির অধিকারভুক্ত হইতে পারে, এইরূপ যতপ্রকার উৎকর্ষ, সুখ ও সৌন্দর্য্য আমরা কল্পনা করিতে পারি, এই প্রতিকৃতি সেই সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ সুখ ও সৌন্দর্য্যের ভাবময়ী প্রতিমা। এই প্রতিকৃতি কেবল যে আমাদের বহিঃসত্তা বা বহিরাকৃতির আলেখ্য, তাহা নহে; পরন্তু যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম চৈতন্যকণায় আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি রচিত, তাহারও এক অপূর্ব্ব সঙ্ঘাতবিশেষ বা সমষ্টি। এই প্রতিকৃতিদর্পণে কেবল জ্যোতি ও পবিত্রতার মূর্ত্তিসকল প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিকৃতি আমাদের অন্তরাত্মা,—মনের মন,—প্রাণের প্রাণ; তাহার চারিদিকে কেবল স্বর্গ; চারিদিকে গণ্ডি দিয়া সে তাহার সেই স্বর্গের সীমানির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে; দুঃখ-দুর্গতি ও পাপ-তাপ সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাহার সেই স্বর্গের ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না। ইন্দ্রিয়বর্গের সমগ্র উপলব্ধি লইয়া আমরা আগ্রহের সহিত তাহাদিগকে এই অন্তরবর্ত্তী আত্মার নিকট উপস্থিত করি; ইচ্ছা—তাহারা স্বর্গের বাতাস পাইয়া স্বর্গবাসীর মত হইবে।

প্রেমের লক্ষ্য কি?—প্রেমের লক্ষ্য অদৃশ্যকে দেখিবে—অলভ্যকে লাভ

করিবে। ইতিপূর্ব্বে যে প্রতিকৃতি বা আদর্শের কথা বলিতেছিলাম, সেই প্রতিকৃতি বা আদর্শের পশ্চাতে যে মূল মহান্ আদর্শ লুকায়িত, প্রেম সেই মূল মহান্ আদর্শকে দেখিতে চায়—এই মানুষের চক্ষু দিয়াই দেখিতে চায়। প্রেম—তাহা যে আধারে আছে, সেই আধারে যে প্রজ্ঞাবুদ্ধি, তাহার পরিমাণ, গুণবত্তা ও যোগ্যতা বুঝিয়া তাহার যথাযোগ্য আদর করিতে জানে, এমন এক প্রজ্ঞাবুদ্ধি দেখিতে চায়। আবার আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যেগুলি অতিসূক্ষ্ম এবং যেন অতিকোমল,—যেন ছুঁইলেই নুইয়া পড়ে,—যেন অল্প আঁচেই শুকাইয়া যায়; যেগুলিকে আমরা সোহাগে-আদরে অতিসন্তর্পণে হৃদয়ের অন্তরালে পুষিয়া রাখি—আর কাহাকেও দেখিতে না দিয়া আপনা-আপনিই অতিগোপনে আপনাদের অন্তরে অন্তরে খুলিয়া দেখিতে থাকি, যে কল্পনাশক্তি ভিতরে ডুবিয়া আমাদের সেই সকল বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে পারে,—লক্ষ্য করিয়া তাহারি সহিত অকপট সমবেদনা জানাইতে আইসে, প্রেম সে-ই কল্পনাশক্তি কোথায় আছে, খুঁজিয়া বেড়ায়। মাধুর্য্যে ভরিয়া রহিয়াছে, এমন দুইটি সুন্দর বীণা, কোন এক সুধাবর্ষী সুকণ্ঠ হইতে অবিরল-বিগলিত সুতানধারার সহিত সমানে ঝঙ্কার করিবে বলিয়া এক সুরে বাঁধা হইয়াছে, এমন দুইটি সুন্দর বীণা; যখন সেই সুতানধারা নির্ঝরধারার ন্যায় ঝড়িয়া পড়িতেছে, তখন যেমন সেই দুইটি বীণার একের তারের হারে যে কম্পন,—অপরের তারের হারেও সেই কম্পন; সেইরূপ প্রেম এমন এক অতুলনীয় সুন্দর দেহ কোথায় আছে দেখিতে চায়, যে দেহের অভ্যন্তরবর্ত্তী ভাবতন্তুসকল আমাদের দেহের অভ্যন্তরস্থ ভাবতন্তুর সহিত,—আমাদের হৃদয়ের ভিতর যখন যে অমৃতস্বর উত্থিত হয়, সেই অমৃতস্বরের অনুরূপে,—সমানে স্পন্দিত হইতে থাকে। আবার এই প্রজ্ঞাবুদ্ধি, সহানুভূতির এই স্পন্দন-কম্পন, এই তলদর্শিনী কল্পনাশক্তি একযোগে যে মহাবস্তুর মধ্যে নিত্যই পূর্ণসত্তায় সমবেত, সেই মহাবস্তুই প্রেমের চিরাকাঙ্ক্ষিত বস্তু। নিজত্বের সেই যে জ্যোতি ও পবিত্রতার প্রতিকৃতি, তাহা স্বকীয় অধিকারসূত্রে এই প্রজ্ঞাবুদ্ধির, এই স্পন্দন-কম্পনের, এই কল্পনাশক্তির, যখন যে-পরিমাণ সম্ভোগ বা সম্মিলন প্রার্থনা করে, তখন ঐ মহাবস্তু তাহার নিকট সেই পরিমাণেই আপনার ঐ সকল উদার সদানন্দ গুণের বৈচিত্র্য বিকাশ করিতে থাকেন।

এইজন্যই বলিতেছিলাম, যাহা সহজে দেখা যায় না, প্রেম তাহাই দেখিতে চায়; যাহা সহজে পাওয়া যায় না, প্রেম তাহাই পাইতে চায়। প্রেমের আকাঙ্ক্ষা

অতি—উচ্চ, প্রেমের লক্ষ্য অতি—উদার। এই উদার লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য প্রেম মানুষের শক্তিসমুদায়কে সর্ব্বদা তাড়না করিতেছে,—সর্ব্বদা উৎসাহদানে উত্তেজিত করিয়া অগ্রসর করিয়া দিতেছে। বলিতেছে—"মানুষ! সেই মহাবস্তু কোথায় আছে, খুঁজিয়া দাও। যদি তাহা অসাধ্য-সাধন বলিয়া মনে হয়, তবে অন্তত সেই মহাবস্তুর অতিক্ষীণ আভাসও যদি কোথাও পাও, খুঁজিয়া দাও; কিন্তু তাহাও যদি না দাও, তাহাও যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার যে হৃদয়ের উপর আমার অধিকার বিস্তার করিয়াছি, সে হৃদয়ের কিছুতেই শান্তি নাই; যতই চেষ্টা করুক, কিছুতেই সে হৃদয় মুহূর্ত্তের তরেও স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না।"

মনুষ্যমাত্রই প্রেমের এই তাড়নার অধীন। যখন আমরা একাকী থাকি,—কেহ কাছে নাই বলিয়া যখন আমরা একাকী থাকি; অথবা যখন আমরা অনেকের কাছে থাকি,—অনেকে আমাদিগকে ঘেরিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা ঘেরিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে এমন একজনকেও দেখিতে পাই না, যে আমার সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাগী হইয়াছে,—তাই যখন আমরা অনেকের কাছে থাকিয়াও একাকী থাকি; তখন আমরা প্রেমের ওই আকুল লালসাময়ী তাড়নায়, ঊষার কিরণে,—সায়াহ্নের বরণে, তটিনীর তানে,—বিহগের গানে, ফুলের হাসিতে,—চাঁদের রজতরাশিতে, অরণ্যের শ্যামকায়ায়,—নিকুঞ্জের শীতল ছায়ায়, বৃক্ষবল্লরীর কিসলয়-সঞ্চালনে,—মলয়ের মৃদুল আন্দোলনে, বর্ষার বিষণ্ণ বারিধারায়,—শরদাকাশের সুমার্জ্জিত নীলিমায়, ঝটিকার দাপে,—মার্ত্তণ্ডের তাপে, দামিনীর বিকাশে,—অশনির নির্ঘোষে, আকাশের বিস্তারে,—প্রান্তরের প্রসারে, সমুদ্রের বিশালতায়,—গিরিশ্রেণীর ব্যাপিতায়, কি-এক অপূর্ব্ব প্রাণবত্তা দেখিতে পাই, আর তাহাদের সহিত কি-এক উদার-সুখময় অচিন্তনীয় যোগসূত্রে জড়িত হইয়া পড়ি। যাহার উপমা খুঁজিয়া পাই না, এমন এক বস্তু আমাদের অন্তস্তলে লুকাইয়া আছে, তাহার সহিত এই যোগসূত্রের সম্বন্ধ। প্রকৃতি ও অন্তরাত্মার পরস্পর এই নিগূঢ় একতানতার ভিতর হইতে কতই প্রাণের ভাষা, কতই সুখদুঃখের কথা, কতই স্বরমাধুর্য্যের লহরী বাহির হইয়া আইসে; অন্তরাত্মা শ্বাসরোধী আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে থাকে; মনে হয়, কে যেন আমার খুব এক আপনার জন, আমাকে বাহুলতায় বাঁধিয়া, আমার মুখের দিকে তাকাইয়া, আমার নয়নে নয়ন মিলাইয়া কত-কি সোহাগের গান গাহিতেছে; যেন স্বদেশভক্তের কার্য্যসিদ্ধির উন্মাদ উৎসাহে বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে; যেমন এক অসীম-

রহস্যপূর্ণ ভাবের বেগে চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইতে থাকে।

মানুষ ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। বনবাসী হইলেও সে একটা বনের মাধবীলতাকে ভালবাসিবে! যাহার ভালবাসিবার আকাঙ্ক্ষা—ভালবাসিবার শক্তি—ভালবাসার অভাবের অনুভূতি লয় হইয়া গিয়াছে, তাহাকে দেখিলে মনে হয়, সে যেন আগে যাহা ছিল, তাহার একটা তুচ্ছ তুষকণা পড়িয়া আছে; সে যেন একটা জীবন্ত শবদেহ; তাহার মনুষ্যত্বের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মনুষ্যত্ব শ্মশান-চুল্লীতে ভস্ম হইয়া গিয়াছে।

সমালোচনা।

পি, এম, বাগচি প্রচারিত ১৩১৫ বঙ্গাব্দের বিশুদ্ধ বৃহৎ পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। এই বৎসরের পঞ্জিকায় কয়েকটি নূতন বিষয়ের সংযোগ আছে।

১৩১৫ সালের গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা। বার্ষিক রীত্যানুসারে এখানিও উৎকৃষ্ট কাগজ ছবি ও গণনাদি প্রশংসার যোগ্য।

সরল ফলিত পঞ্জিকা। সম্বৎ ১০৬৫।৬, শকাব্দ ১৮৩০, সন ১৩১৫ সালের নব পঞ্জিকা। চন্দননগর গোন্দলপাড়া নিবাসী কর্ম্মফলবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, অনেকগুলি সুপণ্ডিতের সাহায্যে ইহা সঙ্কলন করিয়াছেন, মূল্য চারি আনা।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও বোম্বাইয়ের পঞ্জিকা-শোধিনী সভার গৃহীত মতানুসারে স্মৃতি শাস্ত্রের অনুমোদিত ব্যবস্থা ইত্যাদির সম্মিলনে এই পঞ্জিকা সঙ্কলিত। পঞ্জিকাখানি দেখিতে যেমন সুন্দর, গণনাগুলিও সেইরূপ বিশুদ্ধ। প্রচলিত পঞ্জিকা সমূহে মধ্যে মধ্যে গণনার অনৈক্য দৃষ্ট হয়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মতানুসারেই গোলযোগের মীমাংসা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে। বিশুদ্ধ গণনাপূর্ণ এরূপ একখানি পঞ্জিকা আর্য্য-গৃহে আবশ্যক হইয়াছিল। আনন্দের বিষয়, পণ্ডিত শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। গত ১৩১৩ সাল হইতে এই পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই তৃতীয়বর্ষের নবসংস্করণ অতি সুন্দর হইয়াছে।

গুপ্তপ্রেশ অভিধান। বৃহৎ বৃহৎ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। কলিকাতা গুপ্ত-প্রেশের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় দুর্গাচরণ গুপ্ত এই নাম দিয়া যে বৃহৎ অভিধান প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আমাদের আলোচ্য এই দুই খণ্ড তাহারই নূতন সংস্করণ। হেয়ার স্কুলের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামরূপ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় এই সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার শব্দের বাঙ্গালা ও ইংরেজী অর্থ ও সংস্কৃত শব্দের ধাতু প্রত্যয় ও লিঙ্গাদি অতি পরিষ্কার রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বাবু দুর্গাচরণ গুপ্তের সংগৃহীত শব্দাবলীর অতিরিক্ত অনেকগুলি নূতন নূতন শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় এতৎ-সঙ্কলনে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, অভিধানখানির অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শনে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। এই অভিধান যে, সাধারণের পক্ষে বিশেষ উপকারপ্রদ হইবে সে কথা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ যাঁহারা বঙ্গভাষা হইতে ইংরাজী ও ইংরাজী ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় কোন বিষয় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এই অভিধানে তাঁহারা বিস্তর সহায়তা প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অবশ্যই আমাদের সাহিত্য সংসারের ধন্যবাদভাজন। মূল্যও সুলভ;—দুই হাজার ছয়শত পৃষ্ঠা পরিমিত এই প্রকাণ্ড পুস্তকের মূল্য তিন টাকা চারি আনা মাত্র।

নূতন পঞ্জিকা। সন ১৩১৫ সালের স্বর্গীয় কবিরাজ নিশিকান্ত সেন কবি-ভূষণের নূতন পঞ্জিকা তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন দ্বারা প্রকাশিত। অন্যান্য মূল্যবান পঞ্জিকা অপেক্ষা এই পঞ্জিকার গণনার বিশুদ্ধতা কোন অংশে হীন নহে—বিশুদ্ধ সনাতন পঞ্জিকার নিত্য আবশ্যকীয় বিষয় সমুদয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের গৃহে গৃহে এই পঞ্জিকা যাহাতে প্রচারিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন মহাশয়ের অনুগ্রহে আমরা প্রতিবৎসর জন্মভূমির গ্রাহকগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া থাকি। যাঁহারা /০ ষ্ট্যাম্প পাঠাইবেন, তাঁহারাই বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৬শ বর্ষ। | ১৩১৫ সাল আষাঢ়। | ৩য় সংখ্যা।

বিবাহ না বাণিজ্য ?

চর্ব্বিত চর্ব্বণের উপর যাঁহারা হাড়ে হাড়ে চটা, অনুনয় করি, দয়া করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আজ আমরা আবার চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিব। বিষয় বিশেষে চর্ব্বিত চর্ব্বণে আমরাও তাঁহাদের দলভুক্ত; অফলপ্রদ অসার বিষয়ে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ দর্শন করিলে, আমাদের অঙ্গজ্বালা করে, ইহা সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের মহিমা স্মরণ করিয়া, আমাদের সমাজের কল্যাণ কামনায় আজ আমরা চর্ব্বিত চর্ব্বণকে আদর করিতে বাধ্য হইতেছি।

"জন্মভূমি" পত্রিকা আমাদের অধিকারে আসা অবধি একসুরে আমরা বারম্বার চিৎকার করিয়াছি, আজিও সেইরূপ পুরাতন চিৎকার; আজিও আবার সবিনয়ে আমাদের সনাতন সমাজের আপামর সাধারণের নিকট প্রশ্ন করিতেছি বিবাহ না বাণিজ্য ?

পুনঃ পুনঃ চিৎকারে কিছুমাত্র ফল হয় নাই ফল হইবে, এইরূপ আশা করি, নয়ন বিস্ফারিত করিয়া আশাপথ নিরীক্ষণ করি, উৎকর্ণ হইয়া শুভ সংবাদের প্রতীক্ষা করি, হায় হায়! সম্মুখে কেবল নিরাশা—কেবল নিরাশা? শুভফলের লক্ষণ কিছুই দেখিতে পাই না, কিছু শুনিতে পাই না!!!

যাঁহাদের নিকটে চিৎকার, যাঁহাদের মঙ্গলের জন্য চিৎকার,—তাঁহারা অন্ধও নহেন; বধিরও নহেন; বোধ হয় ধর্ম্মের প্রতি সমাজের প্রতি তাঁহাদের অনাদরও নাই, তবে কেন শুভফলের মুকুল দর্শনে সর্ব্বক্ষণ বঞ্চিত থাকি, কিছুই বুঝিতে পারি না। বুঝিতে পারি না বটে, তথাপি ভাব গতিক দেখিয়া এই টুকু বুঝিয়া লইয়াছি, অর্থলোভ,—অর্থলোভ, কেবল নিদারুণ অর্থলোভ!

আবার বলি, আমাদের বিবাহ বাজারে আগুণ লাগিয়াছে! কতদিনে যে এ আগুণ নির্ব্বাপিত হইবে, জানি না, তথাপি ক্রন্দন করিতেও ক্ষান্ত হওয়া যায় না, কাজে কাজেই চুপ করিয়া থাকিতে পারি না।

হিন্দুর প্রাণ ধর্ম্ম প্রাণ, হিন্দুর প্রাণ শাস্ত্র প্রাণ, হায় হায়! সেই ধর্ম্ম প্রাণ হিন্দু সমাজ আমাদের বিবাহ ব্যাপারে ধর্ম্ম মানিতেছেন না, শাস্ত্র মানিতেছেন না, ইহা সাধারণ আক্ষেপের বিষয় নহে। মহামহিম পরম পূজ্যপাদ ঋষিগণ ভূরি ভূরি নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, বিবাহ সংস্কারে পুত্র কন্যার শুল্ক গ্রহণ করিও না,—শুল্ক গ্রহণ মহাপাপ; মহাপুরুষগণের এতদূর নিষেধ সত্বেও উত্তরোত্তর সেই পাপের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। দারুণ অর্থলোভে উন্মত্ত হইয়া সমাজের প্রধান প্রধান লোকেরাও সেই মহাপাপে পরিলিপ্ত হইতেছেন, সেই দৃষ্টান্তে সমাজের অজ্ঞ লোকেরাও দিন দিন প্রশ্রয় পাইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা জ্ঞানবান্, তাঁহারা যে পথে যান, তাঁহারা যে পথ দেখান, অজ্ঞানেরা অবশ্যই সেই পথে ধাবিত হইয়া থাকে, ইহা নূতন কথা নহে, বিচিত্র কথাও নহে; মেষপালের গতি তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ।

শাস্ত্র প্রমাণে অষ্ট প্রকার বিবাহের ব্যবস্থা আছে;—ব্রাহ্ম, দৈব প্রাজাপত্য আর্য গান্ধর্ব্ব আসুর রাক্ষস ও পৈশাচ। প্রথমোক্ত চারি প্রকার উদ্বাহ শ্রেষ্ঠ পদ বাচ্য; তন্মধ্যে একটিতেও পুত্র কন্যার শুল্ক গ্রহণের নাম গন্ধ ও নাই; শেষোক্ত চারি প্রকারের বিবাহ অধম বলিয়া গণ্য, তাহার মধ্যে কেবল আসুর বিবাহে পণ গ্রহণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা শাস্ত্র মান্য করেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন সে প্রকার ক্রীত বিবাহ ভদ্র সমাজে শাস্ত্রমতে অসিদ্ধ; সেইরূপ অসিদ্ধ বিবাহে অপত্য

উৎপাদন হইলে, সেই অপত্যেরাও পিতৃপুরুষগণের কার্য্যের অযোগ্য, ইহা জানিয়াও বর্ত্তমান সামাজিক মহাপ্রভুরাও আপনাদের মধ্যে অনেকে আসুর বিবাহ চালাইতেছেন, দেখিয়া শুনিয়া আমরা তাঁহাদিগকে কি বলিব ?

মুখে বক্তৃতা করিয়া, কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া, বড় বড় সভা করিয়া মধ্যে মধ্যে এই জঘন্য আসুর বিবাহের প্রতিবাদ করা হয়, পুত্রের বিবাহে পণ লইব না, বলিয়া জন কতক লোক এক এক প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষরও করেন, কিন্তু তাহার ফল কোথায় ? পাপের উপর পাপের সংযোগ, শুল্ক গ্রহণ পাপ, তাহার উপর আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পাপের উত্তম সম্মিলন ? হায় রে টাকা ! তুমি যে মানুষের কি সর্ব্বনাশ না করিতে পার, ভাবিয়া গণিয়া তাহা স্থির করা যায় না।

কন্যা বিক্রয় নিসিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রকারেরা স্পষ্টাক্ষরে বিধান করিয়াছেন, পুত্র বিক্রয়ে—স্পষ্ট নিষেধ না থাকিলেও স্পষ্ট বুঝিতে হইবে উভয়ই একসূত্রে গাঁথা। শাস্ত্র বচনে অপত্য শব্দের উল্লেখ ; পুত্রকন্যা উভয়েরই আখ্যা অপত্য ; কন্যা বিক্রয় নিসিদ্ধ, পুত্র বিক্রয় সুসিদ্ধ, ইহা যাঁহারা বুঝিয়া লন, তাঁহাদের বুদ্ধিকে কোটী কোটী নমস্কার !

শাস্ত্রে আছে, যে দেশে শুক্ল বিক্রয় হয়, সে দেশ পতিত। এখন বিবেচনা করিতে হইবে, কন্যা বিক্রয় করিলে দেশ পতিত হয়, পুত্র বিক্রয় করিলে কি দেশটি স্বর্গতুল্য হইয়া উঠে ? মূর্খের কথা, মূর্খের ধারণা, মূর্খের বিবেচনা. যদি অনুমান করেন, সেটা এক প্রকার সিদ্ধান্ত, সেটাও ভুল। হইতে পারে সিদ্ধান্ত, কিন্তু যাঁহারা ব্যাখ্যা করিতে জানেন, অবশ্য তাঁহারা বলিবেন, অর্থ লোভী পাপী লোকের সিদ্ধান্ত।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে—এমন কি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে এ পাপ ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাব হওয়াতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিমায়, শিক্ষা বিস্তার হওয়াতে এই পাপের নূতন প্রবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা কন্যা বিক্রয় করিত, সমাজে তাহারা পতিত হইয়া থাকিত, অনুপাত মতে কন্যাগণের মূল্যও অল্প ছিল, সুন্দরী সুন্দরী বড় বড় মেয়েদের দাম বড় জোর পাঁচশত টাকা উঠিত, এখনকার ছেলেদের দাম পাঁচ হাজারেও থামে না. সমাজের লোকেরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে ঘর বর দেখিয়া, কৌলিক মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বৈবাহিক করণ কারণ করিতেন, আজ কাল সে প্রথাটি উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের "পাশ" গণনা করিয়া বরের মূল্য ধার্য্য হয়, যে ছেলের যত পাশ সেই গণনায় হারাহারি মতে মূল্যের নিরূপণ হইয়া

থাকে; কোন ঘরের কন্যা কোন ঘরের বর, সে দিকে প্রায়ই দৃষ্টি রাখা হয় না, কুল গেল, মর্য্যাদা গেল, বংশ গৌরব গেল, সেটা সকলে ভাবিয়াও দেখেন না, গ্রাহ্যও করেন না; ছেলের দাম বেশী হইলেই চরিতার্থ হন। পুত্রের বিবাহের সময় বরকর্ত্তা এক প্রকার আত্ম বিস্মৃতি হইয়া থাকেন, কন্যার পিতার সর্ব্বনাশের দিকেই তাঁহার মন থাকে, ভবিষ্যতে তাঁহাকে যে, একদিন কন্যার পিতা হইতে হইবে, ভাবি জামাতার পিতা একদিন তাঁহারও সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল, সেটাও মনে থাকে না। গরু ছাগলের মত পুত্র বিক্রয়ে বেশী টাকা লাভ করিয়া বর কর্ত্তারা পরমানন্দে নৃত্য করেন, ছেলেরা নিলামে চড়ে যাহার ডাক উচ্চ হয়, তাহারই কন্যা সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা হইয়া পুত্র বধুরূপে ঘর আলো করে, সুমার্জ্জিত শুভ্র রজত মুদ্রায় লৌহ সিন্দুক পরিপূর্ণ হয়, ইহাই বর কর্ত্তাগণের স্বর্গের সোপান।

প্রথানুসারে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা সমাজের মধ্যে প্রধান। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুই শ্রেণীর ঘরেই অধিক তেজে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কুলীন ব্রাহ্মণেরা টাকার দায়ে অজানিত অকুলীনের পুত্রকে কন্যা প্রদান করিতেছেন। সমাজস্থ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থেরা স্বশ্রেণীতে ঘর বরের অভাবে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের সহিত কুটুম্বিতা করিতে বাধ্য হইতেছেন, কি আমোদ পাইতেছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন, বংশ মর্য্যাদা কুলমর্য্যাদা ও সমাজ মর্য্যাদার বিচার কেবল টাকার বাজারে?

আর একটা বিষম উপদ্রব। কমলার প্রসাদে যাঁহারা বড় মানুষ হইয়াছেন, তাঁহারা টাকার লোভে বড় মানুষের ছেলের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে ব্যগ্র, গরীবের কন্যারদিকে তাঁহাদের নজর পড়ে না, যদি দৈবাৎ পড়ে, তখনি অমনি বর কর্ত্তার নাক মুখ বাঁকিয়া যায় কেননা গরীবের টাকা কম।

সমাজে আগুণ জ্বলিতেছে; ক্রমশঃই কু-বাতাসের জোরে অগ্নি শিখার তেজ বাড়িতেছে, দিন দিন নিলামের বাজারে বরের দাম বাড়িয়া উঠিতেছে, গরীব ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা এক এক কন্যাদায়ে পথের ভিকারী হইতেছেন, মা ষষ্টির কৃপায় যাঁহারা বহু কন্যার পিতা তাঁহাদের যে কি দশা হইতেছে, সকলে তাহা অনুভব করিয়া লইবেন, বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপের নিমিত্ত কটি-বন্ধন করিয়া যাঁহারা সভা করেন, সভায় যাঁহারা সহস্র কথা বিস্তার করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, উচ্চকণ্ঠে তাঁহারা সকলেই বলেন, "করিতে হইবে, করিতে হইবে", কিন্তু হায় হায় কে যে করি-

বেন, কবে যে করিবেন, তাহা কিছুই জানিতে পারা যায় না ; এ প্রকার অকাল গর্জ্জনে কি ফল আছে, তাহা কি কেহ আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারেন ? আকাশে মেঘ হয় ঘন ঘন গর্জ্জন হয় বিন্দু পাত হয় না। অনাবৃষ্টিতে শস্যক্ষেত্র দগ্ধ হইয়া যায়, সেরূপ গর্জ্জনে যে ফল, করিতে হইবে, করিতে হইবে, এইরূপ গর্জ্জনের অধিনায়কেরা সেইরূপ ফলের আশা রাখেন বোধ হয়, দেশ উৎসন্ন যাউক, সমাজ অধঃপাতে যাউক সমাজের অধিক লোক ফকির হইয়া পড়ুক, তাহার পর বক্তৃতা বৃক্ষে ফুল ফুটিবে, তাহার পর ফল ধরিবে, বাগ্মী মহাশয়েরা শূন্য গর্ভ বক্তৃতা করিয়া কি সেইরূপ আশায় মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন ? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর প্রতীক্ষার উদ্দেশে তাঁহাদের মুখপানে চাহিয়া রহিলাম, বারান্তরে আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবে। এই স্থলে আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন বিবাহ না বাণিজ্য ?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

কৃপাকর কৃপাময় ! জুড়ি দুটি পাণি—
মাগি ভিক্ষা; হৃদে ধরি শ্রীপদ দুখানি।
দ্বাপরেতে রামকৃষ্ণ ছিল দুটী ভাই,
বৃন্দাবনে নাম ছিল কানাই বলাই;
কলিযুগে তুমি প্রভু, রামকৃষ্ণ নামে—
অবতীর্ণ হয়েছিলে ইহ বঙ্গ ধামে ;
নররূপে শ্রীঅঙ্গের অপরূপ জ্যোতি—
হেরিয়ে সবার হ'তো পুলকিত মতি ;
যোগেতে পরমহংস, দেব অবতার,
আমি কি বর্ণিব দেব, মহিমা তোমার।
দানিয়া পরম জ্ঞান ভক্তজন গণে,
চরিতার্থ করিয়াছ অমিয় বচনে ;
সংসারের অসারতা করিয়া জ্ঞাপন,
সমভাবে বুঝায়েছ মত্তিকা কাঞ্চন।

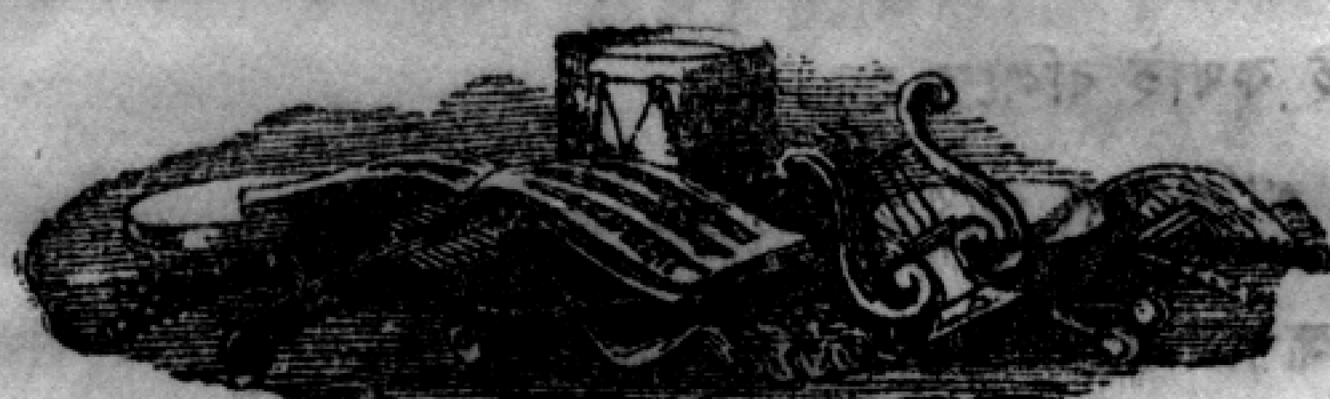
হিংসা দ্বেষ পরিহরি সরল অন্তরে,
ভাই ভাই বন্ধু ভাবে রহিবার তরে,
দিয়াগেছ উপদেশ হইয়া সদয়,
অন্তরে অঙ্কিত আছে মুছিবার নয়।
চর্ম্ম চক্ষে যে দেখেছে তব শ্রীচরণ,
জ্ঞান চক্ষু ফুটিয়াছে তাহারি তখন।
তখনি তোমারি প্রেমে মজায়েছে মন,
ভুলিতে নারিব কভু যাবত জীবন;
জানিয়াছে বুঝিয়াছে ভবের বন্ধন,
বৈতরণি তরিবার ভেলা ওচরণ;
বুঝিয়াছে মনে জ্ঞানে করুণা অপার,
বিভীষণ ভবার্ণবে তুমিই কর্ণধার।

লীলাসারি, মায়াময় দেহ পরিহরি,
পশিয়াছ নিত্যধামে আপনি শ্রীহরি।
চক্ষের অন্তরে তুমি গিয়াছ চলিয়া,
অদৃশ্য অমর পুরে রহিয়াছ গিয়া,
গিয়াছ গিয়াছ প্রভু, ত্যজিয়াছ ভূমি,
জানি আমি, সর্ব্বময়, সর্ব্ব ব্যাপী তুমি
যেদিকে যখন প্রেমে ফিরাই নয়ন,
পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি করি দরশন,
স্বপনে কি জাগরণে কিবা নিদ্রা ঘোরে,
ওই তেজময় রূপ চারি দিকে ঘোরে,
তোমার উৎসবে দেব, অতুল উৎসব,
সর্ব্ব মুখে রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রব।

জয় জয় রামকৃষ্ণ পতিত পাবন,
ভক্তিভাবে হৃদে ধরি রাতুল চরণ,
নামামৃত পান করি নাম করি গান,
নেশায় বিভোর হই, স্নিগ্ধ হয় প্রাণ।

রামকৃষ্ণ পাদপদ্ম হৃদে করি আশ,
রামকৃষ্ণ লীলাভণে রামকৃষ্ণ দাস ॥

—•:*:•—



বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ।

গার্হস্থ্যাশ্রম ।

লেখক—শ্রীপ্রসন্ন কুমার চট্টোপাধ্যায় ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিরোনাম দেখিয়াই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা এই প্রবন্ধে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত গার্হস্থ্যাশ্রমের কথাই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব। কিন্তু তদানুসঙ্গিক অন্যান্য আশ্রমের কথা, বর্ণের উৎপত্তি ও বিভাগ এবং প্রত্যেক বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে কিছু না বলিলে, প্রস্তাবিত বিষয়টী বিশদ হইবে না। অতএব প্রথমে সংক্ষেপেই ঐ সকল কথার আলোচনা করা যাইতেছে।

শাস্ত্রমতে মর্ত্ত্য মানব সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম বর্ণ হইতে উৎপন্ন ও দ্বিতীয়—তদ্‌বহির্ভূত, অর্থাৎ যাহারা চাতুর্ব্বর্ণ্য সম্ভূত নহে। এই শ্রেণীর মানবগণকে মনু দস্যু সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। যথা,—

"মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥"
মনুসংহিতা।

অর্থাৎ যাহারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্য সম্ভূত নহে, তাহাদের আর্য্য ভাষাই (সাধুভাষা) হউক বা ম্লেচ্ছভাষাই হউক, ইহাদের সাধারণ নাম দস্যু।

মূলবর্ণ চারিটী ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারি বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্‌বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়ত ॥"

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদদ্বয় হইতে শূদ্র বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই উদ্ধৃত শ্রুতি বচনের তাৎপর্য্য এই যে সৃষ্টিরক্ষা কার্য্যে বিশ্বরূপ ব্রহ্মার (ঈশ্বরের) বর্ণমূর্ত্তি নিরূপণ করিতে হইলে ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ স্বরূপ, ক্ষত্রিয় বাহু স্বরূপ, বৈশ্য উরু স্বরূপ ও শূদ্র তাঁহার পদদ্বয় স্বরূপ, এই কথাই বলিতে হয়।

মহাভারত শান্তিপর্ব্বে কথিত হইয়াছে,—

"ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণান্তু লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামাসিত স্তথা॥"

আদি সৃষ্টির ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় লোহিতবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল।

সৃষ্টির প্রথমে একমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণেরই উৎপত্তি হইয়াছিল। সেইজন্য ব্রাহ্মণ 'অগ্রজন্মা' নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। পরে সেই ব্রাহ্মণ বংশ হইতেই শরীরের বর্ণ গুণ ও কর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র বর্ণের উদ্ভব হয়। শান্তি পর্ব্বে মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন,—

"ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতঃ।
কামভোগপ্রিয়া স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্ত স্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥"

প্রথম সৃষ্টির ব্রাহ্মণ বংশে যাহারা কামভোগে রত, উগ্র প্রকৃতি, সাহসী, ক্রোধী, বীর ও রক্তবর্ণ হইল, তাহারা ক্ষত্রিয়রূপে, যাহারা কৃষ্যুপজীবী ও পীতবর্ণ তাহারা বৈশ্যরূপে, আর যাহারা হিংসাদি প্রিয়, লোভী, শৌচাচারভ্রষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ হইল, তাহারাই শূদ্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

ভগবান্ ভৃগু পরবর্ত্তী অধ্যায়ে চাতুর্ব্বর্ণ্যের যে, লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাও এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,—

"জাত কর্ম্মাদিভির্যস্ত সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্‌ বিঘসাশী গুরু প্রিয়ঃ
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥
ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়ন সঙ্গতঃ।
দানাদানরতি র্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥
বাণিজ্য-পশু রক্ষা চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥
সর্ব্ব ভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্ত বেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

যে ব্যক্তি জাত কর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত, শুচি, বেদাধ্যায়ী, যজনযাজনাদি ষট্‌কর্ম্মরত, আচার পূত, দেবাতিথি ভোজন-শেষ ভোজী, গুরুভক্ত, নিত্যব্রতী এবং সত্য, দান, পরানিষ্ট বিমুখতা, আনৃশংসতা, লজ্জা, দয়া ও তপস্যাদি গুণ যাঁহাতে বিদ্যমান, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। যিনি অস্ত্র শস্ত্রাদি কার্য্যপটু, বেদাধ্যয়নে তৎপর এবং যাঁহার দানে প্রীতি ও জয়ান্তে গ্রহণেও প্রবৃত্তি আছে, তিনিই প্রকৃত ক্ষত্রিয়। বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম ও পশু পালনে যিনি রত, অথচ শুচি, দাতা ও বেদাধ্যায়ী, তিনিই প্রকৃত বৈশ্য। আর যে ব্যক্তি বেদপাঠ, শৌচ, আচার, সমস্তই বর্জন করিয়াছে, এবং অর্থ লালসায় সকল প্রকার কর্ম্মেই লিপ্ত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শূদ্র।

আবার স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ।"

যাজ্ঞবল্ক্য।

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষত যোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥

মনু।

সবর্ণ পুরুষের ঔরসে অক্ষত যোনি সবর্ণা ভার্য্যার গর্ভে পিতা মাতার সজাতি সন্তান জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণী ভার্য্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, তিনিই ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জন্মও এইরূপ নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও মহাভারতীয় প্রমাণ বচনের এক বাক্যতা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, চাতুর্ব্বর্ণ্য দ্বিবিধ ;—প্রথম ও পরবর্ত্তী। প্রথম চতুর্ব্বর্ণ ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি এবং এক ব্রাহ্মণ বংশ হইতেই শরীরের বর্ণ ও গুণ কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিবর্ণের বিভাগ প্রথমে কল্পিত হইয়াছিল। আর পরবর্ত্তী চতুর্ব্বর্ণ-সজাতীয় পিতামাতার বৈধ সংসর্গে সমুৎপন্ন। ফল কথা ব্রাহ্মণত্ব এক প্রকার প্রবল সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রবল রজোগুণ, বৈশ্যত্ব প্রবল রজস্তমো গুণের সম্মিলন ও শূদ্রত্ব প্রবল তমোগুণ বিশেষ। ভগবান্ গীতাতেও এই কথাই বলিয়াছেন। যথা,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণ ও প্রকৃত্যনুসারি কর্ম্মের বিভাগ ক্রমে আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।

ভগবানের স্বাভাবিক নিয়মে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি ও লক্ষণাদির কথা একরূপ বলা হইল। অতঃপর ঐ চারিবর্ণ হইতে অনুলোম ও প্রতিলোম ক্রমে যেভাবে নানা সঙ্কর বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের, ও বৈশ্য—বৈশ্য ও শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। ইহাই তখন শাস্ত্রানুমোদিত আচার ছিল। ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়া ভার্য্যার গর্ভে মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যা ভার্য্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ ও শূদ্রা ভার্য্যার গর্ভে পারশব জাতির উৎপত্তি। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যা ও শূদ্রা ভার্য্যার গর্ভে যথাক্রমে মাহিষ্য ও উগ্র-ক্ষত্রিয় জাতির এবং বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রা ভার্য্যার গর্ভে করণ জাতির উদ্ভব হইয়াছে। এই ছয় প্রকার হইল, অনুলোমজ সন্তান। আবার প্রতিলোমজ সন্তানও ছয় প্রকার। যথা,—ব্রাহ্মণ কন্যার ব্যভিচারজা গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে সূত জাতির, বৈশ্যের ঔরসে বৈদেহ জাতির ও শূদ্রের ঔরসে চাণ্ডাল জাতির উৎপত্তি। ক্ষত্রিয় কন্যার ব্যভিচারজ গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে মাগধ জাতির ও শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্ত জাতির উৎপত্তি এবং বৈশ্যকন্যার ব্যভিচারজ গর্ভে শূদ্রের ঔরসে আয়োগব জাতির উদ্ভব হইয়াছে সুতরাং সমষ্টিতে এই দ্বাদশ প্রকার সঙ্কর বর্ণই প্রথম ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত ক্ষত্রিয়াদির, ক্ষত্রিয় কন্যার সহিত বৈশ্যাদির ও বৈশ্যকন্যার সহিত শূদ্রের বিবাহ, ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত নহে। সেই জন্য ঐ সকল গর্ভ ব্যভিচারজ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

প্রথমোৎপন্ন পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার সঙ্কর বর্ণ ব্যতীত আরও কতিপয় সঙ্করবর্ণের কথা উল্লিখিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উগ্রক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভজাতসন্তান আবৃত, অম্বষ্ঠ কন্যার সন্তান আভীর ও আয়োগব-কন্যাপ্রসূত সন্তান ধিগ্বন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিষাদ হইতে শূদ্রকন্যা সম্ভূত সন্তান পুকশ শূদ্র হইতে নিষাদ কন্যার জাতসন্তান কুক্কুটক ক্ষত্তা হইতে উগ্রক্ষত্রিয় কন্যা-গর্ভজ সন্তান শ্বপক ও বৈদেহ কর্ত্তৃক অম্বষ্ঠ কন্যার গর্ভজাত তনয় বেণ নামে কথিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণ উপনয়ন সংস্কারসংস্কৃত হয়েন বলিয়া, তাঁহারা 'দ্বিজাতি' আখ্যা পাইয়া থাকেন কিন্তু ইহাদের সবর্ণা ভার্য্যা-গর্ভজাত তনয়েরা যদি উক্ত সংস্কারে সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ব্রাত্য বলা যায়। এই ব্রাত্য ব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজ সন্তান ভূর্জ্জকণ্টক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দেশ বিশেষে ইহাঁদের আরও চারিটী নাম আছে যথা—আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখ। ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের সবর্ণা পত্নী-গর্ভজাত তনয়েরা দেশ-ভেদে সপ্তবিধ আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। যথা ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খশ ও দ্রবিড় ব্রাত্য বৈশ্যের সবর্ণা পত্নীগর্ভজসন্তান সুধন্বা, আচার্য্য; কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র ও সাত্বত নামে কথিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দস্যুজাতি কর্ত্তৃক আয়োগবস্ত্রী গর্ভে যে সন্তান সমুৎপাদিত হয়, তাহার নাম সৈরিন্ধ্র। ইহারা কেশ রচনাদি কার্য্যে বিশেষ পটুতা লাভকরে এবং দাসত্ব কর্ম্ম পাশ দ্বারা মৃগাদি বধ করাও ইহাদের উপজীবিকা। বৈদেহজাতির ঔরসে আয়োগব কন্যার গর্ভজাত সন্তান মৈত্রেয়। ইহারা সভাবতঃ মধুরভাষী এবং প্রভাতে অরুনোদয় কালে ঘণ্টাবাদন পূর্ব্বক শয্যাশায়ি নৃপতি প্রভৃতির স্তুতি পাঠ দ্বারা নিদ্রাভঙ্গ করাই ইহাদের ব্যবসা। নিষাদ কর্ত্তৃক আয়োগব স্ত্রীগর্ভজাত সন্তান মার্গব বা দাস নামে খ্যাত হইয়া থাকে। ইহারা নৌকর্ম্মজীবী। আর্য্যাবর্ত্তনিবাসিরা ইহাদিগকে কৈবর্ত্ত বলিয়া থাকে, নিষাদ কর্ত্তৃক বৈদেহস্ত্রীগর্ভজ সন্তানের নাম কারাবার। মৃতপশুর চর্ম্মচ্ছেদ করাই ইহাদের ব্যবসা। চণ্ডালের পুক্কসী স্ত্রীগর্ভে যে পাপিষ্ঠ জাতির জন্ম হয়, তাহারা সোপাক; নিতান্ত পাপজনক জল্লাদের কার্য্যই ইহাদের উপজীবিকা। চণ্ডালের নিষাদী স্ত্রীগর্ভজাত সন্তানের নাম অন্ত্যাবসায়ী বা গঙ্গাপুত্র। শ্মশান কার্য্যই ইহাদের ব্যবসা এবং ইহারা যাবতীয় ঘৃণিত জাতিরও ঘৃণার্হ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশমান্ জাতি স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারাই পরিজ্ঞেয়। বস্তুত এইরূপে ক্রমে ক্রমে সঙ্করের তৎসঙ্করের সঙ্কর উৎপত্তি হইয়া বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষে সঙ্কর জাতি অসংখ্য হইয়া পড়িয়াছে।

এইস্থানে বলা আবশ্যক যে, ব্রাহ্মণের ঔরসে পরস্ত্রী বা সৈরিণী ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সে সন্তানমূর্দ্ধাবসিক্ত হইবেনা। অনুলোমজ হইলেও সে শূদ্রতুল্য। নিজের পরিণীতা ভার্য্যা না হইলে, ক্ষত্রিয়াদির পক্ষেও ঐ নিয়ম। এমন কি ব্রাহ্মণ যদি পরপত্নী ব্রাহ্মণীর গর্ভে সন্তানোৎপাদন করে, তবে সেই জারজ সন্তানও ব্রাহ্মণ নহে; সে শূদ্রতুল্য। ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গোপনীয়সম্বন্ধ বশতঃ যে সন্তান জন্মে তাহারই নাম নাপিত।

ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়ের সবর্ণা পত্নী সম্ভূত সন্তানের ন্যায় তাঁহাদের অনুলোমজ অর্থাৎ মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) ও মাহিষ্য জাতি দ্বিজধর্ম্মী ও দ্বিজোচিত সংস্কারে সংস্কারার্হ হইয়া থাকেন। কিন্তু শূদ্রা গর্ভজাত সন্তান ও প্রতিলোমজ তনয়েরা শূদ্রতুল্যই হয়। উহাদের উপনয়নাদি কোন সংস্কারই নাই।

চাতুর্ব্বর্ণ্য ও তাহাদের সন্তান ধারায় সমুৎপন্ন সঙ্কর বর্ণের কথা সংক্ষেপে মোটামুটি একরূপ বলা হইল। অতঃপর দস্যু জাতির কথা বলা যাইতেছে। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে কথিত হইয়াছে ;—

"ব্রহ্ম চৈব পরং সৃষ্টং যে ন জানন্তি তেঽদ্বিজাঃ।
তেষাং বহুবিধাস্ত্বন্যাস্তত্র তত্রহি জাতয়ঃ।
পিশাচা রাক্ষসাঃ প্রেতা বিবিধা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥

মর্ম্মার্থ এই যে, শব্দ ব্রহ্মরূপ বেদকে যাহারা পরম শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলিয়া না জানে তাহারা অদ্বিজ অর্থাৎ দ্বিজবিরোধী? অসুরবৎ এই অসুর বংশ হইতেই পিশাচ রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি বহুবিধ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। পাশ্চাত্যমতে যাহারা আদিনিবাসী অসভ্যজাতি নামে কথিত হয়, সেইজুলু, নিগ্রো প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত রাক্ষস ও প্রেত নামক এক জাতি, ফলতঃ ইহারাই প্রকৃত দস্যু। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, ব্রাহ্মণ বিরোধির নিকৃষ্ট যোনিতেই জন্ম হয়। সেজন্য চাতুর্ব্বর্ণ ও তৎসন্তান জন্ম হইতে স্বতন্ত্র। তাহা হইলেই প্রতিপন্ন হইল যে, চাতুর্ব্বর্ণ্যসম্ভূত জাতি ব্যতীত ভূমণ্ডলের অন্যান্য প্রায় সমস্ত জাতিই মনুকথিত দস্যুজাতি মধ্যে পরিগণিত। অন্যান্য বিবিধ প্রকার জাতি ইদানীং ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হইলেও তাহাদিগকে অবশ্যই দস্যু জাতি বলা যাইতে পারেন না। কেননা মনু বলিয়াছেন,—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশা ঃ ॥"

পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড় কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ, এই সকল জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল। পরে ক্রিয়ালোপ হেতু অর্থাৎ উপনয়নাদির সংস্কার ওবজ না ধ্যয়নাদির অভাবে ক্রমশঃ ইহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় বর্ত্তমান কালে এই সমস্ত জাতিই বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

গীত।

লেখক, কবিবর শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

বহুত দোষ আমারি মা,
তোমার আবার কি দোষ তারা।
যা বল কিঙ্করে গো মা,
সব সত্য সারাৎসারা।
যে কঠিন বাঁধন দিয়ে,
রেখেছ জীবে বাঁধিয়ে
কি দিয়ে তারে ছেদিয়ে
কে জীয়ে গো ভবদারা॥
প্রখর রবির করে
দহে বিশ্ব-চরাচরে॥
সে ভস্ম করিতে নারে
এমনি মা তোর কঠিন বেড়া।
সে যখন তোর বাঁধন-জোরে
গগনে গগনে ঘোরে
আমি দোষী বল কি ক'রে
আমি কি তোর বাঁধন ছাড়া?
মাসাদি তিথি ঋতুচয়
কারু না শক্তি উপজয়,
তব শক্তির পরাজয়
করিতে গো ভবদারা॥
যারে যা করাও মা যেমন
সে কর্ম্ম সে করে তেমন—
দ্বিজ কালীর বেলায় যখন তখন
দাও মা কর্ম্মফলের নাড়া॥

——(:০:)——

নমঃ শূদ্র।

লেখক, কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।

আমার যে গ্রামে বাস সেই গ্রামে নমঃশূদ্রের সংখ্যা ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি জাতির সমষ্টির দ্বিগুণ হইবে। সুতরাং এই জাতির সহিত আজন্ম একগ্রামে বাস করিয়া তাহাদের চরিত্র গত যে গুণ দোষ দেখিয়াছি, তাহা প্রকাশ করা এই সময়ে অসমীচিন হইবে বলিয়া মনে করি না; নমঃশূদ্রগণ সমাজে চণ্ডাল বা চাঁড়াল বলিয়াও অভিহিত হয়। তবে চণ্ডাল শব্দের অভিধানিক অর্থ বা প্রাচীনতম প্রয়োগ সমূহের আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় চণ্ডাল ধর্ম্ম ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষে কোনও কালে থাকিলেও এখন তাহার কিছু নাই। পক্ষান্তরে ইহাদের এমন একটীও বৈশিষ্ট্য নাই যাহাতে ইহাদিগকে সৎশূদ্র হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জানিতে পারা যায়।

উপাধি

আমার পরিচিত নমঃশূদ্রগণের মধ্যে মণ্ডল, ঢালী, বারুই, বাছার, ছৈয়াল মিস্ত্রি, চঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটীমাত্র উপাধি দেখিয়াছি।

(আমার বন্ধু শ্রীযুক্তব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয়ের নাম রহস্যে এতদ্ব্যতীত আরও বহু উপাধির নাম উল্লিখিত আছে দেখিয়াছি।) এতন্মধ্যে মণ্ডল উপাধিধারী নমঃশূদ্রের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, চঙ্গ; বাছার ও ঢালী উপাধিধারী নমঃশূদ্র অতি অল্প সংখ্যক। বারুই ও মিস্ত্রি উপাধিধারী নমঃশূদ্রগণ সূত্রধরের কার্য্য করে। ছৈয়াল উপাধিধারী নমঃশূদ্রগণ ঘরামীর কার্য্য করে। শেষোক্ত তিনটী উপাধির নূতন সৃষ্টিও হইতেছে, বর্ত্তমান সময়ে কর্ম্মকারের কার্য্য করিয়া কাহাকে কাহাকে কামার উপাধি ধারণ করিতেও দেখা যায়।

উপজীবিকা।

নাপিত ধোপা বা ভূইমালীর মত ইহাদের বিশেষ কোনও বৃত্তি নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি ও শিল্প; পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুজাতির মধ্যে এক মাত্র কৃষক বলিতে এই জাতিই বিদ্যমান। ইহারা পরিশ্রমী ও সহিষ্ণু। এই জাতির মধ্যে ব্যায়ামের আলোচনাও বেশ আছে। ইহাদের অনেকেই বেশ ভাল লাঠী খেলা জানে এবং কেহ কেহ লাঠী খেলায় নানাবিধ কৌশল দেখাইয়া পোষ্য পালনকরে। কৃষি—প্রায় প্রত্যেক নমঃশূদ্রের কিছু কিছু জমি আছে? জমিতে নিজেরাই হলকর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদন করে। প্রায় সকলের বাড়ীতেই গাভী ও বলদ দেখিতে পাওয়া যায়। গো-প্রতিপালন ও গো

মাতার প্রতি চণ্ডাল (?) জাতির বিশেষ ভক্তি আছে। শিল্পের মধ্যে এই জাতিকে সচরাচর সূত্র ধরের কার্য্যই করিতে দেখা যায়। নদী মাতৃক পূর্ব্ব বঙ্গের প্রায় সমুদায় নৌকা এবং বর্ত্তমান যুগের টিনের ঘর এই জাতির হস্তের প্রস্তুত, দ্বিতীয় কার্য্যছৈয়ালী (ঘরামী) অনেকে এই কার্য্য করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ঘরামির কার্য্যে নমঃশূদ্রগণ যেরূপ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে তাহা পূর্ব্ব বঙ্গের গৃহে গৃহে বিরাজমান। লৌহের কার্য্য প্রায় এই জাতির এক চেটিয়া ব্যবসায়। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে তামা কাঁসা ও পিত্তলের বাসন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া নূতন শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে।

ধনধান্য ।—

নমঃশূদ্রগণ বড়ই আড়ম্বর হীন। অর্থ কৃচ্ছতা এই আড়ম্বর হীনতার হেতু বলিয়া অনুভূত হইলেও তাহা প্রকৃত নহে। ইহাদের সমবস্থা (আর্থিক) অন্যান্য জাতি বড়ই আড়ম্বর প্রিয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের আর্থিক অবস্থা বড়ই বিপদ জনক হইয়া উঠিতেছে। এই জাতির মধ্যে সঙ্গতী অতি অল্প লোকই আছে, সকলেরই প্রায় "যত্র আয় তত্র ব্যয়" অবস্থা ! মোটাভাত মোটা কাপড়েই-ইহাদের তুষ্টি। কিন্তু নিরন্তর দুর্ভিক্ষের তাড়নায় এই মোটাভাত ও মোটা কাপড়েরও সংস্থান কম্ হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যহ দুইবেলা পেট পুরিয়া খাওয়া অল্প লোকেরই ঘটিতেছে। এতদ্ব্যতীত ইহাদিগকে জীবিকার জন্য দৈনিক মজুরী এবং বেতন ভোগী হইয়া চাকুরী স্বীকার করিতেও দেখা যায়। তবে এইরূপ লোকের সংখ্যা-অল্প। এই অবস্থায় ইহাদিগকে সচরাচর নিম্নলিখিত কার্য্যগুলিক রিতে দেখা যায়। বর্ষাকালে নৌকার মাঝীগিরি কার্য্য, গৃহস্থের গো-পালন, বাজার করা, মোট বওয়া; কাঠচেরা করা প্রভৃতি। কিন্তু ইহারা কোনওজাতির উৎসৃষ্ট ভোজন করে না বা উৎসৃষ্ট বাসনাদিও মলেনা। (এই কার্য্যগুলি সৎশূদ্রগণকে করিতে দেখা যায়। অধিকন্তু ইহারা শেষের কার্য্য দুইটীও করিয়া থাকে।) নমঃশূদ্র জাতির স্ত্রীলোকগণ জীবিকার জন্য কোনও রূপ চাকুরী স্বীকার করে না। তবে নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইলে এবং অন্য অভিভাবক না থাকিলে প্রতিবেশী উচ্চ জাতির বাড়ীতে সামান্য কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ইহারসংখ্যা অতি অল্প,

ব্যক্তিগত গুণ ।—

সাহস—নমঃশূদ্র গণের সাহস পূর্ব্ববঙ্গে প্রসিদ্ধ। ইহারা সাহসী হইলেও নিতান্ত নিরীহ। "গোঁয়ার গোবিন্দ" এই জাতির মধ্যে-অল্প আছে। তবে ব্যায়ামের

আলোচনার অভাবে ইহাদের সাহস ক্রমশঃ হ্রাসই হইতেছে; ইহাদের লাঠী খেলা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ছোট বড় সকলেই লাঠী খেলা অভ্যাস করে। পূর্ব্বে উচ্চ জাতির বাড়িতে বিবাহাদি কার্য্যে ইহারা লাঠী খেলা দেখাইত। ইহাদের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ গঠণ শক্তি ও সাহসের পরিচায়ক। এখন উচ্চ জাতীয়গণ শিক্ষিত ও অতি ভদ্র হইয়া লাঠী খেলাটাকে অসভ্যতার তালিকায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্ববৎ পুরস্কারের অভাবে খেলোকরের সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সহিষ্ণুতা—কষ্ট সহিষ্ণুতার জন্যই ইহারা এত শিল্পানুরাগী ও নিপুণ হইতে পারিয়াছে। ইহারা পরিশ্রমী। কার্য্য উপস্থিত হইলে ইহারা শারীরিক শ্রম করিতে ক্রুটী করে না। ইহাদের মধ্যে অলসের সংখ্যা কম ইহারা স্ব স্ব দুরবস্থার কথা সহজে বড় কাহারও নিকট প্রকাশ করে না।

গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।—

নমঃশূদ্র গণের মধ্যে যুক্ত পরিবারের সংখ্যা অল্প নহে। ইহারা পিতৃ মাতৃ ভক্ত। বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদিগকে পালন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে এবং অক্ষম ভ্রাতা ভগিনীদিগকে পালন করিয়া থাকে। সংসারের কার্য্য স্ত্রীলোকগণই সম্পাদন করে। কেবল উপার্জ্জন পুরুষেরা করিয়া থাকে। ছেলে দশ বৎসরের হইলেই সে একজন উপার্জ্জনক্ষম হয়।

সামাজিক ধর্ম্ম।—

এজাতির একতা সুপ্রসিদ্ধ। ইহাদের সকলেই বৈষ্ণব। কিন্তু উচ্চ জাতির আদর্শ মত কালী, মনসা, বা বিষহরি শীতলা প্রভৃতি দেবতার পূজাও প্রয়োজন মত করিয়া থাকে। ইহারা আধুনিক উচ্চ জাতির অখাদ্য কিছু খায়না। তবে বৃদ্ধদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় ইহারা পূর্ব্বে শূকর মাংস খাইত। কিন্তু শূকর পালন করিত না। বন্য শূকর মারিয়া খাইত। এখন এই পদ্ধতিও নাই। অধিকন্তু অনেকে মাংসও খায় না ধর্ম্মের প্রতি ইহারা অন্ধ বিশ্বাসী ইহারা বৈষ্ণব হইলেও শিবের প্রতি ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। নমঃশূদ্রদিগের মধ্যে অনেকেই গাঁজার ধুম পান করে। গাঁজার ধুম পান সূত্রে "ত্রিনাথের" সেবা করিয়া গান গায় ও গাঁজা খায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চৈত্র মাসে চড়কের সন্ন্যাসী হয়। উচ্চ জাতির বাড়ীতে পূজা হইলে প্রতিমার নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। নমঃশূদ্র গণ কায়স্থ ও নবশাকগণের অন্ন গ্রহণ করে না। ইহাদের জল চলন নাই। ইহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ হয়। বিবাহে বর, কন্যার পিতাকে অর্থ দিয়া থা.ক।

বহু বিবাহ নাই। পুরুষ স্ত্রী বিয়োগের পর দারান্তর গ্রহণ করে' বিধবা বিবা নাই। সকলীও উৎসৃষ্ট জ্ঞান ইহাদের বেশ আছে, সকলেই অবস্থানুসারে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, ইহাদের কর্তবেধ সংস্কার আছে, সৎশূদ্রের মত অন্যান্য সংস্কার হইয়া থাকে, অশৌচ ১০ দশ দিন (উড়িষ্যাতে ১০ দশ দিন অশৌচ সর্ব্ব জাতির) পিতৃ মাতৃ বিয়োগের পর সৎশূদ্রের মত আচরণ করে। পিতার স্বর্গার্থ শ্রাদ্ধাহে ভূরি ভোজন করাইয়া থাকে। বৎসরাবধি কালাশৌচ পালন করে। বৎসরান্তে সপিণ্ড করণ করে। ইহাদের ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র ইহাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প। সামান্য লেখাপড়া জানা লোক তত বেশী নাই। অশিক্ষিতের সংখ্যাই অধিক। ইহারা লেখা পড়া শিক্ষাকে তত আবশ্যক মনে করে না। ইহারা অশিক্ষিত হইলেও ভদ্র ব্যবহারে অনভ্যস্ত নহে।

নমঃশূদ্রের স্ত্রীলোকগণ

নমঃশূদ্র জাতির স্ত্রীলোকগণ অশিক্ষিতা হইলেও সতীত্বের প্রতি ইহারা বিশেষ গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকে। কুললক্ষ্মীগণ লজ্জাশীলা, গৃহকর্ম্ম নিপুণা এবং সাধু-স্বভাবা। ইহাদের অলঙ্কারের পারিপাট্য দেখিতে পাই নাই। ভ্রষ্টারমণীকে ইহারা বড় ঘৃণা করে। এই জাতির বিধবাগণ শূদ্রের বিধবার মতই বৈধব্য চিহ্ন ধারণার্থ অলঙ্কার ত্যাগ করে। সাদা কাপড় পরিধান করে। নমঃশূদ্র জাতির পুরুষগণের মধ্যে মদ্যপাণাশক্ত বা দুশ্চরিত্র লোক অতি বিরল এবং এই প্রকৃতির লোক সামাজিকগণ কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে নিগৃহীত হইয়া থাকে। নমঃশূদ্র জাতির ভাষার কোনও বৈশিষ্ট নাই। এতদঞ্চলে কয়েক শ্রেণীর নবশাকের ভাষায় যে একটা বৈশিষ্ট আছে, সেইরূপ বৈশিষ্ট ইহাদের নাই। সচরাচর ইহারা যে জাতির সহিত সর্ব্বদা কথা বার্ত্তা বলে তাহাদের ভাষাই অনুকরণ করে। নমঃশূদ্র জাতি সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি তাহা লিখিলাম। এখন একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। বর্ত্তমান সমাজে পশ্চিম কাহার ও কুর্ম্মির জল পান করিতে আমরা দ্বিধা বোধ করি না। এবং রন্ধন শালায় তাহাদের প্রবেশ নিসিদ্ধ নহে। ইহারা কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল পক্ষান্তরে জ্ঞাত কুলশীল নমঃশূদ্র জাতির সহিত সেইরূপ ব্যবহারে কুণ্ঠা প্রকাশ করি। আমরা তুলনায় সমালোচনা করিলে দেখিতে পাই।

কাহার বা কুর্ম্মি	... ...	নমঃশূদ্র
ইহাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন ভঙ্গুর	...	স্থায়ী

পতি থাকিতে স্ত্রীলোক বিবাহ করে ...	করে না
সকরী জ্ঞান নাই	আছে
অজ্ঞাত কুলশীল	জ্ঞাত কুলশীল
বেশ্যারত ও বেশ্যা বাড়ীতে কার্য্যাদি করিতে ...	সচ্চরিত্র বেশ্যা বাড়ীতে কার্য্য
ঘৃণা বোধ করে না	করা মনেও করিতে পারে না
উপদংশ ও প্রমেহ অনেকের আছে ...	নাই বলিলেই হয়
কে ভাল কেমন ? ...	...

কাহার জল পান করা কর্ত্তব্য ? ...

রন্ধন শালায় কাহাকে যাইতে দেওয়া উচিৎ ?

সামাজিকগণ ইহার উত্তর করিবেন।

——(:০:)——

প্রার্থনা।

রাগিণী আশাবরী একতালা।

কিবা আয়োজনে কি উপ করণে—
বলে দাও নাথ, পুজিব তোমায়।
চারিদিকে যাহা আছে থরে থরে
সকলি ত তোমার তোমারি ধরায়।
কুসুম নিচয় আছে বিকসিত
বিবিধ বরণে হয়ে রঞ্জিত,
তাও ত তোমার স্বকরে সৃজিত,
তাই বা কি করে দিইহে তোমায়।
কনক আশন রতন ভূষণ,
বিবিধ আহার বিবিধ বসন,
কারধন কারে করি বা অর্পণ
দত্তাপহারি কবে যে আমায় ?
তবে মাত্র আছে মনটি আমার
কৃপাকরি নাথ লও উপহার
মনে মন মিশি হয় একাকার
মিশাইয়ে যেন থাকি তব পায়।

(:০:)

বাঙ্গালা ভাষার লেখক, পাঠক ও সমালোচক। *

লেখক-শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, কালনির্ণয়, যুগ বিভাগ ও ক্রমবিকাশ প্রভৃতি গভীর গবেষণাপূর্ণ বিষয় সকল আমার এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের অসাধারণ কবিত্বের সমালোচনার কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত আমার এ প্রবন্ধে নাই। আধুনিক যে সকল মনস্বী লেখকগণ বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিয়া সাহিত্য জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, অথবা যে সকল আধুনিক কবিগণ নূতনভাবে নূতন ছাঁদে নূতন সুরে সুর বাঁধিয়া নববীণা ঝঙ্কারে আমাদিগকে মোহিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমার সম্মান ও পূজার্হ হইলেও আমার এই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করি নাই। আমা অপেক্ষা অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি পুস্তক লিখিয়া এবং সাময়িক পত্রেও সে সকল বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। আমি যেমন ক্ষুদ্র, আমার ক্ষমতা যেমন অল্প, আমার আর আলোচ্য বিষয়টিও তেমনি ক্ষুদ্র ও অল্প পরিসর গণ্ডীর মধ্যে আমি তাহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া লইয়াছি। আমার অদ্যকার আলোচ্য বিষয়-বর্ত্তমান বাঙ্গালার লেখক, পাঠক ও সমালোচকগণ। তাঁহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিকথা বলা আর বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা কি ভাবে কোন পথে চলিয়াছেন, যথাসাধ্য তাহাই প্রদর্শন করাই-আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এরূপ সাহিত্যসেবী বিজ্ঞজন সমাজে এরূপ ক্ষুদ্র বিষয়েও যে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি—সে ভরসাও আমার নাই।

বিগত ৫০ বৎসরের বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস যে কেবল উন্নতির ইতিহাস এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। এমন কি এত অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর আর কোন একটি ভাষা যে এত দূর উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা আমি জ্ঞাত নহি। পাশ্চাত্যসাহিত্যের সংস্পর্শই যে এ উন্নতির প্রধান কারণ একথাও আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকি। সমুদ্র উথলিয়া উঠিলে যেমন শুষ্ক নদ, নদী, খাল, বিল প্রভৃতি জলাশয় জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, পাশ্চাত্যসাহিত্যের ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিয়া সেইরূপ আমাদের দীনহীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টি সাধন করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি-আমাদের সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস বড়ই আশাপ্রদ-বড়ই গৌরবান্বিত। কোন্ জাতি কত দূর উন্নত, সে জাতির সাহিত্যই তাহার প্রধান সাক্ষী। জাতীয়

* বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত হয়।

সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন যে সে জাতি কিছুতেই উন্নত হইতে পারে না একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। এরূপ স্থলে আমাদের জাতীয় চরমোন্নতির যদি আমরা কোন দিন সুখস্বপ্ন দেখিতে পাই সেটা কখন দুরাশা বা দোষের বিষয় হইতে পারে না। "জাতীয়" কথাটা এখন সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আমিও এই স্থলে সেই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি।

আমাদের বর্ত্তমান লেখকগণকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাঁহারা সাহিত্য চর্চ্চার উদ্দেশে অথবা যশের জন্য কিম্বা সখ করিয়া পুস্তক রচনা করেন, তাঁহারা এক শ্রেণীর, আর যাঁহারা বালক বালিকাগণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাঁহারা অপর শ্রেণীর। যাঁহারা সাহিত্যকে একমাত্র উপজীবিকা করেন, প্রথম শ্রেণীর এরূপ অধিকাংশ লেখকই প্রায় দুস্থ সাহিত্যসেবী মধ্যে পরিগণিত হন। মা সরস্বতীর কৃপা থাকিলেই যেন মা লক্ষ্মীর বিরাগ ভাজন হইতেই হয়। তাঁহাদের সে সখের সাহিত্যের সেরূপ কাটতি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই, তাঁহাদের আর্থিক অবস্থাও সেরূপ স্বচ্ছল হয় না। এই শ্রেণীর পুস্তক লিখিয়া হয়ত কেহ কেহ যশস্বী হইয়াছেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই ছাপাখানার দেনার জ্বালায় তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়; তখন ভবিষ্যতে অন্য পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিতে তাঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় আর উৎসাহ থাকে না বা প্রবৃত্তিও হয় না। বড়ই দুঃখেরবিষয় এই, অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশে এইরূপ সখের পুস্তকের প্রকাশক আদৌ নাই। অন্য দেশের এই শ্রেণীর লেখকগন পুস্তক লিখিয়াই খালাস পান, সে সকল পুস্তকের প্রকাশের এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকারের পারিশ্রমিকেরও অভাব হয় না। তথায় পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লইয়া প্রকাশক লেখককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া থাকেন। সুতরাং লেখককে আর কোনরূপ ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হয় না। তিনি পুনরায় অন্য পুস্তক প্রণয়নে মনোনিবেশ করিতে পারেন। এইরূপ প্রকাশকের অভাবে আমাদের সাহিত্যের যে সমূহ অনিষ্ট হইতেছে-এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু এদেশে এরূপ প্রকাশকের অভাবে কেন হয় সে কথা কি একবার আপনারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়-এই শ্রেণীর সখের পুস্তকের সেরূপ কাটতি নাই বলিয়াই প্রকাশকের অভাব হইয়া থাকে। কারণ যে সকল স্কুলপাঠ্য পুস্তকের অধিক বিক্রয় দেখা যায়, সে সকল পুস্তকের প্রকাশের বা পর্য্যাপ্ত পারিশ্রমিকের তত অভাব হয় না। আজ তোমার একখানি পুস্তক কোন পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক তালিকা ভুক্ত হউক, কাল দেখিবে অগ্রিম টাকা লইয়া প্রকাশক তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকগণই আমার মতে অধিকতর সৌভাগ্যবান। তবে যাঁহাদের পুস্তক কোনরূপ পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা ভুক্ত হয় না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র প্রথম শ্রেণীর লেখকগণের ন্যায় তাঁহাদেরও অর্থনাশে ও মনোকষ্টে উভয়ই ভোগ করিতে হয়। তবে এই শ্রেণীর লেখকগণের অর্থোপার্জ্জন যথেষ্ট হইলেও, ইহাদের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কি উন্নতিসাধন হইয়া থাকে, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য অবশ্য বালক বালিকাগণের শিক্ষাসাহার্য্যকল্পে যে এই শ্রেণীর লেখকেরও বিশেষ আবশ্যক একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকি। বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র কিরূপ অসংখ্য পুস্তকরাশি এখন প্রতিনিয়ত মুদ্রিত করিতেছে আমি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথমেই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। আপনারা অনেকেই হয়তঅবগত আছেন—বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হয়, প্রত্যেক তিনমাস অন্তর বেঙ্গল লাইব্রেরী তাহার এক তালিকা "কলিকাতা-গেজেটে" প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন এক বৎসরের সেই তালিকা আলোচনা করিলে আমারবিশ্বাস আমাদের লেখকগণ কিভাবে কোন পথে চলিয়া ছেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ১৯০৭খ্রীষ্টাব্দের পূর্ণ তালিকা আজও প্রকাশিত হয় নাই। ত্রৈমাসিক তিনটিতালিকা অর্থাৎ ৯ মাসের পুস্তক সংখ্যার তালিকাই প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কারণ বিগত ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ণ তালিকাই আমি এক্ষণে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি সেই তালিকার প্রত্যেক শ্রেণীর সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শুনুন।

(১ম) শিল্প, শিল্প সম্বন্ধে আলোচ্য বা বিগতবৎসরে ৩০ খানি মাত্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রথম সংস্করণের পুস্তক ১৩ খানি। এইস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে এই শিল্পবিভাগ মধ্যে নৃত্যগীতবাদ্য বিষয়ক পুস্তকও সন্নিবিষ্ট আছে। দেশে স্বদেশীয় যথেষ্ট আন্দোলন চলিতেছে বটে, কিন্তু ২।১ খানি "বস্ত্র বয়ন শিক্ষা" আর একখানি মাত্র "দেশলাই প্রস্তুত শিক্ষা" পুস্তক ভিন্ন দেশীয় শিল্প সম্বন্ধে আর কোন পুস্তক গতবৎসর প্রকাশিত হয় নাই।

(২য়) জীবন চরিত। সর্ব্বসমেত ১৫ খানি জীবনচরিত গত বৎসর প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে ১২ খানি প্রথম সংস্করণের আর অবশিষ্ট ৩ খানি পুনর্মুদ্রিত। [(৩য়) নাটক। সর্ব্ব সমেত ৭৪ খানি নাটক গতবৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৬৫ খানি প্রথম সংস্করণের নামের তালিকায় দেখিলাম নাটক শ্রেণীর মধ্যে প্রহসন প্রভৃতি দৃশ্যকাব্য মাত্রেই প্রবেশলাভ করিয়াছে।

[(৪র্থ) উপন্যাস। আলোচ্য বৎসরের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ১১০। তন্মধ্যে ১৩ খানি মাত্র পুন র্মুদ্রিত হইয়াছে। তবে উপন্যাসগুলির নামের তালিকা পাঠ করিয়া বুঝিলাম ডিটেকটেভের গল্প প্রভৃতিও এই উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

[(৫ম) ইতিহাস ও ভূগোল। এই শ্রেণীর ২৬ খানি পুস্তক গত বৎসর প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে ৮ খানি প্রথম সংস্করণের। আর ১৯ খানি স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বা ভূগোল অবশিষ্ট ৭ খানির মধ্যে ৩ খানি মাত্র ইতিহাস। আমি এইস্থলে উল্লেখ যোগ্য মনে করি। (১) শ্রীরামপ্রাণগুপ্তের অনুবাদিত রিয়াজউস্ সালা তিন (২) ডাক্তার শ্রীরাম চন্দ্র প্রণীত "চট্টগ্রামের ইতিহাস।" (৩) শ্রীনিখিল নাথ রায় প্রণীত "প্রতাপাদিত্য।"

[(৬ষ্ঠ) সাহিত্য। গত বৎসরের সাহিত্য পুস্তকের সংখ্যা ১০১ কিন্তু ইহার ৯৭ খানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক। এই স্কুল পাঠ্যের মধ্যে "সচিত্র বর্ণ পরিচয়" পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছে। সুতরাং এ সাহিত্যের আর নূতন পরিচয় আমি কি দিব?

[(৭ম) আইন। আইন পুস্তক খানি প্রকাশিত হইয়াছিল মাত্র। তাহার মধ্যে ১ খানি ব্যতীত সকল গুলিই পুন মুদ্রিত।

[(৮ম) চিকিৎসা পুস্তক। মোট ৭৩ খানি প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে এলো-প্যাথিক, হোমিওপ্যাথিও আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি প্রচলিত সকল চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সকল সকল রকম পুস্তকই আছে। আবার কেবল পুস্তক নহে, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ৩৪ খানি সাময়িক পত্রও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

[(৯ম) বিবিধ। বিবিধ পুস্তকের সংখ্যা ৬৪৭ খানা। তাহার মধ্যে ১৫৮ খানা প্রথম বার মুদ্রিত। আর বিবিধ শ্রেণীর মধ্যেই অধিকাংশ বাঙ্গালা সাময়িক পত্রও স্থান পাইয়াছে দেখিলাম। সে সকল সাময়িক পত্রের সংখ্যাও অল্প নহে ৪৫৭ খানা। শিক্ষা সম্বন্ধে ২৮ খানা পুস্তকও এই বিবিধ তালিকার অন্তর্নিবিষ্ট।

[(১০ম) দর্শন শাস্ত্র। গত বৎসর দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে ৩ খানি মাত্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। সকল গুলিই প্রথমবার মুদ্রিত। সে তিন খানি পুস্তকের নাম আমরা এস্থলে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। (১) মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামখ্যা নাথ তর্কবাগীশ প্রণীত "বেদান্ত বিষয়ক প্রবন্ধ।" (২) শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ উপাধ্যায় প্রণীত "বেদান্তের অপবাদ খণ্ডন" (৩) শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত "আত্মবিজ্ঞান"।

[(১১শ) কবিতা পুস্তক। ইহাদের সংখ্যা সর্ব্ব সমেত ৯৩ খানা। তাহার মধ্যে ৮৩ খানা প্রথমবার মুদ্রিত, অবশিষ্ট ১০ খানি মাত্র পুস্তক পুনঃ মুদ্রিত হইয়াছে।

(১২শ) ধর্ম্ম পুস্তক। ইহার সংখ্যা ২১৪ খানা। আপনারা ধর্ম্ম পুস্তকের এরূপ অত্যধিক সংখ্যা দেখিয়া আহ্লাদিত বা ভীত হইবেন না। কারণ, এই সকল ধর্ম্ম পুস্তকের তালিকার মধ্যে কেবল হিন্দুধর্ম্ম নহে, মুসলমানধর্ম্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রভৃতির পুস্তকও স্থান পাইয়াছে। আবার এই তালিকায় অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টান ধর্ম্মেরই অধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। মথিলিখিত "সুসমাচার" হইতে আরম্ভ করিয়া "বালক যীশু" "তোমার ত্রাণ কর্ত্তা কে?" প্রভৃতি ২।৪ পৃষ্ঠার পুস্তক ও এই ধর্ম্মপুস্তকের তালিকা ভুক্ত করা হইয়াছে। বলিতে কি, কেবল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহেই বাঙ্গালা ভাষার ধর্ম্ম পুস্তকের তালিকার সংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধি দেখা যায়।

[(১৩শ) অঙ্ক শাস্ত্র। অঙ্কশাস্ত্র পুস্তকের সংখ্যা ১৮ খানি। প্রায় সকলগুলিই হয়-ধারাপাত না হয় পাটিগণিত। আর ১৮ খানির মধ্যে ১৭ খানি বালকগণের শিক্ষার উদ্দেশ্যেই রচিত। ইহার মধ্যে ৭ খানি প্রথম সংস্করণের, আর অবশিষ্ট গুলি পুনর্মুদ্রিত।

[(১৪শ) বিজ্ঞান। বিজ্ঞান পুস্তকের সংখ্যা ১৩ খানি মাত্র। তাহার মধ্যে ১২ খানি বালকগণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত। ৪ খানি প্রথম সংস্করণের আর অবশিষ্ট ৯ খানি পুনঃ মুদ্রিত। তবে যে অবশিষ্ট খানি বালকগণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই, সেই খানির পরিচয় এ স্থলে প্রদান করা আমি আবশ্যক মনে করিতেছি। সে পুস্তক খানির নাম-নব্য রসায়নী "বিদ্যা এবং ইহার রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক" শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

(১৫) ভ্রমণ বৃত্তান্ত। এই শ্রেণীর ৩ খানি মাত্র পুস্তক গত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে দুই খানি প্রথমবার মুদ্রিত, আর ১ খানি পুনঃ মুদ্রিত। ডাক্তার শ্রীইন্দু মাধব মল্লিক প্রণীত "চীন ভ্রমণ" প্রথমে সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গবাসী" সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়; তাহার পর পুস্তককারে মুদ্রিত হইয়াছে। আর শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত "হিমালয়" নামক এই শ্রেণীর পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ও মুদ্রিত হইয়াছে দেখিলাম।

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে আলোচ্য বৎসরে দেশ মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রোত প্রবলবেগে বহমান সত্ত্বেও কোনরূপ রাজনৈতিক পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। অর্থনীতি বা সমাজনীতি বিষয়ক কোন পুস্তকও তালিকাভুক্ত দেখিলাম না। এখন আমি বলিতে চাই-এই বেঙ্গললাইব্রেরীর প্রকাশিত

তালিকা দৃষ্টে আমাদের বর্ত্তমান লেখকগণও যে কি ভাবে কোন্ পথে চলিয়াছেন; আপনারা তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের প্রকাশিত মোট বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যা ১৫০৭ তন্মধ্যে ৭০৯ খানি প্রথমবার মুদ্রিত, আর অবশিষ্ট ৭৯৮ খানি পুনঃ মুদ্রিত। এই এক বৎসরের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা হইতে অন্যান্য বৎসরের শ্রেণী বিশেষের পুস্তকের সংখ্যাও অনায়াসে এক রকম অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে, সুতরাং পুনরুল্লেখ ভয়ে এস্থলে আর তাহা প্রদত্ত হইল না।

এইবার আমরা বাঙ্গালার পাঠকগণ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। পূর্ব্বে শিক্ষিত সম্প্রদায় অর্থাৎ ইংরাজীনবীসেরা বাঙ্গালা পুস্তক আদৌ পাঠ করিতেন না, বরং পাঠ করা সম্মান হানিকর মনে করিতেন। কিন্তু বড়ই আহ্লাদের বিষয় এই যে বাঙ্গালা সাহিত্যের সে শোচনীয় অবস্থা এখন অতীতের গর্ভে একেবারে লীন হইয়াছে, অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর ও সম্মান করিয়া থাকেন। তথাপি বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠক সংখ্যা যে যথেষ্ট নাই, অন্ততঃ লেখকসংখ্যার অনুপাতে পাঠক সংখ্যা যে নিতান্তই অল্প একথা লজ্জাকর হইলেও আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। লেখক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে পাঠক সংখ্যার বৃদ্ধি কেন যে হয় না, আমি তাহার কারণ যাহা অনুমান করিয়াছি-তাহা আপনাদিগের নিকট নিবেদনও করিতেছি। আমার মনে হয় পাঠক অপেক্ষা লেখকের সম্মান অধিক বলিয়া কেহ আর পাঠক হইতে অভিলাষী নহেন, সকলেই লেখক হইবার প্রয়াসী। আমাদের এই সাহিত্যের হাটে কেহ ক্রেতা হইতে ইচ্ছা করেন না, সকলেই বিক্রেতা হইতে কোমর বাঁধিতে থাকেন। এ অবস্থায় কোন দিন যে-হাটের দফা একবারেই রফা হইতেপারে এ কথাটা আর কেহ ভাবিয়া দেখেন না। যেমন ক্রেতা না থাকিলে কোন মতেই হাট চলিতে পারে না, সেইরূপ পাঠক না জুটিলে লেখক কখন বাঁচিতে পারে না। আমার বিবেচনায় লেখক শ্রেণীভুক্ত হওয়া অপেক্ষা যাঁহারা পাঠক শ্রেণী বৃদ্ধির চেষ্টা পান, তাঁহাদের নিকট বাঙ্গালাভাষা অধিকতর ঋণী। বটতলার নামে যিনি যতই নাসিকাকুঞ্চিত করুন নাকেন কিন্তু এখনকার প্রকাশকেরা এই পাঠক শ্রেণীর বৃদ্ধি করার দরুন অজ্ঞাতভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট মঙ্গল-সাধন করিতেছে। তুমি এক সহস্র উৎকৃষ্ট উপন্যাস মুদ্রিত করিয়া ৩।৪ বৎসরেও তাহা কাটাইতে পারিবে না, আর তাহারা অপেক্ষাকৃত একখানি নিকৃষ্ট উপন্যাস

এককালীন দশ সহস্র কাপি মুদ্রিত করিয়া এবংপরস্পর দোকানদারে দোকানদারে ভাগাভাগি করিয়া লইয়া এক বৎসরের মধ্যেই সে সংস্করণ নিঃশেষিত করিয়া ফেলিতেছে। এইরূপে অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত লোকের মধ্যে উপন্যাস পাঠ স্পৃহার সৃষ্টি করিয়া তাহারা তোমার ভাল উপন্যাসের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। আর এই বটতল ছিল বলিয়াই অনেক প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের অস্তিত্ব আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি-বাঙ্গালাভাষার সখেরপুস্তকের কাট্‌তি অল্পহয় বলিয়াই সেই শ্রেণীর লেখকগণের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছে। এখন এ পাঠকসংখ্যার বৃদ্ধি ভিন্ন সে সকল পুস্তকের কাটতি আর কিরূপে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে? এখন এই পাঠক সংখ্যার বৃদ্ধির উপায় চিন্তা করাই আমাদের বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কি উপায়ে এই পাঠক সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে পারে-তৎসম্বন্ধে দুই একটি প্রস্তাব আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। যাহাতে বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হয়, প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই সে বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি অনেক অনুসন্ধানের দ্বারা স্থির করিয়াছি—বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় চারি শত এইরূপ লাইব্রেরী ইহারই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অল্প চেষ্টা করিলেই ইহাদের সংখ্যা এক হাজারে পরিণত করা যাইতে পারে। তবে এই সকল লাইব্রেরীর সম্পাদক মহাশয়গণ যে দুস্থসাহিত্যসেবী গ্রন্থকারদিগের নিকট হইতে পুস্তক ভিক্ষা করেন, আমি সে ভিক্ষা আদৌ অনুমোদন করি না। তাঁহারা বরংসাধারণের নিকট অর্থ ভিক্ষা করিয়া গ্রন্থকারদিগের সাহিত্যের উন্নতিকল্পেপুস্তক ক্রয় করাই কর্ত্তব্য।এরূপকরিলে বাঙ্গালার যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে। নূতন ভালপুস্তক বাহির হইলে যদি এই সকল লাইব্রেরী এক এক খণ্ড সে পুস্তক ক্রয় করেন, আর ঐরূপ লাইব্রেরীর ভাগ্যক্রমে যদি অন্ততঃ এক সহস্রে দাঁড়ায়, তবে তোমার আমার প্রথম সংস্করণের এক সহস্র পুস্তক বিক্রয় হইতে আর কয় দিন লাগিবে? এইরূপ গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সাধারণ লাইব্রেরী বা পাঠাগার স্থাপনেরপর সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের গৃহে গৃহে পারিবারিক পুস্তকালয় স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের ন্যায় অনুকরণপ্রিয় জাতি বোধ হয়, এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই, আমরা প্রায়ই যে জাতির অনুকরণ করিতে যাই, সে জাতির ও গুণের অংশ এককালীন বাদ দিয়া কেবল তাহার দোষের অংশেরই অনুকরণ করিয়া

থাকি। আমরা সেই হিসাবে ইংরেজের অনেক দোষেরই অনুকরণ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের গৃহে গৃহে লাইব্রেরী স্থাপনরূপ মাতৃভাষানুরাগের এই মহৎ গুণ অনুকরণ না করি কেন? তাহার পর আমরা পাঠকগণের রুচির সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। অনেকগুলি লাইব্রেরীর পাঠকগণের দৈনিকপুস্তক প্রাপ্তিস্বীকার খাতাখানি পরীক্ষা করিয়া আমাদের মনে এই ধারণা হইয়া গিয়াছে যে বাঙ্গালা ভাষার পাঠক সংখ্যার শতকরা নব্বইজন কেবল নাটক ও উপন্যাসের পাঠক; ৫ জন কবিতা পুস্তক বা কাব্যের অনুরাগী আর অবশিষ্ট ৫ জন মাত্র অন্যান্য শ্রেণীর পুস্তক অর্থাৎ ইতিহাস, ধর্ম্ম পুস্তক বা দর্শনাদি গম্ভীর চিন্তাপূর্ণ পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে ইহা বড়ই কলঙ্কের কথা। পাঠকের অনুপাতেই লেখক। সেই কারণেই আমরা এই নাটক ও নভেল লেখকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাই। সুতরাং পাঠকগণের রুচির পরিবর্ত্তন অচিরে না ঘটিলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের সমূহ অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে।

এইবার আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচকগণ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। আমরা এস্থলে দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের আদৌ সমালোচক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্রে যে সকল সমালোচনা বাহির হইতে দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলেই সে সকল সমালোচ্য পুস্তক পাঠ না করিয়াই সমালোচনা বা প্রশংসা প্রকাশিত হইয়া থাকে। কারণ, অনেকস্থলেই অনুরোধে বা উপরোধে কেবল সুখ্যাতিই করা হইয়া থাকে, সুতরাং সে সকল সমালোচনার উপর লোকের শ্রদ্ধা একবারেই হ্রাস হইয়া যাইতেছে—দেখা যায়। এই কারণ, বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে অনেক আবর্জ্জনা ও প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং প্রতিনিয়তই করিতেছে। সুতরাং সম্মার্জ্জনী তাড়ন বা "বঙ্গদর্শনের" অগ্নি পরীক্ষার ন্যায় একটা উৎকট ব্যবস্থা অচিরে অবলম্বন না করিলে আর আমাদের উপায়ন্তর নাই। বিলম্বে মুড়ী ও মিছরীর সব এক দর হইয়া যাইবে।

এ সম্বন্ধে আমি আর অধিক কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। কারণ উপস্থিত সাহিত্যসেবী মণ্ডলীর মধ্যে অনেক সাহিত্য মহারথীকেই আমি এই স্থলে উপস্থিত দেখিতেছি। সময় অভাবে বা অজ্ঞতা প্রযুক্ত আমি এ সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে পারি নাই, আমার আবল তাবল বকা অপেক্ষা তাঁহাদের সার গর্ভ উপদেশ শ্রবণের জন্য সকলের সহিত আমিও অধিকতর ব্যাকুল হইয়া আসন গ্রহণ করিলাম।

কর্ম্মভোগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দয়ারাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কেশব চন্দ্র। দয়ারাম পল্লিগ্রামের লোক, শৈশবে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় কেশবচন্দ্রকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের কেশব সাত বৎসর বয়সে স্বভাব সিদ্ধ বুদ্ধির প্রভাবে পাঠশালার লেখা পড়ার চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করিয়াছিল। পাঠক মহাশয় ? ইহাকে যদি কেহ প্রতিভা বলিতে নারাজ না হন, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিব, কেশবচন্দ্র একটি ক্ষুদ্রতম প্রতিভা সম্পন্ন বালক, ফলকথা বয়ো বৃদ্ধি সহকারে এই প্রতিভা ক্রমশঃ তেজস্বিনী হইবে, অনুমাণে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলে নিতান্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হয় না।

প্রতিভা হইলে কি হইবে, পিতার অবস্থা বৈগুণ্যে কেশবচন্দ্রের ভাল রকম বিদ্যা শিক্ষা হইল না। অর্থাভাবে দয়ারাম তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যাদি অধ্যয়ন করাইতে পারিলেন না, আরও অধিক ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া অর্থকরী ইংরাজী পড়াইতেও পারিলেন না; কাজে কাজেই তখন গুরুমহাশয়ের পাঠশালা পর্য্যন্ত কেশবচন্দ্রের বিদ্যার সীমা হইয়া রহিল।

একাদশবর্ষ বয়সে কেশব একটি জমিদারি-সেরেস্তায় কিতাবতী কার্য্যের শিক্ষানবীশ হইয়াছিল; সে কার্য্যে নৈপুণ্য জন্মিলে, কেশব একটি পাট ব্যবসায়ী মহাজনের অধীনে গোমস্তার কার্য্য শিখিবার অভিলাষে প্রায় দুই বৎসর উমেদার ছিল, দুই প্রকার শিক্ষা নবীশির সময় ব্যতীত বাকি সময়টা কেশবচন্দ্র বৃথা কাটাইত না; ভাল ভাল পুস্তক পাঠ করিত; দাতাকর্ণ গুরু দক্ষিণা হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ মহাভারত পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করিতে শিখিয়াছিল; অনেক স্থলের অর্থও বুঝিতে পারিত; যেগুলি না পারিত, অপর কোন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া ভাব হৃদয়ঙ্গম করিত, কেশবের কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট ছিল, সেই জন্য পল্লিস্থ প্রাচীনারা এবং ধর্ম্মানুরাগিণী ভদ্র ভদ্র মহিলারা কেশবের মুখে মহাভারত শুনিতে যাইতেন।

কেশবের বয়ক্রম একুশ বৎসর। শিক্ষা নবীশিতে এবং মহাভারত পাঠে আর বেশীদিন কাটাইলে সংসার চলাভার হয়। দয়ারাম বৃদ্ধ হইয়াছেন, পূর্ব্বের মত পরিশ্রম করিতে পারেন না, তাঁহার শ্রমে যা কিছু আয় হইত, তাহাও পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে; সুতরাং কেশবের একটা কিছু বিষয় কর্ম্ম অবলম্বন না করিলে আর চলে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নায়েবী-বন্ধুলাভ।

যে গ্রামে দয়ারামের নিবাস, সেই গ্রামে জয়পাল ঘোষ নামে একজন গোপ ছিলেন, তিনি একটা পতিত আবাদী মহলের চক্‌দার। কেশবের বুদ্ধি আর শিষ্টাচার দেখিয়া জয়পাল তাহাকে ভাল বাসিতেন। আরও একটা কারণ ছিল, গরীব বলিয়া কেশবের পিতাকে তিনি মাঝে মাঝে কিছু কিছু অর্থ সাহার্য্য করিতেন, সেই অনুরোধে তাঁহার বাড়ীতে নিত্যই প্রায় দয়ারামের গতি বিধি ছিল, কাজেই ঘনিষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য বাধকতা জন্মিয়াছিল। জাতিতে গোপ হইলেও জয় পালের প্রকৃতিটি সাধারণ গোপালক গোয়ালার তুল্য অপ্রসস্ত ছিলনা, কায়স্থ ব্রাহ্মণের ন্যায় একটু মার্জ্জিত ভাব সে প্রকৃতিতে দৃষ্ট হইত। দয়ারাম একদিন কথায় কথায় কেশবের একটি চাকরির জন্য জয়পালকে পীড়া পীড়ি করিয়া ধরেন, জয় পালের সরকারে তখন কোন কর্ম্ম-খালি ছিলনা, তথাপি জয়পাল একটি অন্য উপায় করিলেন।

সেই গ্রাম হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দূরে রাধানগর গ্রামে হলধর নাগ নামে একজন জমিদার ছিলেন, তাঁহার সহিত জয়পালের বেশ বন্ধুত্ব ছিল, স্বয়ং জামিন হইতে স্বীকার করিয়া জয়পাল সেই হলধরের কাছে কেশবকে সুপারিস করিয়া ছিলেন, এক কথায় কেশবের চাকুরি হইল, হলধরের নিজ বাটীতে কেশব হইলেন সদর নায়েব।

ইতিপূর্ব্বে জমিদারি সেরেস্তার কাজকর্ম্মে কেশবের দক্ষতা জন্মিয়াছিল, ছয়মাস কাল বিশেষ দক্ষতার সহিত কেশব সেই নায়েবী কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। হল-ধরের সন্তোষ জন্মিল; দামোদর তীরে একখানি বাগান বাড়ীতে বাসাদিয়া কেশবকে তিনি বেশ আদর যত্নে রাখিলেন, মধ্যে মধ্যে বন্ধুবান্ধব লইয়া হলধর নিজেও কেশবের বাসায় গমন করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন, সেই সূত্রে হলধরের কতিপয় বন্ধুর সহিত কেশবেরও বন্ধুত্ব হইল। কতিপয়ের মধ্যে একটির সঙ্গে কিছু বাঁধা বাঁধি—পাকা রকম সম্মিলন। সেই লোকটির নাম ভোলানাথ।

হলধর এবং ভোলানাথ বাস্তবিক কোন জাতি নাগ, তাহা প্রকাশ নাই, সাত বৎসর পূর্ব্বে অন্য এক অঞ্চল হইতে আসিয়া তাহারা দামোদর তীরে বাস করিয়া-ছেন, বাক্যের উচ্চারণে তাঁহাদের কিছু কিছু জড়তা বুঝা যাইত, বেশী কথা কি, আপনাদের নামের উচ্চারণেও তাঁহারা বর্ণ বিবর্জ্জয় ঘটাইতেন। দস্তখতে কি রকম থাকিত,দেখা হয় নাই, কিন্তু মুখে মুখে পরিচয় দিবার সময় হলধর বলিতেন, শ্রীহলধর লাগ্। ভোলানাথেরও ঐ ভাব।

ভোলানাথ হলধরকে বড় বাবু বলিত, কখন বা দাদা বলিয়া ডাকিত। ভোলানাথের পরামর্শক্রমে হলধর অনেক কার্য্যই করিতেন। কেশবচন্দ্রের এক বৎসর চাকুরি করা হইল, এই এক বৎসরের মধ্যে ভোলানাথ তাঁহার পরম হিতৈষী বন্ধু হইয়া উঠিলেন, ভোলানাথের অনুরোধে কেশবের বেতন বৃদ্ধি হইল, সরকারী খরচে বেশীদামের বসন, বেশী দামের বিনামা, বেশী দামের ঘড়ি, ব্যবহার আরম্ভ হইল, ভোজন শয়নের ব্যবস্থাও প্রায় ছোট খাট নবাবী ধরণে দাঁড়াইল। হায়, হায়! কালস্য বিচিত্রা গতি? ভোলানাথের মোসাহেবীর বেগবতী নদীতে ভাঁটা আরম্ভ। হলধর দিন দিন কেশবচন্দ্রের একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িলেন।

হলধরের বাহ্য চরিত্র মন্দ ছিলনা, গুপ্ত চরিত্রে দোষ ছিল, তন্মধ্যে একটি দোষ অত্যন্ত প্রবল। বাগান বাড়ীর অর্দ্ধক্রোশ পশ্চিমে এক বারবনিতাকে তিনি নবনায়িকা নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, তাহার নাম মেঘমালা, মুখখানি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই ঐ নাম। মোসাহেব ভোলানাথ সেই মেঘমালার বাড়ীর দেওয়ান ছিল। বাজার করিত, মাছ ধরিয়া দিত, গরুবাছুরের বিচালী কিনিয়া আনিত, মাসে দুইবার স্বর্ণকারের বাড়ীতে অলঙ্কারের জন্য তাগাদা করিত, দামোদর স্নানের পাল্কি ডাকিয়া দিত, ভাল ভাল কাপড় আনাইয়া পচ্ছন্দ করাইত, আর কত কি করিত, মোসাহেবী কার্য্যের তালিকা আমাদের কাছে না থাকাতে বিশেষ করিয়া সকল কথা বলিতে পারা গেল না, হলধর প্রতিদিন রাত্রি দশ টার পর একখানি পাল্কি চড়িয়া মেঘমালা দর্শনে যাইতেন, উষাকালের পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিতেন। এক এক রাত্রে ভোলানাথও তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

কেশবের অসাক্ষাতে হলধর একদিন ভোলানাথকে বলিলেন, ভাই, ভোলানাথ নবীনের নৌকা খানা ভাড়াকর, মেঘমালাকে নিয়ে ঠাকুর দর্শনে যেতে হবে, তুমিও আমাদের সঙ্গে থাকিবে, ঠাকুর দর্শনের লেগে, মেঘমালার বড় ঝোঁক, কাল রাত্রে অনেক কেঁদেছে, তোমার নামে অনেক অভিমান ঝেড়েছে। বলে কি, ভোলা দাদা আমার কথা শোনে না নাওয়া খাওয়ার পরেই নবীনের নৌকা খানা তুমি নিয়ে এস।”

ভোলানাথের বদন বিমর্ষ হইল। মেঘমালা বলেছে, ভোলা দাদা কথা শোনে না সেই কথা শুনিয়া ভোলানাথের মনস্তাপের ঘনীভূত বাষ্প তাহার দুই চক্ষু দিয়া তরল স্রোতে বহিতে লাগিল। মনস্তাপের আরও একটা কারণ আছে, সেটা

আপাতত অপ্রকাশ। বড় বাবুর আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল, নবীনের নৌকা করিয়া তিন জনে ঠাকুর দর্শন করিয়া আসিলেন, মেঘমালা তখন খুসী হইয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "আহা, বাবুগো তোমাতে আমাতে ঠিক এক, তোমার নামটি হলধর না হয়ে, জলধর হলেই আরও ঠিক হত, আমি মেঘমালা, তুমি জলধর, নামে নামে বেশ মিলে যেত।"—বাবু বলিলেন "নাভাই, না, তা হত না—আমার নাম যদি জলধর হয়, তোমার নাম তাহলে বিদ্যুৎমালা হওয়া চাই।"

এক নাম রহস্তে উভয়েই তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। একটু পরেই চক্ষে একটু জল আনিয়া অর্দ্ধস্তম্ভিত মিহিস্বরে মেঘমালা বলিল, ভোলানাথটা আজকাল আমার বড় হেনস্তা করে, যেটি বলি, সেইটিতেই মাথা নাড়া দেয়। যদিও বা রাজি হয়, দুই তিন মাসেও কাজের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। বাবু বলিলেন, থাক দশ দিন চুপ করিয়া, ভোলানাথের আয়ুশেষ হইয়া আসিতেছে। কেশব বাবুর হিংসা করে; কেশব বাবু আমার মঙ্গল চান, তাঁহার উপদেশে আমি কাজ করি, ভোলানাথ সেই জন্য মনে মনে বড় চটা। সব আমি বুঝিতে পারি- থাক দশ দিন, নিশ্চয় জানিও, কেশবের শত্রু নিশ্চয়ই আমরাও শত্রু।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কেশবের বিবাহ।

যে সময়ের কথা, সে সময়ে আমাদের বিবাহ বাজারে এত আগুণ লাগে নাই, হায়েষ্টবিডারে বর বিক্রয় হয় নাই, নানা জাতীয়া ঘটকী বাহির হয়, গৃহস্থ লোকের কুল মজাইবার জোগাড় করিতে আরম্ভ করেন নাই, বাবু হলধর নাগ স্বত প্রবৃত্ত হইয়া কেশবচন্দ্রের বিবাহ দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কেশবের তিন বৎসর চাকরি করা হইয়াছিল, তিন বৎসরের টাকায় বাস গ্রামে একখানি একতলা বাড়ী করা হইয়াছে, একটি ফলকর বাগান জমা লওয়া হইয়াছে, বাড়ীতে একজন দাসীও নিযুক্ত করা হইয়াছে, পরিবার বেশীনয়, মাতাপিতা আর একটি সধবা ভগ্নি মাত্র, খরচ পত্র বেশী হয় না, কিছু কিছু জমে বিশেষতঃ বাড়ী করিবার ইট কাট হলধর বাবু দিয়াছেন। বিবাহের গহনাও হলধর বাবু চার পাঁচ খানি দিবেন বলিয়াছেন, এই সময় বিবাহ হওয়া ভাল, কেশব তাহা বুঝিলেন, অল্প অনুসন্ধানে একটি সুন্দরী কন্তা পাওয়া গেল, বিবাহের দিনস্থিরও হইল এক পক্ষ পরে বিবাহ।

বাবু ভাল বাসেন বলিয়া মোসাহেবেরাও কেশবের মনোরঞ্জনের চেষ্টা পায়। বিশেষতঃ ভোলানাথ এই বিবাহের উৎসবে ভোলানাথ এক একদিন কেশবের বাড়ীতে গিয়া ফর্দ্দ করা, বাজার করা, ব্যবস্থা করা এবং কর্ত্তার সঙ্গে গল্প করার ইত্যাদি নানা কার্য্যে তোষামোদ করিয়া আইসে। বাড়ীর সম্মুখের জঙ্গল পরিষ্কার করা, রাস্তার খানিক দূর পর্য্যন্ত মাটি ফেলা, দরজা এবং বাহিরের ঘর মেরামত করা বড় আবশ্যক, কর্ত্তাকে এইরূপ পরামর্শ দেয়, কোন্‌দিকে সামিয়ানা খাটাইলে ভাল মানাইবে, কোনদিকে আলো ঝুলাইলে সবদিকে আলো খুলিবে, সে বন্দোবস্তের ও পরামর্শ দাতা ভোলানাথ। কর্ত্তা গৃহিনীতে বুঝিলেন, ভোলানাথ একজন কেশবের পরম হিতৈষী বন্ধু। গৃহস্থ লোকের পুত্রের বিবাহে বেশী জাঁক জমকে বাড়ী সাজাইবার আবশ্যক হয় না, পরামর্শ সময়ে সেটা কেহই বুঝিলেন না।

বাবুর কাছেও ভোলানাথ সর্ব্বদা কেশবের গুণ কীর্ত্তন করে। কেশব আসিয়া অবধি, কেশবের বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় পাইয়া অবধি হলধর বাবু তাঁহার সহিত যুক্তি করিয়াই সংসারেরও বিষয় কর্ম্মের সকল কার্য্যই করেন, ভোলানাথ ইতিপূর্ব্বে এই সকল মন্ত্রনায় সর্ব্বে সর্ব্বাছিল, এখন পদে পদে তাহার মন্ত্রনা ভাসিয়া যায়, ভোলানাথ এখন কেবল মেঘমালার দেওয়ানী কার্য্যেই প্রায় অবিচ্ছেদে নিযুক্ত। ভোলানাথ যখন নির্জ্জনে একাকী থাকে, তখন মনে মনে কেবল ঐ সব কথাই ভাবে, কেশবের ক্ষমতার উপর হিংসা হয়। কার্য্যে কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। অবশ্যই করিবে, মনে মনে কিন্তু সর্ব্বক্ষণ এই দৃঢ় সংকল্প।

বিবাহ হইয়া গেল। আহ্লাদ আমোদ যতদূর হইবার, অবস্থানুসারে তাহাও কিছু বাকি রহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গুপ্তচক্র।

কেশবের বিবাহের পর একবৎসর অতীত। কেশব মধ্যে মধ্যে বাড়ী যান, দুই পাঁচ দিন কামাই হয়, ঠিক যোগাড় হইতেছে ভাবিয়া ভোলানাথ মনে মনে আনন্দ অনুভব করে। বাবুকে কিছুই বলে না; বলে বরং "আহা, কেশব বাবু না থাকিলে সেরেস্তা মানায় না, ঘরবাড়ী মানায় না, কাজ কর্ম্মেও অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটে।" বাবু দুই তিনবার মস্তক সঞ্চালন করিয়া "হুঁ" দেন।

দুর্গাপূজার ছুটীতে একমাস বাড়ীতে থাকিয়া কেশবচন্দ্র কার্ত্তিক মাসের শেষে

কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইলেন। পাঁচ সাতদিন আছেন, ইতিমধ্যে একদিন বৈকালে বাগানের একটা পুষ্করণীর ধারে সাত আট খানা চেয়ার পড়িল, তিন চারিটা বাঁধা হুঁকা আর বৃহৎ লাঙ্গুল বিশিষ্ট একটা রূপার আলবোলাও আসিয়া বসিল। ক্ষণেকের মধ্যে চেয়ারগুলি মনুষ্য কলেবরে পরিপূর্ণ, আলবোলার সমুখের চেয়ারে বাবু। বাবুর দক্ষিণ ভাগে ভোলানাথ। কেশববাবু তখন আপানার সেরেস্তায় বসিয়া এক মহলের গোমস্তার হিসাব নিকাশ দর্শন করিতেছিলেন, ডাক পড়িল। হাতের কাজ মুলতুবী রাখিয়া কেশবচন্দ্র শীঘ্র শীঘ্র পুষ্করিনীর ধারে দেখা দিলেন। সমস্ত আসন জোড়া, বসিবার স্থান নাই, কেশব সুতরাং একটি চাঁপা ফুলের গাছ ঠেস্ দিয়া প্রসন্ন বদনে দাঁড়াইলেন।

ভোলানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল, বাবুর কানে কানে কি বলিয়া অতি দ্রুত পদে বাগান হইতে বাহির হইয়া গেল; বাবুর অভ্যর্থনায় কেশবচন্দ্র সেই শূন্য আসনে বসিলেন। পূর্ব্ববৎ দ্রুতবেগে ভোলনাথ ফিরিয়া আসিল। বাবুর মুখের কাছে হেঁট হইয়া দাঁড়াইয়া, কেহ শুনিতে পায়, কেহ বা পায় না, এইরূপ উচ্চ অনুচ্চ "কণ্ঠে বলিল" শুনে প্রাণ চোম্‌কে যায়! চুরিনয় ডাকাতি, নগদ টাকা ও গহনা পত্র সব সরাইয়াছে, তহবিলে মাগীর যত টাকা ছিল, সর্ব্বস্ব লুটেনিয়ে গিয়েছে! বাপ্‌রে বাপ্‌ এমন চুরি, এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড আমার—"

কেশবচন্দ্র নিকটেই ছিলেন, সমস্ত কথাগুলি তাঁহার কর্ণে গিয়াছিল, শুনিতে শুনিতে চমকিয়া বাধা দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়? কাহার? কি ব্যাপার?—কেহই কিছু উত্তর দিল না। এত আদরের কেশব, সে সময় বাবু একবার সেই কেশবের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না; মুখখানি ভারি করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভীষণ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কেশবের প্রাণ কেমন করিতে লাগিল। ভাবার্থ কিছুই বুঝা গেল না, তথাপি কেশবচন্দ্র কাতর,—অত্যন্ত কাতর। অগ্রহায়ণ মাসের আরম্ভ প্রায় সন্ধ্যাকাল সমাগত, এই শীতকালের শেষ বেলায় কেশব চন্দ্রের কপালে ও কণ্ঠে ঘর্ম্মধারা ঝরিতে লাগিল; তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; সহসা উঠিয়া ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে সরাসর দক্ষিণ দিকে বেড়াইতে চলিলেন; বাগান হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কেহই কিছু বলিল না।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। শুক্লপক্ষ ছিল, আকাশে চাঁদ উঠিল, হলধর বাবুর ফুল বাগানটি শশী কিরণে হাসিতে লাগিল, কেশবচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। বাগানে

কেহ কোথাও নাই। চেয়ার গুলি আর হুঁকাগুলি সেইখানেই পড়িয়া আছে। কেশবচন্দ্র অন্যমনস্ক। কৌমুদী খেলা করিতেছে, ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সুবাসে চারিদিক আমোদিত করিতেছে চঞ্চল মনে যদি কিছু শান্তি আইসে, এই ভাবিয়া কেশবচন্দ্র ফুলগাছের ধারে ধারে ধীরে ধীরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কেহ কোথাও নাই।

অল্পক্ষণ পরে পশ্চাৎভাগে কিঞ্চিৎ দূরে দুইজন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইল। একজন বলিল, "পাকা বদমাস্ বর্ণচোরা"—দ্বিতীয়স্বর বলিল, "ভয়ঙ্কর বদমাস্! বেঁধে ফেল।" প্রথমস্বর আবার বলিল, "এখন না। সকালে সকলের সাক্ষাতে ধরিয়া পুলিশে দিব।"

চকিত চমকে পশ্চাতে ফিরিয়া কেশবচন্দ্র দেখিলেন, বাবু আর ভোলানাথ; একটু নিকটে আসিলে কেশব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?" গম্ভীর বদনে বাবু বলিলেন, "হুঁ।"—ভোলানাথের সঙ্গে বাবু গিয়া ঘরে উঠিলেন, কেশবকে ডাকিলেন না। ঘরের ভিতর হইতে যেন কতই আহ্লাদে গদা, গদা, গদা! বলিয়া তিনবার চীৎকার উঠিল, গদা আসিয়া আল-বোলাতে আর একটা হুঁকাতে তামাক ভরিয়া দিল, আলবোলার গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাবুর আর মোসাহেবের বিকট হাস্য কোলাহল মিশ্রিত গিরিশ চন্দ্রের সঙ্গীত কোলাহল আকাশ মার্গে পশিল। কেশবচন্দ্র তখনও ফুলবাগানে, তখনও কেমন এক রকম অন্যমনস্ক, "ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা ক্যায়া রং বেদম্।" গিরিশচন্দ্রের এই গীতটি ধরিয়া মিহি মিহি থিয়েটারের সুরে বৈঠক খানার মুক্তদ্বারা এত উচ্চ আমোদ করিল, এত উচ্চ হাস্য করিল যে,কেশব চন্দ্রের চমক ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি চঞ্চল পদে গৃহ মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। ঘননাদে হঠাৎ একটা গম্ভীর শব্দ হইলে রজনীর ঝিল্লীরব যেমন ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হয়, কেশবের প্রবেশ মাত্র গায়ক দুটির সঙ্গীত ধ্বনি সেইরূপ নিস্তব্ধ হইল। কেবল তাহাই নহে, গায়কেরা তথা হইতে উঠিয়া গেলেন কেশবচন্দ্র একাকী।

কেশবচন্দ্রের অসুখ। কেশবচন্দ্র সে রাত্রে কিছুই আহার করিলেন না, কেহ আসিয়া শয্যা পাড়িয়া দিবে, সে অপেক্ষাও রাখিলেন না, জাজিমের উপর শক্ত বালিসে নিঃশব্দে শয়ন করিলেন; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না; খানিক পরে গদা আসিয়া হুঁকা আলবোলা লইয়া গেল, ফুঁৎকার দিয়া বসা-সেজের বাতি-টাও নিবাইয়া দিল। কেশবচন্দ্র অন্ধকারে অনাহারে শুইয়া রহিলেন। নিদ্রা হইল না, সমস্ত রাত্রি এপাশ ওপাশ করিয়া ভোর বেলা একটু ঘুমাইলেন; উঠিতে বেলা হইল; উঠিয়াই দেখেন, ঘরের ভিতর রৌদ্র আসিয়াছে, দ্বার দেশে চৌকা-টের বাহিরে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক, সাহেবীধরণের পোষক পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুর্গা নামে স্মরণ করিয়া কেশবচন্দ্র ভাবিলেন, প্রাতে উঠিয়াই অপরিচিতের মুখ দেখিলাম, না জানি কপালে আজ কি আছে।

চক্ষু মার্জ্জন করিয়া কেশবচন্দ্র চৌকাটের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, একখানা হাত লম্বা করিয়া বাড়াইয়া দিয়া অশুদ্ধ হিন্দিতে বাবুটি বলিল, "বড় জ্বর। দেখ দেখি আমার হাতখানা, এখনও জ্বর আছে কিনা ?"—কেশব উত্তর করিলেন, আমি ডাক্তার নহি, আমি হাত দেখিয়া কি করিব ?" পকেট হইতে ছোট একখানা পকেট বুক বাহির করিয়া, পাতা উল্টাইয়া, বাবুটি একবার হাঁসিল, তখনি আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, "স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে, ডাক্তার কেশবচন্দ্র চাটার্জ্জি। তুমি বলিতেছ ডাক্তার নহি। ঝুটবাত।" এই বলিয়াই বাবুটি হাসিতে হাসিতে উদ্যান পার হইয়া গেল।

বেলা দশটা। কেশবচন্দ্র কাছারীঘরের বারাণ্ডায় একটি থাম ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কেহই নিকটে আসিতেছে না; কেহই কথা কহিতেছে না, বাগানটা পর্য্যন্ত যেন নীরব, মলিন অবসন্ন। এই সময় আর একটা বাবু আসিল, কৃষ্ণবর্ণ বাবুটি কটি-তটে গুল্‌ফ পর্য্যন্ত পঁচা পেন্টুলেন, অঙ্গে একটা দাগ ধরা ময়লা কামিজ। কেশবকে দেখিয়া লোকটা বলিল, "দুদিন খাওয়া হয় নাই, একসের চাল্ একসের ডাল। দোহাই ডাক্তার বাবু! সেলাম ডাক্তার বাবু।"

ঠিক সেই সময়ে হলধর বাবু স্নান করিয়া রুদ্রাক্ষ জপিতে জপিতে বাগানের একধারে দেখা দিলেন, যেখানে কেশব, তাহার প্রায় পাঁচ হাত তফাতে দাঁড়াইয়া বাবুটিকে দেখিয়া সহসা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি আবার কি বলেন ?"

কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বুঝিতে পারা গেল না, কিন্তু কেশব উত্তর করিলেন, "ইনি সিঁধে চান খিচুড়ী খাবেন।" বিরক্ত ভাবে শীঘ্র শীঘ্র রুদ্রাক্ষ ঘুরাইয়া, বাবুটির দিকে চাহিয়া, হলধর বাবু কহিলেন, "এখানে কিছু হবেনা, মশায় পন্থা দেখ কুকুর আছে।"

কেশবের দিকে চাহিয়া বাবুটি কহিল, "ডাক্তার বাবুর বড় দয়া। কেশব লাল ডাক্তার খিঁচুড়ী না হয় গোটা কতক পয়সা পেলেও বাজারে গিয়ে খান্‌দুই পাঁউরুটি আর এক গেলাস—"

ভাব কিছু বুঝিতে না পারিয়া কেশব মনে করিলেন, একি তামাসা। দুইটা লোক ডাক্তার ডাক্তার বলিল। ইহারা কাহার অন্বেষণ করে। কেশব এইরূপ ভাবিতেছেন, বাবু আবার পূর্ব্বরূপ মিষ্টবাক্যে সাহেব বেশী বাবুকে বিদায় হইতে বলিয়া অন্যদিকে সরিয়া গেলেন।

কেশবের দিকে চাহিতে চাহিতে সাহেব বেশী বাবুটিও বাহির হইয়া গেল, ভোলানাথ আসিয়া কেশবকে বলিল, "কেশব বাবু! নাইতে যাবে? মাথাটা গরম হয়ে আছে, চুলকটা ফেলেদিয়ে এক শিশি "স্বর্গীয় পরিমল তৈল" মাখো।"

এ কথাতেও কেশবের মনে আরও খট্‌কা বাড়িল। কেন এরা এরকম কথা বলে, সাহেবিপোষাক পরা বাবুটি কেনই বা ডাক্তার বলিয়া গেল, কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

তিনি না পারুন, আমরা যেন একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি। কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি কিংবা কোন প্রকার গুপ্ত চক্র। একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে রামায়ণ কথা হইতেছিল, বালী রাজার পুত্র অঙ্গদ শূন্য পথদিয়া রাবণের সভায় প্রবেশ পূর্ব্বক কথক ঠাকুরের মুখ দিয়া "রাভন্ রাভন্" সম্বোধন করাইলেন। রাবণের মন্ত্রিরা অঙ্গদকে র্ভৎসনা করিয়া বলিলেন, "রাভণকে? রাভণ কেহ নাই।" অঙ্গদ বলিলেন, "সেকি? বংশেই ভুল? কুম্ভকর্ণে ভকারাস্তি ভকারাস্তি বিভীষণে, বয়ঃজ্যেষ্ঠ কুলশ্রেষ্ঠ ভকার নাস্তি রাবণে?"

ইহার অর্থ এই যে, রাবণের তিন ভাই কুম্ভকর্ণে ভ আছে, বিভীষণে ভ আছে, কুল শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সহোদর রাবণের নামে ভ থাকিবে না কেন?

এখানে এই দৃষ্টান্তটি বোধ হয় ঠিক লাগে। বাবুটি বোধ হয় কোথাও কোন কেশব ডাক্তারের নাম শুনিয়া থাকিবে, তাহারা বোধ হয় ভাবিয়াছে, যেখানে কেশব, সেই খানেই ডাক্তার। অন্য কেশব যদি ডাক্তার হয়, হলধরের কেশব তবে ডাক্তার হইবে না কেন?

সমস্যা যাহাই হউক, নাপিত ডাকাইয়া ভোলানাথ তৎক্ষণাৎ কেশবকে বল পূর্ব্বক নেড়া করিল; এক শিশি "স্বর্গীয় পরিমল তৈল" সেই নেড়া মাথায় ঢালিয়া দিল; হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া দামোদরস্নানে লইয়া গেল। স্নানান্তে বাগানে আসিয়া কেশব বাবু কাপড় ছাড়িবার কাপড় পান না। নিত্য যাঁহার দশ জোড়া ধোপ্ দাস্ত কাপড় স্তরে স্তরে সাজানো থাকে, একখানি কাপড়ের জন্য তিনি বার বার ব্যগ্রতা জানাইলেন, চাকরেরা বাহির হইল না, ঘরের ভিতর বসিয়া হাস্য কৌতুক করিতে লাগিল। গদা একটু চীৎকার করিয়া বলিল, "কেশব বাবু-কেশব বাবু, আর কেন কেশব বাবু? কেশব বাবুতো হয়ে গেছে।"

বাবু আসিলেন। রঙ্গ দেখিয়া বলিলেন, "না থাকে যদি, তোদের একখানা কাপড় এনে দেনা।" গদা তখন একখানা আট হাতি ময়লা মোটা কাপড় আনিয়া কেশবের হাতে দিল। আট জায়গায় তালি দেওয়া। তাহাই পরিধান করিয়া কেশব লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বসিলেন। ভোলানাথ স্বহস্তে পাঁচটা ডাব নারিকেলের মুখ কাটিয়া ঘন ঘন তাঁহাকে জল ঢালিয়া খাওয়াইল। পেটে ধরে না, তবু দেয়। তাহার পর আহারের আয়োজন। নিত্য নিত্য কেশব বাবুর আহারের যেরূপ বন্দোবস্ত, সে দিন আহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কলাপাতে মোটা ভাত, তাহার সঙ্গে কেবল এক পুঁইশাক চিংড়ি। আর কিছুই না—কিছুই না—কিছুই না।

কেশবের আহার হইল না। উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া নীরবে অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে তিনি আপন শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বেড়া আগুণ !

রাত্রি প্রায় দশটা। মেঘমালার ঘরে হলধর আর ভোলানাথ। হলধরের মুখখানা ভারি ভারি ভোলানাথ কিন্তু সেদিন হাসি হাসি মুখে বিলক্ষণ চালাক চতুর।

কথায় কথায় অকস্মাৎ মেঘমালা একবার জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের সেই কেশবের নামে কিনা কি, একটা চুরির বদনাম উঠেছে? কি রকম চুরি? কত টাকা চুরি?

হলধর বলিলেন, সে কথার উত্তর পরে দিব, এখন যে কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার জবাব আগে কর। "সেই কেশব" এ কথাটা তুমি কেমন করিয়া জানিলে? তবে কি তুমি কেশবকে দেখিয়াছ না কি?

হাস্য করিয়া মেঘমালা বলিল, আহা! দিব্য সুশ্রী, দিব্য মুখ, কেমন খঞ্জনের মতন দুটি টানাটানা চোক, দিব্য সুন্দর যুবা পুরুষ।

হল।—কবে তুমি কি রকমে কোথায় কোন সময় কেশবের সঙ্গে দেখা করিয়াছ?

মেঘ।—ভোলানাথ তাহাকে একদিন এখানে আনিয়াছিল, দিন মানে নয়,—ঠিক সন্ধ্যার পর, তুমি আসিবার অনেক অগ্রে। আহা! রূপ খানিও যেমন, কথা গুলিও তেমন সুমিষ্ট।

হলধর এই সময় একবার কোপ নয়নে ভোলানাথের দিকে চাহিয়া ছিলেন, ভোলানাথ তখন এক দৃষ্টে কেবল মেঘমালার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, মেঘমালাও আড় নয়নে ভোলানাথের মুখের দিকে কটাক্ষ বর্ষণ করিতেছিল।

হৃদয়ানলকে সম্পূর্ণ রূপে নির্ব্বাপিত করিতে না পারিয়া, হলধর একটু উগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "উঃ—। ভয়ঙ্কর চুরি? ভয়ঙ্কর চুরি তহবিল তছরূপ সঙ্গে সঙ্গে বাক্স ভাঙ্গিয়া গহনা ও নগদ টাকা? ভয়ঙ্কর ব্যাপার! মানুষ চেনা বিষম ভার ভোলানাথের দিকে চাহিয়া এই ভোলানাথ সব জানে; সকলের মুখেই শুনিতেছি, আমি কেবল এখন জান্‌তে পাচ্ছি লোকটা ভয়ঙ্কর বদ্‌মাস্‌!

ভোলানাথ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল, উভয়ের আলাপের একটি কথাও তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল কি না, বুঝা গেল না।

নিশ্বাস ফেলিয়া দুই কর্ণে হস্তার্পণ করিয়া, কাতর কণ্ঠে মেঘমালা বলিল, "ওমা! এই সব কলঙ্ক কেশবের নামে! রাধা মাধব, রাধা মাধব! আচ্ছা বাবু! তুমিত একজন জ্ঞানী লোক, বিজ্ঞ লোক, প্রেমিক লোক, তোমার কি ঐ সকল মিথ্যা কথায় বিশ্বাস হয়? কখনই না কখনই না! চেহারায় আমি দেখেছি, কোন প্রকার দুষ্কর্ম্মের উত্তেজক লক্ষণ সে অঙ্গে কিছুই দেখি নাই। তোমাদের শাস্ত্রেও আছে, যাহার যেমন চেহারা, তাহার চরিত্রও তদনুরূপ হয়। মিথ্যা মোকদ্দমা! নাহয় ত একটা বিষম ভুল! কাহার নাম ধরিতে আর একটি

নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক বিনম্র ভদ্র সন্তানকে ধরিবার কুচক্র সৃষ্টি হইয়াছে। কেশব কখনই অতি সামান্য দোষেও দুষি হইতে পারেন না।

হলধর বাবু দুই তিন রকমে প্রতিবাদ করিবার প্রয়াস পাইয়া, মেঘমালার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উত্তরে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ভোলানাথও যেন একটু বিষন্ন হইয়া, একটি ধারে চুপ্টি করিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রি দুই প্রহরের পর ভোলানাথের বিদায়; বাবু সে রাত্রে প্রাত পাঁচটা পর্য্যন্ত মেঘমালার গৃহেই যাপন করিলেন, পর দিন দিবাভাগে কেশবচন্দ্র অতি হীনাবস্থায় যে গৃহে আবদ্ধ আছেন, সেই গৃহে বসিয়া বারম্বার তিনি শুনিয়াছিলেন দূরে দূরে বহু লোকে অতি উচ্চকণ্ঠে চোর চোর চিৎকারধ্বনি করিয়াছে; ভাবার্থ তিনি কিছুই বুঝিলেন না, কি কারণে আবদ্ধ তাহাও জানিলেন না, অথচ বিষম বিভ্রাট!

হলধর বাবু সেই দিন অপরাহ্নে কেশবচন্দ্রের আবাস গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কেশবের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার কেমন এক প্রকার অদ্ভুত আনন্দ জন্মিয়াছিল, তিনি মৃদু হাসিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "হায়রে ভাগ্য তোমার এই কর্ম্ম! আমরা ভাবিয়াছিলাম, তিনি যেন একটি দেব কুমার, হায় হায়, হায়! থাক কিছু দিন!" পাঁচ বৎসরের কম নয়!

এই শেষ কথাটি বলিয়াই বক্র বদনে হাসিতে হাসিতে হলধর বাবু তথা হইতে বাহির হইলেন, পর ক্ষণেই চতুর্দ্দিকে পুনর্ব্বার চোর চোর চিৎকার ধ্বনি উত্থিত হইল, মধ্যে মধ্যে শশ্মানের সুরে হরি, হরি বোল ধ্বনি, সময় সময় বিরাট গর্জ্জনে শিস্ দেওয়া। রাত্রি কালেও দূরে দূরে ঠিক সেই প্রকার চিৎকার ধ্বনি বারম্বার কেশব চন্দ্রের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিয়াছিল।

সাত দিন সাত রাত্রি এই ভাবে গত হয়, ক্রমশই যন্ত্রনার বৃদ্ধি। দিবা রাত্রি চতুর্দ্দিকে বিকট স্বরে চোর চোর শব্দ, এক লহমাও বিরাম নাই, পলক মাত্রও মনো মধ্যে শান্তি নাই, তাহা উপর আর এক উপদ্রব। কেশবচন্দ্র যে ঘরে আছেন, সেই ঘরের চারিদিকে বারাণ্ডা আছে। কেশব চন্দ্র শয়ন করিয়া থাকুন, আর বসিয়াই থাকুন, কিংবা দাঁড়াইয়া থাকুন, দিব্য শুনিতে পান, দুই তিনজন লোকে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতেছে, হাস্য করিতেছে, দর্প করিতেছে, ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছে, "কেশব বাবুকে হাত বাঁধিয়া বিলক্ষণ পিটন দিতে হবে; আর একজন বলিতেছে, হাত বাঁধিবার দরকার কি? সাচ্চা রকম পিটনে হাত বাঁধার দশগুণ কাজ হয়ে যাবে, পিটন দিবার জন্য বাবুদের ফুল বাগানে নানা রকম পীড়ন যন্ত্র থাকিবে; এরূপ পরামর্শ কেশব চন্দ্র প্রায় সর্ব্বক্ষণ শ্রবণ করেন; সময় অসময় নাই, ঊষাকাল হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বদাই নানা প্রকার ভয়ঙ্কর ভয় প্রদর্শক ভীষণ ভীষণ পরামর্শ।

দোহারা যন্ত্রণা। বাহিরে বাজে লোকের উল্লাস ধ্বনি কতক লোকের মুখে চোর চোর ধ্বনি, কতক লোকের মুখে হরিবোল ধ্বনি, ঘরে কুচক্র মন্ত্রণায় প্রচণ্ড পাবক; এই চারি প্রকার অনলে কেশব চন্দ্র দিবা রাত্রি দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

কাণ্ড ত এই প্রকার, কিন্তু আসল ঘটনাটা যে কি, কোথায় যে কি, কেশব চন্দ্র তাহা তাঁহার কিছুই জানেন না। মনে মনে তিনি দুই তিনবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, স্বয়ং কোন ভদ্র লোকের নিকটে উপস্থিত হইয়া মিথ্যা সন্দেহে নির্দ্দোষীর উপর উৎপীড়ন নিবারণের চেষ্টা পাইব, কিন্তু কি বলিয়া হাজির হইব? কোথায় কি কাণ্ড হইয়াছে, বিন্দু বিসর্গও জানেন না, ভদ্রলোকে বলিবেন কি? চীৎকার করিয়া আমাকে চোর চোর বলিয়া ত্যক্ত করে, তুমি বারণ করিয়া দাও, কেবল এই দুটি কথা বলিলে, সকলে হাস্য করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিবেন, শুনিয়াছে অনেকে, কিন্তু আমি সাক্ষ্য মানিলে কেহই সত্য কথা বলিবে না।

অসহ্য হইয়া উঠিল। আশ্রয় শূন্য মরুভূমে অস্পষ্ট আগুনের প্রখর উত্তাপ কেশব চন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না। আহারে রুচি নাই, নিদ্রাও প্রায় দূরাগত, মনের স্থিরতা ক্ষণমাত্র নাই, এ যন্ত্রণা জীবন্ত শরীরে যথার্থই অসহ্য। কারণ জানিলে বরং প্রতিকারের উপায় হয়, এই জটিল ষড়যন্ত্রে কেশবের ভাগ্যে তাহাও সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। প্রহার দিতে বলিয়া হলধরের মোসাহেবের নিত্য নিত্য ভয় দেখায়, প্রহার দিলেও দিতে পারে, সেখানে রক্ষা কর্ত্তা কেহ নাই কেশব অত্যন্ত চঞ্চল হইলেন, তাঁহার পিতা সংবাদ পাইলেন, কর্ম্মদিবার মুরুব্বি জয়পাল ঘোষ সংবাদ পাইলেন, কেশবের পিতাকে লইয়া জয়পাল আসিয়া হলধরের উদ্যানে উপস্থিত হইলেন, গোপনে হলধরের মুখে, ভোলানাথের মুখে, সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন, বিশ্বাস হইল না, তথাপি গতিক বুঝিয়া হায়, হায়! করিতে লাগিলেন, কেশবের বৃদ্ধ পিতা বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পরামর্শ হইল, কেশবকে গৃহে লইয়া যাওয়া। হলধরের ইচ্ছা ছিল না কেশবকে ছাড়িয়া দেন, জয়পালের নির্ব্বন্ধে এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ক্রন্দনে অগত্যা অনিচ্ছায় তাঁহাকে রাজি হইতে হইল। সেই দিন বৈকালে কেশবকে লইয়া কেশবের পিতা গৃহে গমন করিলেন।

সেখানেও ঠিক তাহাই। লোকেরা যেন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, কেশব গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র বাড়ীর চতুর্দ্দিকে বিকট চিৎকার ধ্বনি, ঘন ঘন গঙ্গা যাত্রার হরিধ্বনি সমুত্থিত হইল। বিরাম রহিল না। ক্রমাগত পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি এই রকম। প্রতিবাসীরা বাহিরে বাহিরে কেশবকে ভাল বাসিতেন, অন্তরে অন্তরে ইদানীং কেশবের উপর তাঁহাদের হিংসা হইয়াছিল। অন্তরালে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহারা "ধরিয়া আন্, টানিয়া আন্ বাঁধিয়া আন্" ইত্যাদি বাক্যে ফাঁকা ফাঁকা হুকুম দিতে লাগিলেন। যাঁহারা কিছু সম্পন্ন লোক তাঁহাদের আরও জোর হুকুম। কিছুই তাঁহারা জানেন না, কৈ হিংসার উত্তেজনায় হিংস্র লোকেরা নিরীহ কেশবের ঘোরতর বৈরী। কেশবের পিতা গরীব, খরচের অভাবে কেশবের ইংরাজী পড়া হয় নাই, এ বাজারে যাহাদের ইংরাজীরাজ ভাষা শিক্ষা হয় না, অন্য ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও তাহারা মূর্খ। এই নীতি অনুসারে গরীব কেশব একটি মূর্খ। সাহেবের বাড়ীতে চাকরী পাইবে না, দেশের লোকের কাছেও বেশী বেতন হইবে না, কেশবেরা চিরদিন গরীব থাকিয়া

তাহাদের উপাসনা করিবে, ইহাই তাহারা ভাবিয়া ছিলেন ; কেশব নায়েব হইল, মান পাইল, টাকা পাইল, কোটাবাড়ী করিল, জমি জমা খরিদ করিল, বিবাহ করিল, সোণার গহনা গড়াইল, সেই কারণেই হিংসা।

চারিদিকেই বেড়া আগুণ। কেশব যেন সত্য সত্য যেন কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, ঠিক সেই রকমে দিবারাত্রি তাঁহার উপর উপদ্রব। প্রতিবাসীরা সকলেই নানা রঙ্গ বিদ্রূপ করিতেছে, প্রতিবাসীরা লজ্জা সম্ভ্রম ভুলিয়া তফাতে তফাতে হাস্য করিতেছেন। হিংসা যাহাদিগকে দগ্ধ করে, যম তাঁহাদিগকে অনেক দিন ভুলিয়া থাকে, এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

বাহিরে বাহিরে বাজে লোক আশে পাশে প্রতিবাসী লোক, ভিতরে ভিতরে সংগোপনে গুপ্ত শত্রু ; সাক্ষাৎ প্রমাণ কিছুই নাই, বলিয়া গুপ্তশত্রু লোকেরা সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত করিয়া নিজ মূর্ত্তিতে কেশবের সম্মুখে যায় না, কেহ কেহ রোগী সাজিয়া, কেহ কেহ সন্ন্যাসী সাজিয়া গণৎকার সাজিয়া, এক একবার দেখা দেয়, কিন্তু কাজেই কেহ পারে না। করিবার উপায়ও নাই। না থাকিলেও তাহারা মিথ্যা কল্পনার উপর দাঁড়াইয়া নানা রঙ্গে নৃত্য করে, একদিন একজন খিড়কীর দ্বারের পার্শ্বে উঁকিমারিয়া চিৎকার স্বরে, কেশবের মাতাকে বলিয়াছিল, "একখানা নেকড়া পরাইয়া বাহির করিয়া দাও, আমরা টানিয়া লইয়া যাই। যেমন ছেলে গর্ভে ধরিয়া ছিলে, তাহার ফল ভোগ কর।" লোকের হস্তে একটি সিকি দিয়া পুত্রবৎসলা দুঃখিনী ব্রাহ্মণি বিরলে অশ্রু মার্জ্জন করিয়াছিলেন।

অভাগা কেশব এইরূপে দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত হইয়া প্রায় এক মাস কাল গৃহবাস করিলেন, আর পারিলেন না অসহ্য হইয়া উঠিল। এমন গৃহবাস অপেক্ষা বনবাস ভাল,এই স্থির করিয়া কেশব একদিন শেষ রাত্রে সকলের অলক্ষিতে বাড়ী হইতে পলায়ন করিলেন। পরিধান একবস্ত্র, গায়ে একটি বোতাম শূন্য খালি চীনাকোট।

দূরে নিকটে অন্যান্য দশবার জায়গায় আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিয়া কেশব চন্দ্র হতাশ হইলেন। সকল স্থলেই সমান বেড়া আগুণ। সকলেই যেন তাহার উপর সন্দেহ করে। কাহাকেও প্রবোধ দিবার কোন সুবিধা হয় না। এক বৎসর এই প্রকার। একবৎসর পরে গোলযোগ একটু থামিল। চুকিয়া গিয়াছে মনে করিয়া কেশব একটু নিশ্চিন্ত হইলেন।

নয় বৎসর চুপ্ চাপ। দশ বৎসর পরে পুনর্ব্বার। পূর্ব্বরূপ বেড়াআগুণ পুনর্ব্বার জ্বলিল। কেশব পুনর্ব্বার নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বেড়া আগুণের উত্তাপ সহ্য করিলেন, শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গেল। হলধরের বাগানে কেশবের বন্ধুগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কেহ বলিল, সাতবৎসর, কেহ বলিল, দশ বৎসর, কেহ কেহ বলিল, বিশবৎসর, কেহ কেহ বলিল, দ্বীপান্তর।

একবৎসর পরে পুনর্ব্বার নিস্তব্ধ। আরো তিন বৎসর, কোন উপদ্রব নাই। প্রথম হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল, কেশবের শান্তি ফিরিল না। দৈব যোগে মফঃস্বলের একজন উকীলের সহিত কেশবের সাক্ষাৎ হয়, কেশব অকপটে

তাঁহার নিকটে আপন ভাগ্যের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। আশ্চর্য্য মানিয়া উকীল বাবু কহিলেন, ভয় নাই, সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছি জেলার দায়রার আদালতে ঐ ভাবের একটা মোকদ্দমা উঠিয়াছে, চৌদ্দবৎসরের পর পলাতক আসামী ধরা পড়িয়াছে, সর্দ্দার আসামীর নাম কেশব ডাক্তার। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সত্য আসামীরা পলাতক হওয়াতে তোমার কোন গুপ্ত শত্রু ভয় দেখাইবার পরামর্শে তোমাকেই গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। তোমারনাম কেশব, সে মোকদ্দমার আসামীর নাম কেশব, নামে নামে মিল থাকাতেই এই অনর্থ ঘটিয়াছে। ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। প্রকৃত দোষীর বিচার সমাপ্ত হইলেই সত্য ফলাফল ঠিক জানা যাইবে। একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, উকীল বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কেশবচন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন, শীর্ণ বদন খানি কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল।

দশ দিন অতীত। দায়রার বিচারে ডাক্তার কেশবচন্দ্রের দশবৎসর কাল কারাবাস এবং তাহার অন্যান্য সঙ্গির পাঁচ পাঁচ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইল, বিচার মুখে প্রকাশ পাইয়াছে, চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার প্রাকালে গোয়ালা জাতীয়া একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক নদী হইতে জল লইয়া ঘরে যাইতে ছিল, ১৫ জন লোক তাহার সঙ্গ হইয়া তাহার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে, স্ত্রীলোকের অনেক টাকা ছিল, সেই লোভে চোরেরা তাহার সমস্ত টাকা লুট করিয়া প্রস্থান করে, দুইজন গোপকন্যা নদীর পথে ঐ কয়েক জনের মধ্যে কেশব ডাক্তার কে চিনিয়াছিল, তদারকের সময় বার বার কেশব ডাক্তারের নাম হয়, কোথায় কেশব ডাক্তার, পুলিশের লোকেরা খুঁজিয়া বেড়ায়, সেই সময়ে হলধর নাগের বাগার সরকার ভোলানাথ সকলকে বলে, আমাদের বাগানে একজন কেশব আছে, কেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সকলে সেই কথা শুনিয়াই দলের মধ্যে ঐ কথা রাষ্ট্র করিয়া দেয়, কেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গোয়ালিনীর নগদ টাকা, গহনা প্রভৃতি যাবতীয় মূল্যবান দ্রব্য চুরি করিয়াছে, এই সন্দেহ করিয়া গ্রামস্থ লোকেরা ঐরূপ গণ্ডগোল করিয়াছিল, তারের খবরে স্থানে স্থানে আসামী অন্বেষণের সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতেই কেশবচন্দ্র স্থানে স্থানে সেইরূপ বেড়া আগুনের মধ্যবর্ত্তি হইয়াছিলেন।

এখন সব গোল চুকিয়া গেল সত্য আসামীরা সাজা পাইল, কেশবচন্দ্র অব্যাহতি পাইলেন, বিপক্ষেরা বিমর্ষ হইল। কেশবের প্রিয় বন্ধু ভোলানাথ সরকার রোগে জীব খসিয়া ঘরে মরিয়া রহিল, মোকদ্দমা শোকে হলধর নাগ মর্ম্মপীড়ায় শয্যাগত হইলেন আর উঠিলেন না। একমাস পরেই প্রাণগেল। হিংস্র লোকের, হিংসার গুপ্ত শত্রুতায় গ্রামস্থ নিরীহ লোকের উৎকট ভ্রমে স্থানে স্থানে এমন ঘটনা বড় অল্প হয় না। যাহাদের ধর্ম্মবল প্রবল থাকে, তাহারাই মুক্তি পায়, নতুবা চক্রজালে জড়াইয়া এইরূপে হাবুডুবু খায়, কথা বড় ভয়ঙ্কর চতুর্দ্দশ বৎসর পরে সত্য প্রকাশ, উদর পিণ্ডি বুদর ঘাড়ে।—ইহাকেই বলে, কর্ম্মভোগ।



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৬শ বর্ষ] | ১৩১৫ সাল শ্রাবণ। | ৪র্থ সংখ্যা।

বিবাহ না বাণিজ্য ?

বর্ষাকালে আকাশে মেঘোদয় দর্শনে কৃষকেরা আশার আশায় উর্দ্ধমুখ হইয়া থাকে, সে মেঘে বারি বর্ষণ না হইলে হায়, হায়! করিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে। বিবাহের সময় বরের মূল্য কমাইবার জন্য কলিকাতামহানগরে মধ্যে মধ্যে এক একটি সভা হয়; ব্রাহ্মণেরা স্রোতে গা ঢালিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আর সে উদ্দেশ্যে সভা সমিতি করেন না। নগরের কায়স্থ মহাশয়েরাই বৈবাহিক সভার নামটি জাগাইয়া রাখিয়াছেন, সে সকল সভায় যেরূপ ফল হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পূর্ব্বোক্ত হতাশ কৃষকবৃন্দের ন্যায় হায়, হায়! করিয়া থাকেন, সভা সমিতির এইরূপ শোচনীয় ফল দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে আমরা বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি বিবাহ না বাণিজ্য ?

এখনকার দিনে সমস্ত সভা সমিতিতে যেরূপ কার্য্য হয়, বিবাহের বায়-লাঘব আকাঙ্ক্ষায় যেসকল সভা বসিয়া থাকে, সে সকল সভাতেও সেইরূপ কার্য্য দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হই। দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা, প্রবল প্রবল যুক্তি জটিল জটিল তর্ক এবং হাত তুলিয়া প্রতিজ্ঞার আড়ম্বর, কথায় কথায় প্রতিজ্ঞা, ঐপ্রকার সভার সভ্য বৃন্দের এক প্রকার আমোদ মধ্যেই গণ্য হইয়াছে, সভ্য মহাশয়েরাও বরের দাম কমাইবার প্রতিজ্ঞা করেন; করেন বটে, কিন্তু শেষকালে সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে কাতর হইয়া পড়েন। সকলেই বলেন, কমাও, কমাও, কমাও, কিন্তু কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের কার্য্যগুলি যেন মুর্ত্তিমান হইয়া উচ্চকণ্ঠে উপদেশ দেয়, বাড়াও, বাড়াও, বাড়াও।

বাস্তবিক ইহাই প্রকৃত কথা। যাঁহারা বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন, আমাদের ঐ কথাগুলি কল্পনা প্রসূত নহে। মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্য্য কালে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা একটা প্রবল রোগ। শাস্ত্রে আছে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ একটা পাপ, এ ক্ষেত্রে আমরা এখন পাপকে কিছুদূরে রাখিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, একটা প্রবল রোগ।

এ রোগের ঔষধ কি ? যাঁহারা রোগগ্রস্ত তাঁহারা চিকিৎসক হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের মুখে ঔষধের নাম শুনিবার আশা নাই। রোগী হইতেছেন, বরকর্ত্তা মহাশয়েরা! ঔষধের নামে অথবা ঔষধ অন্বেষণার্থ যে সকল বক্তৃতা হয়, ঐ প্রমাণে তাহা অবশ্যই শূন্যগর্ভ। বরকর্ত্তা মহাশয়েরা হয়ত ঔষধের উপকারিতা বুঝেন, কিন্তু ঔষধ চিনিতে পারেন না, ঔষধের খাতিরে প্রবল অর্থ লোভটীকে বলিদান দিতেও পারেন না ? অতএব তাঁহাদের দ্বারা এ রোগের চিকিৎসা হইবে না, ইহা আমরা বেশ বুঝিয়াছি, চিকিৎসা করিবার প্রতিজ্ঞা, সভাস্থলেই প্রতিজ্ঞা, কিন্তু সভা প্রাঙ্গনের বাহিরের ধুলা পদস্পর্শ করিলে, বাহিরের বাতাস গাত্রে লাগিলে, তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ?—একেবারে ভঙ্গ না হউক কিছু দিনের জন্য বিস্মরণ। অতএব বরকর্ত্তাগণের দ্বারা উপস্থিত বিপদের প্রতিকার হওয়া অসম্ভব।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বরকর্ত্তাদের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি যদি অসম্ভব হয়, তবে কাহাদের দ্বারা সিদ্ধ হইবার আশা ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভরসা বাঁধিয়া আমরা বলিতে পারি, নব্যসম্প্রদায়ের যুবকেরাই—সাদা কথায় বিবাহযোগ্য বরেরাই উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থাপত্র যোগাড় করিতে পারেন। বরের বাজার অতি উচ্চ

মাত্রায় চড়িয়া উঠাতে—নিলামের উচ্চ ডাকে, বর বিক্রয় আরম্ভ হওয়াতে সমাজের যত অনিষ্ট হইতেছে, দরিদ্র কন্যাকর্ত্তারা যে পরিমাণে অধিকতর দরিদ্রতার গহ্বরে ডুবিয়া যাইতেছেন, পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকবার তাহা আমরা দেখাইয়াছি, গত মাসেও সেই দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ করিয়াছি। যে সকল শিক্ষিত যুবক পরিণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যদি আপনাদের বিবাহের সম্বন্ধের কথা শুনিয়া প্রকাশ্যরূপে প্রতিজ্ঞা করেন, "বহুমূল্য লইয়া কন্যা কর্ত্তার নিকটে আমাদিগকে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব হয়, তাহা হইলে কদাচ আমরা বিবাহ করিব না।" তাহা হইলে ভবিষ্যতে অবশ্য মঙ্গল ফল ফলিতে পারে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে।

কেন আমরা এ কথা বলিতেছি, তাহার প্রকৃষ্ট কারণ আছে। সমাজ তত্ত্বজ্ঞ বহুদর্শী বিজ্ঞজনেরা আজ কাল বলিতেছেন, "প্রাচীন প্রাচীন বংশের বর্ত্তমান বংশ ধরেরা সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, সদুপদেশ লাভ করিয়া আজ কাল ভাল ভাল কার্য্যে উদ্যমশীল হইতেছেন, অধ্যবসায়কে আলিঙ্গন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ শুভকার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারাই এখন আমাদের সংসারিক মঙ্গলের আশা ভরসার স্থল। কিঞ্চিৎ সন্দেহ স্থল থাকিলেও, আমরা বলি তথাস্তু। কেন না বরের মূল্য বৃদ্ধির যেরূপ বিষময় ফল, শিক্ষিত উদ্যমশীল যুবকেরা অবশ্যই তাহা বুঝিয়াছেন, পুত্র বিক্রয়ের অশুভ ফল অবশ্যই তাঁহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিতেছে, "বিক্রীত হইব না, যেখানে উচ্চ পণের প্রস্তাব সেখানে কদাচ বিবাহ করিব না।" এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে তাঁহারা যে ভীত অথবা পশ্চাৎ পদ হইবেন, আমরা এমন বিবেচনা করিতে পারি না।

একটা ভয় আছে। পিতা মাতা বহুমূল্য গ্রহণে দৃঢ় সঙ্কল্প, পুত্র যদি সে সংকল্পে বিঘ্ন জন্মায় সমাজের লোকে সেই সকল পুত্রকে পিতামাতার অবাধ্য বলিয়া নিন্দা করিবে, সেই ভয়। এক কথায় আমরা সেই ভয়টা দূর করিয়া দিতেছি। ধর্ম্ম সঙ্গত ন্যায্যকার্য্যে যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহারা অজ্ঞ ও সমাজের শত্রু; তাহাদের হিতাহিত, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই; তাদৃশ লোকের নিন্দাতে কিছুই ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই, অতএব আমরা নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিতেছি, অধ্যবসায়শীল সুশিক্ষিত যুবকেরা নির্ভয়ে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইতে থাকুন, নিন্দাভয় পরিত্যাগ করুন, চিরদিনের সমাদৃত হিন্দু সমাজ মঙ্গল ফল লাভ করিবেন, যুবকেরা সমাজ মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিলে, ভগবান তাঁহাদের প্রতি

সুপ্রসন্ন হইবেন, তত্ত্বানভিজ্ঞ নিন্দুক মানবগণের অপ্রসন্নতায় কিছু মাত্র আইসে যায় না, আমাদের ইচ্ছা এখন অবধি যেদিন যেদিন ঐ বিষয়ের বিচারার্থ কায়স্থ সভার অধিবেশন হইবে, সেই সেই দিন যেন বিবাহ যোগ্য বর গুলিকে সেই সকল অধিবেশনে সাদরে আমন্ত্রণ করা হয়, কেবল ঔদরিক অর্থগৃধ্নু নির্ম্মম স্বার্থপর বরকর্ত্তাগণকে লইয়া সহস্র সহস্র সভা করিলেও কোন ফল হইবে না, ইহা নিশ্চয়, গত পৌষ মাসে পটলডাঙ্গার মল্লিক ভবনে কায়স্থ সভার এক মহা অধিবেশন হইয়াছিল, তদবধি এ পর্য্যন্ত কোথায় কোথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিবেশন হইয়াছে, কিম্বা না হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত হই নাই, পুনরায় এই নব বর্ষের পৌষ মাঘ মাস সমাগত না হইলে, বিরাট অধিবেশন হইবে না, আমরা জানি। পৌষ মাসেই হউক, অথবা দুই এক মাস অগ্র পশ্চাৎ হউক, সেই অধিবেশনে আমরা যেন অধিক সংখ্যক অবিবাহিত সুশিক্ষিত যুবককে সেই সভায় দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি, ইহাই এখন বাঞ্ছনীয়। অদ্য এই পর্য্যন্ত। প্রস্তাবের ফলাফল দর্শন প্রতীক্ষায় আমরা উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

আর একটি নিবেদন।—কথায় কথায় সভা করা, এবং সভায় নানা প্রকার বিফল প্রসঙ্গের আলোচনা করা আজ কাল এক প্রকার সংক্রামক হইয়াছে, করজোড়ে মিনতি করিয়া, সভ্যগণের নিকটে আমাদের এই প্রার্থনা যে, আপাততঃ কিছুদিন বাজে বিষয়ের আন্দোলন বন্ধ রাখুন, উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহার উপর আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, সেই বৈবাহিক ব্যাপারের দুর্ম্মোচনীয় কলঙ্ক নিবারণ পক্ষে সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হউন, যে সকল বিফল বক্তৃতায় কেবল শ্রোতার মুখে বাহবা বাহবা, সাবাস্ সাবাস্ ধ্বনি সমুত্থিত হয়, করতালি ধ্বনিতে সভাভূমি কম্পিত হয়, আমাদের বিবেচনায় সে সকল বক্তৃতা কেবল আবর্জ্জনা প্রসবিনী। আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ভূমিকে উর্ব্বরা করাই সুনিপুণ কৃষকের কার্য্য। সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণ, দেশের কল্যাণার্থ সেই প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ইহাই আমাদের অভিলাষ।

:০:

প্রভুপাদ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

পরমপূজ্যপ্রভু নিত্যানন্দের বংশে যে কয়েকটি মহারত্ন এই বঙ্গভূমি উজ্জ্বল করিয়া দশদিকে যশঃপ্রভা বিস্তার করিতেছিলেন, সেই উজ্জ্বল রত্নগুলি একে একে কালসাগরগর্ভে বিলীন হইয়াছে, অবশিষ্ট ছিলেন পণ্ডিতবর

মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী ;—বিগত ত্রয়োদশশত চতুর্দ্দশ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের অষ্টাদশ দিবসে, পুণ্যতম শিবচতুর্দ্দশী যামিনীতে তিনি স্বর্গধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। ত্রি-দিবা ত্রি-যামিনী ভাগীরথীতীরে বাস করিয়া অমৃতময় শ্রীশ্রীহরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে পুত্রপৌত্রাদি স্বজন ও বন্ধুবান্ধববর্গের শোকাকুল-নেত্রসমক্ষে সেই পুণ্যবান্ মহাপুরুষের নির্ম্মল আত্মা পরাৎপর পরমাত্মায় মিলিত হইয়াছে। তাদৃশ ভাগ্যবান্ পুরুষ আজকাল আমরা অতি অল্পই দেখিতে পাই।

১৭৫৭ শকাব্দের (বঙ্গাব্দ ১২৪৩ সালের) ২৭-শ কার্ত্তিক তারিখে এই মহানগরীর সিমুলিয়াপল্লীতে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর জন্ম, ১৮২৯ শকাব্দের (বঙ্গাব্দ ১৩১৪ সালের) ১৮ই ফাল্গুন রবিবার রজনীতে ইহলীলা সংবরণ; মৃত্যুকালে তাঁহার ৭২বৎসর বয়স হইয়াছিল।

গোস্বামী মহাশয় বংশাবলী গণনায় নিত্যানন্দপ্রভু হইতে দ্বাদশ পুরুষ। সংক্ষেপে এই স্থলে সেই বংশাবলীর কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে :—

প্রথম প্রভু নিত্যানন্দ, দ্বিতীয় বীরভদ্র, তৃতীয় রামচন্দ্র, চতুর্থ রাধামাধব, পঞ্চম রাঘবেন্দ্র, ষষ্ঠ গোপালবল্লভ, সপ্তম হরিরাম, অষ্টম লালবিহারী, নবম কৃষ্ণচন্দ্র, দশম অদ্বৈতচন্দ্র, একাদশ হরনাথ, দ্বাদশ মহেন্দ্র নাথ।

বংশের নবম পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী জ্ঞাতিবিরোধসূত্রে খড়দহবাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কালকাতায় আগমন করেন, বঙ্গাব্দ ১২০৫ সালে এই নগরীর সিমুলিয়া-পল্লী মধ্যে বাটী ক্রয় করা হয়, তদবধি ইঁহারা সিমুলিয়াবাসী হইয়াছেন।

প্রভুপাদ মহেন্দ্রনাথ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পরম পণ্ডিত ছিলেন, ইংরাজী ভাষাতেও তাঁহার অনেকদূর ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল ; তখনকার এল, এ, পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পুস্তকাবলী তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন, পরীক্ষার স্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শিক্ষানুরূপ তাঁহার চরিত্রও সর্ব্বাংশে নির্ম্মল ও পবিত্র ছিল। তিনি সুধীর, সত্যবাদী, সদ্বক্তা স্পষ্টভাষী, ও অকপট হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন। সচরাচর বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই প্রায় শক্তি-উপাসনায় বীতরাগ হন, কিন্তু পরমভক্ত মহেন্দ্র নাথ প্রতি বৎসর শরৎকালে আপনার আলয়ে মহামায়ার প্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে মহাসমারোহে মা দুর্গার পূজা করিতেন। তাঁহার মন্ত্রশিষ্য অনেক ছিল, কিন্তু তিনি শিষ্যসেবকের মুখাপেক্ষী ছিলেন না ; কোথায় কত শিষ্য, তাহার তালিকাও তিনি

রাখিতেন না, শাস্ত্র আলোচনা এবং নিরন্তর ভজনসাধনই তাঁহার কার্য্য ছিল, কোন-স্থলে শাস্ত্রবচনের বিপরীত অর্থ ঘটাইয়া কাহাকেও কোনপ্রকার ব্যবস্থা দিতেন না; তাহাতে তাঁহার অর্থের ক্ষতি হইত, তাহাও তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। বড় বড় পণ্ডিতের সহিত বিচারে সর্ব্বত্রই তিনি জয়লাভ করিতেন। পুরাণপাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার প্রচুর আয় হইত, তাহাতেই তিনি স্বচ্ছন্দে পরম সুখে পরিবার পালন ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। সামাজিক ব্যবহারে তিনি মধুরভাষী, আমায়িক, সদালাপী ও সর্ব্বজনরঞ্জন ছিলেন।

এই স্থলে কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক বোধ হইল।

তৃতীয়বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মহেন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ ও অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে পিতৃবিয়োগ হয়; তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপত্নী তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। সেই জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর নাম ছিল মধুমুখী দেবী; সিমুলিয়ায় তিনি "মাগোঁসাই" নামে পরিচিতা। মাগোঁসাইঠাকুরাণী পরম দয়াবতী ও অতিথিসৎকারপরায়ণা ছিলেন। এমন কি, নিজের আহারের অগ্রে বাটীতে অতিথি আসিলে নিজের আহার্য্য অন্নব্যঞ্জনাদি অতিথিকে অর্পণ করিয়া স্বয়ং উপবাসিনী থাকিতেন; দয়াগুণে জনসমাজে তিনি সবিশেষ যশস্বিনী হইয়াছিলেন; আজিও সিমুলিয়ার লোকে মুক্তকণ্ঠে তাঁহার যশোগান করে।

এক্ষণে আমরা প্রভুপাদ মহেন্দ্রনাথের পুরাণদক্ষতার আলোচনা করিব। প্রধান প্রধান লোকের বাটীতে অথবা দেবালয়ে সঙ্কল্পিত ভাগবতপাঠব্রতের অনুষ্ঠানসময়ে পণ্ডিতবর মহেন্দ্রনাথ পাঠক, ধারক অথবা সদস্যের কার্য্যভার গ্রহণ করিতেন; তাঁহার মুখে পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভক্তজনের হৃদয় বিগলিত হইত। একদা পাথুরিয়াঘাটার ৺ যদুলালমল্লিকের উদ্যানবাটীতে সঙ্কল্পিত ভাগবতপাঠ হয়, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ সেই সভায় ধারকের পদে ব্রতী ছিলেন; পাঠক ছিলেন তাঁহার একজন সহাধ্যায়ী পৌরাণিক পণ্ডিত। পাঠ করিতে করিতে পাঠকমহাশয় ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ তাঁহাকে মৃদুমধুর ভর্ৎসনা করিয়া স্বয়ং রাসলীলার পাঁচটি অধ্যায় পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা শেষ করিয়া দেন। যদুলাল মল্লিকের উদ্যানটি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীর পার্শ্ববর্ত্তী ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব সেই পাঠস্থলে উপস্থিত হইতেন; প্রভুপাদের পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তিনি পরম সন্তুষ্ট হন। সেইখানেই পরমহংসদেবের সহিত গোস্বামী মহা-শয়ের দেখা সাক্ষাত ও আলাপ-পরিচয় উভয়ে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত একত্র বসিয়া

পুরাণপ্রসঙ্গে নানাপ্রকার সদালাপ করিতেন, সিমুলিয়ার বাবু রামচন্দ্র দত্ত, সুরেশ চন্দ্র মিত্র, মনোমোহন মিত্রেরবাটীতে পরমহংসদেবের গতিবিধি ছিল, নবমীপূজার রাত্রে ঠাকুর বিনা নিমন্ত্রণে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর বাটীতে প্রতিবৎসরই উপস্থিত হইতেন, সেখানেও শাস্ত্রীয় সদালাপ হইত, ভক্তিপূর্ণ শ্লোকপাঠ ও ব্যাখ্যার নিমিত্ত পরমহংসদেব তাঁহাকে স্থানে স্থানে লইয়া যাইতেন; বালাখানার বাটীতে ভাগবতপাঠের সময় ঠাকুর সেইখানে উপস্থিত ছিলেন, গোস্বামী মহাশয়কে তিনি বলিয়াছিলেন, "যাতে নিরপেক্ষা ভক্তিরস ব্যাখ্যা হয়, অন্য কোনদিকে ঢোলে না পড়ে, তাই করুন" তদবধি পরমহংসদেব এবং গোস্বামী মহাশয়ের পরস্পর প্রগাঢ় প্রীতি দাঁড়াইয়া ছিল।

মৃত্যুর দশবৎসর পূর্ব্বাবধি পূজ্যপাদ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রস্রাবের পীড়ায় কাতর হইয়াছিলেন, দৃষ্টিশক্তিও খর্ব্ব হইয়াছিল, তথাপি পুরাণ শাস্ত্রের আলোচনায় তিনি বিরত ছিলেন না। অদ্ভুত ক্ষমতা! অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণখানি প্রায়ই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল; দর্শনশক্তির অভাব হইলেও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ গোস্বামী অথবা অন্য কেহ তাঁহার নিকট ভাগবতের কোনশ্লোকের ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে, তিনি সেই শ্লোকের পূর্ব্বের পাঁচটি ও পরের পাঁচটি পূর্ণ শ্লোক মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া পরিষ্কার ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিতেন। তাদৃশ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ অধুনা নিতান্ত বিরল।

মা গোঁসাই যখন জীবিতা ছিলেন, তৎকালে সিমুলিয়ার বাটীতে প্রায় নিত্যই মহোৎসব, নিত্যই সংকীর্ত্তন, নিত্যই ব্রাহ্মণভোজনাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইত, প্রভুপাদ মহেন্দ্রনাথও সেই কীর্ত্তি বজায় রাখিয়া ছিলেন; তাঁহার পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীও অকপট পতিসেবার সহিত সেই সকল পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী সানাজার পাঁড়াগো গ্রাম নিবাসী ৺ মুক্তারাম রায়ের কন্যার সহিত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছিল, পত্নীর নাম ভুবনমোহিনী দেবী ১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সজ্ঞানে তাঁহার গঙ্গালাভ হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া বাঁকিপুরে ছিলেন, জননীর আসন্ন কাল, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, দুইদিনমাত্র পথ্য করিয়াই তিনি কলিকাতায় চলিয়া আইসেন; বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন, জননীর বাকরোধ মৃত্যুদিবসে প্রাতে তাঁহার একবার কথা ফুটিয়াছিল, স্নেহাস্পদ পুত্র অতুলকৃষ্ণের মুখের

দিকে চাহিয়া তিনি ক্ষীণস্বরে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমার কিছু করিতে পারিলাম না!" উহাই তাঁহার শেষ কথা। ঐদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে তীরস্থ করা হয়। অনেক লোক গঙ্গাতীরে সঙ্গে গিয়াছিলেন, পুণ্যবতী সাধ্বী এক একবার চক্ষু ফিরাইয়া সকলের দিকে চাহিতেছিলেন; যেন আর কাহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা, সেই দৃষ্টিপাতের ভাবে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ধর্মশীলা পত্নীর জীবনাবসান দর্শন করিতে পারিবেন না বলিয়াই স্নেহপরবশ পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ প্রথমে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন নাই, শেষকালে তিনি উপস্থিত হইবামাত্র সাধ্বী সতীর জনৈক আত্মীয় বলিয়া উঠিলেন, "মেজ কাকীমা, ঐ দেখুন মেজো গোঁসাই এসেছেন।" পতিব্রতা ঐ কথা শুনিবামাত্র পতিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুলা হইলেন, গোস্বামী মহাশয় সেই সময় তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; পতিপ্রাণা পুণ্যবতী অনিমেষনেত্রে পতির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পতিপাদপদ্মে নয়ন স্থাপন করিলেন; সকলে তাঁহার কর্ণকুহরে হরে কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করাইল, পতিপাদপদ্ম দর্শন করিতে করিতে পতিব্রতা সতীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইল!!

পত্নীবিয়োগে গোস্বামী মহাশয়ের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে; তাহার উপর প্রস্রাবের পীড়া ও দৃষ্টিরোধ। মৃত্যুর দুইএক বৎসর পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার সমবয়স্ক সমধর্ম্মা যে কয়েকটি লোকের বহুমূত্ররোগ হইয়াছিল, ডাক্তারেরা তাহাদিগকে মাংসভক্ষণ করাইবার ব্যবস্থা দেন, তাহারা মাংসভক্ষণ করিয়া একে একে সকলেই পৃথিবী হইতে বিদায় হইয়াছেন; আমি মাংসভক্ষণ করি নাই, সেইজন্য আজিও বাঁচিয়া আছি।"

গোস্বামী মহাশয়ের তিনটি পুত্র বিদ্যমান। জ্যেষ্ঠ গোকুলচাঁদ, মধ্যম অতুলকৃষ্ণ, কনিষ্ঠ মাণিকচাঁদ। মহেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সহোদর অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার উইলের আদেশমতে তদীয় পত্নী ঐ মাণিকচাঁদকে দত্তক গ্রহণ করেন। তাঁহার আর একটি বিশেষকার্য্যের উল্লেখ করা আবশ্যক। বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার আন্তরিক আস্থা থাকাতে পরলোক যাত্রার পূর্ব্বে তিনি দ্বিতীয় পুত্রকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, চৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকমালার একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া যেন বৈষ্ণবসমাজে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। শাস্ত্রীয়গ্রন্থপ্রচারে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল।

প্রভুপাদ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী স্বধামগত হইয়াছেন, তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী পৈতৃক গুণসমূহের অধিকারী হইয়া ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হইয়াছেন। আমরা আশা করি, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী নিরাময়ে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া পিতার মহিমা ও কীর্ত্তিকলাপ সমভাবে রক্ষা করিয়া জনসমাজে সমাদর লাভ করিবেন।

—:০:—

দেহ ও প্রাণ

লেখক, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম, এ,

গভীর নিশীথঃ চারি দিকে কোন সাড়াশব্দ নাই। বুঝি জগৎ প্রাণ হারা হইয়া নিস্পন্দে পড়িয়া আছে। এরূপ সময়ে ঘোর স্বপ্নে সুপ্তজীবদেহে একটী কথোপকথনের ধ্বনি শোনা গেল। নিদ্রায় অবগতরজীবাত্মা তাহা শুনিতে লাগিল। কথোপকথনকারী দ্বয় তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। সেই কথোপ-কথনের সার নিম্নে লিখিত হইল।

দেহ কহিল, প্রাণ তুমি বড় না আমি বড়? প্রাণ বলিল, সে কথার মীমাংসা অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। যেদিন প্রজাপতি বলিয়াছিলেন-যে, "যস্মিন্নুৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্টতরমেব দৃশ্যেত সবঃ শ্রেষ্টতরঃ" অর্থাৎ যিনি উদ্গত হইলে শরীর পাপিষ্টবৎপ্রতীয়মান হয় সেই শ্রেষ্টতর" সেইদিন হইতেই আমার উৎকর্ষ জানিবে।

দেহ বলিল, প্রাণ যদি তুমিই শ্রেষ্ট, তবে তোমার শ্রেষ্টত্ব প্রতিপাদন করিয়া আমার কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দাও, প্রাণ বলিল, তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি বলিয়া যাইতেছি।

দেহ কহিল, আমার স্বরূপ কি আমাকে বুঝাইয়া দাও, প্রাণ বলিল, শুন দেহ তোমার স্বরূপ কি, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এখন স্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নানাবিধ উপাদানকে তোমার স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, ও দুই দিন পরেই তাহা তোমার উপাদান নয়, ইহাও প্রতিপন্ন করেন,—কিন্তু মোটের উপর প্রাচ্য আর্য্যজাতির মীমাংসা তোমার সম্বন্ধে ঠিক বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না, তুমি ক্ষিতি, অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোমের সমষ্টি মাত্র। দেহ বলিল, তবে কি আমি একান্তই জড় পদার্থ। প্রাণ বলিল, একরকম তাহাই বটে, কিন্তু তোমার মহত্ত্ব সমবায়ে আমার মত তোমার পৃথক্ সত্তা নাই।

দেহ বলিল, তোমার আদিই বা কি, আমার আদিই বা কি, তাহার মীমাংসা কর। প্রাণ বলিলেন, এ প্রশ্নের মীমাংসা বড় সুকঠিন। ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন দার্শনিকগণ ইহার মীমাংসা লইয়া বিস্তর বিচার করিয়া গিয়াছেন। কাহারও মতে পঞ্চভূত অনাদি. কেহ বলেন, তাহা সেরূপ নহে। সে মীমাংসা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। এই পর্য্যন্ত তোমার কথা ; আমার সম্বন্ধে আমার অনাদিত্ব সর্ব্বকাল সিদ্ধ কারণ আমি মহা প্রাণের স্ফুলিঙ্গ মাত্র, "প্রবর্ত্তিতো দীপাইব প্রদীপাৎ" সেইরূপ আমার উৎপত্তি জানিবে। দেহ বলিল, প্রাণ তুমি নিজে খুবউচ্চ শিখরে যে আরোহণ করিতে চাহ তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাকে ছোট কর কিসে ? এই জীবাশ্রিত দেহে আমার পর্য্যবসান নহে। পাঞ্চ ভৌতিক এই দেহ মিশাইয়া যাইবে এবং পুনরায় সেই পঞ্চভূতের সমাবায়ে আমার পুনরস্তিত্ব সম্ভব হইবে। এই প্রণালী পিছনে বা অগ্রে যতদুর দেখিতে পাও সমান ভাবে চলিতেছে। তুমি যেরূপ মহাপ্রাণের দোহাই দিয়া নিজের মহত্ব প্রচার করিলে আমিও সেরূপ কি করিতে পারি না। যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান স্থূলভূত দেহ দেখিতেছ তাহা সেই মহাপুরুষের অঙ্গ বিশেষ শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ।
জ্যোতীংষিসত্বানি দিশোক্রমাদীন্॥
যৎকিঞ্চ পশ্যেৎ প্রাণমেদনন্যঃ।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং॥

দেহ আরও কহিল, আমি অবিনাশী ও অনাদি, তুমি বলিবে তুমি তাহাই, কিন্তু সে বিষয় প্রমাণ কি ?

প্রাণ কহিলেন, তাহার প্রমাণ ভূরি ভূরি আছে, সর্ব্বাগ্রেই শ্রুতির প্রমাণ দ্বারা আমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি, এখন শুনিতে চাও, আরও বলি, দেহ বলিল, তুমি বলিয়া যাও. আমি শুনিতেছি,—

প্রাণ বলিলেন, সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন

"অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্ব মিদং ততং।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য নকশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥"
ন জায়তে ম্রিয়তেবা কদাচিৎ
নায়ংভূত্বা ভবিতাবানভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতো হয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

দেহ কহিল, প্রাণ তুমি আত্মার গুণ প্রতিপাঁদক শ্লোকমালা তোমার সপক্ষে টানিতে পার না। তোমায় উল্লিখিত শ্লোকে আত্মার গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে, তোমার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই।

প্রাণ কহিলেন, আত্মা ও প্রাণের বিভিন্নতা কি? মূলে দুই এক। দেখ শ্রুতি পরমাত্মা সম্বন্ধে কহিয়াছেন,

"প্রাণস্য প্রাণমুতশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি—

সেই আনন্দময় সার ব্রহ্মে ও প্রাণে মূলতঃ একত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে—বক্ষমান শ্রুতি প্রমাণদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে—যে আনন্দময়ই প্রাণ ও এই আনন্দময় না থাকিলে প্রাণ থাকিতে পারে না।

"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
অশেষ আকাশ আনন্দো নস্যাৎ"

দেহ বলিল, তুমি, আত্মার অংশ হইতে পার বা না পার, তুমি তো আত্মা নহ তবে তুমি কি করিয়া আত্মার গুণ প্রতিপাদনকারী শ্লোকের দোহাই দাও? প্রাণ কহিলেন, আমি না থাকিলে জীবাত্মার স্ফুরণ কোথায়! আমি আছি বলিয়া তোমার পুষ্টি ও জীবাত্মার পরমাত্মার দিকে গতি সম্ভবে। পূজ্যপাদ ঋষিগণ আমাকে দীর্ঘকাল ধারণ করিয়া রাখিবারজন্য মনিমন্ত্র ঔষধি ধারণ ও সেবন করিবেন, তবেই দেখ আমার প্রাধান্য কত। প্রাণ আরও বলিলেন, তোমার মত অনুসারে চলিলে ইহাই মীমাংসিত হইবে যে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই। তুমিই বা কি, আমিই বা কি, ইন্দ্রিয়গণই বা কি, পঞ্চমহাভূতই বা কি, কেহই কিছুই নহে; সকলেই সেই পরমাত্মার তেজে অনুপ্রাণিত। উপনিষদ উক্ত ইন্দ্রিয়দিগের শাসন ও অগ্ন্যাদি ভূতদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব বিষয়ক আখ্যান পাঠ করিলে, তাহাই জানাযায় বটে, কিন্তু তা বলিয়া আমাদের প্রত্যেকরই নিজ নিজ সত্তা নাই, ইহা স্বীকার করিতে মন চাহে না। দেহ বলিল, শেষে যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তোমার প্রাধান্য বিষয়ে যাহা বলিলে, তাহা স্বীকার কিরূপে করা যাইতে পারে? ঋষিগণ যে তোমাকেই ধারণ করিবার জন্য মণিমন্ত্র ঔষধি ধারণ করিতেন, তাহা নহে। দেহের পুষ্টি ও উন্নতি তাঁহাদিগের লক্ষ্য ছিল, দেখ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বলে,

"ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণা মারোগ্যং মূলমুত্তমং" এবং মহা কবি কালিদাস মহাদেবের মুখে বলাইয়াছেন, "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং" অতএব দেখা যাইতেছে আমি না থাকিলে, তুমি থাকিতে পার না; আমি আধার তুমি আধেয় তোমার

এমন ক্ষমতা নাই যে, তুমি স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতে পার। আমি অসুস্থ হইলে, তুমি যাই যাই কর, তবে এক্ষণে আমার প্রতি তোমার এত কোপ্ কেন?

প্রাণ কহিলেন, দেহ! কোপের কথা বলিও না। তোমার সুস্থতাতেই আমার আনন্দ এবং তুমি অপটু হইলে, আমার কষ্টের অবধি থাকে না। দেখ এই জীবাশ্রিত দেহে তুমি ও আমি কতকাল বাস করিলাম। শৈশবে নূতন আনন্দে ও উৎসাহে তুমি ও আমি দুইজনে পরস্পরের সৌভ্রাত্রে বর্দ্ধিত হইয়াছি, লৌকিক পিতা মাতার যত্ন তুমি যেমন পাইয়াছ, আমিও সেইরূপ পাইয়াছি, তবে তোমার রূপ বাহ্য ও আমার অন্তর। লৌকিক পিতামাতা তোমাকে দেখিয়া ও তোমাকে যত্ন করিয়া সন্তুষ্ট ও কৃতার্থ হইবেন, কিন্তু আমি না থাকিলে, তোমার সে বাহ্য রূপের বাহার কোথায় থাকে বল? যৌবনে তোমার রূপের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু আমার সৌন্দর্য্যেরও বিকাশ ঘটে। জীব যতই সেই আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য দেখিতে চেষ্টা করে ও তাহাতে কৃতকার্য্য হয়, ততই তাহার দৈহিক রূপ লাবণ্যও জুটিয়া পড়ে। দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রয়াসী জীব অগ্নিতে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সেই ক্ষুদ্র বুদ্ধি কারণকে যাহা উপাসনা করে, তাহার ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী।

"যত্নেতৃণ কাষ্টখান।
রহে যুগ পরিমাণ॥
কিন্তু যত্নে দেহনাশ।
না হয় বারণ॥"

তোমার যখন এতই দুর্দ্দশা তখন তোমার প্রাধান্য আমি কিরূপে স্বীকার কারিতে পারি?

দেখ প্রাণের সৌন্দর্য্য অনুশীলন দ্বারা কালে বৃদ্ধি পায়; কিন্তু কাল সহকারে তোমার সৌন্দর্য্যের হ্রাসই হইয়া থাকে। কি ইউরোপীয় মনীষীগণ কি এতদ্দেশীয় মনীষীগণ সকলেই এক বাক্যে প্রাণের সৌন্দর্য্যের সহিত দৈহিক সৌন্দর্য্যের যে অধিকতর বিকাশ হইয়া থাকে, তাহার স্বীকার করিয়া থাকেন।

কবিওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন,—

"*And beauty born of murmurring sound shall pass into her face.*"

এবং উপনিষদ ঋষি অবীত বিদ্য ছাত্রের মুখ মণ্ডল দেখিয়া তাহাতে পূর্ণ ব্রহ্ম জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক রশ্মি দেখিয়াছিলেন, বলিয়া বলিয়াছেন "ব্রহ্মবিদইবতে সৌম্য-মুখ মাভাতি"

অতএব দেখ দেহের বার্দ্ধক্যে তোমার সৌন্দর্য্য নাই, আমারই সৌন্দর্য্যে তোমার সৌন্দর্য্য। সকল জীবের ভাগ্যে সে সৌন্দর্য্যবত্তা সম্ভবে না; কিন্তু যাহাদিগের ভাগ্যে তাহা ঘটে, তাঁহারাই ধন্য, যখন কবি বর্ণনাচ্ছলে বৃদ্ধ তপস্বী সম্বন্ধে লিখিলেন—

"অথাজিনাষাঢ়ধর প্রাগল্ভবান্।
জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা॥
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং।
শরীর বদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা॥

তখন তপস্বিবরের দৈহিক সৌন্দর্য্য তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, তাঁহার মানসিক সৌন্দর্য্য দেহে ফুটিয়া পড়িয়াছে, তাহাই বর্ণনা করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

দেখ এই জীব দেহ এখন প্রৌঢ় বয়সে উপনীত হইতেছে ইহার পূর্ব্বকার কাহিনী সৌন্দর্য্য দিনে দিনে ক্ষয় পাইতেছে তুমিও ক্রমে অপটু হইয়া পড়িতেছ, চক্ষুর জ্যোতি কমিতেছে। ব্যাধি তোমাকে ক্রমেই আয়ত্তের ভিতর আনিতেছে; সেই নিমিত্ত আমার এক এক সময় মনে হয়, বুঝি আর অধিক দিন তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিব না, কিন্তু কি করি, কাল পূর্ণ না হইলে, তোমাকে ছাড়িতে পারিতেছি না; শাস্ত্র বলিয়াছেন "কাল মেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা" আমিও তাই ভৃত্যের ন্যায় কালের অপেক্ষা করিতেছি। যদি ব্যাধি তোমাকে কিছু কালের জন্য ছাড়িয়া দেয়, তবে আরও কিছু দিন তোমার সাহায্যে থাকিতে পারি নচেৎ নহে।

দেহ কহিল, প্রাণ বর্ত্তমান জীবাশ্রিত দেহের কথা ছাড়িয়া দাও— সাধারণতঃ বলিতে গেলে, সৌন্দর্য্যতো আমাকেই আশ্রয় করে; কি নারীগত সৌন্দর্য্য, কি পুরুষগত সৌন্দর্য্য, সকলেই আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; যখন কবি বলিয়াছেন,

"Oh ! She doth teach the torches to burn bright !
Heu beanty hangs upon the cheek of night ;
Like a rich jewel in an Ethiop's ear,
Beauty too rich for use, for earth too dear !"

Shakspeare.

তখন তোমার সৌন্দর্য্যের নাম গন্ধও নাই; আমার সৌন্দর্য্যেরই কথা বলা হইয়াছে—

প্রাণ কহিলেন, সত্য বটে কিন্তু দেখ সেই কবিই আবার বলিয়াছেন—

Beauty is but a vain and doubtful good,
A shining gloss that fadeth suddenly;
A flower that dieth when it firs't gins too bud;
A brittle glass, that is broken presently,
A doubtful good, a gloss, a glass, a flower;
Lost, faded, broken, dead within an houu.

Shakspeare.

তোমার সৌন্দর্য্যের যখন এইদশা তখন আর অধিক বড়াই করিও না। দেহ কহিল, গোলাপের সৌন্দর্য্য ক্ষণস্থায়ী বলিয়া হেয় নহে। কালে সৌন্দর্য্যের উদয় ও কালেই বিলয় হইয়া থাকে। তুমি ও আমি কালের বশবর্ত্তী। কালই সুন্দর কালই ভীষণ একাধারে তিনি দুই। "সভীমরূপ শিব ইত্যুদীর্য্যতে"—আমরা তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিতে চাহি, রুদ্র মুখ দেখা আমাদের অভিপ্রেত নহে। দেহ কহিল, প্রায় রাত্রি অধিক হইল, আমার বিশ্রামের আবশ্যক, তবে এই পরিণত বয়স্ক জীবের বল সঞ্চার হইবে, অতএব অদ্য আর বাদানুবাদে আর কাজ নাই। প্রাণ সম্মত হইলেন; সব গোল মিটিয়া গেল।

গীত।

লেখক, কবিবর শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামকেলি ঝাঁপ তাল।

জঙ্গলে মঙ্গল আছে,
শুনেছ মন কার কাছে।
স্থাবর জঙ্গমে সে যে মঙ্গলময় বিরাজে॥
জলে হরি স্থলে হরি অনলে অনিলে হরি,
কোন্ স্থান পরিহরি যাবি হরি যথায় আছে॥
মহাভ্রান্তি বশে মন ভ্রম ত্রিভুবন বন,
যে বনে সাধনের ধন (আছে) সে বন তোর হৃদয় মাঝে॥

বাবা ওঁকার দেব।

(অত্যাশ্চার্য্য যোগীর অপূর্ব্ব ক্রিয়া)

লেখক—শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে, পঞ্চনদ বিধৌত পঞ্জাব প্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে পবিত্র ও প্রাচীন কুরুক্ষেত্র তীর্থে প্রবেশ করিবার জন্য অভিলাষী হইয়া এক দিবস সায়ঙ্কালে থানেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশনে বাষ্পীয় শকট হইতে অবতরণ করিয়াছিলাম। তখন শরৎকাল; বায়ু শীতল; চারিদিকে সন্ধ্যার প্রকোপে নৈসর্গিক পদার্থ পুঞ্জ নয়ন সম্মুখে অদৃশ্য প্রায় এবং গগণে গম্ভীর জলদ রাশি বর্ত্তমান ছিল। সার্দ্ধেক ক্রোশ দূরবর্ত্তী কুরুক্ষেত্র নগরে সেই অস্থবিধা জনক সময়ে অগ্রসর হইতে অভিলাষী না হইয়া, কিয়দ্দূরে আমেরিকান প্রেস্ বেটেরীয়ান মিশন নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ভুক্ত বাঙ্গালী পাদ্রী শ্রীযুক্ত বি, সরকার মহাশয়ের কুঠি বা বাংগ্লো বাটীতে উপনীত হইলাম। রেলওয়ে ষ্টেশন প্রাঙ্গন হইতে এই কুঠি অনেকটা দূরে অবস্থিত; ইহার চারিদিকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কুরু পাণ্ডবগণের ভুবন প্রখ্যাত মহাসময়ের সুপ্রাচীন ও সুপ্রশস্ত প্রান্তর (ময়দান বা মাঠ) দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিকটে লোকালয় নাই, চতুর্দ্দিকে কেবল এক মহাবিশাল প্রান্তর বিদ্যমান। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টক বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন বন অথবা অভ্রভেদী অত্যুচ্চ মহীরুহ সমূহ দণ্ডায়মান। রেভরেণ্ড সরকার বাবুর মিশনপ্রাঙ্গন মধ্যে একটী অনতি বৃহৎ গির্জ্জা, পাচকগণধিকৃত পাকশালা, ভৃত্যদের বিরাম গৃহ, কতিপয় খৃষ্টান বালক ও যুবকের অবস্থানের ঘর এবং পাদ্রীর কুঠি দৃষ্ট হইয়াছিল। সরকার বাবু যখন সাহারাণ পুর নগরের মিশন স্কুলে হেড্‌মাষ্টার ছিলেন, তখন আমি একবার তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছিলাম, সুতরাং এবারে আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন্ হয় নাই। পাদ্রী মহাশয় আমাকে সাদরে গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সহধর্ম্মিনীর নিকটে আমাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহার পত্নী পঞ্জাব দেশীয় স্ত্রীলোক, তিনি বাঙ্গালা ভাষার একটি অক্ষরও জানেন না, কিন্তু উর্দ্দু ও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতা রাখেন।

ক্রমে অন্ধকার ঘন হইয়া আসিল এবং নৈশ সমীরণ শীতল হইতে শীতলতর হইতে লাগিল। সম্মুখের গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোড্ (পথ) দিয়া কদাপি দুই একজন লোক গমনাগমন করিত, রাত্রি সমাগত দেখিয়া সেই পথ দিয়া আর কেহ চলিতে সক্ষম হইতেন না, সুতরাং মিশন প্রাঙ্গনস্থিত কয়েকজন মনুষ্য ব্যতীত সেই স্থানে অপর মনুষ্যের গন্ধ পর্য্যন্ত রহিল না। বলিতে পারি না, সেই রাত্রে, কি প্রয়ো-

নীয় কারণ বশতঃ, কুঠির অনেক লোক অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল। বাংগলো ঘরের চৌকিদার পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল না।

রাত্রি অষ্টম ঘটিকার সময় ভৃত্যেরা যখন শয্যার বন্দোবস্ত করিতে ছিল, তখন আমি মেমসাহেবকে কহিলাম "ঘরের মধ্যে না শুইয়া আমি বারান্দায় নিশি যাপন করিতে ইচ্ছা করি। বহির্দ্দেশের বায়ু সেবন করিতে করিতে নিদ্রিত হওয়া আমার অনেক দিনের অভ্যাস আছে।" তিনি বলিলেন, "এরূপ শৈত্যময়ী আঁধার রজনীতে আপনাকে বারান্দায় আমি শুইতে দিতে সম্মতা হইতে পারি না।" যাহা হউক, অবশেষে তিনি অগত্যা সম্মতি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একজন বালক ভৃত্য একখানি "নারিকেল দড়ির খাটিয়া" ঐ বারান্দায় বিস্তৃত করিল এবং তদুপরে মেমসাহেব প্রদত্ত শয্যাদি যথারীতি রক্ষা করিয়া একটা ল্যাম্প স্থাপন পূর্ব্বক কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। ঐ রাত্রে আমার সঙ্গে একখানি সুবৃহৎ ও সুন্দর ব্যাঘ্র চর্ম্মাসন ছিল, তাহা রাজপুতানান্তর্গত কোন রাজী আমাকে উপহার দিয়া ছিলেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেল্লেরী (কিস্কিন্ধ্যা) নগরীতে তৈয়ারী একখানা স্থূল কম্বল, কয়েকটা দেশীয় ঔষধ, কয়েক খানি পুস্তক এবং একটা ক্ষুদ্রাকার থলি মধ্যে দশ ও কুড়ি টাকার কয়েক খানি নোট ও কিছু রৌপ্য মুদ্রা রক্ষিত ছিল। তদ্ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পর্কে দুইখানি অতি প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও প্রয়োজনীয় পুস্তকের দুইখানি হস্ত লিখিত অনুলিপি (নকল) আমার সঙ্গে ছিল। এই দুই পুঁথি পশ্‌তো ভাষায় লিখিত; এই দুষ্প্রাপ্য পুঁথিদ্বয় কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে আমি পশ্চিম উত্তর প্রদেশ পরিভ্রমণ কালে কান্দাহার নগরে প্রাপ্ত হইয়া ছিলাম। অনেক দিন পর্য্যন্ত পেশোয়ার নগরে জনৈক বন্ধুর বাটিতে ইহা আমি রাখিয়া দিয়াছিলাম; কোন প্রয়োজনীয় বশতঃ সম্প্রতি আমি অন্যত্র লইয়া যাইতে ছিলাম। আমার শয্যার নিম্নে এই সমুদয় দ্রব্য সযত্নে রাখিয়া দিয়া, ল্যাম্পের আলোক নির্ব্বাণ পূর্ব্বক, আমি নিদ্রা দেবীর শরণাগত হইলাম। ভক্ত বৎসলা তন্দ্রাদেবী ভক্তের মনো বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে সুনিদ্রা আমাকে আক্রমণ করিল। লোকে কথায় বলে "মরামানুষ আর ঘুমন্ত মানুষ প্রায়ই এক। কথাটা বাস্তবিক নয় কি?

রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় আনুমানিক তিন ঘটিকার সময় বোধ হইল, কে যেন বল প্রয়োগ করিয়া আমার গা টিপিয়া দিতেছে। হঠাৎ শয্যা হইতে গত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তখন আমার মাথায় অতীব দীর্ঘ কেশ ছিল, সেই

কেশ গুচ্ছ "খাটিয়ার" কোনের দড়িতে আট্‌কাইয়া গিয়া আমাকে ভয়নেক অসু-বিধায় পতিত করিয়া দিল। আমি চক্ষু খুলিবামাত্র দেখিলাম, একটা স্থূলাকার কিন্তু খর্ব্বাকায় মানুষ মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে বারান্দা হইতে সজোরে লম্ফ দিয়া নিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক ভয়ানক তীব্র বেগে দূরবর্ত্তী বনের দিকে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। আমি ইতিমধ্যে অবাধ্য কেশ গুলকে সুস্থির করিয়া ল্যাম্প জ্বালিলাম। হরিবোল হরি!! আলোক হাতে করিয়া শয্যা পরীক্ষা করনান্তর দেখিলাম, আমার সকল দ্রব্যই স্থানান্তরিত হইয়াছে। সেই লোক আমার টাকা, লোটা, কম্বল, ব্যাঘ্র চর্ম্ম, বই, পুঁথি ইত্যাদি সমুদয় দ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া পলাইয়াছে। লোকটার নাম, ধাম, বয়স বা জাতি, কিছুই জানি না; চেহারা দেখিয়া অনুমান করিয়াছিলাম, অনেক বৎসর পূর্ব্বে যখন সিঙ্গাপুর ও পিনাং দেশে গিয়াছিলাম তখন এই প্রকার লোক দেখিয়াছিলাম।

প্রত্যুষে সরকার বাবু আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রিতে আপনার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় নাই তো? শীতে কষ্ট পা'ন নাই তো?" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া নীরব রহিলাম, আর কিছু বলিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম, ইনি এত যত্ন করিয়া আমাকে রাখিয়াছেন, ইহাঁকে ইহাঁর বাটীর চুরির কথা জানাইলে ইনি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইতে পারেন, এই কারণে ইহা প্রকাশ না করাই ভাল। প্রাতে বেলা নয়টার সময়, রৌদ্র প্রখর হইয়া শৈত্যের অপনোদন করিয়া দিবার পরে, আমি বাংগ্‌লো পরিত্যাগ করিয়া কুরুক্ষেত্র অভি-মুখে অগ্রসর হইলাম। সরকার বাবু ও তাঁহার পত্নী আমাকে আরও দুই একদিন রাখিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু আমি আর রহিলাম না। তাঁহারা বিমর্ষ হইয়া আমাকে বিদায় দিলেন, এবং রাত্রির দুর্ঘটনার কথা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

বলা বাহুল্য, আমার সঙ্গে আর একটা কাণা কড়িও ছিল না; আধ পয়সার মুড়ি কিনিয়া ক্ষুধা শান্তি করাও আমার পক্ষে সহজ সাধ্য ছিল না। আবার কম্বল ও শার্দ্দুল চর্ম্মাসনটি পর্য্যন্ত চুরি গিয়াছে, অথচ শীতঘন হইয়া আসিতেছে। আমার সে সময়ে একটা ব্রত ছিল; ঐ শাস্ত্রীয় ব্রতের নিয়মানুসারে ব্রতধারী কোন বিবাহিত ব্যক্তির গৃহে থাকিতে পারেন না; যদি বিশেষ কারণে গৃহস্থের বাটীতে থাকিতে বাধ্য হয়েন, তাহা হইলে সেই গৃহের কোন দ্রব্য আহার করিতে পাইবেন না। সরকারের বাটীতে আমি ঐ নিয়মই পালন করিয়া ছিলাম এবং

কুরুক্ষেত্রেও ঐ নিয়ম পালন করিতে বাধ্য। ব্রত সমাপ্ত হইতে তখনও কয়েক মাস বাকি ছিল, সুতরাং পাঠক মহাশয়! ভাবিয়া দেখুন, আমাকে কি দুর্দ্দৈব অবস্থায় পতিত হইতে হইল। কুরুক্ষেত্রে এবারে আমি নূতন আসি নাই, পূর্ব্বেও কয়েক বার আসিয়াছিলাম, তথায় অনেক বন্ধুও ছিল, কিন্তু কাহারও বাটীতে গেলাম না। সমস্ত দিন মুখে জল দিই নাই। ক্ষুধা ও পিপাসায় অস্থির হইয়া আছি। কিন্তু আমার সঙ্গে তখন মুড়ি মুড়কি কিনিবার পয়সাটিও ছিল না। যাহা হউক, অপরাহ্ণ চতুর্থ ঘটিকার সময় একটা সুবৃহতী পুষ্করিণীর পাড়ে একাকী পরিভ্রমণ করিতেছি, আর একটা হিন্দী "ভজন" গাহিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক, এক মেমসাহেব ও তাঁহাদের এক জন ভৃত্য আমার দিকে বেড়াইতে বেড়াইতে আসিতেছে। আমার সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ পরিচয় হইল এবং প্রায় এক ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া নানাবিধ ধর্ম্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। আমি বিদায় গ্রহণ করিবার সময়, মেমসাহেব আমার হাতে কুড়ি টাকার একখানি নোট দিয়া কহিলেন, "সাধুগণকে সাহায্য করা আমরা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি।" সাহেব বলিলেন, "আমরা গবর্ণমেণ্টের ডাক বাংগলো মধ্যে আছি। সুবিধা মত আর একদিন আপনার সঙ্গে এই মনোরম বিষয়ের আবার প্রসঙ্গ করিব।" আমি কিয়দ্দূর চলিয়া গেলে সাহেব আমাকে ডাকিলেন। আমি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব বলিলেন, "আমরা শুনিয়াছি ভারত-বর্ষে খুব ভাল ভাল যোগীর দর্শন হইয়া থাকে। আপনি কি এমন কোন স্থানের নাম করিতে পারেন, যেখানে ভাল যোগীর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে? অথবা কোন যোগীকে আমাদের কাছে আনিয়া দিতে পারেন? আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। আমরা এমন লোক চাই, তিনি প্রকৃত যোগী এবং সত্যবাদী ও খলতা (কপটতা) শূন্য।" আমি কহিলাম, "আগামী কল্য অপরাহ্ণে আমি ডাক বাংগলো মধ্যে গিয়া আপনাদের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব এবং এই বিষয়ে যাহা বক্তব্য তাহা কহিয়া আসিব।"

পুষ্করিণী হইতে কুরুক্ষেত্র নগরে আসিবার পথে আমি ঐ নগরে তহশীলদার পোষ্টমাষ্টার ও সেরেস্তাদার মহাশয়কে একত্রে দেখিতে পাইলাম। সেখানে কোন ভাল সাধু আছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করায়, সেরেস্তাদার বলিলেন, "সহরের পার্শ্বে, সুবৃহৎ ময়দানের উপরে যে ক্ষুদ্র পর্ণ কুঠির দেখিতে পাইবেন, তাহা শ্রীশ্রীমৎ বাবা ওঁকারদেবজী মহাপুরুষের আশ্রম। সম্প্রতি তিনি এই স্থানে আছেন।

ইনি নরাকারে দেবতা ; ইঁহার ক্ষমতা অত্যদ্ভুত। ইনি প্রজ্জলিত হুতাশন মধ্যে বসিয়া থাকিতে পারেন, জলে ডুবিয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া থাকিতে পারেন, কাঁটার উপর দিয়া চলিয়া যান, সর্প বিষ ভক্ষণ করিয়া মরেন নাই; লৌহের সিন্দুক মধ্যে চারি দিবস জল ও আহার্য্য দ্রব্য এবং বায়ু ও আলোক ব্যতিরেকে বাস করিয়াছিলেন এবং তদ্ভিন্ন অনেক অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। এই সাধু অপৌরুষের সামর্থ সম্পন্ন। ইনি চর্ব্বিশ ঘন্টাই বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন। এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। কবির কথাটি মনে পড়িল—

"যদি অভিলাষ মত অতুল ঐশ্বর্য্য যত
করতল গত হয় কামধেনু মত।
কিম্বা যদি শত্রুদলে আমার চরণ তলে
পালিত দাসের মত রহে অবনত॥
তবু দেখ সে সকলে নাহি কোন ফলাফলে
কারণ এ জগতের সকল অস্থায়ী।
কল্পনাও যদি রয় তবুসুখ নাহি তায়
সার সুখ ব্রহ্মানন্দ রহে চিরস্থায়ী॥"

আমি তখন সেই ময়দানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সাধু দর্শন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল, এবং ইহাও ভাবিলাম—

"সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম।
ক্লান্ত হ'লে তথা করিও বিরাম॥"

সুপ্রশান্ত ময়দানের উপর দিয়া অনেকক্ষণ চলিতে চলিতে এক মহা শ্মশান ক্ষেত্র দৃষ্টিপথে পতিত হইল। শিবা ও সারমেয় তথায় উপস্থিত ছিল এবং অর্দ্ধ দগ্ধ বংশ, কাষ্ঠ, ভগ্নকলস, নরাস্থি প্রভৃতি পতিত দেখিলাম। নিকটে একটা অভ্রভেদী অত্যুচ্চ মহীরুহ ; তাহার পার্শ্বে আর একটা সুবৃহৎ বৃক্ষ। সেই সায়াহ্নে, সন্ধ্যার মলিনতায়, শ্মশান পার্শ্বে যাহা দেখিলাম, তাহাতে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল, আমি অবাক হইয়া গতিরোধ করিলাম। দেখিলাম, সেই গাছের উচ্চ শাখা হইতে একটা মানুষ আকাশের দিকে পা ও নীচের দিকে মাথা রাখিয়া ঝুলিতেছে। তাহার পা দুইখানি শক্ত রজ্জু দ্বারা শাখায় আবদ্ধ। আমি কিছুক্ষণ ইঁহাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, ইনিই সেই মহাপুরুষ ওঁকার দেব। তন্ত্র শাস্ত্র মতে শ্মশান পার্শ্বে ইনি একটা সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া

বৃক্ষতলে আমি দণ্ডায়মান আছি, এমন সময়ে ঐ সাধু পায়ের দড়ি খুলিয়া দিয়া শাখায় উপবেশন করিলেন, তদনন্তর মুহূর্ত্ত মধ্যে লম্ফ দিয়া নীচে অবতরণ করিলেন। সেই মহোচ্চ বৃক্ষ শাখা হইতে ঐ বৃদ্ধ বয়সে ঐরূপে লম্ফ দিলে মানুষ কখনই জীবিত থাকিতে পারে না; ইহা ধ্রুব সত্য, কিন্তু মহাপুরুষের কিছু মাত্রও ক্লেশ হইল না, তিনি হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিয়া পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় উর্দ্দু ভাষায় কহিলেন, "কেয়াজি! খয়ের হল্লা"—অর্থাৎ কি মহাশয়! সব ভালতো? তাহার পরে কহিলেন "তবিয়ৎ খোশ? বড়ি মেহেরবানগী কিয়ি-হ্যায়। খয়ের, পদারীয়ে। তশরিফলাইয়ে।" অর্থাৎ স্বাস্থ্য সুন্দর তো? এখানে এসে বড়ই অনুগ্রহ প্রকাশ কল্লেন। যাহা হউক, আমার সঙ্গে আসুন।" আমি নীরবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম, তিনি আমাকে তাঁহার পবিত্র পর্ণ কুটীরে লইয়া গেলেন। পথিমধ্যে আর একটি কথাও কহেন নাই। কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই আমার দিকে নয়ন নিক্ষেপ পূর্ব্বক সুন্দর ইংরাজিতে যাহা কহিয়াছিলেন, আমার সে সময়ের ডায়েরি (রোজনামচা) হইতে তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহার পরে অবগত হইয়া ছিলাম, ওঁকার দেব অনেক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

"মরি মরি!! আপনার মূল্যবান পুঁথি ও দুর্লভ পুস্তকগুলি কেমনে খোয়া গেল? যে ব্যক্তি আপনার এই সকল মূল্যবান দ্রব্য চুরি করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ব্যবসায়ী দস্যু।" কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। সরকারের বাংগ্‌লো ঘরের চুরির কথা আমি ভিন্ন আর কেহ জানিত না। যাহা হউক, তিনি আরও কহিলেন, চিন্তা নাই, চিন্তা নাই। টাকাকড়ি, কম্বল ইত্যাদি আর পাইবেন না। কিন্তু পুঁথি ও বই পুনরায় আপনার হস্তগত হইবে, ইহা নিশ্চয়।" এই কথা কহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুরুক্ষেত্র হইতে অতঃপর কোথায় যাইবেন?" আমি বলিলাম, "আগ্রা জেলার অন্তর্গত ফেরোজাবাদ নগরে। সেখানে কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন আছে।" সাধু বলিলেন, "তবে সেই খানেই বই ও পুঁথিগুলি আপনার হস্তগত হইবে। অপহৃত দ্রব্য (অর্থাৎ চোরাই মাল) উদ্ধার করিয়া দেওয়া যাহার জীবিকা, এমন এক ব্যক্তি আপনাকে ঐ দ্রব্য গুলি দিবে। অতএব চিন্তা নাই।" সাধুর কথা আমি কিছুই বুঝিলাম না, সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করি নাই, কিন্তু তাঁহার কথাটা স্মরণ রাখিলাম।

ক্রমশঃ রাত্রে শয়নের কিছু পূর্ব্বে ওঁকার দেবকে পুষ্করিণী পাড়ের বাঘ ও মেঘের কথা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, "আগামী কল্য অপরাহ্নে

তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" পর দিবস বৈকালে বেলা ৩টার সময় তিনি ও আমি একত্রে ডাক বাংগ্লো মধ্যে গিয়া সাহেব ও মেমসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। ওঁকার দেবজীর সুপরিচয় দিবার পরে তাঁহারা সাধুজীকে পরম আদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। সকলেই উপবিষ্ট হইলে বিবি বলিলেন, "মহাশয়! দিল্লীনগরী হইতে কুরুক্ষেত্র আসিবার সময় আমরা তথাকার টেলিগ্রাফ মাষ্টারকে কহিয়া আসিয়া ছিলাম, আমাদের নামে কোন টেলিগ্রাফ আসিলে কুরুক্ষেত্রে যেন (*Redirected.*) পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তদনুসারে গত পরশ্ব দিবস আমার এথানে দিল্লীনগরী হইতে এক টেলিগ্রাফ পাইয়া ছিলাম। ঐ তারের সংবাদটি আমেরিকা হইতে আসিয়াছিল। আমার পূজ্যপাদ পিতা আমেরিকা দেশে কঠিন পীড়ায় শয্যাগত; তিনি মৃত্যুর অতি নিকটে অবস্থিত; তাঁহার প্রাণ রক্ষার অনুমাত্র আশা নাই। আমার পূজনীয় পিতৃদেব স্বর্গবাস করিয়াছেন কি, এখনও জীবিত আছেন? আমি ইহার ঠিক উত্তর চাই।" যোগী কহিলেন, "আপনার যতগুলি প্রশ্ন আছে, অথবা যাহা কিছু বলিবার আছে, তৎসমুদয় প্রথমে শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনার কথা সমাপ্ত হইলে আমি যথোচিত উত্তর দিব।" মেমসাহেব তখন পুনরপি যাহা কহিতে লাগিলেন তাহা এই—"আমার স্বামী ইংরাজ; ইংলণ্ডনগরের তিনি অধিবাসী। আমার পিতা ও মাতা আমেরিকা দেশের নিউইয়র্ক নগরের লোক, আমার বিবাহ হইবার পরে স্বামী সহ আমি ইংলণ্ডে বাস করিতেছি। আমরা রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান। ভারতবর্ষে নানা দেশ দর্শন করিবার জন্য বিলাত হইতে আমরা আসিয়া এ দেশে ভ্রমণ করিতেছি' সম্ভবতঃ এক মাস কাল মধ্যে আমরা ইংলণ্ডে চলিয়া যাইব। আমার পিতা আমেরিকা দেশের একজন মহাধনী ব্যক্তি। নগদ টাকার ও ভূসম্পত্তিতে তিনি বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী। আমার আর ভাই কি ভগ্নি নাই, আমিই একমাত্র আমার জনকের অপত্য। কিন্তু নানা কারণে পিতৃদেব আমার উপরে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট। কারণ গুলি অতিশয় গোপনীয় সুতরাং তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। যাহা হউক, যদি পিতা তাঁহার মৃত্যুকালে আমাকে ধন সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিয়া যান ভাল কথা; না করেন, তাঁহার পর লোক গমনের পরে তুমুল মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইবে। যদি আমার পিতার মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে টাকা কড়ি ও ভূ-সম্পত্তি প্রভৃতি কে পাইল? আপনি কি এই সব কথার খাঁটি উত্তর দিতে পারেন?" কথা শুনিয়া সাধু বলিলেন, "কয়েক ঘণ্টার জন্য আমি একটা কুটিরির ভিতর নির্জ্জনে অবস্থান

করিতে ইচ্ছা করি। ঐ ঘরে যেন আর কেহ না যায়। ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমি আপনার সকল প্রশ্নের খাঁটি জবাব দিতে পারিব।" মেমসাহেব সম্মতা হইলে বাংগলোর একটা কুটুরি মধ্যে সাধুজী প্রবেশ করিয়া গবাক্ষ ও দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। সে ঘরে আর কেহ যাইতে পাইল না। ঘরের মধ্যে কি হইতে লাগিল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না। আনুমানিক সার্দ্ধ তিনঘন্টা বা চারিঘন্টা পরে ওঁকারদেব ঐ কুঠুরি হইতে বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব ঐশীজ্যোতি দেখা গেল; নয়ন দ্বয়ে অত্যাশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক আলোকের ছায়া দৃষ্ট হইতে ছিল। তিনি বলিলেন, "তোমরা এখন ধৈর্য্য সহকারে আমার কথা শুন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে উপবেশন করিলে পর মহাপুরুষ যাহা কহিয়া ছিলেন, এখানে অবিকল তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি বলিলেন—"হাঁ তোমার পিতা সাংঘাতিক রোগে শয্যাগত, তিনি মৃত্যুর অতি নিকটে পৌছিয়াছেন, তাঁহার বাঁচিবার আর আশা নাই। দুই তিন দিন মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হ্যারিশ সাহেব তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন, ডাক্তার কহিয়াছেন, তোমার পিতার প্রাণ রক্ষার আর আদৌ আশা নাই। পাদ্রীবোচ্‌কুফট্ সাহেব নিত্য দুই তিনবার আসিয়া তোমার পিতার পরকালের কল্যাণ কামনায় ভগবৎ প্রার্থনা করিতেছেন। আমি আমেরিকায় গিয়া তোমার পিতাকে দেখিয়া আসিলাম, অথবা আমার "সূক্ষ্মশরীর" তথায় গিয়াছিল বলিলেই পরিষ্কার বলা হয়। তোমার প্রিয়তমা বন্ধু কুমারী (মিশ) জেম্‌সন্ আমাকে তোমার পিতার সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। তোমার জনক তাঁহার হাত তুলিয়া আমাকে সেলাম করিয়াছেন, কিন্তু কথা কহিতে পারেন নাই। তাঁহার এখনও জ্ঞান আছে। তোমাদের বাড়ীখানা সদর রাস্তার পার্শ্বেই অবস্থিত। ফটকের কাছে ইটালী দেশীয়া এক প্রসিদ্ধা রমনীর পাথরের মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছি। কোনের দিকের বড় হলে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পাখি দেখিলাম; বারান্দার পার্শ্বের ঘরে অনেক গুলি বালক বালিকা রহিয়াছে। বোষ্টন নগর হইতে এক পাদ্রী ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। তোমাদের বাটী দ্বিতল। সম্মুখে ঘাষের ময়দান খুব সুন্দর, তাহাতে চারিটা ফোয়ারা, সেগুলি বড়ই মনোহর। তোমার পিতা ইতিমধ্যেই "উইল" করিয়াছেন। তুমি তাঁহার ভূসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছ; উইলে তাহাই লিখিত রহিয়াছে; কিন্তু নগদ টাকাকড়ি কিছুই তিনি তোমাকে দেন নাই। কাহাকে দিয়াছেন জান? তোমার জননীর মৃত্যুর পরে

তোমার পিতা আর্ম্মেনী দেশীয় একটা পরমাসুন্দরী রমণীকে পত্নী রূপে ঘরে রাখিয়াছিলেন, তাহার গর্ভজাত একমাত্র পুত্রকে তোমার পিতা সমুদয় নগদ ধন দিয়াছেন। উইলে তাহাও লিখিত আছে, তুমি আমাকে বলিয়াছ. নানাবিধ গুপ্ত কারণে তোমার পিতা তোমার উপরে অসন্তুষ্ট। আমি সেই গুপ্ত কারণ গুলি জানিতে পারিয়াছি। সেই সব ভয়ানক কথা সেই সব মহা গোপনীয় কথা—সেই সব আশ্চর্য্য কেলেঙ্কারী কথা—গোপনে কহিতে পারি।" অবাক হইয়া মেমসাহেব ঐ সাধুকে স্বতন্ত্র ঘরে লইয়া গেলেন এবং চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া মহাপুরুষের কথা শুনিতে লাগিলেন। কথা শেষ হইলে, বিবি কহিলেন, আমাকে দুই মিনিটের জন্য বিদায় দিউন। দুই মিনিট পরে মেমসাহেব তাঁহার হ্যাট্ (টোপি) আনিয়া মহাপুরুষের পায়ে রাখিয়া করযোড়ে কহিলেন আপনি ভগবানের দূত এবং মানবজাতির প্রভু।

পাঠক মহাশয়! আমি কয়েক দিবস ঐ সাধুর কুটীরে ছিলাম। সাহেব ও মেমসাহেবের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা জন্মিয়া গিয়াছিল। তাঁহার বিলাত গমনের পরে আমার সহিত তাঁহাদের পত্রাপত্রি চলিত। মেমসাহেব লিখিয়াছিলেন, সাধুর মুখারবিন্দ হইতে যে সকল কথা নিঃসৃতা হইয়াছিল, "তাহার প্রতিকথা অকাট্য সত্য। ধরাতলে ইনি দেবতা। এই সাধু মানুষ নহেন, পূর্ণ দেবতা।" আমি তখন কবির ভাষায় আনন্দে গাহিলাম—

হে প্রভো!
তব পদাম্বুজ প্রসাদের কণা
পাইয়া সুজন হয়েছে যে জনা
সেই জানে দেব! মহিমা তোমার
অন্যে অন্বেষিয়া বুঝিবে কি আর॥

এইবারে সেই চুরির কথা। মহাশ্চর্য্য ব্যাপার!! স্মরণ হইলে এখনও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া উঠি। এক পক্ষকাল মধ্যে আমি আগ্রা জেলান্তর্গত ফিরোজাবাদ নগরে পৌছিলাম। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাটীতে আমার প্রয়োজন ছিল, তাঁহার বৈঠকখানার নিকটে গিয়া শুনিলাম, তিনি সপরিবারে অন্যত্র গিয়াছেন, এক মাসের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবেন না। একজন ক্ষত্রিয় কহিল, "আপনি চিন্তিত হইবেন না। এই নগরের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তির নাম লালা সোহন লাল। তাঁহার বাটীতে গিয়া আপনি অবস্থান করিতে পারেন।" আমি অগত্যা লালা সাহেবের বাটীতে গিয়া পৌছিলাম। তাঁহার কথাবার্ত্তা মধুর এবং তিনি

বিদেশী দিগের বন্ধু। অতি যতনের সহিত তিনি আমাকে স্থান দিলেন ; আমি তাঁহার বাটীতে মাত্র রহিলাম, কিন্তু তাঁহার ঘরে না খাইয়া বাজারে এক ময়রার লুচি ইত্যাদি খাইতে গেলাম। সোহন লাল ইহাতে দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু আমি আমার নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারিলাম না।

জলযোগ করিয়া আমি লালার বাটীতে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলাম। অপরাহ্ণ চতুর্থ ঘটিকার সময় লালার একটী বন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল লালা আমাকে কহিল, "আমার একটি মিত্র আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত কোন বিষয়ের গুপ্ত পরামর্শ করিতে হইবে, সুতরাং কিছুক্ষণ আমি অন্যঘরে বসিব। আপনি ততক্ষণ আমার টেবিলস্থিত ইংরাজী খবরের কাগজ পড়িতে পারেন।" লালা চলিয়া গেলে পর আমি কিছুক্ষন সম্বাদ পত্রখানা পড়িয়া একখানি চিঠি লিখিতে বসিলাম। চিঠিখানার অর্দ্ধেকাংশের লেখা শেষ হইলে, বোধ হইল, পশ্চাদ্দিক হইতে কে যেন সজোরে পাঁচটা অঙ্গুলি দ্বারা আমার পিঠে আঘাত করিল। আমি পশ্চাদ্দিক চাহিয়া দেখিলাম, কোন মনুষ্য নাই। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে বা গৃহমধ্যে কোথাও কেহ ছিল না। আমি একাকী ছিলাম। সুতরাং অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া চেয়ার হইতে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। চারিদিকে পুনরায় চাহিয়া দেখি, জানালার নিকটে লোহার একটা বড় গজালে, একটা বৃহদাকার ক্যাম্বিসের ব্যাগ ঝুলিতেছে, ব্যাগটা পুরাতন মলিন ও স্থানে স্থানে ছেঁড়া। অতি তীব্র বেগে ব্যাগটা দুলিতেছিল, যেন প্রবল ঝড়ে ইহাকে হেলাইতেছিল, অথচ জানালা দিয়া অতি সামান্য বায়ু বহিতেছিল। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ব্যাগে হাত দিলাম। ব্যাগটার উপরে সজোরে হস্ত রাখিবা মাত্র এক স্থানের ছিন্ন ভাগের ছেঁদা দিয়া কতকগুলা দ্রব্য নীচে পড়িয়া গেল হরি বোল হরি!! নিম্নে চাহিয়া দেখি, আমার সেই বই ও পুঁথি!! অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া তাহা ভূমি হইতে উঠাইয়া টেবিলের উপরে রাখিলাম।

যখন লালা আসিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি এই বই ও পুঁথি কোথায় পাইলেন? ইহা আমার।" লালা কহিল, "একজন পুরাতন পুস্তক বিক্রেতা ইহা আমাকে বিক্রয়করিয়া গিয়াছে।" আমি অন্যত্র চলিয়া গেলাম। তখন স্মরণ হইল, কুরুক্ষেত্রের সেই অসাধারণ যোগী—সেই তপ প্রভাব শালী মহাপুরুষ—আমাকে কহিয়া ছিলেন "যে নগরে যাইতেছ, সেই নগরেই তুমি তোমার পুস্তক ও পুঁথি পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।

আত্মরক্ষা।

লেখক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, ডি,

আমরা রোগের অনু বা বীজের দ্বারা সর্ব্বদা বেষ্টিত, সুস্থাবস্থায় আমাদেরদেহাভ্যন্তরে কলেরা রোগের বীজ, ডিপ্‌থিরিয়া রোগের বীজ, টাইফয়েড জ্বরের বীজ, এইরূপ নানা প্রকার রোগের বীজ থাকে। অনেক সংক্রামক রোগের বীজ সুস্থ মনুষ্যকে স্পর্শ করিয়া থাকিলেও তাহার কিছু ক্ষতি না হইতেও পারে। কতকগুলি অবস্থা আছে, যাহাতে মনুষ্যের রোগ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি হ্রাস হইয়া যায়, এই শক্তি কিসে হ্রাস হয়, কিসে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহা সকল গৃহস্থের মোটামুটী জানা উচিত। আমাদের দেহের রক্তে এক প্রকার অনু (*whitecor pachil.*) আছে, ইহারা সর্ব্বদাই রোগের অনুর সহিত সংগ্রাম করিয়া দেহকে নীরোগ করিয়া রাখে, জগৎ রোগের অনুশূন্য কখনই হইবে না, কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের দেহ রক্ষক অনু গুলিকে সতেজ রাখিতে পারিলে, আমাদের সংক্রামক রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অনেক সম্ভাবনা।

একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত একটা কলেরা বীজ সংলগ্ন পদার্থ পান করেন, তাহাতে তাঁহার কলেরা রোগে মৃত্যু হইল না, তৎপরে তিনি আফিং ব্যবহার করিয়া এবং আপনার উদরের রোগাণু নাশ করিবার শক্তি হ্রাস করিবার জন্য কতকটা সোডা চূর্ণ সেবন করেন। এইরূপ প্রস্তুত হইয়া তিনি পুনরায় কলেরা সংসৃষ্ট পদার্থ পান করেন, এ প্রক্রিয়াতে তাঁহার ভয়ঙ্কর কলেরা রোগে কষ্ট পাইতে হয়, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের শরীর রক্ষক অনুগুলি বিশেচষ্ট না হইয়া পড়িলে আমাদের সংক্রামক রোগ প্রায়ই হইতে পারে না

পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আফিং বা সুরা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে আমাদের দেহ রক্ষক অনুগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, অধিকাংশ উগ্রবীর্য্য ঔষধের ক্রিয়া এইরূপ। এই জন্য আফিং সুরা বা উগ্রবীর্য্য ঔষধ সর্ব্বদা সেবন করা যুক্তি যুক্ত নহে। পুনশ্চ দেখা গিয়াছে যে, দেহ অধিক উত্তাপে থাকিলে আমাদের দেহ রক্ষক অনুগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই জন্য অনেক মনুষ্য অধিকক্ষণ রৌদ্রে ভ্রমণ করিয়া ভীষণ রোগাক্রান্ত হন। ভয়, শোক, মনস্তাপ প্রভৃতি কারণে আমাদের দেহ রক্ষক অনুগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত কারণ সকলে আত্মরক্ষা শক্তির হ্রাস করিতে না পারে, এ বিষয়ে সকলের লক্ষ্য রাখা উচিত।

নিম্ন লিখিত কতকগুলি উপদেশ স্মরণ রাখিলে গৃহস্থের অনেক সংক্রামক

ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেহের মধ্যে যে সকল ক্রিমি বাস করে, তাহারা স্বতঃই আমাদের দেহে জন্মগ্রহণ করে না, পরন্তু তাহারা অন্য কোন স্থান হইতে আমাদের দেহে আনীত হয়, এক জনের দেহস্থিত ক্রিমির অণ্ড তাহার মলের সহিত বহির্দ্দেশে নিক্ষিপ্ত হয় এই অণ্ড জলের সহিত বা আহারীয় পদার্থের সহিত মানব দেহে পুনর্ব্বার প্রবেশ করে, সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, যদি পুষ্করণীর জলে জল শৌচ করিতে দেওয়া এবং সেই পুষ্করণীর জল পানার্থ ব্যবহার হয় তাহা হইলে সেই পানীয় জলের সহিত ক্রিমির অণ্ড আমাদের দেহে প্রবেশ করিতে পারে। সকলেরই এই ঘৃণার কথা স্মরণ রাখিয়া পানীয় জলের পবিত্রতা রক্ষা করা উচিত।

শাক-সব্জী, ওল, মান, আলু, পেয়াজ প্রভৃতি কন্দ অনেক সময় ক্রিমির অণ্ড সংযুক্ত থাকে, রীতিমত সিদ্ধ না হইলে, এই সকল শাকসব্জী হইতেও আমাদের দেহে ক্রিমির অণ্ড প্রবেশ করে, এমন কি ছানা যে সকল জলে ভিজাইয়া রাখা হয় সেই জল ক্রিমির অণ্ড বা কলেরা বীজের দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলে সেই ছানা খাইলে কলেরা বা ক্রিমি রোগ হওয়া অসম্ভব নহে, অনেকের ধারণা যে, গুড়, চিনি কলা প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য খাইলে উদরে ক্রিমি হয়, বাস্তবিক ইহারা যে ক্রিমিতে পরিণত হয় এইরূপ নহে, অত্যধিক পরিমাণে এই সকল দ্রব্য খাইলে পকাশয়ে এক প্রকার শ্লেষ্মা জন্মে, এইরূপ শ্লেষ্মাতে ক্রিমিগণ বাস করিতে ভাল বাসে, তিক্ত পদার্থ অথবা তার্পিণ তৈল, থাইমল প্রভৃতি তীক্ষ্ণ পদার্থ সেবন করিলে নাড়ী মধ্যে ক্রিমি বাস করিতে পারে না। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রমতে বহ্নিকে সর্ব্বভুক্ বলা হয়, অগ্নি সংস্পর্শে বিশুদ্ধ হইলে কোনও বিষাক্ত পদার্থ আমাদের দেহে মন্দ ক্রিয়া করিতে পারে না। জল, দুগ্ধ এবং শাক সব্জী প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য রীতিমত সিদ্ধ হইলে তাহাদের সহিত কোন বীজ আমাদের দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। বর্ষাকালে অনেক স্থলের বিষ্ঠা প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ জলের সহিত মিশ্রিত হয়, এই কারণে জল রীতিমত ফুটাইয়া পান করিলে, অধিকাংশ সংক্রামক রোগ না হইবার সম্ভব।

যত প্রকার সংক্রামক রোগ আছে তন্মধ্যে ফিরিঙ্গ রোগ উপদংশ ও গণোরিয়া যত ভয়ানক এরূপ আর কোন রোগই নয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোকে গলদ কুষ্ঠ ধবল রোগ প্রভৃতিকে সংক্রামক রোগ বলিয়া ঘৃণা করে কিন্তু বস্তুতঃ ইহাদের অপেক্ষা ফিরঙ্গ রোগ প্রভৃতি

অধিক সংক্রামক এই সকল সংক্রামক ব্যাধি মনুষ্য হইতে মনুষ্যে গমন করে, এই সকল রোগ হইবার প্রারম্ভে লবণ জলে ইন্দ্রিয় স্থান ধৌত করিলে সংক্রামক রোগ স্পর্শ করিতে পারে না। কণ্ডিজ ফ্লুইড লোশনে ধৌত করিলে ঐ রূপ ফল হয়।

লীলা খেলা।

লেখক, শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ।

পুরাকালে এক শিবভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভিক্ষালব্ধ যৎসামান্য দ্রব্যে কোন মতে দিনপাত করিতেন। কিন্তু সহস্র অসচ্ছলতার মধ্যে দেবাদিদেব আশুতোষের সেবায় শিথিলযত্ন হইতেন না। একদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় মর্ত্যভূমে ভ্রমণ করিতে করিতে মহেশ্বরী, ধূর্জ্জটীকে কহিলেন "প্রভো! এই ব্রাহ্মণ বড়ই ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচারী, দুঃসহ দারিদ্র-যন্ত্রণায় বিব্রত থাকিয়াও আপনাকে বিস্মৃত হয় না। আপনার কি উহার প্রতি কিছুমাত্র দয়া হয় না? প্রসন্ন হইয়া অচিরাৎ ইহার দুর্দ্দশার অবসান করুন, নতুবা জগতে আপনাকে কেহ আর পূজা করিবে না। আশুতোষ নামেও কলঙ্ক স্পর্শিবে। চিরদিনই দেখি, আপনাকে যে যত ভক্তি করে, আপনি তাহাকে ততই লাঞ্ছনা দেন। নিজেও কোন ক্লেশ গ্রাহ্য করেন না, ভক্তকেও সেইরূপ ক্লেশ দিতে কাতর হন না! যাহা হউক, ব্রাহ্মণের জন্য আমার বড় কষ্ট হইতেছে। আমার অনুরোধে উহার দুর্দ্দশা মোচন করুন।"

ভগবান ভবানীপতি ভগবতীর মুখে এইরূপ মধুর তিরস্কার শুনিয়া ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন,—"দেবি, ভক্তের জন্য আমারও ঐ রূপ প্রাণ কাঁদে, আমি তাহাদের দুঃখ, দুর্দ্দশা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকি না। তুমি জানিয়া শুনিয়া অনর্থক অনুযোগ করিতেছ। এতদিন বিপ্রের কর্ম্মযোগ ভাল না থাকায় সে কষ্ট ভোগ করিয়াছে। কল্য তাহা ঘুচিবে। কল্য সে প্রচুর অর্থ পাইবে, আমি তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছি। আর উহার জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই।"

দেব-দম্পতি যে সময় এইরূপ কথোপকথন করেন, তখন নিকটস্থ পাদপমূলে এক ধনী বণিক বিশ্রাম সুখোপভোগ করিতেছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণের অর্থ প্রাপ্তির বিষয় আদ্যোপান্ত শুনিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন ও মনে মনে ঐ বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রত্যূষেই ব্রাহ্মণের কুটীর দ্বারে উপনীত হইলেন। ধনবানের মান সর্ব্বত্র, দ্বিজবর, বণিক প্রবরকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া এই আকস্মিক আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, বণিক কহিলেন, "ঠাকুর, আপনার দুঃখ দেখিয়া বড়ই কষ্ট হয়, আমি সর্ব্বদাই আপনার কথা চিন্তা করিয়া থাকি, আপনি ঈশ্বর জানিত পুরুষ, আপনাকে দান গ্রহণ করাইয়া পাপ ভাগী হইতে ভয় হয়। সেই জন্য বুঝিয়াও কোন প্রতিকার করিতে পারি নাই। কল্য রাত্রে অনেক চিন্তার পর একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, অন্য সমস্ত দিনে আপনি যাহা কিছু পাইবেন, তাহার বিনিময় স্বরূপ আমার নিকট কি চাহেন? এইরূপে যদি আপনাকে অর্থ সাহায্য করা হয়, তাহা হইলে কোন পক্ষেরই ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করা হয় না। এখন বলুন, আপনি কি পাইলে সুখী হন?" পাষাণহৃদয় অর্থকীট বণিকের মুখে সহসা এমন করুণার নির্ঝরের উৎপত্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, একি? আজ সহসা পাষাণে কর্দ্দম কেন? যিনি—এক তোলা লবণ ধার দিতে ইতস্ততঃ করেন, তাঁহার আজ এমন সুমতি কেন? যাহা হউক, বিধাতার খেলা, বিধাতাই বুঝেন। বিশ্বেশ্বরের কৃপা না হইলে এরূপ হয় নাই। প্রকাশ্যে বলিলেন, আপনারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, ইচ্ছা করিলে আমার ন্যায় শত শত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করিতে পারেন। যখন আমার দুঃখ দূর করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন যাহাতে ভিক্ষাবৃত্তি ঘুচে, তাহার ব্যবস্থা আপনিই করুন।" শুনিয়া বণিক শত মুদ্রা দানের প্রস্তাব করিলেন। দ্বিজবর ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! একেবারে এতদূর! দ্বারে দ্বারে দান গ্রহণ করা যাহার নিত্য ক্রিয়া, তাহাকে দান গ্রহণে পতিত করার ছল ধরিয়া ভিক্ষা বিক্রয় করিবার প্রস্তাব লইয়া প্রত্যূষে আগমন, তাহার পর একেবারে একশত দিতে অঙ্গীকার! এ সমস্ত কি ইন্দ্রজাল? যাহা হউক, ছাড়িব না, দেখি, কত রহস্য আছে। বলিলেন "যদি এই প্রাচীন বয়সে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ না ঘুচিল, তবে এক শত টাকা লইয়া কি হইবে? যদি দুঃখ দূর করাই উদ্দেশ্য হয়, তবে তদুপযুক্ত ব্যবস্থা করুন।" বণিক বুঝিলেন, ব্রাহ্মণের ধন স্পৃহা বলবতী হইয়াছে, তাহারও সে দিনের লোভ-সম্বরণ করা অসাধ্য, তিনি ক্রমেই বাড়াইতে লাগিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণেরও কুতূহলের সহিত আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে লাগিল। তিনি কলের পুতুলের মত কেবল "না "না" বলিতে লাগিলেন। শেষে বণিক বর যখন দশ সহস্র মুদ্রা দিতে সম্মত হইলেন, তখন "অতি লোভে তাঁতি নষ্ট" ভাবিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বণিক অবিলম্বে বাটী হইতে প্রতিশ্রুত অর্থ আনিয়া দিলেন।

অকস্মাৎ এত অর্থের অধিকারী হইয়া ব্রাহ্মণের আনন্দ ধরে না, তিনি কোথায় পূজার ঘর, কোথায় অতিথিশালা, বাস ভবন ইত্যাদি করিবেন, সহধর্ম্মিনীর সহিত সারাদিন তাহারই জল্পনা করিতে লাগিলেন। এবং মধ্যে মধ্যে বণিকের হঠাৎ এমন দানশক্তি কেন হইল, তাহা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, আমরা এখন দ্বিজ দম্পতিকে এই আনন্দ সাগরে ফেলিয়া, বণিকের তত্ত্ব লইতে যাইব।

অর্থ-লোলুপ বণিক হৃষ্টমনে সেই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া অর্থভার আগমনের প্রতীক্ষ করিতে লাগিলেন। স্নানাহার নাই, একমনে অর্থের চিন্তা করিতেছেন, দিনমণি অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িলেন, ব্রাহ্মণের টাকা আসিল না! সন্ধ্যা হইল, প্রান্তর প্রদেশ বণিকের চিত্তের স্থায় বিষণ্ণ হইয়া আসিল, টাকা আসিল না! বিধাতার কথা অব্যর্থ ভাবিয়া সেই খানেই রজনী যাপনের ব্যবস্থা করিলেন, অন্যের কথা নহে, স্বকর্ণেই মহেশ্বরের কথা শ্রবণ করিয়া বণিক সন্দেহ করিতে পারিলেন না। নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের জন্য মহাদেব টাকা পাঠাইবেন, অনেক টাকা, পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হওয়া বিচিত্র নয়, রাত্রিযোগে অবশ্যই টাকা আসিবে। মধ্যে মধ্যে পথিকের কথা কর্ণে গেলে মনে হয় টাকা আসিতেছে, আবার সন্দেহ। ক্রমে রাত্রি গভীরা হইল, বসুন্ধরা গাঢ় হইতে গাঢ়তর কৃষ্ণাবরণে বদন আবৃত করিয়া ফেলিলেন, টাকা আসিল না। বণিকের প্রাণ উদ্বেল হইয়া উঠিল। সিদ্ধিখোর ঠাকুরের কথায় নির্ভর করিয়া এত টাকা ব্রাহ্মণকে দেওয়া ভাল হয় নাই, উপায় কি? এখনও সময় আছে, টাকা আসিবে বৈ কি?

রজনী দ্বিপ্রহরাতীত, চারিদিক নিস্তব্ধ, এমন সময় অদূরে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, বণিকের প্রাণে জল আসিল, টাকা আসিতেছে, উৎকর্ণ হইয়া কথা শুনিতে পাইলেন—"প্রভো! আজ না আপনি সেই ব্রাহ্মণের দুঃখ দূর করিতে চাহিয়াছিলেন? কৈ? কিছুই ত করিলেন না? সিদ্ধি খাইয়া ভোর, কখন ভক্তের কথা ভাবিবেন? সংসারে কেহ আর সত্যে আদর করিবে না। আপনিই কথা রক্ষা করেন না!" পার্ব্বতীর মুখে এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া আশুতোষ কহিলেন, দেবি? সিদ্ধি খাই বলিয়া আমি আমাকে ভুলিয়া যাই সত্য, কিন্তু ভক্তকে ভুলি না। আমি প্রত্যুষেই ব্রাহ্মণের জন্য টাকা পাঠাইয়াছি।"—এই পর্য্যন্ত শুনিয়া বণিকের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইল, অগ্রেই অর্থ পাইয়াছে, তথাচ আমার সহিত এই প্রতারণা খেলিতে ব্রাহ্মণের লজ্জা হইল না? আচ্ছা, শুনি

কি ভাবে কত টাকা পাইয়াছে। এমন সময়ে ভবানী কহিলেন ঠাকুর, আমি ত তিল মাত্রও শ্রীচরণ ছাড়া নই, কখন আপনি টাকা পাঠাইলেন? কিছুই ত দেখি নাই?

তখন কৌশলময় শঙ্কর বলিলেন,—"গিরি-কুমারী আমার পৈত্রিক বা তোমার জনক-দত্ত যৌতুক ধনের পরিমাণ কি তোমার জানা নাই? ব্রাহ্মণকে আমি কোথা হইতে দিব? কোন্ কালেই.বা সেরূপ নিজে স্কন্ধে করিয়া দিয়াছি?" পার্বতী বলিলেন,—"তবে আমাকে এরূপ মিথ্যা প্রবোধ দিবার প্রয়োজন কি? শিব-বাক্য কি মিথ্যা হয়?"

ধূর্জ্জটী কহিলেন,—"আমি মিথ্যা বলি নাই, ব্রাহ্মণের টাকা সকালেই পাঠাইয়াছি। ঐ যে বণিক, বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া আছে, ঐ অর্থ পিশাচের স্কন্ধে দিয়া ভোরেই দশ সহস্র টাকা ব্রাহ্মণের বাটী পাঠাইয়া দিয়াছি।" বণিক হত-জ্ঞান।

ভগবানের লীলা খেলা এইরূপেই হইয়া থাকে।

নিবেদন।

লেখক, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।

কে আমি? কোথায় আমি? "ভব-মায়া পান্থবাসে,"
এ কি বল হায়!—
"ঢলে পড়ে আয়ু রবি, কালনিশা ঘুনাইয়ে
আসে পায় পায়?"
"যেতে হবে" অহো কোথা? কোন দূর পর পারে?
কি আছে সম্বল?
সংসার মমতা ঠেলি কেমনে যাইব? এত
প্রাণে কোথা বল?
বড় সাধে সাজায়েছি সংসার কানন, বিন্দু
মিটেনি পিয়াস;
জ্বেলোনা হৃদয়ে বহ্নি, স'রে যাও, টুটাওনা
প্রাণের বিশ্বাস।
ভুলে আছি? বেশ আছি, কেন ভাঙ্গ ভুল? তুমি
কেগো? পায়ে পড়ি,
বাসনা-তরঙ্গে রঙ্গে এখনো জীবন তরী
দিতেছে যে পাড়ি,

হে বিধাত! একি লীলা? এ লীলা রহস্য তব
বুঝিতে না পারি;
কেন গড়? কেন ভাঙ্গ? মরমে লাগে না ব্যথা
হেরি আঁখি বারি?
সৃষ্টির প্রভাত হ'তে আসে জীব, কেঁদে আসে
কেঁদে চ'লে যায়;
হতভাগ্য জীব-জন্ম কাঁদিবারে শুধু ভবে
কোন্ পাপে হায়!
কর্ম্মফল ভোগ হেতু যদি এ সংসার কারা,
কেন হেথা মায়া?
সংসার আসক্তি ফাঁসে জীবে যে জড়ায় মায়া
কুটীল হৃদয়া।
দেছ সুবিবেক-অস্ত্র. দেছ বটে দয়াময়!
মঙ্গল কারণ!
কিন্তু হেন মায়া ফাঁস ছেদি যেতে অকাতরে
পারে কয়জন?
মায়ামুগ্ধ জীবের যে জন্ম-মৃত্যু অনিবার্য্য,
যন্ত্রণা অপার;
তোমার করুণা বিনা হে করুণাময়! কোথা
তাদের নিস্তার?
চিন্তানলে অহর্দিন জ্বলে প্রাণ, চাওফিরে
বড় ব্যথা পাই;
বারম্বার জন্ম-মৃত্যু, অহো কি কঠোর দণ্ড!
ত্রাণ কিগো নাই?
দাও মুক্তি, মুক্তিদাতা! প্রাণের দেবতা! প্রভো!
পতিত তারণ!
আর এ সংসারে এসে যেন না লইতে হয়
মায়ার বাঁধন।
মায়ার বাঁধন যে গো বড়ই মমতাময়;
দুর্ব্বল হৃদয়,
অধম মানব আমি, কেমনে ছেদিব? প্রাণে
বড় ব্যথা হয়।
দয়াময়! তাই চাই ঐ চরণের ছায়া
জুড়াতে জীবন;
যেন না আসিতে হয় আর এ যন্ত্রণাময়
সংসারে কখন।

সব তুমি।

রাগিণী আশাবরী তাল-একতালা।

পরমেশ তুমি পরমেশ্বরি ,
একাধারে তুমি জগত আধার,
তুমি প্রাণময় তুমি দয়াময়,
দয়ার তোমার নাহি দেখি পার॥
জনক রূপেতে করিছ শাসন,
জননী রূপেতে করিছ পালন,
গুরু রূপে তুমি উপদেশ দানে,
লয়ে যাও সবে ভবসিন্ধু পার॥
ভক্তি শক্তি আর জ্ঞান বুদ্ধিবল,
উৎসাহ সাহস বিশ্বাস অটল,
ভাগ্যবান যেবা লভি, এ সকল,
অনায়াসে পায় চরণ তোমার,
আমি যে মা তব অকৃতি সন্তান,
কিসে তবে আমি পাব পরিত্রাণ
তবে মা ভরসা অভয়া মোক্ষদা
মঙ্গলময়ী জননী আমার॥

উপনয়ন

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্রগঙ্গোপাধ্যায়।

পুণ্যক্ষেত্র ভারতে জনমে পুণ্যবান,
তদোধিক পুণ্যে জন্মে ব্রাহ্মণ সন্তান ;
আছিলে অসংস্কৃত, বংশমানে পরিচিত,
ব্রাহ্মণ বালক নামে হ'তে অভিহিত,
আজি উপবীতধারী-ব্রাহ্মণ প্রকৃত।

নহ তুমি সাধারণ বালক এখন,
সংযম শিক্ষায় কর আত্ম সুশাসন ;
বেদমন্ত্র উচ্চারণে, নবকায় এ জীবনে,
সংস্কারে সংস্কৃত কায়-মন-প্রাণ,
দ্বিতীয় জনন আজি-দ্বিজ তব নাম।

গায়িত্রী জননী এবে ব্রহ্ম তব পিতা,
তপস্যা তোমার ক্রীড়া, বেদ তব ভ্রাতা,
নিষ্টা ক্ষমা অলঙ্কার, সঙ্গীতব সদাচার,
অধ্যয়ন অধ্যাপন তোমার জীবন,
ব্রহ্মচারী দণ্ডধারী হয়েছ ব্রাহ্মণ।

ভীষণ সংসার ক্ষেত্র কলি বলবান,
পাপের প্রশ্রয় নিত্য, ধর্ম্মে অসম্মান ;
তুমি আর্য্যঋষি পুত্র. হেরি তব যজ্ঞসূত্র,
সন্তাপিত, বিদলিত ধর্ম্ম আশ্বাসিত,
ধর্ম্মরক্ষা ভার তব না হও বিস্মৃত।

আত্ম সুখ ত্যজি সদা বিশ্বের কল্যাণে
ব্রাহ্মণ সতত রত, তাই সযতনে—
ব্রাহ্মণের পদধুলি, বক্ষে ধরি বনমালী,
ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য বিশ্বে করিলা প্রচার,
তুমি সে ব্রাহ্মণ-ভাগ্য অধিক কি আর!

জীবন

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু বি, এ,

অনন্ত অন্তর হ'তে উঠে মৃদু তান—
ভীষণ-মধুর শুধু মানব-জীবন,
ত্রাসিত মানস-কক্ষ সীমা-বদ্ধে প্রাণ.
জাগায় হৃদয় মাঝে সুখের স্বপন,
নিভৃত আসন হ'তে, মৃত্যু-তীর গামি,
জীবন ছড়ায় ধীরে হাসি-অশ্রু-আশা,
দেখায় রে কতশত সুখ দুঃখ ভয়,
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালবাসা ;
ক্রমে ধীরে কাল যাবে অতীতে ভাসিয়া,
ক্ষুদ্র এ মানব প্রাণ তারি স্রোতে ভেসে-
যাইবে ছুটিয়া অনন্ত সাগর পানে,
পুণ্যময়ি জ্যোতির্ম্ময়ি শান্তির উদ্দেশে,
থেমে যাবে তবে এই বিষাদ কাকলি,
ঝরে যাবে এককালে হাসি অশ্রু গুলি।

Mermaid Tavern.

লেখক, শ্রীনগেন্দ্র নাথ সোম।

আজি মনে পড়ে পান্থ-প্রমোদ-আশ্রমে,
দিবসে নিশীথে সেই কবি-সম্মিলন!
সুললিত গীতি, গাথা, মনপ্রাণ রসে,
কতই বিচিত্র নাট্যে চরিত্র সৃজন!
ছিল কি ত্রিদিব কুঞ্জ এ মর্ত্ত্য-নিবাসে,
মন্দার সৌরভ-পূর্ণ কবিত্বের ফুলে;
ভবের বিষাদ ভরা চিরতাপ নাশে,
সান্ত্বনার শীতস্নিগ্ধ ভাবনদী কূলে!—
টাল মল পানপাত্রে ভরিও মদিরা,
গোধূলী রঞ্জিত রক্ত কিরণ প্রভায়;
অধীর এ নরচিত্ত-রমণী অধীরা।
অতৃপ্তির চিরশুষ্ক রভস তৃষায়।
উছলি উঠুক পাত্র মদিরা প্লাবনে,
ডুবায় বিস্মৃতি নীরে জীবনে মরণে।

খদ্যোত।

লেখিকা, শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

অমল-বিমল-ভাতি——উজল কোমল
জ্বালিয়া প্রেমের দীপ—উদ্বেল অন্তরে,
কা'রে অন্বেষণ তুই করিস্ খদ্যোত!
নীরব নিশায় নিত্য ব্যাকুলিত মনে?
প্রণয় ভাজন তোর—মোর মত কিরে
হরি' প্রেমিকার প্রাণ ব্যথা দিয়া বুকে
পলা'য়েছে দূরদেশে, রাখি দূরে তোরে?
তাই কি নীরবে—ল'য়ে মৃদু দীপ্ত দীপ
খুঁজিস্ ব্যাকুল প্রাণে প্রাণ-প্রিয়-জনে,
কানন-কুহর কুঞ্জ- কান্তার সংসারে,
জুড়া'তে জীবন-জ্বালা লভিয়া বল্লভে?
প্রোষিত ভর্তৃকা যদি মম সম তুই,
আয় তবে খদ্যোতিকা—প্রিয়-সহচরি!
উভয়ে মিলিত হ'য়ে, আয় এক যোগে,
সম দুখে দুখী—তাই মিলি' সখী ভাবে-
মনঃ প্রাণ মিশাইয়া নয়নের সনে
খুঁজি যত্নে সাধ্য যত অবলার বলে,
অদূর-সুদূর-দূর, স্বদেশ বিদেশে,
পাই যদি ভাগ্য-গুণে পুনঃ প্রাণ ধনে।
দুরূহ বিরহ বহ্নি দহিয়া হৃদয়
গুপ্ত হৃদি-ভস্ম-মাঝে, তাই শিখা তা'র
নাহি আর দীপ্তিমান—তব দীপ্তি-সম।
ক্লান্ত-ভ্রান্ত-খিন্ন প্রাণ; মোহের কুহকে
আছে দগ্ধ হৃদি মাঝে দরশন আশে।
আয় দুই সখী-মিলি' খুঁজি দুই জনে;
মিলে যদি 'দু-ই,' সুখী হব 'দুইজনে'।
উঠিবে অমৃত ঊর্ম্মি পুনঃ প্রেমার্ণবে,
ভাসিবে উল্লাসে তাহে মানস মরাল।
উদিবে আঁধার নভে সুধাংশু আবার।
সঞ্চারিবে নবপ্রাণ নীরস শরীরে।



অদৃষ্ট ও ঈশ্বর

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসত্য বেদান্ততীর্থ।

এই পরিদৃশ্যমান চরাচরাত্মক বিশ্বমণ্ডলে এমন কোনও ব্যক্তি নাই, যিনি পরিবর্ত্তন-শীল সুখ দুঃখাদির নিকট হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। অদ্য যিনি অসংখ্য বান্ধবাদি পরিবেষ্টিত হইয়া সুধা ধবলিত অভ্রংলিহপ্রাসাদোপরি অনন্ত রত্নাদির তরুণালোকে আলোকিত, এবং আনন্দমন্দার তরুর সুশীতল ছায়ায় সুখাসীন; কল্য তিনি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতঃ গভীর বিষাদ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সাশ্রু নয়নে কৃতাঞ্জলি পুটে, ভগবন! এ বিপদ হইতে রক্ষা করুন, বলিয়া পাষাণকেও বিগলিত করিতেছেন। অদ্য যিনি দারিদ্র্য রাক্ষসের ভীষণ কবলে পতিত হইয়া পত্নী পুত্রের আর্ত্তনাদে কিরাত-শরবিদ্ধ হরিণের ন্যায় চকিত নেত্রে অতি নীচ ব্যক্তিরও করুণাকণালাভার্থ ধূলি ধূসরিত, কল্য তিনি অপরিমিত ধনশালী দরিদ্রগণের দুঃখ দূরীকরণার্থ বদ্ধপরিকর। অদ্য যিনি প্রতিমা রূপিণী সহধর্ম্মিণীর অনিন্দ্য-সুন্দর বদনারবিন্দ সন্দর্শনে সংসারকে অসীম সুখাকর মনে করিতেছেন, কল্য তিনি তাদৃশী জীবন সহচরীকে জীবনের মত হারাইয়া বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট ও অশান্তি জর্জ্জরিত। অদ্য যিনি সুকুমার প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্ররত্নের নিকটে ভবিষ্য উপকার প্রার্থনায় স্বয়ং অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও তদীয় উন্নতির জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন, কল্য দেখিবেন সেই পুত্র তাঁহার সকল আশামূল উন্মূলিত করিয়া আত্মীয় স্বজনবর্গকে চিরকালের জন্য সন্তাপানলে নিক্ষিপ্ত করিয়া নির্দ্দয়ের ন্যায় লোকান্তর গমনে উদ্যত।

হায় এ জগতে মানব কেন পশুপক্ষী কীট প্রভৃতি প্রত্যেক প্রাণী উক্তবিধ নিয়মের বশবর্ত্তী। এরূপ পরিবর্ত্তের কারণ কি? এই প্রশ্ন উঠিলে আর্য্যশাস্ত্র বিশ্বাসী হিন্দুর হৃদয় আবেগ ভরে শাস্ত্র তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষী হয়। কেন না; আমাদের (হিন্দুগণের) শাস্ত্র কল্পবৃক্ষ। এমন বিষয় প্রায়শঃ দৃষ্টি গোচর হয় না, যাহা আমাদের শাস্ত্রে অল্লাধিক ভাবে মীমাংসিত হয় নাই। উহা কাহারও সাময়িক স্বকপোল কল্পিত নয়, উহার মূল পর্ব্বতবৎ সুদৃঢ়, সহস্র ঝঞ্ঝাবাতে তাহার লেশও বিপর্য্যস্ত হইতে পারে না।

আমাদের শাস্ত্র সাগরে যে সকল অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, তাহার ইয়ত্তা বা স্বরূপ নির্ণয় একজন্মসাধ্য নয়! তথাপি যেমন রত্নাকর স্থিত সমগ্র রত্নরাশির জ্ঞান সুদূর পরাহত হইলেও অনুকূল বায়ু দ্বারা আন্দোলিত তদীয় সলিলের মধ্য হইতে তরঙ্গমালার সাহায্যে তীরদেশে উপনীত, দুই একটী রত্ন তীরস্থ ব্যক্তির

প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ অস্মদীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক স্বীয় অলৌকিক প্রতিভা বলে তত্তৎ সন্দর্ভ নিচয়ে প্রকটীকৃত দুই একটী বিষয় আমাদের একেবারে অজ্ঞেয় হইতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, জীব-গণের সুখময় ও দুঃখময় পরিণাম বিষয়ে অদৃষ্টই অসাধারণ কারণ। অধ্যাত্ম রামায়ণে উক্ত আছেঃ—

"সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা পরোদদাতীতি কুবুদ্ধি রেষা।
অহংকরোমীতি বৃথাভিমানঃ স্বকর্ম্মসূত্র গ্রথিতো হি লোকঃ॥"

অর্থাৎ সুখ দুঃখের দাতা কেহ নাই, অন্যে আমাকে সুখ বা দুঃখ দিতেছে, এরূপ জ্ঞান নিন্দনীয়, আমি অমুক কার্য্য করিতেছি, এরূপ ধারণা মিথ্যা, যেহেতু সকলে নিজ নিজ কর্ম্মসূত্র দ্বারা গ্রথিত।

"স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" পুরুষ স্বকর্ম্মানুসারে ফলভোগ করে। "শরীরজৈঃ কর্ম্ম দোষৈ র্যাতি স্থাবরতাংনরঃ। বাচি কৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাং॥" মানব শারীরিক কর্ম্মদোষ (দুরদৃষ্ট) দ্বারা স্থাবর যোনিকে বাচিক কর্ম্ম দোষ দ্বারা পক্ষি মৃগাদি যোনিকে এবং মানসিক কর্ম্মদোষে নীচ যোনিকে প্রাপ্ত হয়। "তদ্য ইহ রমণীয় চরণা রমণীয়াং যোনি মাপদ্যন্তে কপূয় চরণাঃ কপূয়াংযোনিং" ছান্দোগ্য। রমণীয়-আচরণ কারী রমণীয় যোনিকে কপূয়-আচরণ কারী কপূয় যোনিকে প্রাপ্ত হয়। রমণীয় শব্দে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রাদি যোনি, কপূয় যোনি শব্দে শ্বশূকরাদি যোনি বুঝিতে হইবে। "যথাকারী যথাচারী ভবতি তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি দ্বারা জীবের কর্ম্মাধীন ফল-ভোক্তৃত্ব প্রকাশিত হই-তেছে। অদৃষ্ট বাদীর পক্ষে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তিনি জানেন যে, আমাদের বেদ পৌরুষেয় বা পুরুষ বুদ্ধি কল্পিত নয়। যাহা পুরুষ বুদ্ধি কল্পিত তাহাতে ভ্রম প্রমাদাদি অসম্ভাব্য নয়, পক্ষান্তরে বেদ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত। এইরূপ সংহিতাদি স্মৃত সমূহ বেদানুসারিতা বশতঃ মৌলিক এবং প্রামাণিক। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে পূর্ব্ব লিখিত শ্রুতি স্মৃত্যাদিতে কর্ম্ম বা তৎপর্য্যায় চরণশব্দের উল্লেখ আছে, অদৃষ্টের কথা ত নাই, সুতরাং ইহাতে অদৃষ্ট বাদী পরিতুষ্ট হইবেন কিরূপে? এতদুত্তরে কর্ম্ম ও অদৃষ্ট শব্দের কথঞ্চিৎ অর্থ বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয়।

কর্ম্মশব্দ 'কৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং প্রাতিপাদিক (নাম) ও ক্রিয়ার বাচক। যখন উহাকে কর্ম্মবাচ্যে নিষ্পন্ন করা যায় তখন দ্বিতীয়া বিভক্তি যোগ্য নামকে বুঝায়, ভাব বাচ্যে নিষ্পন্ন করিলে তাবৎ কার্য্য কলাপের বাচক হয়।

আলোচ্যমান কর্ম্ম শব্দটী ভাব বাচ্যে নিষ্পন্ন, সুতরাং ক্রিয়া বাচক। শাস্ত্রীয় কর্ম্মনিচয়ের মধ্যে কতকগুলি ঐহিক ফলদ, (অর্থাৎ) ইহলোকে ফলদান করে, কতকগুলি আমুষিক ফলদ, (অর্থাৎ) পরলোকে ফলদান করে, আর কতকগুলি উভয় ফলদ (অর্থাৎ) উক্ত উভয় স্থানে ফলদান করে। যে গুলি ইহলোকে ফলদান করে, তাহাদের ফল যদি হাতে হাতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তজ্জন্য অদৃষ্ট রূপ পদার্থের কল্পনা স্থূলদর্শী দিগের নিকটে অসমীচীন হইতে পারে, হয় হউক তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যাহারা পরলোকে ফলদান করে বা ইহলোকে বিলম্বে ফলদান করে, তাহাদের জন্য অদৃষ্ট কল্পনা অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। কেন না, প্রত্যেক ক্রিয়াই ফলবতী (অর্থাৎ) ক্রিয়া যাহাকে বলিব তাহার ফলও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, নিষ্ফলা ক্রিয়া ক্রিয়াপদ বাচ্য নয়। যেমন,—পাক আমার ক্রিয়া; তাহার ফল তণ্ডুলের অবয়ব শৈথিল্য বা অন্নরূপে পরিণাম, যতক্ষণ তণ্ডুল গুলি অন্নরূপে পরিণত না হয়, ততক্ষণ আমার পাকক্রিয়ার সিদ্ধি হয় না, তবে যে অন্ন নিষ্পত্তির পূর্ব্বেও পাক হইতেছে বলিয়া ব্যবহার করি, তাহা কেবল তণ্ডুলগুলি শীঘ্র অন্নরূপে পরিণত হইবে, এইরূপ সম্ভাবনা বশতঃ। এই জন্যই পাককালের মধ্যে কোনও প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে পাক হইল না, এইরূপ ব্যবহার হয়। গমন ভোজনাদি স্থলেও ঐরূপ, গমন ক্রিয়ার ফল উত্তর দেশ সংযোগ বা গন্তব্য দেশ প্রাপ্তি, ভোজনের ফল ক্ষুন্নিবৃত্তি বা তৃপ্তি। উক্তরূপ ফল না হইলে গমন হইল না, ভোজন হইল না, ইত্যাকার ব্যবহার। আলোচ্যমান কর্ম্ম শব্দটী ক্রিয়া বাচী হইলে তাহার মধ্যে যে গুলি আমুষ্মিক ফলদ বা বিলম্ব ফলদ, সে গুলিও ফলদান করিলে ক্রিয়াপদ বাচ্য হইবে, পরন্তু কর্ম্মগুলি চিরস্থায়ী নয়, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে, লোকান্তরে যখন আমি ফলভোগ করিব, তখন কর্ম্মের নাম গন্ধও থাকিবে না, তবে নিষ্কারণ ফল প্রসূত হইবে কিরূপে? ইহার সমাধানের নিমিত্ত ফলদান কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী, কোনও বিলক্ষণ পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। উহাই অস্মৎ-সম্মত অদৃষ্ট।

এই অদৃষ্ট অনুষ্ঠিত কর্ম্মাবলীর সূক্ষ্মাবস্থা বা ভবিষ্য ফলের অব্যক্তাবস্থা বলিয়া মীমাংসা দর্শনে অভিহিত হইয়াছে, যাহা হোক, তাহা এই প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। অদৃষ্ট শব্দটী "ন" "দৃষ্ট" এই দুই শব্দে সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন, তাহার ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য অর্থঃ—যাহা দৃষ্টি বিষয় নয়, "দৃশ" ধাতুর অর্থ এস্থলে সাধারণ লৌকিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহার অবিষয় বলিলে, একরূপ অতীন্দ্রিই বলা হইল। আকাশ

দিক্ কাল প্রভৃতি অনেক বস্তু জগতে অতীন্দ্রিয় আছে, কিন্তু অদৃষ্ট শব্দটী তাহাদের বোধক না হইয়া কেবল পূর্ব্বোক্ত অর্থের ঘোষণা করে। তাহার কারণ,—শব্দার্থ সাধারণতঃ ত্রিবিধ। কেহ যোগলভ্য কেহ রূঢ়িলভ্য কেহবা যোগ এবং রূঢ়ি এতদুভয় লক্ষ্য। পাচক বাহক ইত্যাদি শব্দের অর্থ যোগ লক্ষ্য ঐ গুলি ব্যুৎপত্তি জনিত যথাযথ অর্থকে (অর্থাৎ) পাক কর্ত্তাকে এবং বহন কর্ত্তা প্রভৃতিকে বুঝাইয়া দেয়। মণ্ডপাদি শব্দের অর্থ রূঢ়ি লভ্য, উহা বুৎপত্তি জনিত অর্থের বোধক না হইয়া অর্থান্তরকে বুঝাইতেছে, মণ্ডপ শব্দের যোগার্থ মণ্ডপান কর্ত্তা গবাদি, কিন্তু তাহাকে না বুঝাইয়া গৃহ বিশেষের বোধক, যেমন চণ্ডীমণ্ডপ শীতলা মণ্ডপ ইত্যাদি। যৌগিক রূঢ় শব্দার্থ, যথা পঙ্কজ প্রভৃতি। ইহার যৌগিক অর্থ যাহা পঙ্কজাত। কিন্তু পঙ্কজাত শৈবাল কুমুদ প্রভৃতি বস্তু পঙ্কজ নহে, কেবল পদ্মই পঙ্কজ আখ্যা ধারণ করে, সুতরাং পঙ্কজ শব্দ পঙ্কজাত পদ্মকে বুঝাইতেছে বলিয়া অংশতঃ যৌগিকার্থের বোধক এবং পঙ্কজাত অন্যান্য পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত বলিয়া অংশতঃ রূঢ়ার্থ বোধক। অতএব যোগরূঢ়ার্থ বোধক। অদৃষ্ট শব্দটী তৃতীয় (অর্থাৎ) যোগরূঢ় অর্থের বোধক, কেন না কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট নাম ধারী পদার্থটী দর্শন যোগ্য নহে, তাহার বোধক বলিয়া যোগার্থ বোধক এবং অন্যান্য অতীন্দ্রিয় পদার্থ হইতে নিবৃত্ত বলিয়া রূঢ়ার্থ বোধক। লোকান্তরে ফলের অনুপপত্তি নিবন্ধন যেরূপে অদৃষ্ট পদার্থের কল্পনা করা হইয়াছে, উহা অর্থাপত্তি দ্বারা বস্তু কল্পনা। গত্যন্তর না থাকিলে বাধ্য হইয়া যে বস্তুর কল্পনা করিতে হয়, তাহাই অর্থাপত্তি লক্ষ্য মীমাংসক মতে অর্থাপত্তি একটী প্রমাণ, সুতরাং তদ্দ্বারা কল্পিত পদার্থ প্রামাণিক।

যাহা হোক পূর্ব্বে কর্ম্ম বা তৎপর্য্যায় চরণ শব্দের দ্বারা অদৃষ্টের উল্লেখ না থাকায় অদৃষ্ট বাদী পরিতুষ্ট হইবেন কিরূপে? ইত্যাকার যে আপত্তি উঠিতেছিল, সম্ভবতঃ তাহার সমাধান হইল। (অর্থাৎ) যে যে স্থলে কর্ম্ম বা তৎপর্য্যায় শব্দ শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে তজ্জন্য অদৃষ্ট পদার্থকে হৃদয়ঙ্গম করিলে কোনও ক্ষতি নাই। এতাদৃশ অদৃষ্ট জীবগণের সুখ দুঃখাদির কারণরূপে শাস্ত্রকার গণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে।

এই অদৃষ্ট দ্বিবিধ, শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য যে অদৃষ্ট তাহা শুভাদৃষ্ট, নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য যে অদৃষ্ট তাহা দুরদৃষ্ট। কেহ কেহ পণ্ডিতা মানী ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, অদৃষ্টবলিয়া কোনও পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন নাই, ফলভোগের প্রতি কেবল পুরুষকার কারণ, যে যেরূপ পুরুষকার করে, সে তদনু-

সারে ফলের ভাগী হয় ইত্যাদি। ইহাঁদিগকে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পুরুষকার অদৃষ্ট ব্যতিরেকে কার্য্যকারী হইতে পারে না। এস্থলে শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ না করিয়া একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি,—আপনি ধনবান্ জনবান্। বহুজন আপনার ঈঙ্গিতে পরিচালিত হয়, আপনি তাদৃশ ধন জনের সাহায্যে কোনও ব্যবসা আরম্ভ করিলেন, ফলে আপনি সেই ব্যবসা প্রভাবে কালে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। তাহা দেখিয়া আমিও তদনু-সারে সেই ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিলাম, অবশ্য আমিও আপনার অপেক্ষা কোনও বিষয়ে অন্ততঃ ব্যবসারোপযোগী ধনজনাদি বিষয়ে নিকৃষ্ট ছিলাম না, তবে কেন এরূপ হইল? পুরুষকার বাদী হয়ত বলি-বেন যে, অবশ্যই আপনার সে বিষয়ে কোনও পুরুষকারের ত্রুটি ছিল, নচেৎ এরূপ হইতে পারে না। আমি তদুত্তরে বলিব যে, আপনি যে উপায় অবলম্বন করায় অমুককে ধনবান্ দেখিতেছেন, আমিও ত সেই উপায়কেই সর্ব্বাংশে গ্রহণ করিয়া ছিলাম। কৈ কোনও বিষয়ে যে ত্রুটি ছিল, তাহাত মনে হয় না বা কেহ কোনও ত্রুটির নির্দ্দেশও ত করিতে পারেন নাই, আপনিও আমাকে তাহা দেখাইতে পারেন কি? ইহাতে যদি আপনি বলেন যে, আপনার অজ্ঞাত সারে কোনও বিষয়ে ত্রুটি হইয়া থাকিবে, আপনি স্বয়ং বা অন্য কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, বলিয়া যে ত্রুটি হইতে পারে না এমন নহে। তাহাতে আমার এই উত্তর যে, আপনি বা আমি অথবা অপর কোনও ব্যক্তি ত্রুটি বিষয়ে যখন কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে অসমর্থ, তখন কেবল অশুভ ফল দেখিয়া তাহার অনুমান করা হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সেই অনুমেয় পদার্থটীকে যদি আমি প্রাক্তন কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট বলি, তাহাতে আপনার (পুরুষকার বাদীর) প্রতিবাদ কি? আপনি তাহাকে কার্য্যানুমেয় ত্রুটি বলিতেছেন, আর আমি তাহাকে অদৃষ্ট বলিতেছি, কেবল নাম মাত্রে বিবাদ নয় কি? অধিকন্তু আমার মতেই শাস্ত্র প্রমাণাদির আনুকূল্য আছে। অবশ্য এতদ্দ্বারা পুরুষ কারের খণ্ডন হইতেছে না, পুরুষকার অদৃষ্ট সহকৃত হইয়া ফলদান করে, ইহাই বলা হইতেছে। অস্মদীয় ব্যবহার ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ দেখুন,—আপনি এক বন্ধুর সহিত আলাপ করিতে করিতে পথে বায়ু সেবন করিতেছেন, হঠাৎ সম্মুখে একখণ্ড কাগজ দৃষ্টিগোচর হইল, গ্রহণ করিয়া বুঝিলেন যে, তাহা একটী বহুমূল্য নোট। আপনি তাহা হস্তগত করিলেন, কিন্তু আপনার বন্ধু তাহাতে বঞ্চিত হইলেন। এস্থলে

ভবদীয় শুভাদৃষ্ট নিবন্ধন সমীপ পতিত অর্থটী গ্রহণ ও ভ্রমণ রূপ পুরুষ কারের সংযোগে আপনার করগত হইল, এরূপ বলা যায় না কি? আপনি এমন কোনও গরীয়ান্ পুরুষকার করেন নাই, যদ্দ্বারা তাবৎ পরিমাণ অর্থপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে। এবমাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা অদৃষ্ট সহকারে পুরুষ কারের ফল জনন সহজে উপলব্ধ হয়। পরন্তু অদৃষ্টকে পুরুষকার অপেক্ষা বিশিষ্ট-শক্তি শালী বলিতে পারা যায়। আপনি বহু চেষ্টা করিতেছেন, তথাপি ফল লাভ হইতেছে না, ইত্যাদি স্থলে অদৃষ্টের প্রাবল্য সহজে অনুমেয়। সুতরাং কেবল পুরুকারবাদীর মত কিরূপ যুক্তিযুক্ত তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

এক্ষণে অদৃষ্ট ও পুরুষকার স্বীকার করিলেও ঈশ্বর স্বীকার কেন করিতে হয় তাহার আলোচনা বারান্তরে করিব।

শত্রুকে? পুত্রই পরম শত্রু।

বিগত ২২শে ভাদ্র সোমবার বেলা ১২টা ১৫ মিনিটের সময় জন্মভূমির অন্যতম সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র অক্ষয় কুমারের অকাল মৃত্যু হয়, সেইপুত্র শোক অপনোদন উদ্দেশ্যে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় নন্দী মহাশয় পুত্রশোকাচ্ছন্ন পিতাকে যে হৃদয় গ্রাহী উপদেশ পূর্ণ পত্রখানি লিখিয়া ছিলেন, তাহারই সার মর্ম্ম এস্থলে প্রকাশিত হইল :—

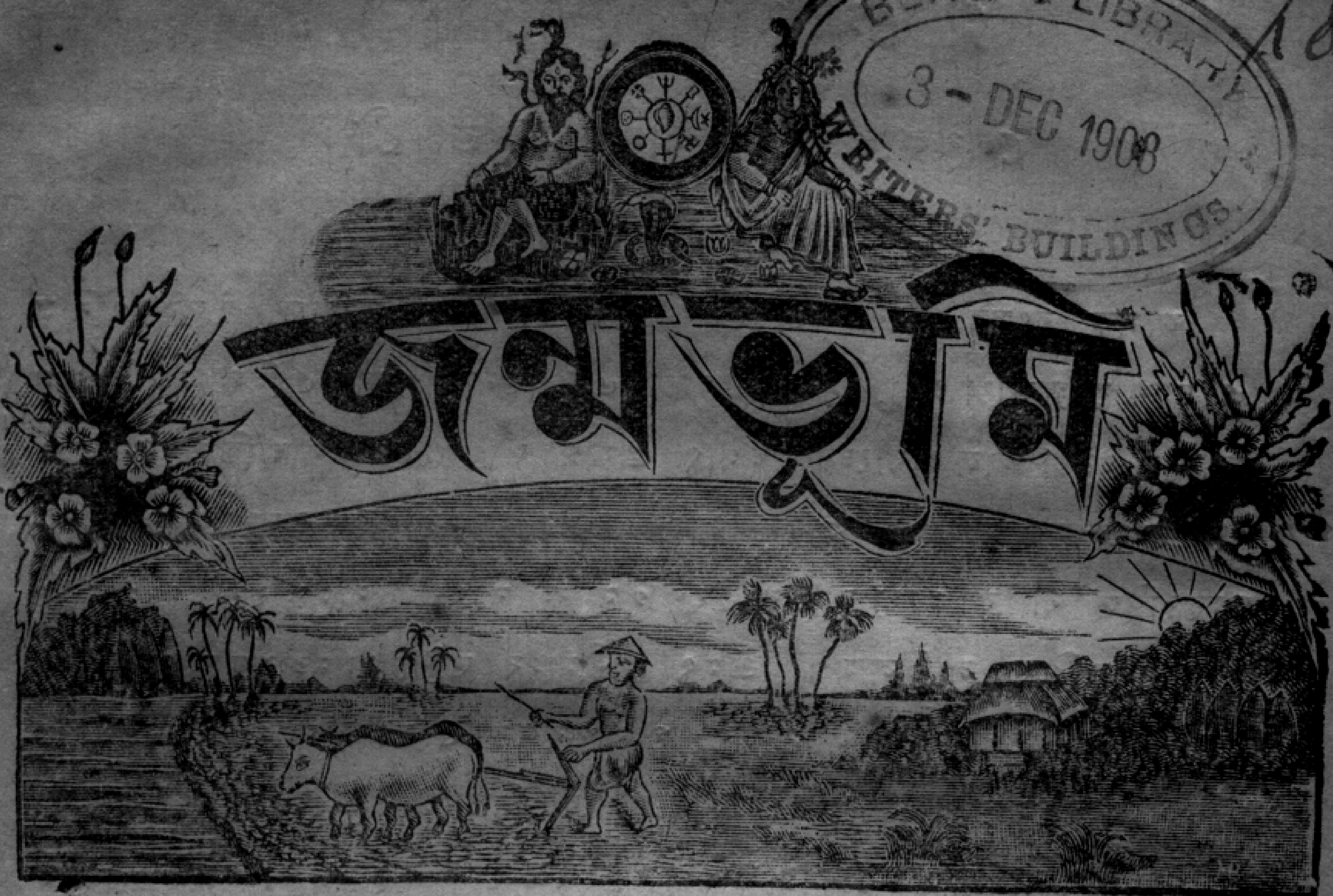
পুত্রঃস্যাদিতি দুঃখিতঃ সতিসুতে তস্যাময়ে দুঃখিতঃ
তদ্দুঃখাদিকমার্জ্জনে তদনয়ে তন্মৌর্খতো দুঃখিতঃ।
জাতশ্চেৎ সগুণোহথতন্মৃতিভয়ং তস্মিন্মৃতে দুঃখিতঃ
পুত্রব্যাজমুপাগতোরিপুরয়ং মা কস্যচিজ্জায়তাম্॥

কবি সিল্হনের বাক্যগুলি অতীব হৃদয়গ্রাহী এবং পুত্রমমতা বিষয়ে আমাদিগকে পদে পদে চৈতন্য প্রদান করে। পুত্র নিমিত্ত কেহই অন্তরে সুখী নয়, কারণ পুত্রের জন্য চিন্তা করিতে করিতে আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়, কোন সময়েই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। মন বুঝিয়াও যাহা বুঝে না, কবি তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন, পাঠকগণ দেখুন, তাঁহার এক একটী কথা হৃদয় মর্ম্মে এরূপ ভাবে আঘাত করে যে তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। দেখুন! "পুত্রঃস্যাদিতি

দুঃখিতঃ” “যদি একটী পুত্র হইত” অর্থাৎ যাঁহার পুত্র হয় নাই, তিনি পুত্র কামনায় দুঃখিত, রাজেন্দ্র দিলীপ পুত্রকামনায় অতি কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি সস্ত্রীক কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবের আশ্রমে গমন করিয়া গুরুর আদেশ ক্রমে নন্দিনী নাম্নী গাভীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, নন্দিনী ভোজন করিলে তিনি ভোজন করিতেন, নন্দিনী জলপান করিলে তিনি জলপান করিতেন, এবং নন্দিনীর গাত্রের দংশমশকাদি তাড়াইয়া দিতেন, তিনি সংযত ছিলেন এবং রাজা হইয়াও কুশ শয্যায় শয়ন করিতেন। এইরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া তিনি তিন সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করেন, ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, পুত্র হয় নাই বলিয়া তিনি কতই দুঃখিত। রাজা দশরথও বৃদ্ধ কাল পর্য্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। অন্য সামান্য লোকের কথা আর কি বলিব! “সতিসুতেতস্যাময়ে দুঃখিতঃ” পুত্র হইলেও তাহার পীড়া নিমিত্ত দুঃখিত হইতে হয়, অর্থাৎ “ঔৎসুক্যমাত্রমবসায়-য়তি প্রতিষ্ঠা” পুত্র হইলে পুত্রকামনার দুঃখ দূর হয়, কিন্তু তাহার পীড়া জন্য দুঃখভোগ করিতে হয়। “তদ্দুঃখাদিকমার্জ্জনে” ক্লিশ্নাতি লব্ধপরিপালনবৃত্তি-রেব” পুত্রের দুঃখ নিবারণ জন্য লোকে দুঃখিত, অতি দরিদ্র ব্যক্তিও পুত্রের কষ্ট দূর করিবার জন্য অতিশয় কষ্ট করিয়া থাকে। নিজে না খাইয়া না পরিয়া পুত্রকে খাওয়ায় ও পরায়। “তদনয়ে” অর্থাৎ পুত্রের অনয়ে (দুর্ণীতি) দুঃখিত। “তন্মৌর্খতো দুঃখিতঃ” পুত্র মূর্খ হইলে দুঃখিত হইতে হয়।

“অজাতমৃতমূর্খাণাং বরমাদ্যৌ ন চান্তিমঃ।
সকৃদ্দুঃখকরাবাদ্যা বন্তিমশ্চ পদে পদে ॥”

অর্থাৎ অজাত (যে জন্ম গ্রহণ করে নাই), মৃত (যে জন্মগ্রহণান্তর মরিয়াছে) এবং মূর্খ; এই তিনের মধ্যে আদ্য দুইটী ভাল, অন্তিম অর্থাৎ মূর্খ ভাল নয়, যেহেতু আদ্য দুইটী একবার দুঃখ অর্থাৎ “পুত্র হয় নাই” ও “পুত্র মরিয়াছে” এই একদুঃখ উৎপাদন করে, কিন্তু মূর্খ পুত্র পদে পদে বহু দুঃখ উৎপাদন করে। “জাতশ্চেৎ সগুণোঽথতন্মৃতিভয়ং” অর্থাৎ পুত্র গুণবান্ হইলে তাহার মৃত্যু আশঙ্কায় সর্ব্বদা ভয়। “তস্মিন মৃতে দুঃখিতঃ” অর্থাৎ পুত্র মরিলে দুঃখিত হইতে হয়; পুত্র শোকে কেহ কেহ প্রাণত্যাগও করে। পুত্র হেতু সর্ব্ব সুখের নাশ দেখিয়া কবি উপসংহারে বলিয়াছেন “পুত্রব্যাজমুপাগতোরিপুরয়ং মাকস্যচিজ্জায়-তাম্।” অর্থাৎ কাহারও যেন পুত্ররূপধারী পরম শত্রু জন্ম গ্রহণ না করে। কবি সিল্হনের বাক্যের সত্যতা আমরা পদে পদে অনুভব করিতেছি।



জন্মভূমি

"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৬শ বর্ষ] | ১৩১৫ সাল, ভাদ্র। | ৫ম সংখ্যা।

জন্মাষ্টমী।

অসিত অষ্টমীতিথি নিশা দ্বিপ্রহর,
আকাশে জলদঘটা বারি বরিষণ—
টিপি টিপি ;-চারিদিক ঘোর অন্ধকার।
ঘোর অন্ধকারাময় কংস-কারাগারে,
বন্দিনী দেবকীসতী বসুদেবসহ।
কারাগারে পূতগর্ভ পূর্ণ দশ মাস,
ভূমিষ্ঠ হইলা কৃষ্ণ, জগতের পতি,
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি, রূপ জ্যোতির্ম্ময়।
লয়ে গেলা বসুদেব নন্দের মন্দিরে,
প্রকাশ পাইল কৃষ্ণ, নন্দের নন্দন।
হেথা কংস মায়া-কন্যা আছাড়ে পাথরে,
শূন্যে উঠে মহামায়া, করি দৈববাণী।

গা গোঁ বাই (মাতাজী)

লেখক, শ্রীমৎ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

(প্রথম প্রস্তাব)

অনেক বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে করিতে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পুণ্যতোয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, এই তিনটি পুরাণ-প্রসিদ্ধা-নদী-সঙ্গমে উপনীত হইয়া আলাহাবাদের (অর্থাৎ প্রয়াগ তীর্থধামের) পার্শ্বস্থিত দারাগঞ্জ পল্লীতে প্রখ্যাত নামা শ্রীমৎ বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুরম্য পুষ্পোদ্যানা-ভ্যন্তরস্থিত বাটিকা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কয়েক দিবসের জন্য পরমানন্দে অবস্থান করিতে লাগিলাম। শ্রীমৎ বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয় আনুষ্ঠানিক হিন্দু, বৈদিক শ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, পরোপকারে প্রতিষ্ঠাবান্, ধর্ম্মপরায়ণ এবং সাত্ত্বিক ভাবের সদাচারী পণ্ডিত। কমিশেরীয়েট বিভাগে উচ্চ বেতনে বহুবর্ষ কাল ব্যাপিয়া প্রশংসার সহিত চাকুরি করিয়া ইনি উচ্চ পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন; গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ইহাঁকে অনরেরি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল কমিশনর পদে নিযুক্ত করিয়া ইহাঁর যোগ্যতার সমুচিত পুরস্কার দান পূর্ব্বক সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে ইহাঁকে সম্মানিত করিয়া দিয়াছেন। জাতীয় মহাসমিতির (ন্যাশনাল কংগ্রেসের) ইনি অন্যতম নেতা এবং আলাহাবাদ গবর্ণমেণ্ট কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ও পরীক্ষক শ্রীমৎ পণ্ডিত আদিত্য রাম ভট্টাচার্য্য, এম, এ, মহাশয়ের ইনি জ্যেষ্ঠসহোদর। আদিত্য বাবু এক্ষণে পেন্সন গ্রহণ করিয়া বারাণসীধামের প্রখ্যাত নামা হিন্দু সেণ্ট্রাল কলেজের সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন। ইহাঁদের আদি নিবাস ভট্টপল্লী (ভাট পাড়া), কিন্তু প্রায় চার পুরুষ পর্য্যন্ত প্রয়াগধামের পার্শ্বে দারাগঞ্জ উপনগরে ইহাঁরা বাস করিতেছেন।

বেণীবাবুর বাগান বাটীতে অবস্থান করিতে করিতে দেখিলাম, কলিকাতার সুবিখ্যাত জমিদার বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কালীবাবুর সহিত আমার এই প্রথম আলাপ পরিচয় হইল। তিনি কহিলেন, "আমি একজন সন্ন্যাসিনীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, ইনি কাশীধাম হইতে আগমন করিয়াছেন। এই সন্ন্যাসিনী কয়েক দিবস পর্য্যন্ত এই উদ্যানে অবস্থান করিবেন; আপনিও এইখানে আছেন, অতএব তাঁহার যাহাতে কোন বিষয়ে ক্লেশ বা অসুবিধা না হয়, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।"

কালীবাবু ঐ বাগানে থাকিতেন না, কিন্তু প্রতিদিবস প্রায় দুইবার ঐ স্থানে আসিতেন। সন্ন্যাসিনীর সহিত আমার আলাপ পরিচয় করিয়া দিয়া কালীবাবু বাসায় চলিয়া গেলে, দেখিলাম, ঐ সন্ন্যাসিনী মহাশয় পুরুষের পরিচ্ছদ পরিয়া আছেন। তাঁহার পদতলে বোম্বাইয়ের মারাঠী (নাগ্‌রা) জুতা, তাহার উপরে গৈরিক-রঞ্জিত ষ্টকীং, তদুপরে কার্পাশ ভরা পায়জামা। তাহার উপরে গৈরিক ধুতি। গায়ে তুলাভরা জামা এবং মাথায় (কর্ণাবরণ কারী) টোপি। মধ্যে মধ্যে তিনি খড়ম্ ব্যবহার করিতেন। লোকের মুখে শুনিলাম, ইনি "মাতাজী" উপাধিতে সম্বোধিতা হইয়া থাকেন। কিন্তু অনুসন্ধানে জানিলাম, পবিত্র বারাণসী ক্ষেত্রের অনেক ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনী "মাতাজী" বলিয়া সমাদৃতা হয়েন। যাহা হউক, আমিও ইহাঁকে সুমধুর "মা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ অনেক বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী যুবক ইহাঁকে মাদার (MOTHER) বলিয়াও ডাকিত, কিন্তু "মা" বলিলে প্রাণে যে আনন্দ হয়, মাদার কহিলে সে আনন্দ টুকু হয় না, সুতরাং "মা" কহিবার জন্য আমি সকলকে পরামর্শ দিতে লাগিলাম। সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আপনি অতি সত্য কথাই কহিয়াছেন। মা শব্দটী খাঁটি আনন্দের জিনিষ, আর মাদার কিম্বা মাম্মা নামক ইংরাজী শব্দগুলা উচ্চারণ করিলে ইউরোপীয় সমাজের যে সকল ভাব আমাদের মনোমধ্যে উদয় হয়, তাহা বিশুদ্ধ প্রেম বা বিশুদ্ধ ভক্তি অথবা খাঁটি আনন্দের ভাব নহে।"

মাতাজী মহাশয় কয়েক দিবস পরে মুঙ্গের নগরে গিয়া তথাকার পর্ব্বতোপরি স্থিত ঠাকুরবাবুদিগের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পরে কোথায় গিয়াছিলেন, জানি না। অনেক দিন পরে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম; মন্দিরের সিঁড়ির ধারে মাতাজীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মন্দির হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী "কালিখো" নামক এক পুরাতন ও প্রখ্যাত মূর্ত্তি ও মন্দির দেখিবার জন্য উভয়ে একত্রে গমন করিয়াছিলাম। ঐ মন্দির অতীব নিভৃত স্থানে অবস্থিত; চারিদিকেই পর্ব্বতমালা এবং তাহার পার্শ্বে বন। লোকালয় প্রায় নাই বলিলেই হয়। প্রবাদ আছে, এক সময়ে এখানে নরবলি হইত. এবং অনেক "কাপালিক" সাধু বাস করিতেন। এখন নরবলি দিবার অধিকার বা আদেশ নাই। আমরা দুই দিবস এখানে একত্রে ছিলাম। পবিত্র "কালিখো" তীর্থে মাতাজী মহাশয় দুই একটী অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন

করিয়াছিলেন। মহাপুরুষদিগের সকল কথা সর্ব্বপ্রকার লোকের নিকটে সকল সময়ে প্রকাশ করা অযৌক্তিক। কেন অযৌক্তিক তাহা অজ্ঞ লোককে বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। যাহা হউক, মাতাজী মহাশয়া কহিলেন, "আমি সত্বরে কাশীধামে গমন করিব, তথা হইতে কলিকাতা যাইবার বাসনা আছে, আপনি যদি বঙ্গদেশে গমন করেন, কলিকাতায় অনুসন্ধান করিলে আমার ঠিকানা জানিতে পারিবেন।"

অনেক দিন পরে কলিকাতা মহানগরীতে আগমন করিয়া শুনিলাম, মাতাজী নামে এক সন্ন্যাসিনী "মহাকালী পাঠশালা" নামে এক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইনি আমার সুপরিচিতা মাতাজী কিনা তাহা জানিবার জন্য আকাঙ্ক্ষী হইলাম। অবশেষে জানা গেল, ইনই সেই প্রয়াগ ধামের সর্ব্ব প্রথম পরিচিতা সন্ন্যাসিনী মাতাজী। আমি কলিকাতায় কয়েকবার মাত্র মাতাজীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। প্রথমবারে বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর জমিদার মহাশয়ের বাটীতে এবং দ্বিতীয়বারে মহারাজাধিরাজ বাবর্দ্ধমাধিপতির কলিকাতাস্থ প্রাসাদে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তৃতীয়বারে এক প্রকাশ্য সভায় এবং চতুর্থবারে কলিকাতার এক পথপ্রান্তে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম; তৃতীয় ও চতুর্থ বারে একটিও কথা তিনি কহিতে পারেন নাই। পঞ্চম বারে শেষ দেখা,— আমি কিছু দিবস ষ্ট্রাণ্ড রোডে (নিমতলা ঘাটের সম্মুখে) এক বন্ধুর বাটীতে অবস্থান করিতে ছিলাম। মাতাজী গঙ্গাস্নানে যাইতে ছিলেন। আমিও স্নানের জন্য ঘাটের দিকে যাইতে যাইতে মাতাজীর সাক্ষাৎ পাইয়া উভয়ে নানা কথা কহিতে কহিতে চলিতে লাগিলাম। ঘাটে বসিয়া নানা বিষয়িণী কথা হইতে লাগিল; কলিকাতার একটী ভদ্রলোক সম্বন্ধে তিনি কথোপকথনচ্ছলে মাতাজী যাহা কহিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে আমি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে তাহাই শেষ কথা শুনিয়াছিলাম, ইহার পরে আর কোন কথা শুনি নাই। নিমতলার শ্মশান ঘাটের দিকে একটি অঙ্গুলি লক্ষ্য করিয়া তিনি সাধারণ লোক সম্বন্ধে কহিয়াছিলেন "এই ঘাটে যে সকল মড়া পুড়িয়াছে তাহাদের দগ্ধ অস্থিরও কিছু মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু যাহারা কেবল খায় আর শোয় অথবা কেবল বাজে কাজে জীবনটাকে বৃথা নষ্ট করে, তাহাদের ইহকালে কিম্বা পরকালে এক কড়া কাণা কড়িও মূল্য নাই, ইহা অতি নিশ্চয়।"

মাতাজীর "মহাকালী পাঠশালা" এখন সর্ব্বজন পরিচিতা। নানা স্থানে ইহার শাখা প্রশাখাও স্থাপিত হইয়াছে, এবং অনেক বালিকা ইহাতে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া উপকৃতা হইয়াছে ও হইতেছে। হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রমতে এই উপকারিণী পাঠশালার

পরিচালনা হইয়া থাকে, সুতরাং হিন্দু মাত্রেরই ইহা গৌরবের জিনিষ। মাতাজী মহাশয়ার এই অমর কীর্ত্তি বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের পুত্রী, ভগ্নী, ভাগিনী প্রভৃতির পক্ষে নিতান্ত কল্যাণকারিণী। ভরসা করি, এরূপ পাঠশালার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেক হিন্দু যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিতে অণুমাত্রও অবহেলা প্রদর্শন করিবেন না।

ইংরাজি ১৯০৭ অব্দে তপস্বিনী মাতাজী মহোদয়া ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়া ও মিশিয়া গিয়াছে। তিনি সুপবিত্র বারাণসী তীর্থে পতিতপাবনী মোক্ষদায়িনী জাহ্নবীর কূলে নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভবলীলা-সম্বরণের পরে সমাচার পত্রাবলীতে তাঁহার জীবন চরিত সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু বলা বাহুল্য তাঁহাদের অনেক কথা অপ্রামাণিক। কেহ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া, কেহ শোনা কথা সোণার ন্যায় গ্রহণ করিয়া, কেহবা সামান্য মাত্র সত্য অবলম্বন করিয়া মাতাজীর জীবনী লিখিয়াছেন। আমি অদ্যকার প্রবন্ধে তপস্বিনী মাতাজী মহাশয়া সম্বন্ধে কথঃ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। আমি শোনা কথার উপরে নির্ভর করি নাই; আমি যাহা কিছু অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রামাণিক। মাতাজী মহাশয়া তাঁহার জীবিতাবস্থাতেও এই সকল কথায় অনুমোদন করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক লজ্জা অথবা অন্য কোন কারণে প্রবন্ধান্তর্গত দুই চারিটি কথা সম্বন্ধে তিনি কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই, অথচ অসত্য বলিয়াও প্রতিবাদ করেন নাই। সুতরাং ঐ দুই চারিটি কথা সম্বন্ধে তিনি নিজে কিছু না কহিলেও উহা প্রামাণিক। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তিনি কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। এস্থলে সর্ব্ব প্রথমে কহিয়া রাখি, তপস্বিনী মাতাজীর আদি নাম (পিতৃদত্ত নাম) গঙ্গাবাই। মাতা, পিতা, জ্ঞাতিবর্গ ও পাড়ার লোকেরা শৈশবাবস্থায় তাঁহাকে "গাঁ গো বাই" বলিয়া ডাকিতেন। এই স্নেহময় গাঁ গো বাই নাম, মাতাজীর অনেক বয়স পর্য্যন্ত, অনেকে ব্যবহার করিত। মাতাজী বাঙ্গালী কন্যা ছিলেন না, তিনি দক্ষিণাবর্ত্তের (মহারাষ্ট্র দেশের) সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা পিতা উভয়েই মহারাষ্ট্র দেশোদ্ভূত ছিলেন। এই ক্ষণজন্মা স্ত্রীলোকের জীবন চরিত যেমন সুখপাঠ্য তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এস্থলে ইহাও কহিয়া রাখা উচিত, মাতাজীর মৃত্যুর পরে তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে বুঝিয়াছেন,

মাতাজী একটি প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন; কিন্তু দুই একজন মাত্র জানেন যে, তিনি কেবল রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই পরন্তু এক তপস্বীর বংশে অথবা রাজ-যোগী কিম্বা যোগী রাজের বংশে জন্ম লইয়াছিলেন। তিনি কেবল নিজে তপস্বিনী ছিলেন না, পরন্তু তপস্বীর বংশেও জন্মিয়া ছিলেন। সে কথা পরে লিখিতেছি।

মহারাষ্ট্র দেশে গোদাবরী নদীতটে শঙ্কটাগেষ্ঠি নামে এক পল্লী ছিল, তথায় রাজারামরাও নামক এক সুন্দর কায় ও সুশিক্ষিত পুরুষ বাস করিতেন। তাঁহাকে অনেকে "রাওলাজী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। রাজারাম রাও নানা কারণে তাঁহার ভূসম্পত্তি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া নাসিক (NASIK) নগরে আসিয়া বাস করেন, এই নাসিকের অপর নাম দণ্ডকারণ্য বা পঞ্চবটী। নাসিক নগরে দুই তিন পুরুষ অতিবাহিত হইলে, শিবরাম রাও নামে এক ব্যক্তি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত অরকটম্ (ARCOT) নামক প্রসিদ্ধ পরগণায় গিয়া বসতি স্থাপন করেন, এবং নাসিকের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করেন। সে কালে অরকটম্ (বর্ত্তমান নাম আর্কট) বলিলে একটা স্থান বিশেষ বুঝাইত না, বরং একটা সুবৃহৎ প্রদেশ বুঝাইত। এতদঞ্চলে মুসলমানদিগের তখন প্রবল প্রভাব ছিল। শিবরাম রাও নবাব সরকারে উচ্চ বেতনে এবং উচ্চপদে থাকিয়া অনেক কাল চাকুরী করেন, তদনন্তর তাঁহার পুত্র যাদবরাও মৃত শিবরামের সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। যাদবরাও মহাপণ্ডিত ও মহা ধার্ম্মিক ছিলেন; তিনি পিতার অতুল ধনের মালিক হইয়াও বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। অনেক বয়স পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নাই। তিনি ঘোরতর তপস্বী ছিলেন। অতি উগ্রতপস্যা দ্বারা তিনি মহাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহাঁর পুত্র শশাঙ্ক রাও মুসলমান দিগের পরমোপকার সাধন করিয়া রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং পরিণামে রায়বেল্‌হর্ (বেলুর) দুর্গের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। শশাঙ্কের পুত্র রাজা নারায়ণ রাও, তাঁহারই কন্যা গঙ্গাবাই অথবা (শৈশব কালের) গাঁ গো বাই এবং কলিকাতার প্রসিদ্ধা মাতাজী। জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণী।

জ্বরে পথ্য।

লেখক—ডাক্তার শ্রীধনঞ্জয় নন্দী।

বিনাপি ভেষজৈর্ব্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে॥
নতু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥

ভেষজ বিনা কেবল পথ্যের দ্বারা রোগ নিবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু পথ্য বিহীন হইলে শত শত ঔষধের দ্বারাও ব্যাধি নিবৃত্ত হয় না। উপরিউক্ত বৈদ্য শাস্ত্রোক্ত

বাক্য যে অতীব সত্য, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই, পথ্যই আরোগ্যের এক মাত্র কারণ, যেহেতু আহার বিহারের অনিয়মে যখন রোগ জন্মিতে পারে, তখন আহার বিহারের সুনিয়মে অবশ্য ব্যাধি প্রশমিত হইতে পারে। আজ কাল জ্বরে পথ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত গোলযোগ দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ কোন শাস্ত্রে জ্বর মাত্রেই দুগ্ধ, দুগ্ধবার্লি ও দুগ্ধ সাগু প্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থা দেখা যায়, আর কোন শাস্ত্রে তরুণ জ্বরে পেয়াদি ক্রমে আরম্ভ করিয়া জীর্ণ জ্বরের অবস্থা বিশেষে দুগ্ধাদি পথ্যের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। এই উভয়বিধ ব্যবস্থাই কি যুক্তিযুক্ত ? না উহাদের মধ্যে উপযুক্তানুপযুক্ততা আছে ? এই উপযুক্তানুপযুক্ততা নির্ণয় করিতে হইলে জ্বরের সম্প্রাপ্তির আলোচনা করা কর্ত্তব্য ; সম্প্রাপ্তির দ্বারা জ্বরের উৎপত্তি প্রকার বুঝা যায়। জ্বরের উৎপত্তি প্রকার বুঝিতে পারিলে অনায়াসে উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, জ্বরোৎপত্তিপ্রকার না জানিলে পথ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভ্রম নিরাকৃত হয় না। এক্ষণে এই জ্বরোৎপত্তিপ্রকার কি ? যুক্তিবিদ্ ডাঃ রবার্ট সাহেব বলিয়াছেন "বহু পরীক্ষাসমন্বিত অনুসন্ধান সত্ত্বেও জ্বরের নিদান এখনও পর্য্যন্ত সন্দেহ এবং অনিশ্চিততা পূর্ণ রহিয়াছে। ইহার উৎপত্তি, স্বভাব এবং স্বভাব সিদ্ধ তাপাদি লক্ষণ সমূহের গূঢ়তত্ত্ব নির্ণয় জন্য নানাবিধ বিবাদ জনক মত অবলম্বন করা হয়।" যখন তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ডাঃ রবার্ট সাহেব বলিতেছেন "জ্বরের নিদান এখনও ভ্রমপূর্ণ রহিয়াছে, তখন ডাক্তারি শাস্ত্রোক্ত জ্বর নিদানে আমরা যে অত্যন্ত বিশ্বাস করি, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। বৈদ্যক শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, "মিথ্যাহারবিহারকুপিতবাতাদ্যামাশয়গমনরসদূষণকোষ্ঠাগ্নি বহির্নিরসনরূপং জ্বরোৎপত্তিপ্রকারং বোধয়তি সম্প্রাপ্তিঃ॥" অর্থাৎ মিথ্যা আহার ও মিথ্যা বিহার দ্বারা কুপিত বাতাদি দোষ আমাশয়ে গমন করতঃ রস দূষিত ও কোষ্ঠাগ্নির উষ্মা বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া জ্বরোৎপাদন করে।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—

"বিক্ষিপ্যামাশয়োষ্মাণং যস্মাদ্‌গত্বারসং নৃণাং।
জ্বরংকুর্ব্বন্তিদোষাস্ত হীয়তেঽগ্নিবলং ততঃ॥"

যেহেতু দোষ সকল আমাশয়ের উষ্মা বাহিরে নিক্ষিপ্ত ও রস ধাতু দূষিত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে, তজ্জন্য অগ্নিবল অর্থাৎ পরিপাক শক্তিহীন হয়।

"যথাপ্রজ্জ্বলিতোবহ্নিঃ স্থাল্যামিন্ধনবানপি।
ন পচত্যোদনং সম্যগ নিলপ্রেরিতো বহিঃ॥
পক্তিস্থানাৎতদা দোষৈরুষ্মা ক্ষিপ্তো বহির্নৃণাং।
নপচত্যভ্যবহৃতং কৃচ্ছ্রাৎপচতি বা লঘু॥"

যদ্রূপ কাষ্ঠের সহিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নি বায়ু কর্তৃক বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইলে স্থালীস্থ অন্ন সম্যক্ পাক করে না, তদ্রূপ দোষ কর্তৃক পক্তিস্থান হইতে উষ্মা বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইলে আমাশয়স্থ ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক পায় না, বা অতি কষ্টে

লঘু অন্ন পরিপাক পায়। আর্য্য চিকিৎসকগণের এই জরোৎপত্তি প্রকার যে সত্য তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, যেহেতু ইহাই প্রমাণ সিদ্ধ; প্রমাণ এই যে নবজ্বরে গুরু আহার দ্বারা জ্বরসন্তাপের বৃদ্ধি এবং লঘু আহার বা অনশন দ্বারা তাপের হ্রাস। ঋষিগণ জরোৎপত্তিপ্রকারে নির্ণয় করিয়াছেন যে, "জ্বরে অগ্নি বলহীন এবং আমরসের দ্বারা আমাশয় ব্যাপ্ত হয়। এই জরোৎপত্তিপ্রকারনিরূপণ করিতে ঋষিগণ ভিন্ন অন্য কেহ সমর্থ হন নাই, ভবিষ্যতে কেহ হইবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হয়, যেহেতু ইহা সামান্য দর্শনশক্তির আয়ত্তাতীত। আমরসের দ্বারা আমাশয় ব্যাপ্ত হইলে

"অরুচিশ্চাবিপাকশ্চ গুরুত্বমুদরস্য চ।
হৃদয়স্যাবিশুদ্ধিশ্চ তন্দ্রাচালস্যমেবচ॥
জ্বরোহবিসর্গীবলবান্ দোষাণামপ্রবর্ত্তনম্।
লালাপ্রসেকোহৃল্লাসঃ ক্ষুন্নাশোহবিশদংমুখম্॥
স্তব্ধসুপ্তগুরুত্বঞ্চ গাত্রাণাং বহুমূত্রতা।
ন বিড়্ জীর্ণা নচগ্লানির্জ্বরস্যামস্য লক্ষণম্॥"

অরুচি, অবিপাক, উদরের গুরুতা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধি, তন্দ্রা, আলস্য, প্রবল অবিচ্ছেদী জ্বর, দোষের অপ্রবৃত্তি, লালাস্রাব, বিবমিষা, ক্ষুধার নাশ, মুখের বিরসতা, শরীর স্তব্ধ, সুপ্ত ও গুরু, মূত্রাধিক্য, বিষ্ঠা কিম্বা গ্লানির জীর্ণ না হওয়া; এই সকল লক্ষণ হয়। জ্বরের পরিপাক শক্তিহীনতা সর্ব্বশাস্ত্র স্বীকৃত। আর্য্য চিকিৎসাশাস্ত্রকারগণ নির্দ্দিষ্ট জ্বরের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসে জ্বরে পথ্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, সামজ্বরে বলরক্ষার জন্য দুগ্ধ পথ্য উপযুক্ত কি না? ঋষিগণ বলিয়াছেন "আমাভিভূতকোষ্ঠস্য ক্ষীরং বিষমহেরিব।" অর্থাৎ যে কোষ্ঠে (আমাশয়ে) আমরস আছে, তাহার পক্ষে দুগ্ধ সর্প বিষের তুল্য অর্থাৎ সর্প বিষ যেরূপ শীঘ্র প্রাণ নষ্ট করে, দুগ্ধ ও সামাবস্থায় প্রযুক্ত হইলে তদ্রূপ শীঘ্র প্রাণ বিনষ্ট করে! আমি দেখিয়াছি, একটী শিশুর সামাবস্থায় দুগ্ধ পথ্য দেওয়ায়, ঐ দুগ্ধ আমাশয়ে ছানার আকার ধারণ করে, এবং বমির সহিত উঠিয়া যায়, শিশুটী ৩য় দিনে প্রাণত্যাগ করে। সর্ব্বত্র এরূপ ঘটনা হয় না সত্য, কিন্তু সামাবস্থায় দুগ্ধ সেবন করিলে যে বহুদিন কষ্ট পাইতে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন।

উদীর্ণদোষস্বল্পাগ্নিরশ্নন্ গুরুবিশেষতঃ।
মুচ্যতেসহসাপ্রাণৈশ্চিরং ক্লিশ্যতি বা নরঃ॥

যে রোগীর দোষের প্রকোপ অতি অধিক এবং পরিপাক শক্তি অল্প সে রোগী গুরু আহার করিলে হঠাৎ তাহার মৃত্যু বা সে বহুদিন কষ্ট পাইতে পারে।

ক্রমশঃ



মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

হায় হায়! বঙ্গগগনের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রপাত হইয়াছে! মহারাজা সার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর কে, সি, এস, আই, লীলাময় ইহসংসার পরিহার পূর্ব্বক যোগ্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন! মহারাজের জীবনী আলোচনা করিলে মহাশোকচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে বিপুল আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়। শৈশবাবধি মহারাজ বাহাদুর সংসারের সর্ব্বগুণের আধার হইয়াছিলেন। সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত ও রাজনীতির আলোচনায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশ ধনগৌরবের সহিত দৈহিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক ঐশ্বর্য্যে চিরবিখ্যাত। পূর্ব্বতন কতিপয় পুরুষ পর্য্যায়ে এই বংশ ঠাকুর উপাধিতে সুপরিচিত; বাস্তবিক ইহাঁরা ভট্টনারায়ণ বংশসম্ভূত বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি-ভূষিত।

কান্যকুব্জ হইতে এদেশে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্ট-নারায়ণের ১৬টী পুত্র সন্তান হয়, তন্মধ্যে অন্যতম নৃসিংহ হইতে ঠাকুর বংশের উৎপত্তি। এই নৃসিংহের অষ্টম পুরুষ ধরণীধর মনুসংহিতার টীকা করেন। তাঁহার পৌত্র ধনঞ্জয় বাঙ্গালায় বল্লালসেনের প্রাড়বিবাক ছিলেন। এই ধনঞ্জয়ের পুত্র হলায়ুধ। ইনি রাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনিই প্রসিদ্ধ কোষকার হলায়ুধ। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ হলায়ুধের অধঃস্তন সপ্তম পুরুষ। জগন্নাথের অধঃস্তন সপ্তম পুরুষ পঞ্চানন গোবিন্দ পুরে জমী লইয়া বাড়ী করেন। ইনি ঠাকুর উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জয়রাম ২৪ পরগণার আমীন ছিলেন। ঐ সময়ে ইংরাজী ইতিহাসের লিখিত অন্ধকূপহত্যা সংঘটিত হয়। ইংরাজেরা দুর্গ প্রস্তুত করিবার জন্য জয়রামের গোবিন্দপুরের ভিটা ক্রয় করিয়া লইলে তিনি কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটায় আসিয়া বাস করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জয়রামের মৃত্যু হয়। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে দর্পনারায়ণ ও নীলমণি সুপ্রসিদ্ধ। জ্যেষ্ঠ দর্পনারায়ণের পুত্র গোপীমোহন, গোপীমোহনের পুত্র হরকুমার। হরকুমারের পুত্র যতীন্দ্রমোহন।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বর্গীয় বাবু হরকুমার ঠাকুরের পুত্র। বঙ্গাব্দ ১২৩৭ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে) অক্ষয় তৃতীয়ার দিবসে পাথুরিয়াঘাটার পৈত্রিক ভদ্রাসনে যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার জননীর নাম শিব সুন্দরী দেবী। পুণ্যবতী শিব সুন্দরী সেই নবকুমারের নাম রাখিয়াছিলেন, জটীন্দ্র মোহন. বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই নামটি সুসংস্কৃত হইয়া যতীন্দ্রমোহন হইয়াছিল।

মহারাজের পিতা বিদ্যানুরাগী সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি ছিল। পুত্রের পঞ্চম বর্ষ বয়সে হাতে খড়ি দিয়া তাঁহার শিক্ষার জন্য বাড়ীতে একজন গুরুমহাশয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে যতীন্দ্রমোহন মার্কিণ সাহেবের ইন্‌ফ্যান্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ইংরাজী ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগাথা মুখস্থ করিয়াছিলেন. তাহার পর হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। পরিবারের প্রাচীন কিঙ্কর কৃষ্ণদাস যতীন্দ্রমোহনকে পালন করিয়াছিল, প্রতিদিন সন্ধ্যারপর কৃষ্ণদাস শিশু যতীন্দ্রমোহনকে ক্রোড়ে লইয়া রামায়ণ—মহাভারতের গল্প শুনাইত, তদবধি রামরাবণের ও কুরুপাণ্ডবের কাহিনী গুলি যতীন্দ্রমোহনের হৃদয় পটে অঙ্কিত হয়। কলেজে অধ্যয়ন সময়ে যতীন্দ্রমোহন ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় গদ্যপদ্য রচনা করিয়া সংবাদ পত্রে প্রেরণ

করিতেন, সংবাদ পত্রে তাহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। সংবাদ-প্রভাকরের সম্পাদক কবিবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরমাদরে যতীন্দ্রমোহনের বিরচিত নানা বিষয়িণী কবিতা মালা প্রভাকর পত্রে স্থান দান করিয়া প্রতিভান্বিত বালকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দেবানুগ্রহে আজন্ম প্রতিভা বান্ ছিলেন, বাবু যতীন্দ্রমোহনকে তিনি প্রতিভা বান্ বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

বাবু যতীন্দ্রমোহন সংস্কৃত বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, তাঁহার স্বহস্ত লিখিত একখানি খাতায় তদ্বিষয়ের নিদর্শন আছে।

বাবু যতীন্দ্র মোহন যখন কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া বহির্গত হন, কলিকাতায় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় নাই। অধ্যয়নে অত্যধিক অনুরাগ থাকাতে কলেজ পরিত্যাগের পরেও তিনি নিজ ভবনে ইংরাজী শিক্ষকের নিকটে ইংরাজী ভাষা এবং উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকটে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন। অধ্যয়নে ও আলোচনায় নিরন্তর তাঁহার সাতিশয় আগ্রহ ও আনুরক্তি ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার রচিত শাস্তরসাত্মক অনেক শ্লোকাবলী আছে। নাট্যাভিনয়ের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ থাকাতে স্বীয় ভবনে তিনি নাট্যশালা স্থাপন করিয়া বিবিধ নাটক প্রহসনে অভিনয় করিতেন। রাজা শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর, উভয় সহোদরে মিলিত হইয়া নাট্যশালায় একতান বাদন (*CONCERT*) প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, বাবু যতীন্দ্রমোহন স্বয়ং কয়েক খানি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিদ্যাসুন্দর, চক্ষুদান, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ও উভয়সঙ্কট উল্লেখ যোগ্য। তৎসাময়িক অনেক বড় বড় লোক তাঁহার বাটীতে অভিনয় দর্শন করিতে আসিতেন।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক জমিদারি সভায় বাবু যতীন্দ্র মোহন সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন, পাইক পাড়ার রাজা ঈশ্বরনারায়ণ সিংহের পরলোক যাত্রার পর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত সভার সভাপতি হন। অতঃপর পর্য্যায় ক্রমে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক ছোটলাট সারউইলিয়ম গ্রে তাঁহাকে বঙ্গ দেশীয় ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে বরণ করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি প্রচার হইয়াছিল। প্রধান প্রধান ইংরাজ রাজ পুরুষেরা তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিতেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ৭ই মার্চ্চ বড়লাট লর্ডমেয়ো তাঁহাকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। ক্রমান্বয়ে তিনি রাজ দরবার

হইতে রাজা, মহারাজা ও কে, সি এস, আই. উপাধি লাভ করেন, মহারাজা উপাধি তাঁহার পুরুষানুক্রমিক হইয়া রহিয়াছে।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ট্রষ্টি, ও প্রেসিডেণ্ট, মেয়োহাঁসপাতালের গবর্ণর, সিণ্ডিকেটের ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং ফ্যাকল্টিঅবআর্টের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন সামাজিকতায়, রাজনীতিজ্ঞতায়, বিদ্যানুরাগিতায়, সঙ্গীত প্রিয়তায়, মিষ্টভাষিতায়, সুরসিকতায়, আমাদের সমাজের আদর্শপুরুষ ছিলেন। অধ্যাপক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সম্মান, বঙ্গীয়, সাহিত্য জীবীগণের ও সঙ্গীত গায়ক বাদকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনে, যথাযোগ্য পুরস্কার দানে তিনি কদাচ বিমুখ ছিলেন না, সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহিত বিনম্র ভাবে মধুর বচনে সদালাপ করিতেন, যাঁহারা তাঁহার সহিত একবার মাত্র সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার গুণাবলী কদাচ ভুলিতে পারিবেন না। স্বদেশের বিবিধ সৎকার্য্যে তাঁহার প্রচুর অর্থদান ছিল। তাঁহার বাটীতে নিত্য অতিথি সেবা হইত, জননী শিবসুন্দরীর নামে লক্ষটাকা ব্যয়ে তিনি একটি "হিন্দু বিধবাফণ্ড" স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, মেয়োহাঁসপাতালে দশসহস্র মুদ্রাদান করিয়াছেন, পিতার নামে একটি "স্কোয়ার" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই স্কোয়ারে বাবু হর কুমার ঠাকুরের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি আছে, সংস্কৃত ও ইংরাজী উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কতিপয় ছাত্রের জন্য উপযুক্ত ছাত্রবৃত্তি ও স্বর্ণপদক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার খুল্লতাত বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের নিকটে তিনি জমিদারি কার্য্য প্রণালী শিক্ষা করেন, প্রসন্ন কুমারের মৃত্যুর পর তিনি চিরজীবনের জন্য তাঁহার সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগী হইয়াছিলেন।

দরিদ্রের প্রতি মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের যথেষ্ট দয়া ছিল, প্রজারঞ্জনেও তিনি অকপট অনুরাগী ছিলেন, ১২৭৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি আপন বিস্তৃত জমিদারির দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের খাজনা মহকুপ করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার বাটীতে নিত্য নিত্য প্রায় তিনশত গরীব লোক পরিতোষ রূপে আহার পাইয়াছিল, অপরাপর দুর্ভিক্ষের বৎসরেও তিনি প্রজাগণের খাজনা ক্ষমা ও অনেক দরিদ্র লোককে অন্নদান করিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে নব প্রতিষ্ঠিত অন্নরক্ষিণী সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি একদিন এই মর্ম্মে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, দেশের দরিদ্র লোকের অন্নকষ্ট নিবারণের উপায় করা নিতান্ত

আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; কি উপায়ে তাহা সিদ্ধ করা যায়, তাহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এদেশ হইতে চাউল রপ্তানি বন্ধ করা সহজে হইবে না, স্বাধীন বাণিজ্যের খাতিরে সাহেব ব্যবসায়ী অধিক মূল্যে এ দেশের চাউল কিনিয়া লইয়া বিদেশে পাঠায়, দ্বিতীয়তঃ এ দেশের নির্ব্বোধ কৃষকেরা অর্থলোভে ঘরে অন্ন সংস্থাপন না রাখিয়াও সাহেবদিগকে অধিক মূল্যে চাউল বিক্রয় করে. তাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য, একটি উপায় এই আছে যে, দেশের সর্ব্বস্থানে অধিক পরিমিত জমিতে ধান্য চাষ করা জমিদারেরা যদি আপনাপন অধিকারের পতিত ভূমিগুলি কয়েক বৎসরের জন্য নিস্করভ্রূপে প্রজাগণকে আবাদ করিতে দেন, তাহা হইলে কৃষকেরা আগ্রহপূর্ব্বক যত্নসহকারে সেই সকল ভূমিতে ফসল উৎপাদন করিতে পারে, এবং প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিলে রপ্তানী সত্বেও গরীব প্রজালোকে অন্নবিনা হাহাকার কমিয়া আসিতে পারে, আমি আমার নিজের জমীদারী সমূহে ঐরূপ ব্যবস্থা করিবার অনুমতি দিয়াছি; দেশের সকল জমিদার যদি এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করেন, তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। আক্ষেপের বিষয়, এই মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই দুরন্তকাল আমাদের দেশের অনাথবন্ধুকে হরণ করিয়া লইয়া গেল!

মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর কেবল বঙ্গদেশের নহেন, সমগ্র ভারতবর্ষের বন্ধু ছিলেন। যাহাতে ভারতের মঙ্গল হয়, সে পক্ষে তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ ছিল। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশেষ বিশেষ আইনের পাণ্ডুলিপির সংশোধন কালে তিনি ভারতের অনিষ্টকর ধারা গুলির পরিবর্ত্তনে যেরূপ প্রস্তাব করিতেন, উদারচেতা সভ্যেরা তাহার খণ্ডন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন, একখানি পাণ্ডুর সংশোধন প্রস্তাবে অন্যতম সভ্য সার আর্থার হবহাউস সাহেব বলিয়াছিলেন, "মহারাজের প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে অন্য যুক্তি দেখাইতে আমি প্রস্তুত হইতে পারি না। এই দৃষ্টান্তটি দেশহিতৈষী মহারাজের অতুল গৌরবের বিষয়।"

মহারাজের মাতৃভক্তি অচলা ছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ উপলক্ষে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লর্ড লিটন বাহাদুর রাজা যতীন্দ্রমোহনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেই দরবারে তাঁহাকে মহারাজ উপাধি দিবার কথা। পারিষদ লোক জন ও জিনিষ পত্র বাষ্পীয় শকটে অগ্রেই দিল্লিতে প্রেরিত হইয়াছিল, রাজা যতীন্দ্রমোহন শুভযাত্রা

করিবার অগ্রে জননীর অনুমতি লইতে গিয়াছিলেন ; পুত্রবৎসলা স্নেহময়ী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যাইও না, পথে অমঙ্গল ঘটিবে, আমার আশীর্ব্বাদে এই খানেই তুমি মহারাজা হইতে পারিবে।" মাতৃবৎসল রাজা মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই, তিনি দিল্লির দরবারে যান নাই, জননীর আশীর্ব্বাদ ঠিক ফলিয়াছিল। বঙ্গের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেব বেলভেডিয়ার উদ্যানে সভা করিয়া রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে "মহারাজা" উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই মহারাজ যতীন্দ্রমোহন সি, এস, আই, উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পুরুষানুক্রমিক—মহারাজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বৃদ্ধবয়সেও স্বভাব সিদ্ধ অমায়িকতা ও সামাজিকতা রক্ষায় উদাসীন ছিলেন না, কোন প্রকার হিতকারী সভা সমিতিতে সভাপতি হইবার জন্য আহূত হইলে তিনি আহ্লাদ পূর্ব্বক সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন, কোন পরিচিত গৃহস্থ ভবনে কিংবা কোন ব্যবসায় স্থলে কোন উৎসব উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইলে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া যথোচিত শিষ্টাচারে মিষ্টালাপে আমোদ আহ্লাদ করিয়া আসিতেন। অনেক বড় লোকের অনেক গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু একাধারে এত গুণ প্রায়ই নয়ন গোচর হয় না। মহারাজের বিয়োগে আমরা যথার্থই একটি মহারত্ন হারাইয়াছি।

ত্রয়োদশশত চতুর্দ্দশ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের চতুর্ব্বিংশ দিবসে উষাকালে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বহু লোককে কাঁদাইয়া ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত রাজা শৌরেন্দ্র মোহন ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুরকে তিনি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, কুমার প্রদ্যোৎ কুমার এক্ষণে তৎপদাভিষিক্ত মহারাজা। আমরা আশা করি নবীন মহারাজা সর্ব্বাংশে ধনাধিকারের সহিত পিতৃ গুণের উত্তরাধিকারী হইবেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট মহারাজকে নানাবিধ উচ্চ সম্মান প্রদান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দিবস বেলা ৭ ঘটিকার সময় তাঁহার সম্মান জন্য কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে পর পর একুশটি তোপ ধ্বনি হইয়াছিল, অধিকন্তু দুর্গের নিশান ১৫ দিন ধরিয়া ধ্বজদণ্ডের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত সমুত্থিত থাকিবে এইরূপ আদেশও হইয়াছিল। এ সম্মান অন্য কোন ভারতীয়ের ভাগ্যে কখন ঘটিয়াছে কি না, স্মরণ হয় না।

দ্বাদশ নীতি।

লেখক, শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

(১)

লজ্জশীলা স্নেহবতী ভক্তি-পরায়ণা,
আশ্রিতের প্রতি যাঁর সদাই করুণা ;—
নাহি অহঙ্কার যাঁর নাহি লোভ তম,
সংসার মাঝারে হন তিনি দেবী সম।

(২)

গৃহ-কর্ম্মে সুনিপুণ সদা হৃষ্টচিত,
এমন গৃহিণী হন জগতে পূজিত ;
কার প্রতি হিংসা দ্বেষ না করে কখন,
হেন নারী-গুণগান করে সর্ব্বজন।

(৩)

ভূষণ বসন কিংবা ধনের গৌরব,
রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি স্বীয় যশ-রব ;
প্রকাশিতে যে রমণী সদাই বিমুখ,
রমণী আদর্শ সেই ভুঞ্জে নানাসুখ।

(৪)

আয়-ব্যয়ে সদা দৃষ্টি গৃহ-কর্ম্মে মন,
কোন কার্য্যে অবহেলা না করে কখন,
হেন নারী যে সংসারে করয়ে বসতি,
নিশ্চয় সে সংসারে হইবে উন্নতি।

(৫)

বিহিত যতনে কর ধান্যের সঞ্চয়,
পৃথিবীতে কোন বস্তু ধান্য সম নয় ;
ক্ষুধার নিবৃত্তি কভু হয় কি রতনে,
ধান্য হ'তে প্রাণদান পায় সর্ব্বজনে।

(৬)

পোষ্য বর্গে অন্নদান গৃহ-কার্য্যে রত,
সর্ব্বজীবে দয়া মায়া পরহিত-ব্রত,
সাধিতে সংসার-হিত সদা সযতন,
ধন্য ধন্য সেই নারী সংসার-রতন !

(৭)

সদা মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিতে যতন,
প্রাণপণে করে যেই আশ্রিত পালন,
দরিদ্র দয়ার পাত্রে দান করে যেই,
ধরা মাঝে গুণবতী পুণ্যবতী সেই।

(৮)

অন্ত্যজ যদি হয় আগত ভবনে,
তাহারেও সমাদরে তুষিবে যতনে ;—
অধম জনেও দয়া করে সাধুগণ,
চন্দ্র কি করে না দীপ্ত-চণ্ডাল ভবন।

(৯)

শত্রুও যদ্যপি হয় গৃহে উপস্থিত,
অতিথি সৎকার তার করা সমুচিত ;
পাশে বসি কাঠুরিয়া করয়ে ছেদন,
তবু বৃক্ষ করে তারে ছায়া বিতরণ।

(১০)

যে নারী পতির প্রিয় কর্ম্মে সদারত,
ধর্ম্ম উপার্জ্জনে সদা রহে যে নিয়ত ;—
অবিবাদী মিতব্যয়ী প্রসন্ন বদন,
সদা তার গুণগান করে সর্ব্বজন।

(১১)

বিপুল আয়াসে হয় উন্নতি আত্মার,
কিন্তু সহজেই হয় অবনতি তার,
কত শ্রম হয় শিলা পর্ব্বতে তুলিতে,
মহূর্ত্ত লাগে কিন্তু নিম্নেতে ফেলিতে।

(১২)

স্বভাব চরিত্র যার হয় নিরমল,
ধর্ম্ম আচরণে যার বাসনা প্রবল।
পরমেশে সদা ভক্তি, দয়া সর্ব্বজীবে,
তাকে ত রমণী রত্ন সকলে বলিবে।

ঊষালোকে।

লেখিকা, শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

সুখদ বসন্ত-নিশা অবসান প্রায়
ঊষার কোমল আলো আসি'ছে ধরায়।
লুকাই'ছে তমোরাশি; স্নিগ্ধ সমীরণ-
বহে ধীরে; পুষ্প-বাস করিয়া হরণ।
তরুণ অরুণভাতি করি' বিলোকন,
আনন্দ অন্তরে জাগি' নীড়ে খগ গণ
করি'ছে প্রফুল্ল মনে' মধুর কূজন,
শ্রুতি মাত্র তাহে মুগ্ধ হইতেছে মনঃ।
গগনে কুমুদকান্ত হয় ক্রমে ম্লান,
নিরখিয়া সুখময়-নিশা-অবসান।
একে একে তারাকুল হ'তেছে বিলীন;
সর-নীরে কুমুদিনী ক্রমশঃ মলিন।
বিষম বিরহ-অন্তে, প্রেমানন্দ মনে,
মিলিতেছে চক্রবাক্ চক্রবাকী সনে।
সঞ্চারিছে হৃদে মর্ম, বিহগ কূজনে-
অপূর্ব্ব মধুর ভাব—এই শুভক্ষণে।
হরি' প্রজাপতি কত কুসুমের রেণু,
করি'ছে রঞ্জিত তা'র সুচিত্রিত তনু।
হেরি নভে নবভানু, হাসি'ছে নলিনী,
নবরবি-কর-স্পর্শে—হয়ে উল্লাসিনী।
প্রিয়জন-প্রেম-মূর্ত্তি হৃদয়ে ধরিয়া,
রাখি'ছে গোপনে তা'রে দল আবরিয়া।
হইল প্রভাত;—বায়ু মৃদু বয়ে যায়,
সুখময় স্পর্শে তা'র স্নিগ্ধ হয় কায়।
সুখদ সময়ে, সম, পিক-'কুহু' তানে,
উঠি'ছে আনন্দ-ঊর্ম্মি—দুখদগ্ধ প্রাণে।
বহি'ছে মধুর স্রোতঃ, এ মধু-সময়;
ভাসি'ছে আনন্দ-নীরে জীব সমমুদয়।

প্রেমময়ী মূর্ত্তি ধরি' প্রকৃতি সুন্দরী
ভাবেতে ভাবুকচিত লইছেন হরি।
ফুটি'ছে নীরবে কুঞ্জে কত ফুলকলি,
আসিছে'ঝঙ্কারি'—রঙ্গে—মধুলোভা অলি।
স্বার্থপর মধুকর প্রসূন-সদনে
রহে মধুপানে রত, প্রেমানন্দ মনে।
কুসুমে আদরে অলি, প্রেমে ততক্ষণ,
রহে মধু-ভার তা'র হৃদে যতক্ষণ।
মধুহীন ফুলে অলি ফিরিয়া না চায়,
নিত্য নবফোটা ফুল চুম্বিয়া বেড়ায়।
সম্পদ-সময়ে সখা সকলেই হয়;
ফিরিয়া না চায় কেহ হ'লে অসময়।
সর্ব্ব জীবে সম দয়া 'দয়াসিন্ধু' যিনি,
সম্পদ-বিপদে বন্ধু সবাকার তিনি।
বিনশ্বর বিশ্ব-বস্তু, ক্ষণপ্রভা-প্রায়,
দেখিতে দেখিতে সব কোথা উড়ে যায়।
ধরার আপাত সুখে মজিওনা মনঃ,
ভাব' সেই ভববন্ধু নিত্য নিরঞ্জন।
ত্যজি' সার, ভুলিও না অসার সংসারে;
ভজ নিত্য, 'নিত্যধনে'—ভক্তি সহকারে।
সর্ব্ব শোক নাশে হ'বে সুখের উদয়,
হ'বে মগ্ন শান্তিরসে কাতর হৃদয়।
অসার বিষয় যে বা ভাবে 'সারধন,'
ভুলি' ভগবানে,—ভবে সেই মূঢ়জন
দগ্ধ হয় অনুতাপে,—প্রিয়নাশে—শেষে,
সংসারী জীবের যাহা ঘটে পরিশেষে।
দয়াময়! দিয়ে মোরে 'সংসার খেলনা'
ভুলায়ে মায়ায়, প্রভো! কর না ছলনা।
শ্রীনিবাস! করবাস, অন্তরে আমার;
ঘুচে যা'ক শোক-তাপ, মোহ অন্ধকার।
দাসী করি'রাখ তব অভয় চরণে;
পাইব অনন্ত শান্তি জীবনে মরণে।

—:০:—

শোক সঙ্গীত।*

লেখক, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী।

কোথায় কোথায় কোথায় আজ
সেই অর্দ্ধেন্দু শেখর।
সতত ধ্বনি যাঁর যশোগান,
কুমারিকা হ'তে কৈলাস শিখর।
আমরা তাঁহার কিছুই জানি না,
আমরা তাঁহার কিছুই চিনি না,
তিনি হাস্য লাস্য অবতার,
তাঁহার সতত আস্য ঝরিত,
পুরিত মধুময় সেই অমৃত ধার।
তাঁহার মহিমা, তাঁহার গরিমা,
হেলিয়ে সুখ পারাবার—
তিনি মধুরে মধুরে মাধুরীময়,
তাঁর ছন্দে বন্ধে আপনার লয়—
তিনি জগতের হিতে, পরাণ সঁপিতে,
আলিঙ্গিয়া রঙ্গালয়।
আত্ম বলিদানে, পুষ্পের সোপানে,
পড়েছেন পথ মরি পরতর।
তাঁর যশোগান, বঙ্গের নিশান
উড়াইয়ে দেও প্রতি ঘরে ঘরে।
অভিনেতা কি অভিনেত্রীর হৃদে,
অঙ্কিত থাক তাঁর চিরস্মৃতি
হিরণ্য অক্ষরে।
গাও—কাঁদ—কাঁদ—গাও
তাঁর গুণসনে বিভুরে মিলায়ে
জগৎ জগদন্তর

---

* নটকুলশেখর স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী মহাশয়ের স্মরণার্থ-শোক সভায় লেখক কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল।

অদৃষ্ট ও ঈশ্বর।

লেখক, শ্রীযুক্ত রামসত্য বেদান্ততীর্থ।

কোন কোনও সম্প্রদায় আপত্তি করেন যে, যদি অদৃষ্ট ও পুরুষকার উভয়কে ফলজনক রূপে নির্ণীত করা হয়, তবে আর ঈশ্বর স্বীকার অনাবশ্যক। মহর্ষি জৈমিনি তদীয় মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বরাস্তিত্বের খণ্ডন করিয়াছেন। যুক্তি এইরূপঃ—ঈশ্বরকে যদি জীবগণের সুখ দুঃখ দাতৃরূপে অঙ্গীকৃত করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষপাতাদি দোষ সংঘটন অবশ্যম্ভাবী। কেন না জগৎ নানাবিধ চরাচর পদার্থের সমষ্টি মাত্র। ইহাতে কেহ প্রাসাদ বিহারী ঐশ্বর্য্যধারী রাজ কুলবর্ত্তী, কেহ বা পরভাগ্য-উপজীবী দারিদ্র সেবী অল্পজীবী, কেহ কামিনী প্রেম প্রয়াসী অসদভিলাষী বিলাসী, কেহ বা নিবৃত্তিমার্গ ধুরন্দর ব্রহ্মানন্দপর যোগিবর; কেহ পরক্লেশ হারী সাক্ষাৎ দয়াবতার, কেহ বা পরশ্রী-কাতর ছিদ্রান্বেষী জনদ্বেষী এইরূপ মানব কেন, সমস্ত জীব পরস্পর তারতম্য ভাবে ব্যবস্থিত। ঈশ্বরকে তাহার ব্যবস্থাপক বলিলে পক্ষপাতী এবং নির্দ্দয় বলা হয়। জীবগণের স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত অদৃষ্ট অনুসারে যদি ঈশ্বর সুখ দুঃখ দান করেন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অদৃষ্টকেই সুখ দুঃখদাতা বলিব, অতিরিক্ত নিরর্থক ঈশ্বর বলিয়া কোনও পদার্থ মানিব না। আরও দেখুন, অদৃষ্টাধীন ঈশ্বর কর্তৃত্ব হইলে তাঁহার স্বাতন্ত্র রূপ ঈশ্বরত্ব অব্যাহত হয়। সুতরাং ঈশ্বর নাই, অদৃষ্টই ঐহিক পারত্রিকাদি ফলের দাতা। এই আপত্তির সমাধানার্থ ভগবান্ বেদব্যাস তদীয় ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন, "বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি" অর্থাৎ :—ঈশ্বরের বৈষম্যাদি দোষ নাই, যেহেতু তিনিও অদৃষ্ট সাপেক্ষ হইয়া কার্য্য করেন। "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন" "যে যথামাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদি শাস্ত্র তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। বিচারক গুণ দোষ বিচার করিয়া কাহাকেও তিরস্কৃত বা পুরস্কৃত করিলে তদীয় মাধ্যস্থের ব্যাঘাত হয় না। মনে করুন :—আপনার ও আমার সদৃশ দুইটী শস্যক্ষেত্র আছে। আমরা উভয়ে এক সময়ে ভূমি কর্ষণাদি দ্বারা ক্ষেত্রকে ফলোপযোগী করিয়া যথা কালে বীজ বপন করিলাম, আপনার ক্ষেত্র ও আমার ক্ষেত্র তুল্যরূপে বৃষ্টির আনুকূল্য প্রাপ্ত হইল, কিন্তু ফলতঃ তারতম্য হইল। হয়ত আপনার শস্য মদপেক্ষায় উৎকৃষ্ট হইল। ইহার কারণ কি? বৃষ্টিকারী জলধরকে কি এজন্য দায়ী করিতে পারা যায়? কখনও না। কেন না

উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে বৃষ্টি হইয়াছে। তবে দায়ী কে ? এস্থলে ঐ উৎকর্ষ নিকর্ষের প্রতি শস্য বীজকে দায়ী করিতে পারা যায়, হয় ত আমার বীজ আপনার বীজ অপেক্ষায় কার্যোৎপাদনে অসমর্থ, বস্তুতঃ কীট দংশনাদি দোষ গ্রস্ত বীজের কার্য্য কারিতা শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সেই কার্য্য-কারিতা শক্তির ন্যূনাধিক্য বশতঃ কার্য্যতারতম্য হইবে ইহা স্বাভাবিক। এইরূপ আমাদের ফল তারতম্যের প্রতি আমাদের অদৃষ্ট বীজ দায়ী, ঈশ্বর জলধর সদৃশ, তাঁহার কোনও অপরাধ নাই, এজন্য তাঁহার স্বাধীনতা রূপ ঈশ্বরত্বও অক্ষুণ্ণ হয় না। কোনও স্থলে ঈশ্বর বা অধিপতি বলিলে যথেচ্ছাচারীকে বুঝায় না, বিচারকের বিচার স্বেচ্ছাচার প্রসূত হইলে তাহাকে বিচার বলা যায় না, তাহা স্বেচ্ছাচারিতার রূপান্তর মাত্র। অতএব উক্ত প্রকারে অদৃষ্টাধীন কর্তৃত্ব ঈশ্বর স্বীকৃত হইলে পক্ষপাতাদি বা তদীয় স্বাতন্ত্র ঐ ব্যাঘাত রূপ দোষাদির অবকাশ থাকে না। অদৃষ্টোৎপত্তির পূর্ব্বে সৃষ্টি (প্রাথমিকী) হইল কিরূপে ? ইত্যাকার প্রশ্নের সমাধান কল্পে ব্যাসদেব পুনরায় বলিয়াছেন, যে "ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" অর্থাৎ :—সৃষ্টির অনাদিত্ব নিবন্ধন "প্রাথমিকী সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মের অর্থাৎ অদৃষ্টের অবিদ্যমানতা হেতু আদ্য সৃষ্টিবৈচিত্র অসম্ভব" এই পূর্ব্ব পক্ষ খণ্ডিত হইতেছে। সৃষ্টিও অনাদি, অদৃষ্টও অনাদি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অদৃষ্ট নিবন্ধন পরাচীন সৃষ্টিবৈচিত্র হইতে পারে। "সূর্য্য-চন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইত্যাদি বেদ বাক্য তাহার প্রমাণ। লৌকিক বীজাঙ্কুর-ন্যায় ঐরূপ অনাদিত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ স্থল। বীজ হইতে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর হইতেও ক্রমশঃ কাণ্ডশাখা প্রভৃতির আবির্ভাব হইলে পরিশেষে ফল হইতে বীজ উৎপন্ন হয়, কিন্তু বীজ অগ্রে উৎপন্ন কি অঙ্কুর অগ্রে উৎপন্ন তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐরূপ কার্য্য কারণ ভাবের আলোচনা করিলে কেবল অনাদিত্ব স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই, বীজ ও অনাদি এবং অঙ্কুরও অনাদি বলিতে হইবে।

অদৃষ্ট ও সৃষ্টিবৈচিত্র্যও ঐরূপ অনাদিত্ব সূত্রে গ্রথিত। এইজন্য ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ সৃষ্টিকে ধারাবাহিক রূপে নিত্য বলিয়াছেন। যাহা হউক এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের পক্ষপাতাদি দোষ, বা অদৃষ্ট সাপেক্ষ কর্তৃত্বের তদীয় স্বাতন্ত্র ব্যাঘাত রূপ দোষ পরিহৃত হইল। পরন্তু অদৃষ্টই কার্য্যকারী হইবে ঈশ্বর স্বীকার নিরর্থক বলিয়া যে আপত্তি হইয়াছে তদুত্তরে আমি দুই একটী শাস্ত্রীয় ও লৌকিক যুক্তি প্রদর্শিত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্র সমূহে সহস্র সহস্র যুক্তি বিদ্যমান কিন্তু সে গুলি সম্পূর্ণ ভাবে উপন্যস্ত করিলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, এজন্য বিরত হইলাম। যিনি প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ মানেন না, যাঁহার মতে অদৃষ্ট নাই, জন্মান্তর নাই, স্বর্গ নরক ইত্যাদি কিছুই প্রামাণিক নয়, যাঁহার যুক্তিতে বেদ মুনি ও ভণ্ডগণের স্বকপোল কল্পিত জীবিকার উপায় মাত্র। "যাবজ্জীবেৎ সুখংজীবেৎ ঋণংকৃত্বা ঘৃতংপিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনংকুতঃ। ইত্যাদি বাক্য যাঁহার মূলমন্ত্র, তিনিও একেবারে ঈশ্বরের অপলাপ করিতে পারেন নাই। লোক সিদ্ধ মহাত্মাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। ঈশ্বর আমাদের মতে অলৌকিক, কেহ বলেন, তিনি জীব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কেহবা বলেন, যে তিনি জীব হইতে বাস্তবিক ভিন্ন নয়, উভয়ের ঔপাধিক ভেদ মাত্র। যাহা হোক ঈশ্বরের পৃথগস্তিত্বই আমার আলোচ্য, তত্ত্বাক্ত অবান্তর বিশেষ সমূহ উল্লেখ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধটীতে অসম্ভব, সুতরাং তাহাতে বিরত হইলাম। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, যে কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট পদার্থ টী অচেতন, তাহার স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্যকারিতা হইতে পারে না। সারথি ব্যতীত বিমান স্বয়ং গমন করিতেছে, ইহা বোধ হয় কেহ স্বীকার করিবেন না। অচেতন বস্তু চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে কার্য্য করিতে পারে না, পরিচালক অবশ্য প্রয়োজনীয়। দেখুনঃ—ইদানীন্তন পাশ্চাত্যাভিমানী ব্যক্তিবর্গের নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক গবেষণাবল্লীর সুললিত ফল "আগ্নেয় যান" (রেলগাড়ী) বা "প্রাবৃত্তিক যন্ত্র" (টেলিগ্রাম) প্রভৃতিও পরিচালক সাপেক্ষ। যদিচ কোনও দার্শনিক সম্প্রদায় পয়স্বিনী গাভীর দুগ্ধ ক্ষরণকে চেতননিরপেক্ষ অচেতন প্রবৃত্তির উদাহরণ রূপে ব্যবহৃত করেন তথাপি তাহার সমর্থন করিতে পারা যায় না। কেন না, গাভিগণের মধ্যে এতাদৃশ চাতুর্য্যশালিনী এক একটী গাভি দৃষ্টিগোচর হয় যে, তাহারা দোহন কর্ত্তার আত্যন্তিক দুগ্ধগ্রহণ দর্শনে বৎসের ক্লেশাতিশয় চিন্তা করিয়া স্বীয় দুগ্ধের অধিকাংশ দুগ্ধস্থলীতে সংগোপিত করে, এবং পুনর্ব্বার ইচ্ছা করিলে তাহা প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, সুতরাং স্পষ্ট বোধ হয় যে দুগ্ধক্ষরণ ও গাভীর ইচ্ছা পরতন্ত্র। এবমাদি বিচারে চেতন নিরপেক্ষ অচেতন প্রবৃত্তিকে সমর্থন যোগ্য বলিয়া মনে হয় কি? ঈশ্বর অস্মদীয় অচেতন অদৃষ্ট পদার্থের পরিচালক, অথবা জাগতিক সমস্ত পদার্থের পরিচালনাকে অবলম্বন করিয়াই "ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি" ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা উক্তবিধ বাক্যের অযথাভূত অর্থের গ্রহণ করিয়া অনেক

সময়ে সমস্ত দোষ ঈশ্বরে অর্পিত করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা কি চিন্তার বিষয় নয় যে, যিনি চির করুণাময় অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র সম্রাট পূর্ণানন্দ স্বরূপ, যিনি অন্তর্য্যামি রূপে নিখিল জীবের হৃদয়াকাশে অধিরূঢ়, তিনি কি বর্ব্বরোচিত পক্ষ পাতাদি দোষে দূষিত হইয়া নিরর্থক কখনও আমাদিগকে অসৎকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দুঃখভাগী করিতেছেন। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাদৃশ শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তিনি তদনুসারে আমাদের নিয়ন্তা, তিনি অস্মদীয় অদৃষ্ট সাপেক্ষ হইয়াও পরিচালনা কার্য্যে স্বতন্ত্র, কিন্তু যদৃচ্ছাচারী নয়। আমরা সহস্র সহস্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলাম না। দেখিয়া তিনি আমাদিগকে সৎকর্ম্মের উপযোগী উপকরণ সহকারে অদ্বিতীয় কর্ম্মভূমি ভারত ক্ষেত্রে প্রেরিত করিয়াছেন, কিন্তু আমরা এমন কৃতঘ্ন ও মূঢ় যে, তাঁহার এই অপরিসীম দয়ার পক্ষপাতী হইতে অভিলাষী নই। আমরা সকল বিষয় একপদে বিস্মৃত হইয়া নিত্য নিত্য অসৎকার্য্যে মনযোগী হইতেছি। পরজন্মে বা অদৃষ্টাদিতে আর আমাদের বিশ্বাস নাই, অনেকে স্বভাবের দোহাই দিয়া স্বকীয় অদ্ভুত বিজ্ঞান বত্তার পরিচয় দিতেছেন। বলা বাহুল্য জন্মান্তর স্বীকার না করিলে-কেবল স্বভাব স্বীকার আত্মবঞ্চনার প্রকারান্তর মাত্র। সদ্যোজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই রোদন করে, পরে মাতৃস্তন্য পান করিলেই শান্ত হয়, অধিক কি? পশুপক্ষী প্রভৃতি ও জন্মমাত্রে স্বীয় আহার্য্য জ্ঞানে সমর্থ হয়, পূর্ব্বজন্মবাদীর মতে ইহ প্রাক্তন সংস্কার নিবন্ধন হইয়া থাকে। স্বভাব বাদী উহা কেবল স্বভাব সিদ্ধ বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, যে আপনি ত জন্মান্তর স্বীকার করেন না, জন্মের পরক্ষণে শিশুর স্তন্যপানাদি যদি আপনার মতে স্বভাব কৃত হয় তবে উৎপত্তির পূর্ব্বে ঐ স্বভাবটী কোথায় ছিল? পুনরায় যদি প্রশ্ন হয় যে স্বভাবটী তৎকালে শিশুর সঙ্গে সঙ্গে যদি আবির্ভূত হইয়া থাকে বলেন, তবে সেই স্বভাবেরও স্বভাবান্তর স্বীকার অনিবার্য্য হইতেছে না কি? এইরূপ অনাদি অনন্ত কাল স্বভাব সমূহ স্বীকার করিলে আপনার অভিপ্রেত সিদ্ধ কিরূপে হইতে পারে? পরন্তু আপনি যে জন্মান্তর স্বীকার করেন না, তাহার কারণ কি? তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই বলা যায় না, কেন না যদি অনুমান বা আগম প্রভৃতিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করা হয়, তবে প্রত্যক্ষ বাদী চার্ব্বাকের দলে প্রবিষ্ট হইতে হয়, প্রত্যক্ষ বাদীর কিরূপ লাঞ্ছনা তাহা প্রত্যক্ষ বাদীই জানিতে পারেন তাহা হইলে স্বভাববাদী প্রশ্ন পরম্পরা শ্রবণে কেবল বিচলিত হইয়া পড়েন, প্রকৃতার্থ সিদ্ধি তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যাহা হোক আমাদের (হিন্দুগণের) অদৃষ্ট বাদ বা জন্মান্তরবাদ যে অপরিহার্য্য অপরিবর্ত্তনীয় এবং অবিনশ্বর, তাহাতে সন্দিহান হইবার কোনও কারণ নাই।

জুড়াইবার স্থান কোথায় ?—

দেখা যাইতেছে, বিংশতিবৎসরাবধি কলিকাতা সহরে কয়েকটা দুঃশ্চিকিৎস্য কুৎসিৎ রোগ প্রবেশ করিয়াছে। অম্লরোগ, অজীর্ণরোগ, বহুমূত্র, প্রমেহ ও যক্ষ্মাকাশ, বহুমূত্র ও যক্ষ্মাব্যতীত ঐ প্রকারের অন্যান্য রোগ গুলি নূতন বলিতে হইবে, বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল রোগের অস্তিত্ব ছিলনা বলিলেও উত্যুক্তি হইবে না। অধিক পরিতাপের বিষয় এই যে, সকল গুলিই প্রায় স্থায়ী রোগ। যাঁহাদের অর্থ সঙ্গতি আছে, তাঁহারা অনেক প্রকার চিকিৎসা করাণ কিন্তু প্রায়ই চিকিৎসা বিফল হয়, যাঁহারা অর্থহীন, তাঁহারা দুই একটা টোট্‌কা ব্যবহার করেন, কোন কোন দেবতার নামে মাদুলী পরেন, কেহ কেহ তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে হত্যাদেন এইমাত্র তাহাদের ভরসা।

কলিকাতা সহরেই ঐ সকল রোগের অসম্ভব আধিক্য ; শতকরা পঞ্চাশ জন ঐ সকল রোগের আক্রমণে জীর্ণকায়, এইরূপ অনুমান করাও বোধ হয় ভুল নয়। কলিকাতার জল হাওয়া এবং আহারাদির পদ্ধতি যদি ঐ সকল রোগ উৎপত্তির কারণ হয়, তবে কোন্ কোন্ রোগের পক্ষে বিশেষ বিশেষ কোন্ কোন্ স্থান আরোগ্যপ্রদ, বহুযন্ত্রণাভোগী রোগীরা কোন্ কোন্ স্থানে গেলে আরাম হইতে পারে, তাহা সকলেরই জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, রোগ বিশেষে জল হাওয়া পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতায় স্থান পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থাও আছে। শীতল উষ্ণ লবণাক্ত ও নাতিশীত উষ্ণ প্রদেশে জল হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে অনেকে গমন করেন যথাঃ—কাশী, মঙ্গের, বৈদ্যনাথ, দারর্জ্জিলিং সিমলাপাহাড়, সমুদ্রকুল পুরীধাম, নেপাল, এদিকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ওয়াল্‌টিয়ার নামক একটি স্থান ইদানিং নূতন সানিটেরিওয়ম বলিয়া গণ্য হইতেছে।

ভারতের রাজধানিতে আজকাল প্রাচীন প্রাচীন সুবিজ্ঞকবিরাজ প্রাচীন প্রাচীন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও নব প্রতিষ্ঠালব্ধ হোমিওপ্যাথিক সুচিকিৎসক অনেক হইয়াছেন, আমরা সবিনয়ে তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন করিতেছি উপরে যে কয়েকটি রোগের উল্লেখ করা গেল, কলিকাতার হাওয়া পরিহারার্থ ঐ সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা সম্ভবমত কোন্ কোন্ প্রদেশে গমন করিলে কোন্ কোন্ স্থানের জল বায়ু সেবন করিলে, তাঁহারা দীর্ঘকাল স্থায়ী যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারেন, বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসক মহাশয়েরা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব বিবেচনা মতে আপনাদের অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করেন, সাধারণের মঙ্গল কামনায়

সাদরে আমরা সেই সকল ব্যবস্থাপত্র জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া একটি গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদন করি, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা।

অদ্ভুত আবিষ্কার।

লেখক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, ডি,

মার্কিণ দেশে অনেক অদ্ভুত আবিষ্কার হইতেছে, তন্মধ্যে একটীর কথা এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিতেছি। অনেকেই জানেন (Hernia) অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ বিনাঅস্ত্র চিকিৎসায় নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয় না। মার্কিণদেশে একপ্রকার ট্রাস্ (Truss,) আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা অল্পদিন ধারণ করিয়া অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ নির্দ্দোষ রূপে আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি, যাঁহারা বহুকালাবধি অস্ত্র চিকিৎসা করাইবার ভয়ে এই রোগ হইতে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের উপকারার্থে আমি এই অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করিতেছি।

আজ কয়েক বৎসর হইল ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে আমার এসিস্টেণ্ট ডাক্তার নুরমহম্মদ একটী মুসলমান ভদ্রলোককে আমার নিকট পরীক্ষার জন্য লইয়া আসেন, এই ভদ্রলোকটী অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, তাঁহার আর কয়েক জন বন্ধু এই (Truss) ট্রাস্ পরিয়া আরোগ্য হইয়াছেন, শুনিয়া তিনি বিলাত হইতে (Dr Pierce) এর (Magnetia Truss.) ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে আমার নিকট ট্রাসের মাপ লইতে আসিয়াছিলেন। মাপ পাঠাইবার কতকগুলি প্রশ্নের তালিকা আছে, এই প্রশ্ন গুলির উত্তর সমেত মূল্য পাঠাইতে হয়। তিনি এই ট্রাস্ আনাইয়া ব্যবহার করিয়া কয়েক মাস পরে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইয়া আমাকে দেখাইতে আসেন। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, অগ্রে যেখানে চারি অঙ্গুলি প্রবেশ করিত, সেস্থলে এখন একটী অঙ্গুলিও প্রবেশ করে না, এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমি অনেককেই এই ট্রাস্ আনাইয়া দিয়াছি, ইহা ব্যবহার করিয়া সকলেই উপকার পাইয়াছেন। একটী যুবার ব্যবহারোপযোগী ট্রাসের মূল্য ৩৫৲ পঁয়ত্রিশ টাকা।

এই ট্রাস্ আনাইতে হইলে, বিলাতের ঠিকানায় চিঠি লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারা যায়, অথবা আমার কাছেও ইহার প্রশ্নের তালিকাদি পাওয়া যাইতে পারে।

—:•:—

কলির রঙ্গ।

একদা বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তপ্তাঙ্গ হইয়া, একজন বিপ্র সন্তান এক পল্লীগ্রামের বালুকাকীর্ণ পথবাহন করিয়া, লোকালয়ের উদ্দেশে গমন করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মধারা, পথশ্রমে পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক। নিকটে একটীও জলাশয় ছিল না, স্নান করিয়া জলপান করিবার সুবিধা ঘটিল না, দিবা দ্বিপ্রহর চলিতে অক্ষম হইয়াও ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল; কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একটি ক্ষেত্র দেখিতে পাইল; ক্ষেত্রস্থ লতায় লতায় বিস্তর কাঁকুড় ফলিয়া রহিয়াছে, দেখিয়া একটি কাঁকুড় গ্রহণ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল; কাঁকুড় ভক্ষণে পিপাসার শান্তি হয়, ব্রাহ্মণের ইহা জানা ছিল, অতএব কাঁকুড় ক্রয় করিবার অভিলাষে পিপাসুপথিক বারম্বার "ক্ষেত্র স্বামী, ক্ষেত্র স্বামী", বলিয়া উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল।

দিবা দ্বিপ্রহর, বৈশাখ মাস, নিদারুণ গ্রীষ্ম, রবিকর অতিশয় প্রখর, কৃষকেরা সে সময় স্ব স্ব গৃহে স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম লাভ করে, সে সময়ে ক্ষেত্রের নিকটে কেহই থাকে না; কেহই ছিল না, কেহই উত্তর দিল না। ব্রাহ্মণ কি করে, অত্যন্ত পিপাসা, কাঁকুড় গ্রহণে একান্ত আগ্রহ, ক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটি লতামূলে একটি পয়সা রাখিয়া, একটি কাঁকুড় ছিঁড়িয়া লইল, সূর্য্যদেবকে সাক্ষী করিয়া, গাত্র মার্জ্জনীতে কাঁকুড়টি জড়াইয়া, স্নানার্থ জলাশয় অন্বেষণে উত্তর মুখে চলিল।

সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামে অবশ্য পুষ্করিণী আছে, ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ সেই গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। একদিক হইতে একটা লোক আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল; দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ কেশ, দীর্ঘশ্মশ্রু, কৃষ্ণবর্ণ, আকৃতি ভয়ানক। বিকট হাস্য করিয়া সেই লোক বলিল, "কি গো ঠাকুর! ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, গলায় যজ্ঞসূত্র, কক্ষদেশে শূকরশাবক! এমন প্রবৃত্তি কেন তোমার?" ব্রাহ্মণ বলিল, তুমি কে? কেন আমাকে বিদ্রূপ কর? কোথায় শূকর শাবক?

লোক বলিল, "তোমার গাত্রমার্জ্জনী মধ্যে লুক্কায়িত আছে।" ব্রাহ্মণ বলিল, "গাত্রমার্জ্জনী মধ্যে একটি কাঁকুড় আছে।" লোক বলিল, "তাহার উপর আবার মিথ্যা কথা?—খোল তোমার গামছা, দেখাও আমায় কাঁকুড়।"

কাঁকুড় দেখাইবার জন্য ব্রাহ্মণ আপন গাত্রমার্জ্জনি উন্মোচন করিল, সত্যই একটা শূকর শাবক বাহির হইয়া খুর খুর করিয়া ছুটিল।

মহাবিস্ময়ে ব্রাহ্মণ অবাক; ভাবিল, একি ইন্দ্রজাল! কাঁকুড় হইল শূকর ছানা! এ স্থানটা বোধ হয় ভেল্‌কীওয়ালা বাজীকরের ক্রীড়াভূমি! ভাবিল এইরূপ, কিন্তু বিস্ময়ে তাহার রাক্‌রোধ হইল, একটিও কথা কহিতে পারিল না।

শ্মশ্রুধারি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ হাস্য করিয়া বলিল, "জান আমি কে? আমি কলিদেব যাহারা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া আমার শত্রুর আদর করে, তাহারা এইরূপ প্রতিফল পায়। তোমরা যাহাকে ধর্ম্মবল, সেই ধর্ম্ম আমার শত্রু; কাঁকুড়তলায় পয়সা রাখিয়া আসিয়া তুমি আমার শত্রুর পূজা করিয়াছ। যাও, ছুটিয়া গিয়া পয়সাটি লইয়া আইস; আসিয়াই দেখিতে পাইবে, তোমার শোরের ছানা কাঁকুড় হইয়াছে। যাও, বিলম্ব করিও না, কলির প্রতাপ দর্শন কর।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, অধিকারি দেখিতে না পাইয়া তরুতলে মূল্য রাখিয়া কাঁকুড় ক্রয় করিয়া আনিয়াছি, মূল্য ফিরাইয়া আনিয়া চোর হইতে পারিব না; আমার পিপাসার শান্তি হইয়াছে, কাঁকুড়ে আর আমার প্রয়োজন নাই; যাহারা তোমার ভক্ত, তাহাদের একজনকে তুমি ঐ শূকর ছানা প্রদান কর, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া অধমতারণ ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে পিপাসার্ত্ত ব্রাহ্মণ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই গল্পটি সমূলক কি অমূলক, সে বিচার না করিয়া সকলে দেখুন, কলিযুগে ধর্ম্মের দুর্গতি কিরূপ। যাঁহারা ধর্ম্মাচরণ করেন, এ যুগে তাহাদের শীঘ্র শীঘ্র অধঃপতন হয়, যাহারা নিয়ত অধর্ম্মে রত থাকে, দিন কতক তাহাদের সৌভাগ্য লক্ষণ দেখা যায়; সেই লক্ষণ দেখিয়া সংসারের অধিক অজ্ঞ লোক অধর্ম্ম শিক্ষা করিতেছে, এবং রোগে শোকে দারিদ্রতায় যারপর নাই কষ্ট পাইতেছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রাবণমাসের জন্মভূমি পত্রিকায় "শত্রুকে? পুত্রইপরম শত্রু" শিরোনামযুক্ত পত্রখানি পাঠ করিয়া আন্তরিক প্রীতি অনুভব করিয়াছি। তৎসম্বন্ধে দু একটি মন্তব্য প্রকাশ করা আমার বাসনা। অপরাপর যুগে পিতৃদ্রোহী পুত্রের দৃষ্টান্ত অতি অল্পই পাওয়া যায়, বর্ত্তমান কলিযুগে ঘোর বিপর্য্যয়। রামচন্দ্রের সহিত মিত্রতা করিবার সময় রাবণানুজ বিভীষণ শপথ করিয়াছিলেন, "আমি যদি প্রতারণা করিতে আসিয়া থাকি, তাহা হইলে যেন কলিযুগে শত পুত্রের পিতা হই; প্রবঞ্চনা যদি আমার মনে থাকে, * * *

"শত পুত্রের পিতা হই"

বিভীষণের এই শপথ শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ ঠাকুর হাস্য করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ যদি এই সময় বিদ্যমান থাকিতেন, তাহা হইলে নেত্রবাষ্প উদ্যাত হইয়া তাহার হাস্য রেখা ঢাকা দিয়া ফেলিত। শতপুত্র দূরের কথা, আজ কাল এক এক পিতার এমন এক এক কুলধ্বজ পুত্র জন্মিতেছে যে তাহাদের উপদ্রব্যে পিতাকে অস্থিতে অস্থিতে জর্জ্জরিত হইতে হইতেছে। মুর্খ হইল, কদাচারি হইল, অসাধু হইল, কেবল তাহাই পর্য্যাপ্ত নহে, পিতৃদ্রোহী হইয়া কুলাঙ্গার পুত্রেরা অহরহ ইহসংসারকে পাপ পঙ্কে ডুবাইতেছে। অবাধ্যতার ত কথাই নাই, অকারণে পিতার শত্রুতা আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া তাহাদের আনন্দের বিষয়, গৌরবের বিষয় দম্ভের বিষয়। এমন কি বৃদ্ধ পিতাকে অন্ন বস্ত্র প্রদান করিতেও অনেক সঙ্গতিমান পুত্র সক্রোধে পরাঙ্মুখ। আরও এক ভয়ঙ্কর কথা;—অর্থ লোভে কোন কোন পুত্র পিতৃহত্যা। করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। মুসলমান রাজগণের ইতিহাসে সেরূপ ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত অবিরল। সৎপুত্র জন্মিতেছে না, এমন কথা বলি না, অসতের সহিত তুলনায় সতের সংখ্যা অতি অল্প, কাল ধর্ম্ম বলিয়া অনেক লোকে ইহাতে উপেক্ষা করেন, কিন্তু অনেকে আবার অভি-সম্পাৎ করিয়া সংসারে অপুত্রক থাকিবার কামনা করেন। পুত্র বিলক্ষণ শত্রু হইয়া উঠিতেছে, অথচ সেই পুত্রের জীবনে মরণে পিতার দুঃখ সমভাবেই রহিয়া যাইতেছে। প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য খেলা মায়ার কি সাংঘাতিক আকর্ষণ।

এবারে আর নয়। আর একবার আপনার সহিত সাক্ষাত করিব।

ভুক্তভোগী—

পিতা।

উষা

লেখক, শ্রীবীরেন্দ্র নাথ মিত্র।

অরুণ রাগ রঞ্জিত গগন ভালে,
শোভে সোণার কিরীট কিরণ জ্বলে;
অম্বর চুমিয়া চুমিয়া অরুণ হাসি
(আজি) উষার মহিমা বিশ্বে প্রকাশি,

চিত্ত সরসে যথা কুঁহেলা রাশি—
সরসীর জলমাঝে পড়েছে আসি,
তরুণ কিরণ রাগ চুমিয়া চুমিয়া,
সরমে সরসী জল উঠিছে রাঙিয়া ;
অরুণ কিরণ যেন পড়িছে গলিয়া ;
হিরণ্য রেতসে সর উঠিছে পুরিয়া,
সমীর চুম্বনে ভাঙা ঢেউ গুলি গলে,
কুলে কুলে হেলে দুলে লোটে পদতলে ;
রক্তোৎপলদল তায় উঠিছে ফুটিয়া,
কালোভ্রমর আসিছে ছুটিয়া ছুটিয়া,
মৃদু মলয় পরশে মৃণাল কাঁপিয়া,
ভ্রমরে রাগিয়া দূরে দিতেছে ঠেলিয়া ;
ভৃঙ্গ অঙ্গ বেড়ি কুমুদ পরাগ শোভা ,
নহে গো মানিনী নলিনী লোচন শোভা,
গোপনে অভিমান ভরা রমণী হৃদয় পারা—
জগৎ লোচন পরাণ নলিনী বালা,
থুইয়া বুকে প্রেমেরি ডালা,
ভ্রমর গুঞ্জন বোলে নাহি দেয় সারা ॥
আসিয়াছে উষারাণী, কুমারী রতন—
মেলেছে জগত চক্ষু আপন লোচন ;
শীত জল লিপ্ত সিক্ত সুরভি চুম্বিত,
ফুল্ল কোমল কমল পরাগ বাহিত,
মৃদু সঞ্চালিত, সুধীরমলয় বায়,
সুরভি শ্বাস বহিয়া, দিগন্ত ছাপায় ॥
সমীর পরশ ঘায় উঠে শিহরায়,
সহকারে ঘেরি মাধবী ব্রততী বালা,
অশোকের লাল হাসে চারিদিক আলো,
ঢুলি যেন সমীরণ কতই খেলায় ॥
কুসুম সুরভি শ্বাসে পূর্ণ চারিধার,
ব্রততীর কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমর ঝঙ্কার ;

কশের চামর রাশি রহে হাসি হাসি,
হরিত ব্রীহির গুচ্ছ ঘেরি দশদিশি ॥
সরকূলে দাড়াইয়া পাদপ নিচয়,
নিশির শিশির অশ্রু ভূমে বরিষয়,
পত্র প্রান্ত বিগলিয়া অশ্রু যেন বয়,
আঁখি কোণ দিয়া ধীরে অশ্রু যথা ক্ষয়
বালার্কের রশ্মি হেরি চমকি চমকি,
আধ ঘুমে থাকি ডাকে বিনিদ্রিত পাখী;
কুমুদ বিরহে বুঝি উঠিছে কাঁদিয়া,
নতশির তরু রাজি থাকিয়া থাকিয়া,
গাভীগণ হম্বারবে চলিছে ধাইয়া ॥
হলস্কন্ধে কৃষীদল চলিছে গাহিয়া;
মুখরিত চারিদিক বিহগ কূজনে
আনন্দিত জীবগণ উষা আগমনে ॥

বাল বিধবার প্রতি।

লেখক, শ্রীঈশান চন্দ্র মহাপাত্র।

হা বালিকে ! বৃথা শোক, বৃথাতব কাতর রোদন,
বৃথা বিধাতারে নিন্দা, বৃথা অশ্রু-আপ্লুত নয়ন।
ভুলে যাও মর্ম্ম ব্যথা, মুছে ফেল নয়নের নীর,
নিবে দাও মনানল-দীপ্ত শিখা, চিত্ত কর স্থির।
না ফুটিতে কমলিনী, এ ত নহে বিধির নিয়ম,
বাল্যারুণ ঘনদলে চিরতরে হ'ক নিমগন ;
সরোবরে-কুমুদিনী, না খুলিতে বদন সুন্দর,
করাল রাহুর গ্রাসে লুপ্ত হ'ক পূর্ণ শশধর ;
কুসুমিতা না হইতে সহকারে লতা মনোহরা,
প্রবল অনিল বেগে তরুবর স্পর্শকরু' ধরা।
তিনি যে গো ! দয়াময়, সর্ব্বজীব মঙ্গল নিধান,
তোমাদের আমাদের সুখে তুষ্ট, দুঃখে ম্রিয়মাণ।

তবে কেন এ বিরহে? উচ্ছ্বাসের বৃশ্চিক দংশন?
কে ছিঁড়েছে আশালতা? কে জ্বালালে এই হুতাশন?
এ নহে গো দয়াময়; এ যে তব অতীত করম,
কালবিষ-ধর-রূপে দংশিয়াছে তোমার মরম।
ভুলি শোক, স্থিরচিতে বিভুপদে সঁপি কায়মন,
লভিবারে প্রাণধন, আজ হ'তে করহ যতন।

নমঃশূদ্রজাতির অব্যবহার্য্যতা।

(প্রতিবাদ)

গত আষাঢ় মাসের জন্মভূমি পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী লিখিত, "নমঃশূদ্র" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান সমাজে পশ্চিমাকাহার ও কুর্ম্মির জলপান করিতে দ্বিধা বোধ করি না, এবং রন্ধনশালায় তাহাদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ নহে, ইহারা কিন্তু অজ্ঞাত কুলশীল, পক্ষান্তরে জ্ঞাতকুলশীল নমঃশূদ্র জাতির সহিত সেইরূপ ব্যবহার কুণ্ঠা প্রকাশ করি" ইহার পর লেখক নমঃশূদ্র জাতির কতকগুলি গুণ ব্যাখ্যা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কাহার জলপান করা উচিত? রন্ধনশালায় কাহাকে যাইতে দেওয়া উচিত? ইত্যাদি।

পশ্চিম দেশীয় কুর্ম্মী কাহারের সহিত তুলনা করিয়া লেখক না হয়, নমঃশূদ্র জাতিকে উচ্চ সিংহাসনে বসাইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগের জল চলন বা সামাজিক ব্যবহার্য্যতা বিধিবদ্ধ করিতে পারেন না? কুর্ম্মী কাহারের জলপানাদি সহরবাসী সামাজিকতাবজ্ঞাকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে বহুশঃ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু মফঃস্বলে ঐরূপ অনাচার এখনও ততটা প্রবিষ্ট হয় নাই। এখনও যদি সামাজিকতা বলিয়া কোন সামগ্রী থাকে, তবে তাহা মফঃস্বলেই আছে। কলিকাতায় যখন নিম্নজাতির সহিত কায়স্থাদি জাতির হুঁকা চলে, এক পঙক্তিতে বসিয়া পৈতাধারী মাত্রের (সময় সময় নিরুপবীতেরও) খাওয়া চলে, তখন কলিকাতায় আচার সামাজিকতা কোথায়? সুতরাং সহরের দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্থল হইতে পারে না। নমঃশূদ্র জাতির নামান্তর চাণ্ডাল। চাণ্ডাল জাতির যত কেন ব্যবহার শুদ্ধি ও গুণসদ্ভাব পরিলক্ষিত হউক না, তাহাদিগের পাতিসত্য দোষ

কোন কালে অপনীত হইবে না। শাস্ত্রে যাহা বলিয়া গিয়াছে, শাস্ত্রী মহাশয় আয়ুর্ব্বেদের তোপে তাহা উড়াইয়া দিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। স্মৃতি নিবন্ধে চাণ্ডালের স্পৃষ্টোদক পানে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে।

যস্তু চাণ্ডাল সংস্পৃষ্টং পিবেত্তোয় মকামতঃ।
স তু সান্তাপনংকৃচ্ছ্রং চরেৎশুদ্ধ্যর্থ মাত্মনঃ॥

(অঙ্গিরা)

জলপান ত দূরের কথা, চাণ্ডালের ছায়াস্পর্শও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ভগবান্ মনু বলিয়া গিয়াছেন—

ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চাণ্ডালৈর্ন পুক্কশৈঃ।
ন মূর্খৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ॥ ৪।৭৯

যাহারা নমঃশূদ্র জাতিকে চাণ্ডাল বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহাদিগকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ জাতি নিশ্চিত একটী পতিত, অমেধ্য, বা অন্ত্যজ জাতি। অন্ত্যজাদি জাতিরও জল চলিতে পারে না। তাহাদিগেরও সংস্পৃষ্ট দ্রব্যাদি ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। যথা—

অমেধ্যপতিত চাণ্ডাল পুক্কশ রজস্বলাবধূত।
কুনিকুষ্ঠি কুনখি স্পৃষ্টানি ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রমাচরেৎ॥

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, নমঃশূদ্রজাতির জলপানাদি ও সামাজিক ব্যবহার্য্যতা শাস্ত্রও দেশ বিগর্হিত। শাস্ত্রীমহাশয় সেই পদ্ধতির প্রচারের প্রমাণ কোন সাহসে করিতে চাহেন জানি না, আরও এককথা লেখক যখন এই জাতির প্রাক্তন শূকর, ভক্ষণের কথা অবগত আছেন তখন তিনি কেমন করিয়াই বা ইহাদিগের পাতিত স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন? শাস্ত্রে আছে।

"যস্মিন্দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্যং বিধীয়তে।
তত্রতন্নাবমন্যেত দেশাচারো মতোহিসঃ॥"

জিজ্ঞাসা করি, স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থার কচকচি ছাড়িয়া দিয়া লেখক মহাশয় কি এ মহাজন স্বজনেরও সম্মান রক্ষা করিতে চাহেন না।—আমাদিগের দেশাচার নমঃশূদ্রের জলপানাদি নিষিদ্ধ। লোক পরম্পরায় এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কাহারও ক্ষমতা নাই তাহার অবমাননা করে।

আমরা আর অধিক কথা বলিতে চাহি না—প্রকৃত পক্ষে যাঁহারা সমাজ মানিয়া চলেন, ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিতে প্রস্তুত তাঁহাদিগকে এই টুকু জানাইয়া

রাখি. দেশের বড় দুর্দ্দিন আসিয়াছে। নচেৎ নিম্নজাতি বৈশ্য হইবার প্রয়াস পাইবে কেন? কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইতে চাহিবে কেন? আবার নমঃশূদ্রকে সমাজে চালাইবার চেষ্টা হইবে কেন? এখন বুঝিয়া শুঝিয়া চলিতে হইবে। নচেৎ জাতীয়তা সামাজিকতা রক্ষার উপায় নাই।——

শ্রীরাজকুমার স্মৃতিতীর্থ।
কৈকালাচতুষ্পাঠী—(হুগলী)

যাত্রা।

মদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, মহেশ চক্রবর্ত্তী, নারাণদাস, মদন মাষ্টার, দুর্গাচরণ ঘড়িওয়ালা গোপাল উড়ে, ও রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী প্রভৃতি যে প্রণালিতে যাত্রা করিয়া গিয়াছে, আধুনিক যাত্রা সম্প্রদায়দিগের সে প্রণালি নাই। এখনকার যাত্রায় প্রায় নাট্যাভিনয়ের অনুকরণ দৃষ্ট হয়। প্রভেদের মধ্যে রঙ্গভূমি ও চিত্রপটাদি থাকে না। এই প্রণালী অনেকের পক্ষে অরুচিকর, যাত্রা শুনিতে হয়, যাত্রা শুনব, অভিনয় দেখিতে হয়, থিয়েটারে দেখিব, ইহাই অনেকের মুখে শ্রবণ করা যাইতেছে। কথাও নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সমস্ত যাত্রা দলের মধ্যে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের দলটি আজ কাল প্রকৃত যাত্রার মান রক্ষা করিতেছে, কিছুদিন পূর্ব্বে এই দলেও অভিনয়ের ধুম লাগিয়াছিল, কেবল একটিং একটিং একটিং! গীত গাহিবার সময় চোগা চাপকান ধারিগণ আদালতের উকীলের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া হস্ত মুখ ভঙ্গি করিয়া, উচ্চ চিৎকার করিত, একপাল,সখি রোদনের গীতের সময়ও এক রকম নৃত্য করিতে করিতে হো, হো, করিয়া হটুগোল বাঁধাইত? গীতের একটি বর্ণ মর্ম্মে স্পষ্ট বুঝা যাইত না, পঞ্চস্বর মিশ্রিত, কণ্ঠে রাগ রাগিণীও বুঝিয়া লওয়া যাইত না। মতিলাল রায় মহাশয়ের দলে এখন অনেক দূর সংস্কার হইয়াছে। উত্তম উত্তম যাত্রার যে প্রকার প্রথা, ঐ দলে অধুনা সেই প্রথার নবজীবন দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি আমরা আমাদের কার্য্যালয়ে মতিরায়ের দলের নব যাত্রা শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। যাত্রার নাম তিলোত্তমা গীতাভিনয় রায়মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস রায়, এই বর্ত্তমান সংস্কারের প্রবর্ত্তক। জুড়ি আছে, কিন্তু জুড়িরা এখন পূর্ব্বের ন্যায় শৃগালের ন্যায় হুয়া হুয়া রব করে না, দুই দুইজন একত্র দাঁড়াইয়া, শাস্ত্র

সিদ্ধ রাগ রাগিণী যোগে পরিষ্কার কণ্ঠে সুস্বরে গীত গায়, সখিরাও চারি পাঁচ জনে স্পষ্ট স্পষ্ট রাগ রাগিণী আলাপ করে। শ্রোতৃ বর্গের কাণ ঝালা পালা হয় না, গীতগুলি মধুর শ্রবণে কর্ণ শীতল হয়। নায়ক নায়িকা গুলির কথোপকথনও বিব্য পরিষ্কার, সাধু ভাব পূর্ণ শ্রুতি মধুর। যাত্রা শুনিতে হইলে, এইরূপ যাত্রা শ্রবণেই আশানুরূপ আমোদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা এই যাত্রা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, প্রচলিত সমস্ত যাত্রায় এইরূপ দৃষ্টান্ত অনুসৃত হয়, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

সমালোচনা।

শুভবিবাহ-তত্ত্ব। শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য দুই টাকা।

আর্য্যশাস্ত্রোক্ত দশবিশ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ একটি প্রধান সংস্কার; এই সংস্কারের দ্বারা পতি পত্নী উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিলেও একাঙ্গভূত হইয়া যায়। শাস্ত্রমতে নারী পরিণীত পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপিনী। যদবধি বিবাহ সংস্কার না হয়, তদবধি পুরুষ পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না, হস্তপদ বিশিষ্ট অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়াই গণ্য থাকে। হরগৌরী মিলিতাঙ্গ এই বিষয়ের অদ্বিতীয় উদাহরণ। বিপ্রদাসবাবু আমাদের বৈবাহিক মন্ত্রের একটি সূক্ষ্মস্থল উদ্ধৃত করিয়া অতি প্রশংসনীয় রূপে স্বীয় সারবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। যথাঃ——

পাত্র বলিতেছে পাত্রীকে, "আমি লক্ষ্মীহীন, তুমি লক্ষ্মী, আমি সামবেদ, তুমি ঋক্‌বেদ,—আমি আকাশ তুমি পৃথিবী;—আমরা দুইয়ে মিলিয়াই পূর্ণ। তুমি বিনা আমি শূন্য; তুমিই আমার লক্ষ্মী।"

আর্য্য বিবাহের এতদূর মহিমা, সেই কারণেই আমাদিগের বিবাহের নাম শুভ-বিবাহ। জগতের অপরাপর জাতিরও বিবাহ বন্ধন আছে, কিন্তু আর্য্যশাস্ত্রোক্ত বিবাহের তুল্য, ধর্ম্মভাব পূর্ণ পবিত্র পরিণয় আর কোন দেশে, কোন শাস্ত্রে অথবা কোন জাতির মধ্যেই নাই। খৃষ্টান ও মুসলমানেরা নারীকে অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, বিবাহ হইলে উভয়ে মিলিয়া পূর্ণাঙ্গ হন, এ কথাও বলেন; প্রমাণ এই যে তাঁহাদের শাস্ত্রমতে আদি পুরুষের অঙ্গ হইতে নারীর উৎপত্তি, ইহা বিধাতার সৃষ্টি, এই প্রমাণে স্ত্রীপুরুষে একাঙ্গ। মুখেতাঁহারা একথা বলেন, কার্য্যে কিন্তু বিষম ব্যতিক্রম। দুইজন মনুষ্য সাক্ষার সম্মুখে চুক্তিপত্র লেখাপড়া করিয়া বিবাহ করা; ইহাকে ধর্ম্মানুসারে প্রকৃত সংস্কার বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে হয়। চিরদিনে যে বন্ধন ছিন্ন হইবার নহে, উক্ত উভয় সম্প্রদায় কোন না কোন সূত্র প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে সেই বন্ধন ছেদন করেন; এক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা চুক্তি

প্রমাণে একাঙ্গ হইয়াছিলেন, বর্ষাবসানে তাঁহারা পুনর্ব্বার দুই অঙ্গে বিভক্ত হইতে পারেন, এরূপ বিবাহকে "শুভবিবাহ" বলিতে তাঁহারাও বোধ হয় লজ্জাপান।

অপর জাতির দৃষ্টান্তের বহুল আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন। হিন্দুর বিবাহই প্রকৃত শুভবিবাহ, হিন্দুর বিবাহই প্রকৃত সংস্কার। বাবু বিপ্রদাসমুখোপাধ্যায় ভারতের স্মরণাতীত কালের সহিত, সমন্বয় রাখিয়া বর্ত্তমান সময়ের পরিণয় পদ্ধতির পূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন; হিন্দু সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন শাখার বৈবাহিক প্রণালীর আমূল বর্ণনা করিয়াছেন; পুরাতত্ত্ব ও নবতত্ত্ব সংগ্রহ করিতে তাঁহার কত সময় ও কত শ্রম ব্যয় হইয়াছে, পাঠক মহাশয়েরা এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন। পুস্তকখানি প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, সাংসারিক অন্যান্য পরিবর্ত্তনের ন্যায় আমাদের পরিণয় প্রথারও বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভারতের ক্ষত্রিয় জাতির বিবাহে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল, তাহাতে স্বয়ম্বরা কন্যা বিবাহ সভায় পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া রূপবান্ পাত্রকেই বরমাল্য প্রদান করিতেন, কুলশীল পদ অথবা ধনমর্য্যাদার আদর থাকিত না; সাধারণ হিন্দু পরিবারে সেরূপ প্রথা ছিল না, এখনও নাই; যাঁহাদের মধ্যে ছিল, তাঁহাদের মধ্যেও সে প্রথা প্রায় তিরোহিত। আমাদের দেশের পরিণয় প্রথা কিছুদিন পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিপ্রদাস বাবু তাহা সপ্রমান করিয়াছেন, শ্লোকটির অর্থ এই যে, কন্যা কেবল বরের রূপ কামনা করিতেন, কন্যার মাতা জামাতার ধন কামনা করিতেন, কন্যার পিতা জামাতার সদ্‌বিদ্যার কামনা করিতেন, আত্মীয় স্বজনেরা বরের কুলমর্যাদা কামনা করিতেন, ইতর জনেরা কেবল মিষ্টান্ন কামনা করিত, পরিবর্ত্তনের যুগে এখন আর সে দিন নাই, অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বিবাহে যাহারা মিষ্টান্ন লোভী, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, কন্যা কর্ত্তার আত্মীয় স্বজনের মতামতও এখন আর প্রায়ই চলে না, কন্যার কামনাও সর্ব্বস্থলে পূর্ণ হয় না। তবে হয় কি?—বরের মাতাপিতা কেবল অর্থ ও অলঙ্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখেন; কন্যার পিতা মাতাকে উৎপীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করাই তাঁহাদের দৃঢ় সংকল্প। যোগ্য পাত্র, যোগ্য কুল, যোগ্য মর্য্যাদা, অন্বেষণ করা এখনকার কন্যাকর্ত্তাগণের পক্ষে নিতান্ত দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বরকর্ত্তারাও সে সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে চান না: তাঁহাদের বিবেচনায় এখন পুত্রের মূল্য স্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রাপ্তিই আর্য্য

বিবাহের মূলমন্ত্র! অহো এখনকার বিবাহকে "শুভবিবাহ" বলা যদি সঙ্গত হয়, তবে অশুভ বিবাহ কি প্রকার, তাহা জানিয়া লইতে হইবে। বাবু বিপ্রদাস বহুকষ্টে বহু যত্নে বিবাহ সাগর মন্থন করিয়াছেন, অমৃত তুলিয়াছেন কি, বিষ তুলিয়াছেন, বিজ্ঞ বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা তাহা পরীক্ষা করিবেন। আমরা আশা করি, হলাহলপায়ীরা পরিতুষ্ট না হউন, এ মন্থনে অমৃত উঠিবে। কমলাপতি নারায়ণ মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দেবোপম আর্য্যসন্তানগণকে সুধা বণ্টন করিলেই আমরা চরিতার্থ হইব। ভবিষ্যতে নিলকণ্ঠের ভাগ্যে যাহা থাকে, তাহা নিলকণ্ঠেরই ইচ্ছা।

স্থূল কথা এই যে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, গ্রন্থকারের শ্রমযত্ন সার্থক হইয়াছে, দেশের কল্যাণ সাধনে বৃদ্ধ বয়সে তিনি যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, দেশের লোকেরা এখন তাঁহার অমৃতময় বাক্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিলে নিশ্চয়ই মঙ্গল ফললাভ হইবে।

উপসংহারে কেবল একটীমাত্র ক্ষুদ্র কথা।—মিনতি করি, এই কথাটিতে কেহ যেন রহস্য বিবেচনা না করেন। কথাটি এই যে, বাবু বিপ্রদাস আমাদের পাকশালা হইতে বহির্গত হইয়া আমাদের বিবাহ সভায় শুভাগমন করিয়াছেন, ইহাতে আমরা পরম সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার অভিনন্দন করিলাম। তাঁহার শুভবিবাহ তত্ত্ব" আমাদিগকে পরমানন্দ দান করিল।

সদৃশ চিকিৎসা—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত, ১০১ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানির দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য চারি টাকা। এখানি হোমিওপ্যাথিক মতে সুবৃহৎ চিকিৎসা পুস্তক। সদৃশ চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাননীয় আবিষ্কর্তা ডাক্তার হানিমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী এই পুস্তকের প্রথমাংশে প্রকটিত হইয়াছে। বিজ্ঞান বিশারদ প্রতিভা-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের জীবন চরিত আলোচনায়, যাঁহাদের আন্তরিক অনুরাগ, ডাক্তার হানিমানের জীবন চরিত পাঠে তাঁহারা বিশেষ আনন্দ ও উপকার লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

ডাক্তার লাহিড়ী মহাশয় এই দুই খণ্ডে বিবিধ রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। সুস্থ শরীরে ঔষধ পরীক্ষা, সদৃশ বিধি, স্বাভাবিক রোগ নির্ণয়, ঔষধের মাত্রা পরিমাণ, ক্ষুদ্র মাত্রার কার্য্যকরি শক্তি,

নাড়ী পরীক্ষা, জিহ্বা পরীক্ষা, মূত্র পরীক্ষা, শ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা নৈদানিক ও লাক্ষণিক চিকিৎসা, ইত্যাদি এই দুই খণ্ডে অতিসুন্দররূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

মস্তিষ্ক পীড়া, চক্ষুরোগ সমূহ, কর্ণরোগ সমূহ, নাসা রোগ সমূহ, মুখগহ্বরের পীড়া সমূহ, হৃদ্‌রোগ সমূহ, প্রদাহ সমূহ, যকৃতের পীড়া সমূহ, প্লীহার পীড়া সমূহ, বহুমূত্র, রক্ত প্রস্রাব, মধুমেহ, শুক্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, উপদংশ, বাগী, বসন্ত, হাম, বাতরোগ সমূহ, জ্বররোগ সমূহ, অতিসার ও প্লেগ প্রভৃতি রোগ সমুহের লক্ষণ ও চিকিৎসা এই পুস্তকের সারাংশ। যাঁহারা আজকাল হোমিওপ্যাথির প্রতি ভক্তিমান হইয়া, সেই মতে চিকিৎসা করিতে অভিলাষী, এই পুস্তক তাঁহাদিগের পরম বন্ধুরকার্য্য করিবে, একথা বলাই বাহুল্য। চিকিৎসক হইবার ইচ্ছা না থাকিলেও এই পুস্তকের এক এক খণ্ড আলোচনা করা সর্ব্ব সাধারণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এতৎপাঠে আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বহুতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয়ের নামে শত শত ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য তত্ত্ব।-প্রাগুক্ত ডাক্তার লাহিড়ী মহাশয় এই পুস্তকেরও প্রণয়ন কর্ত্তা; উক্ত লাহিড়ী কোম্পানীর দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ছয় টাকা।

ইংরাজীতে যাহাকে মেটিরিয়া মেডিকা বলে, আমাদের ভাষায় তাহার নাম ভৈষজ্য তত্ত্ব। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় যে সকল ঔষধের প্রয়োগ প্রয়োজন, এই পুস্তকে সেই সকল ঔষধের গুণাবলী বিজ্ঞাপক সুবিস্তৃত তালিকা বিদ্যমান। স্বর্গীয় ডাক্তারমহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকাস্থলে লিখিয়া গিয়াছেন, "ভৈষজ্য-তত্ত্ব অপার সমুদ্র স্বরূপ, এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত তদুপযুক্ত অর্ণবপোত ও সুনিপুণ কর্ণধার আবশ্যক।" অখণ্ডনীয় প্রকৃত কথা। কার্য্য কুশল ডাক্তার মহাশয় এই সমুদ্র পারের কাণ্ডারি হইয়া যথাসাধ্য সুগম উপায় করিয়া দিয়াছেন। এদেশে অধুনা দিন দিন হোমিওপ্যাথির আদর বৃদ্ধি হইতেছে; তবে যে কিছু কিছু মৃদুগতির লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল বর্ত্তমান রাজ পুরুষগণের উৎসাহ বিরহের ফল। সে বিরহ সত্ত্বেও হোমিওপ্যাথি শনৈঃ শনৈঃ জয়লাভ করিবে, অবশ্যই আমরা এইরূপ আশা করিতে পারি। যাঁহারা আজকাল আদর পূর্ব্বক, যত্ন পূর্ব্বক, আগ্রহ পূর্ব্বক হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতে অগ্রসর, তাঁহারা সমান আদরে, সমান যত্নে ও সমান আগ্রহে লাহিড়ী মহাশয়ের এই ভৈষজ্যতত্ত্ব পাঠ করুন, ইহা আমাদের একান্ত অনুরোধ; অনুরাগী চিকিৎসক মহাশয়েরা কার্য্য ক্ষেত্রে এই মূল্যবান গ্রন্থখানিকে পরম সহায় প্রাপ্ত হইবেন, স্বগৌরবে সহস্রবার আমরা এ কথা বলিতে পারি।

শ্লোকমালা।—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের শ্লোকমালার বিশুদ্ধ সংস্করণ। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

সিমুলিয়া নিবাসী নিত্যানন্দ বংশ সম্ভূত প্রভুপাদ স্বর্গীয় মহেন্দ্র নাথ গোস্বামী মহাশয় চৈতন্য চরিতামৃতের পরম সমাদর করিতেন। অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীকে এই অনুজ্ঞা দান করিয়া গিয়াছিলেন যে, "শ্রী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের শ্লোকমালার একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যেন বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।" সেই অনুজ্ঞানুসারে পিতৃদেবের প্রীতি স্মৃতির উদ্দেশে, পিতৃবৎসল পুত্র স্বীয় পিতৃব্য পুত্র সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ গোস্বামীর সহিত মিলিত হইয়া, এই বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। চৈতন্য চরিতামৃতের মধুময়ী শ্লোকমালা ভক্ত হৃদয়ে সুধা-সিঞ্চন করে, ভক্তের শ্রবণ-কুহরে সুধা বর্ষণ করে, সুতরাং এই বিশুদ্ধ সংস্করণ যে তাঁহাদের হৃদয়কে প্রেমানন্দে নিত্য করাইবে, একথা বলা অত্যুক্তি। চৈতন্য-ভক্তেরা এই পুস্তক বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইতেছেন। সম্পাদকেরা নিদেশ কর্ত্তার অনুমতি পালন করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন. প্রভু চৈতন্যদেব তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করুন। আমাদের একটী কথা বলিবার আছে। চৈতন্য দেবের ভক্তবৃন্দ সকলেই সুপণ্ডিত নহেন, তাঁহাদের বোধ সৌকর্য্যার্থ শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলে ভাল হইত।

সয়রুল মোতাখরীন।—৺গৌরসুন্দর মৈত্রমহাশয় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুদিত। ইহাতে আওরঙ্গজেবের পুত্র বাহাদুর সাহ হইতে ৭ (সাত) জন দিল্লীর পাতসাহের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৭৪ (চুয়াত্তর) বৎসরের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ কীর্ত্তিত। আওরঙ্গজেব্ পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাটগণের ঐতিহাসিক বিবরণের অভাব ছিল না। ইলিয়টু ও ডাউসেন্ সে অভাব মোচন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে অংশের অভাব ছিল, "মোতাখরীনের গ্রন্থকার মুন্সী গোলাম্ হোসেন্ কর্ত্তৃক সে অভাব পরিপূরিত হইয়াছে।

আলিবর্দ্দী হইতে আরম্ভ করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাবগণের অধঃপতন ও ইংরাজ-রাজের রাজত্বের সূত্রপাতের ইতিবৃত্তও, এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অংশের বিবরণ অতীব বিস্তারিতরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। তাহার কারণ, গ্রন্থকার গোলাম্ হোসেন্ বঙ্গের তদনীন্তন রাজধানীতে (মুর্শিদাবাদে)

নবাব-দরবারে অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব তাহার বিবৃত বিবরণ যে, প্রামাণিক—তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই।

যদিও ইতঃপূর্ব্বে দুইবারে দুই খানি ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে নানা কারণে সাধারণের উপকার হইতে পারে নাই। ১ম কারণ সে গুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মূল্যও, অত্যন্ত অধিক ছিল। অধিকন্তু ইংরাজি ভাষাও নির্ভুল ছিল না।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, কয়েক বৎসর অতীত হইল, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত নশীপুর নিবাসী (অধুনা স্বর্গগত) গৌর সুন্দর মৈত্র মহাশয় মোতা-খরীনের" আদ্যোপান্ত যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার ভাষা, যেমন সরল তেমনিই নির্দ্দোষ। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আবদুল্ মজিদ্-নামক কোন সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান কর্ত্তৃক যে মূল পুস্তকের বিশুদ্ধ পারসী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া, এই বাঙ্গালা অনুবাদ লিখিত হইয়াছিল। এস্থলে একথা উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে-মুস্তাফা ও কর্ণেল্ ব্রিগস্ যে দুই খানি ইংরাজি অনুবাদ প্রচার করেন, তাঁহারা হস্তলিখিত পুস্তক হইতে অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হস্তলিখিত পারসী পুস্তকে কত যে ভ্রমের সম্ভাবনা, তাহা অভিজ্ঞগণের জানিতে বাকী নাই। সুতরাং মৈত্র মহাশয়, মজিদের মুদ্রিত গ্রন্থের সাহায্য লওয়ায়, অতি বিজ্ঞতার কার্য্যই করিয়াছেন।

আমরা আশা করি যে, সহর ও মফস্বলের প্রত্যেক লাইব্রেরিতে এই সুন্দর বঙ্গানুবাদের বিলক্ষণ সমাদর হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে সহৃদয় প্রত্যেক সাহিত্যসেবী, এই মহামূল্য গ্রন্থের গ্রাহক হইয়া, প্রকাশক শ্রীযুক্তযোগীন্দ্র প্রসাদ মৈত্র মহাশয়কে প্রোৎসাহ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সর্ব্ব-শেষে আমরা এই স্বর্গীয় গ্রন্থকারের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন মৈত্র ও যোগেন্দ্র প্রসাদ মৈত্র মহাশয়-দ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া, থাকিতে পারি না। কারণ, এক্ষণে ইহারাই বঙ্গের ঐতিহাসিক চর্চ্চার অধিকতর সুবিধা করিয়া দিতেছেন।

ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী।—(তৃতীয় খণ্ড) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত। এই খণ্ডে বাঙ্গালীর পরমায়ু, বাঙ্গালীর বিদেশিনী বিবাহ, মশ্-তানসা, ও কারদীপ, শ্রীকৃষ্ণের নরদেহ, হেরড সাহেবের হাকিমী, মঙ্গলামাতা, পাঞ্জাবের পাঠান প্রদেশ, এক পেয়ালামদ, জাঁদরেল কাশীপ্রসাদ, জুতা আর

গুঁতা, আমেরিকার শিক্ষা প্রণালী, বেলুচি মল্লুক, রোঁয়া ছেঁড়া পণ্ডিত, ইত্যাদি ছাব্বিশটী সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধ গুলি পাঠে বঙ্গবাসী পাঠক মহাশয়েরা অনেক বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ও অতুল আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। ভারতী মহাশয় সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রবন্ধাবলীর ভাষাও অতি প্রাঞ্জল।

মুর্শিদাবাদ কাহিনী।—শ্রীযুক্তবাবু নিখিল নাথ রায় বি, এল, প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য আড়াই টাকা। এই সংস্করণে কয়েকটি প্রবন্ধ—বিশেষতঃ মহারাজ নন্দ কুমার শীর্ষক প্রবন্ধটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে বৰ্দ্ধিত আয়তন হইয়াছে। বঙ্গের মুর্শিদাবাদ প্রদেশ বহু প্রাচীন, মুর্শিদাবাদ সহরটিও এক সময়ে বঙ্গের রাজধানী ছিল। বাবু নিখিল নাথ তৎপ্রণীত "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস" নামক পুস্তকে অনেক প্রাচীন বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই ইতিহাস খানি যথা সময়ে জন্মভূমিতে সমালোচিত হইয়াছে। বর্তমান পুস্তকের সহিত পূর্ব্ব প্রকাশিত ইতিহাসের সামঞ্জস্য আছে। ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া এই কাহিনী পাঠ করিলে, বঙ্গীয় পাঠকেরা প্রাচীন ইতিহাসের বহুতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। নিখিল নাথ বাবু বঙ্গের সাহিত্য সমাজের লব্ধ প্রতিষ্ঠ, মুর্শিদাবাদ কাহিনীর বিবরণ ও ভাষা তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় দিতেছে, বোধ হয় একথা বলিয়া দিবার আবশ্যক করে না। বঙ্গসাহিত্য এই গ্রন্থকারের নিকট বিস্তর উপকার ঋণে ঋণী। মুর্শিদাবাদকাহিনী পুস্তকে সুন্দর সুন্দর বারখানি হাফটোন চিত্র আছে।

প্রতাপাদিত্য।—এখানিও উক্ত নিখিল নাথ বাবুর সম্পাদিত; মূল্য আড়াই টাকা। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দির বঙ্গের ইতিহাস, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত, হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের প্রতাপাদিত্য চরিত, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রীর প্রতাপাদিত্য এবং অন্যান্য টীকা টিপ্পনি আলোচনা করিয়া নিখিল নাথ বাবু এই পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন, দুই খানি ইংরাজী পুস্তকের সংক্ষিপ্ত অনুবাদও ইহার মধ্যে আছে। যাঁহারা ইতিহাস পাঠে অনুরাগী তাঁহারা এই পুস্তকে ষোড়শ শতাব্দির বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেকগুলি বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইয়া আমোদিত হইতে পারিবেন। নিখিল নাথ বাবু দেখাইয়াছেন, ষোড়শ শতাব্দির বাঙ্গালীর সহিত তুলনায় এখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালী অসার ছায়া মাত্র। তখনকার বাঙ্গালী বঙ্গদেশের গৌরব স্বরূপ ছিলেন। আমরা এইখানে গ্রন্থকারের একটি বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতেছি, তখনকার বাঙ্গালীর গৌরবে এখন আমরা নির্জ্জিববৎ হইয়াও গৌরবান্বিত।

সোণার বাঙ্গালা।—এখানি ও শ্রীযুক্ত বাবু নিখিল নাথ রায় প্রণীত, ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "স্বদেশী আন্দোলনে সকলের হৃদয়েই অল্প বিস্তর তুফান উঠিয়াছে। সেই বিরাট আন্দোলন গ্রন্থকারেরও মর্ম্মস্পর্শ করায় সোণার বাঙ্গালার অবতারণা। সাধারণে সোণার বাঙ্গালাকে আদরের চক্ষে দেখিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।"—ইতিপূর্ব্বে দুই খানি মাসিকপত্রিকায় এতৎ সম্বন্ধে পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাই এখন পুস্তকাকারে পরিণত। বঙ্গের অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, এখন কিরূপ হইয়াছে, সৌভাগ্যের অবস্থা কিসে বিলুপ্ত হইয়াছে, এই পুস্তকে তাহাই প্রদর্শন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য! তিনি বলিয়াছেন, "সাধারণে সোণার বাঙ্গালাকে আদরের চক্ষে দেখিলে" ইত্যাদি। পুস্তক খানিকে আমরা আদরের চক্ষেই দেখিলাম।

স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী।—শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। এক রাত্রি, চন্দ্র পুরের হাট, বনপ্রান্ত, পুলের ধারে, যাত্রা, প্রণাম, বান্দনী, হৃদয়াঞ্জলি, আষাঢ়ে গল্প, কুন্দনন্দিনী ও সূর্য্যমুখী, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, রাম প্রসাদের গান, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, ভারত চন্দ্র রায়, কৃত্তিবাস ও কাশীদাস, এবং বড়মানুষী প্রভৃতি শতাধিক প্রবন্ধ এই পুস্তকের নির্ঘন্ট। প্রবন্ধ গুলি গদ্যপদ্যময়। সকল গুলিই ভাব পূর্ণ প্রকৃতি সঙ্গত ও সুখপাঠ্য। বাবু বলেন্দ্রনাথ স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পৌত্র। শৈশবাবধি তিনি সাহিত্য রসাস্বাদনে আনন্দ অনুভব করিতেন। প্রবন্ধাবলীর মধ্যে কতকগুলি তাঁহার শৈশবের ও যৌবনের রচনাসমষ্টি একত্র গ্রন্থন করিয়া এই প্রবন্ধাবলী পূর্ণ করা হইয়াছে। বাবু বলেন্দ্রনাথের সহপাঠি মিত্র শ্রীযুক্তরামেন্দ্র নাথ সুন্দর ত্রিবেদী, এই পুস্তকের ভূমিকায় সংক্ষিপ্ত জীবনীর প্রণালীতে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইয়া দিয়াছেন, শরৎকালের শুকতারার সহিত তাঁহার প্রকৃতি ও রচনার ভাব মাধুর্য্য তুলনা করা আছে। উপমাটি সার্থক। রচনা গুলি যথার্থই শুক্রতারকার ন্যায় কোমল ও উজ্জ্বল; কবিতা গুলি প্রকৃতই প্রকৃতিদেবীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। আহা! যৌবনের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতেই বাবু বলেন্দ্র নাথ অকালে কাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হইলে, বঙ্গের একজন সুকবি বলিয়া গণনীয় হইতে পারিতেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস মুকুন্দ রাম রামপ্রসাদ কৃত্তিবাস, কাশীদাস ও ভারতচন্দ্রের কবিত্বের যেরূপ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও আলোচনা অপ্রীতিকর হয় নাই, পাঠকালে কাব্য রসজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা নিশ্চয়ই তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। পরিশেষে আমাদের একটি বক্তব্য আছে। এই পুস্তকের নাম গ্রন্থাবলী না রাখিয়া "প্রবন্ধাবলী" রাখিলেই ঠিক হইত। যাহা হউক এতৎপাঠে আমরা পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছি।



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৬শ বর্ষ। | ১৩১৫ সাল, আশ্বিন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বেহুলা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ গুপ্ত।

ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস প্রণীত "মনসার ভাসান" নামক গ্রন্থখানি আমাদের দেশে বড়ই আদরণীয়, ইহা একখানি গীতিকাব্য খোল ও মন্দিরার সঙ্গতে এই গীতিকাব্য সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে। আজিকালি আমাদের দেশ হইতে প্রাচীন গীতিকাব্য গুলির সঙ্গীত ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। উৎসাহ না পাইয়া এই সম্প্রদায়স্থ-গায়ক গণের তিরোধান হইতেছে। শারদীয় মহামহোৎসবের পূর্ব্বে দলে দলে চণ্ডী, রামায়ণ ও মনসার ভাসান, কৃষ্ণমঙ্গল, চৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি গীতি কাব্যের গায়কেরা বর্দ্ধমান বাঁকুড়া ও হুগলী জেলা হইতে মহানগরী কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিত, সহরে ও মফস্বলে এই সকল গীতিকাব্য শ্রবণের

আকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত পূজা বাড়ীতে এই সকল গায়ক সম্প্রদায়ের বিলক্ষণ আদর ছিল, পূজার তিন দিন গান করিয়া সেই সকল গায়ক বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিত। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষার ও বর্ত্তমান সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই সকল পুরাতন সঙ্গীতের আদর এতই কমিয়া গিয়াছে, যে পূজার পূর্ব্বে আর সেই সকল গায়ককে কি সহরে কি মফস্বলে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের জাতীয় ভাব এই-রূপে সকল দিকেই কমিয়া গিয়াছে। পুরাতনের আদর করিতে আমরা এক-বারেই ভুলিয়া গিয়াছি। যাহা কিছু পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা, তাহারই আদর যত্ন আমাদের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছে।

"মনসার ভাসান" মনসা বা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মহিমা কীর্ত্তন—বর্দ্ধমান সহরের উত্তর পশ্চিম দিকে চম্পাক নগর (চম্পাইকনগরে) গ্রামে চাঁদ সদাগর নামে একজন শিবভক্ত গন্ধবণিক বাস করিতেন। চম্পক নগর দামোদর তীরবর্ত্তী। চাঁদের বাসবাটী দামোদর হইতে অর্দ্ধ-ক্রোশ দূরে অবস্থিত, তাঁহার নিত্য পূজনীয় একটী বৃহৎ শিবলিঙ্গ ছিল, চাঁদ প্রতিদিন তাঁহাকে লইয়া দামোদরে স্নান করিতে আসিতেন। সেই শিবলিঙ্গ বিশ পঁচিশ জন লোকের বোঝা, কিন্তু চাঁদ অনায়াসে তাঁহাকে লইয়া দামোদরে স্নান পূজা করিয়া বাড়ী যাইতেন, প্রবাদ এইরূপ যে, চাঁদের পূজিত শিবলিঙ্গ অদ্যাপি চম্পকনগরে দেখিতে পাওয়া যায়। চাঁদ অতি বড় শৈব হইলেও বড় মনসাদ্বেষ্টা ছিলেন, তিনি মনসার দেবত্ব কিছুতেই স্বীকার করিতেন না, মনসার নাম শুনিলে রুষ্ট হইতেন, যাহার মুখে শুনিতেন তাহাকে নিগৃহীত করিতেন, মনসাদেবীও তাহার প্রতি বড়ই বৈমুখী ছিলেন, তিনিও তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য চাঁদের ছয়টী পুত্রকে সর্পদংশনে দেহত্যাগী করেন, তাহাতেও চাঁদের মনসার নিকট নম্রতা নাই, বরং অধিকতর উগ্রতা। অগত্যা দেবী ও মানবে ঘোরতর দ্বন্দ,—চাঁদ মনসার নিগ্রহে ধনেপ্রাণে বিব্রত তথাপি মনসার দেবত্ব স্বীকারে নারাজ।

এরূপ অবস্থায় চাঁদ-সীমন্তিনী সনকা গর্ভবতী হইলেন, বাণিজ্যোপলক্ষে চাঁদ যখন বিদেশস্থ তখন সনকা এক পুত্র প্রসব করেন, তাহার নাম হইল লখিন্দর। যথাকালে তাহার জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন হইল। এ যাত্রায় চাঁদ সাতখানি বাণিজ্যতরী লইয়া দেশান্তর গমন করেন, মনসাদেবীর নিগ্রহে তাঁহার সাতখানি তরীই জলমগ্ন হয়, চাঁদ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া চাম্পাই নগরে প্রত্যাগত হয়েন।

প্রায় ইহারই সমসময়ে নিছনী নাগকগ্রামে সায় সদাগরের ঔরসে এবং তৎপত্নী অমলাসুন্দরীর গর্ভে শাঁপভ্রষ্টা বেহুলার জন্ম হয়। আমাদের প্রাচীন কবিরা প্রায়ই তাঁহাদের নায়ক নায়িকা-গণকে স্বর্গ হইতে শাঁপভ্রষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। নায়ক নায়িকার চরিতাখ্যান উচ্চ আদর্শে গঠিত বলিয়া জানাইবার ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর নাই। প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর প্রতি স্বভাবতঃ অনুরাগী ছিলেন, স্বর্গবাসী দেবদেবীর নাম শুনিলে মস্তক অবনত করিতেন, গ্রন্থকারগণও এই সুযোগে সাধারণের চিত্তাকর্ষণে সমধিক্যে সমর্থ হইতেন। বেহুলা শাপভ্রষ্টা, সুতরাং তাঁহার চরিতাখ্যান সাধারণের পুণ্যজনক পাঠ্য।

চাঁদ সদাগরের অবস্থা আপাততঃ তাদৃশ অনুকূল না হইলেও পুত্রের উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দিয়া তাহাকে ভবসংসারের একজন সংসারী করিয়া দেওয়া পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে তিনি পুত্রের বিবাহ জন্য পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে পুরোহিত জনার্দ্দন ঠাকুরকে ব্রতী করিলেন, জনার্দ্দন ঠাকুর নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া উজানী নগর বাসী ধনপতি * সদাগরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, ধনপতির নিকট তিনি সংবাদ পাইলেন যে নিছনী নগরের সায়বেণের একটী অবিবাহিতা কন্যা আছে। ব্রাহ্মণ বিলম্ব না করিয়া নিছনপ নগরে উপস্থিত হইলেন, সায়সদাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কন্যার বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে চাঁদের পরিচয় পাইয়া তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন,জ্যোতির্ব্বিদ আনাইয়া গণনা দ্বারা উভয়ের শুভসম্মিলন স্থিরীকৃত হইল। জনার্দ্দন ঠাকুর চম্পক নগরে প্রত্যাগমন করিলেন—পাত্রের পিতা স্বভাবতঃই সর্ব্ব প্রথম পাত্রীর রূপের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, চাঁদও সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ঘটক ঠাকুরকে তাহা জিজ্ঞাসিলে তিনি নিম্নোক্ত প্রকারে পাত্রীর সমস্ত বিষয় চাঁদকে জানাইলেন :—

ঘটক বলেন সাধু, তোমার পুত্রের বধু,
রূপে যেন স্বর্গবিদ্যাধরী।
দেখিনু অনেক ঠাঁই, তাহার তুলনা নাই,
যেন লক্ষ্মী উর্ব্বশী-অপ্সরী॥
বদন ক্ষীরদ শশী, তাহে মৃদু মন্দ হাসি,

* এই ধনপতি সদাগরই কবিকঙ্কণের চণ্ডী কাব্যের নায়ক শ্রীমন্ত-সদাগরের পিতা।

জলদ নিন্দিত কেশভরা।
কন্যা পতিব্রতা বটে, লোটন লম্বিত পৃষ্ঠে,
হাবভাব সকলি সুধারা ॥
গজেন্দ্রগামিনী রামা, রূপে যেন তিলোত্তমা,
বেহুলা নাচনী তার নাম।
বারমাসে বার ব্রত, পুণ্যতীর্থ করে যত,
দেবকার্য্য করে অবিরাম ॥
তোর পুত্র নখীন্দর, বেহুলার যোগ্য বর,
ইথে কিছু নাহিক অন্যথা।
দেবী মনসার গীত, কেতকার বিরচিত,
নায়কেরে হবে বরদাতা ॥

পাত্রীর রূপ সর্ব্বত্র সকল সময়েই আদরণীয়, কিন্তু গুণের আদর একালে ভিন্ন রকমের দাঁড়াইয়াছে, বেহুলা বার ব্রত পরায়ণা, তীর্থদর্শনাভিলাষিণী—সেকালে ঈদৃশী পাত্রীই সর্ব্বগুণান্বিতা বলিয়া পরিগণিতা হইতেন। একালের পরিচয়টা মনে মনেই ভাবিয়া দেখুন —কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বেহুলা নৃত্যগীতাদি কলা বিদ্যাপারদর্শিনী ছিলেন, তাহাও ঘটকের পরিচয়ে জানিতে পারা যায়।

চাঁদ সদাগর জনার্দ্দনের নিকট বেহুলার রূপ গুণের পরিচয় পাইয়া মেলানী ভারসহ জনার্দ্দন ঠাকুরকে লইয়া বিবাহ স্থিরীকরণে যাত্রা করিলেন, নিছনী নগরে সায়সদাগর ভবনে উপস্থিত হইয়া পাত্রী নিরীক্ষণের পর তুলসী পত্র বিনিময়ে দুই বৈবাহিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে চাঁদ বলিলেন পাত্রী কতদূর পতিব্রতা হইবেন ইহা জানিবার প্রয়োজন তজ্জন্য বেহাইকে কহিলেন আপনার কন্যা যদি লোহার কলাই পাক করিয়া দিতে পারেন, তবেই আমি তাহাতে নিঃসন্দেহ হইতে পারি। এই রীতি আমার পুরুষ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, এরূপ পরীক্ষা ব্যতিরেকে কোন পাত্রী আমার পুত্রের জন্য মনোনীত হইতে পারেন না! সায় ইহা অসম্ভব বোধে উপহাস করিয়া বলিলেন, "লোহার কলাই কিরূপে পাক করা যাইতে পারে, সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।" সায় আপন কন্যাকে এই কথা প্রস্তাব করিলে সে তাহাতে সম্মতা হইয়া লোহার কলাই পাক করিয়া দিল। ইহা কবির নূতন কল্পনা নহে, প্রাচীন ঋষিগণ সতীত্বের পরীক্ষার্থ প্রায়ই এরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। এখনও যে আমরা জল বায়ুর উৎকর্ষ প্রতি পদার্থে বলিয়া থাকি

যে, "লোহার কলাই হজম হয়।" লোহার কলাই হজম হওয়ার ন্যায় লোহার কলাই পাক করা বুঝিতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে কেহ কখন লোহার কলাই ভোজন করেন নাই, হজমও করেন নাই। অথচ লোহার কলাই হজম করিবার প্রবাদ আছে, ইহাও সেইরূপ—ফলতঃ বেহুলার সতীত্ব কোনরূপে পরীক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

যাহা হউক বিবাহ প্রস্তাব উভয় পক্ষেই পরিগৃহীত ও অবধারিত হইয়া গেল। এদিকে চাঁদ সদাগর বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া আপনার বাসসমীপবর্ত্তী সাঁতালী পর্ব্বতে এক লৌহনির্ম্মিত বাসরগৃহ প্রস্তুত করাইয়া যাহাতে নবদম্পতি নিরাপদে বসবাস করিতে পারে—সর্পাদি হিংস্র জন্তু তাহাদের কেশস্পর্শে সমর্থ না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। মনসা দেবীও তাহার প্রতিকারার্থে প্রস্তুত হইলেন, তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন "যদি তুমি লোহার বাসরগৃহে সর্প প্রবেশের সুবিধা না করিয়া দাও তাহা হইলে চাঁদকে ছাড়িয়া তোমার অকল্যাণ সাধনার্থ যত্নবতী হইব।" বিশ্বকর্ম্মা ভয় পাইয়া লোহার বাসগৃহে সূত্রাকারে এক ছিদ্র করিয়া দিলেন।

চাঁদ নির্দ্দিষ্ট দিনে জ্ঞাতিগোত্রজ, আত্মীয় অন্তরঙ্গ সমভিব্যাহারে নিছনী নগরে উপস্থিত হইয়া সায়বেণের কন্যা বেহুলার সহিত পুত্র নখিন্দরের শুভবিবাহ সম্পাদন করিলেন। বিবাহস্থলে চাঁদ যে মনসাদ্বেষী তাহা জানিতে পারিয়া সায়বেণে বড়ই ক্ষুন্ন হইলেন, কিন্তু বেহুলা মনসার ব্রতদাসী, অতএব তাহার পরিচর্য্যায় দেবী কখন, তাহার অকল্যাণ করিতে পারিবেন না, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কতকটা সান্ত্বনা পাইলেন। বিবাহান্তে নবদম্পতি চম্পক নগর যাত্রা করিল। যথাকালে তথায় উপস্থিত হইয়া বেহুলা নখিন্দর সাঁতালী পর্ব্বতস্থ লোহার বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ফুলশয্যার নিশায় পুত্র ও পুত্রবধূকে লোহার বাসগৃহে প্রবেশ করাইয়া চাঁদ সদাগর একটী নকুলকে পাহারায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন, নকুল সর্প শত্রু—কিছুতেই সর্প গৃহপ্রবেশে সমর্থ হইবে না। গৃহে নবদম্পতি কিয়ৎকাল পাশক্রীড়ান্তে দ্বার বন্ধ করিয়া সুখশয্যায় শয়ন করিলেন। ভুজঙ্গজননী দেবী মনসা প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে নখিন্দরের জীবনহানি-জন্য সাঁতালী পর্ব্বতে তিনটী সর্পকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কোনটীই তাহাতে কৃতকার্য্য হইল না। বেহুলা ভাবী-বিপদ বুঝিতে পারিয়া জাগ্রত ছিলেন। তিন প্রহরের তিনটী সর্পকেই মধুর বচনে দুগ্ধ পান করাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করেন, বেহুলার অনুনয়বিনয়ে তাহারা দেবীরআজ্ঞাপালন করিতে

পারে নাই, এই সময়ে নখিন্দরের নিদ্রাভঙ্গ হয়, সহধর্ম্মিণীর মুখে সর্প কর্তৃক তাঁহার প্রাণহানির উদ্যোগ বার্ত্তা শ্রবণে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তিনি প্রাণেশ্বরী বেহুলা সুন্দরীকে অন্নপানীয়ের আকাঙ্ক্ষা অবগত করিলেন। পতিপ্রাণা বেহুলা লোহার বাসগৃহে অনেক কষ্টে খুঁজিয়া মঙ্গল ঘটের তিনটী নারিকেল পাইলেন, আর অষ্টমঙ্গলার তণ্ডুলে নারিকেল জলে অন্ন পাক করিয়া নখিন্দরকে জাগাইতে না জাগাইতে দেবীর মায়ায় আপনি নিদ্রিত হইল। আহার হইল না, স্ত্রীপুরুষে নিদ্রিত এমন সময় দেবী কালনাগিনী নাম্নী নাগিনীকে বিশ্বকর্ম্মা কৃত রন্ধ্রের সন্ধান বলিয়া দিয়া নখিন্দরকে দংশন করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন, কালনাগিনী ছিদ্রপথে লোহার গৃহে প্রবেশ করিয়া নবদম্পতির রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া কিরূপে সেই কমনীয় অঙ্গে নির্ম্মম হইয়া দংশন করিবে তাহাই ভাবিতে ছিল, এমন সময় নখিন্দরের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন উপলক্ষে নাগিনীর অঙ্গে পাদস্পর্শ হইল, তাহাতে সে ক্রুদ্ধা হইয়া বিষদন্ত দ্বারা তাহার পদতলে দংশন করিল। নখিন্দর জাগ্রত হইয়া বিষের জ্বালায় অস্থির হইলেন, বেহুলাকে জাগাইয়া সর্পদংশনের কথা জানাইবামাত্র বেহুলা - সুবর্ণের জাঁতি নিক্ষেপে নাগিনীকে আঘাত করিলে সেই আঘাতে তাহার পুচ্ছ ছিন্ন হইল, বেহুলা সেই সর্পপুচ্ছ কাপড়ে বাঁধিয়া পতির শুশ্রূষার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলেন, অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল। পতি বিয়োগে বেহুলা কাতর কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন, শোক প্রকাশের ভাষা যতই সহজ ও সরল ততই স্বাভাবিক,—

প্রাণনাথ মরে, লোহার বাসরে,
বেহুলা নাচনী কাঁন্দে
শেশ ছার থার, মুক্ত কেশ তার,
ছড়ায়ে পড়েছে কান্ধে ॥
সঙ্কেতে কেবল, নেউল অম্বুবলা
কোথা গেল ধন্বন্তরি।
কাল নিদ্রা দিয়া, কালিনী আসিয়া,
মোর প্রভু কৈল চুরি ॥
বড় পাইতাপ, তাহে দংশে সাপ,
মনসা লাগিল বাদে।
দুঃখে ফাটে হিয়া, ও মুখ চাহিয়া,
এই:ব'লে সদা কান্দে ॥

হেম যিনি অঙ্গ, সহজে সুরঙ্গ,
বিষম বিষে হইল কালী।
খণ্ড কপালিনী, আমি অভাগিনী,
কেবা দিল শাপ গালি ॥
কাঁদি বিষজ্বালা, মুখে গোটানালা,
চক্ষে কিছু নাহি দেখে।
লোহার বাসরে, বধে প্রাণ বরে,
বেহুলা কর্ণেতে ডাকে ॥
তোমার লাগিয়া, রজনী জাগিয়া,
কাল নিদ্রা আইল শেষে।
মোর প্রাণ ধন, নিল কোন জন,
না জানি যাবো কোন্ দেশে ॥
শিরে হানি হাত, উঠ প্রাণনাথ,
ধারণে না যায় হিয়া।
আমি অভাগিনী, খণ্ড কপালিনী,
কোথা গেলে ফাঁকি দিয়া ॥
দেবী পদতলে, ক্ষেমানন্দ বলে,
তোমার সকল মায়া।
ভক্তজনে মাতা, হবে বরদাতা,
মোরে দিবে পদছায়া ॥

বালিকা বেহুলার ক্রন্দনে বনের পশু, বৃক্ষের বিহঙ্গম পর্য্যন্ত আকুল হইল, বেহুলার জীবনের প্রধান সহায় তাঁহার অভিনব পতি পঞ্চত্ব পাইলেন, বেহুলার আশার ইন্দ্রধনু আকাশে মিশাইল, তিনি চারিদিক শূন্য দেখিলেন, যাঁহাকে পাইয়া সংসার সাগরে সুখের তরী ভাসাইবার বাসনা করিয়া ছিলেন, তিনি ইহ সংসার পরিত্যাগ করিলেন। স্বামী ব্যতিরেকে তাঁহার জীবন ভারভূত বোধ হইল, জীবনের প্রয়োনীয়তা বিলুপ্ত হইল, বেহুলা আত্মহারা হইলেন, তাঁহার আপন জীবনে ধিক্কার জন্মিল। তাঁহার রোদন ধ্বনি শ্বশ্রূ সনকার কর্ণগোচর হইল—তিনি শুনিলেন তাঁহার পুত্রের জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে, নখিন্দর ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে জননী বলিয়া সম্বোধন করিবার আর কেহ নাই, তাঁহার

জীবন সহায়সম্বন্ধহীন হইয়াছে, তিনিও গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইলেন। পুত্র বধূর দুরদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

গৃহ বিচ্ছেদ ঘটায় কে ?

বাবু না বৌমা ?

আজকাল আমাদের দেশে ভ্রাতৃ বিচ্ছেদের ঘোরতর তুফান উঠিয়াছে। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" এই অপ্রিয় বাক্যটা বহু-দিবসাবধি আমরা শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু কথাটা কেবল কথায় পরিণত ছিল, একথা বলিলে, দোষ হইতে পারে না। অতি অল্প স্থলেই বাক্যের সার্থকতা দৃষ্ট হইত ; তাহাও ভদ্র সমাজের অন্তর্গত ছিল না। যাঁহাদের বিবেচনা শক্তি আছে, ভ্রাতৃবৎসলতা শব্দের মহিমা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা প্রায়ই ঠাঁই ঠাঁই হইতেন না। এখন দেখা যাইতেছে প্রায় প্রত্যেক গৃহেই ভ্রাতৃ বিরোধ, ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃ পার্থক্য। এই ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ হইতেও গৃহ বিচ্ছেদ ঘটে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিষয় থাকিলেই বিষয় বণ্টনের লোভে ভাই ভাই পৃথক হয়, সামান্য গৃহস্থেরা পৃথক হইতে চাহে না, একথাও ঠিক নহে, অধুনা যেরূপ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, তাহাতে অধন সধন সকলেই পৃথক হইতে অনুরাগী।

অন্য দেশে যাহা হয়, তাহা হইতে পারে বংশাবলী ক্রমে যাঁহারা ঐরূপ ব্যবহার করে, তাহাদের অভ্যাস হইয়া যায়, আমাদের দেশে কিন্তু ভ্রাতৃবিচ্ছেদ অত্যন্ত অনিষ্টকর ; মান অপমানের কথা না ধরিলেও লোকের স্বচ্ছলতার বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত।

মনে করুন পিতার জমিদারি আছে, বৎসরে পাঁচ-হাজার টাকা আয় হয়, পাঁচ ভ্রাতা একসঙ্গে থাকিয়া পরস্পর স্নেহ বন্ধনে মনের সুখে সংসার ধর্ম্ম করেন পিতৃ পিতামহের আচরিত ক্রিয়া কলাপও বজায় থাকে, লোকেও তাঁহাদিগকে বাবু বলিয়া সমাদর করে, সেই পাঁচ ভ্রাতা যদি পৃথক হইয়া যায়, তাহা হইলে সেরূপ আয়ও থাকে না, সেরূপ সুখও থাকে না, সেরূপ ঐক্যও থাকে না সমস্তই

খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে, ভদ্রাসন বিভাগ হয়, বিষয়ও বিভাগ হয়, পরিবারেরাও বিভাগ হয়, ক্রিয়া কর্ম্মও বন্ধ হইয়া যায়। আজ কাল মফস্বলের যে সকল স্থলে শ্রীবৃদ্ধিকারি মিউনিসিপালিটির অধিকার হইয়াছে, সহরের ন্যায় সে সকল স্থলে বাড়ীতে বাড়ীতে নম্বর দিবার রীতি হইয়াছে, যে সকল স্থলে ট্যাক্স আদায়ের সুবিধার নিমিত্ত এক এক প্রসস্ত ভদ্রাসনে ভিন্ন ভিন্ন নম্বর ও নম্বরের ভগ্নাংশ বিরাজ করিতেছে, বিংশতিবৎসরপূর্ব্বে যাঁহারা কলিকাতার বাঙ্গালীটোলার গৃহস্থের বাড়ীগুলি দর্শন করিয়া ছিলেন, এখন যদি তাঁহারা সেই সকল বাড়ী দর্শন করেন, নম্বরের বিচিত্রতা দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। অধিক কথা কি, এক একখানি বৃহৎ বাটীতে একটি সদর দরজা ছিল, এখন সেখানে অতি কম সাত আটটা দরজা বসিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন নম্বর বসিয়াছে, ভিতরে ভিতরে প্রাচীর বসিয়াছে বাহ্য শোভা থাকিতে পারে, কিন্তু ভিতর ফাঁক; সহরের এক একটা গলিতে ভ্রমণ করিবার সময় দৃষ্ট হয়, বাড়ীর নম্বরের শোচনীয়ভাব ৩৫।১ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৫।১৮ পর্য্যন্ত নম্বর পড়িয়াছে, নূতন লোকে ৩৫ নম্বর ধরিয়া কোন নম্বরে প্রবেশ করিবে, ভাবিয়াই আকুল হয়।

কেবল তাহাই কি যথেষ্ট ? না, তাহার উপর আরও বেশী। যে সকল বিষয়পন্ন লোক ভাই ভাই কলহ করিয়া পৃথক হয়, তাহাদের পরস্পর মুখ দেখা দেখি থাকে না, অধিকন্তু আদালতে ঘন ঘন মোকদ্দমাদায়ের হয়, দীর্ঘকাল ব্যাপী দেওয়ানী মোকর্দ্দমা চলে, উকীল ব্যারিষ্টার ও পেয়দারা ক্রমাগত টাকা খায়। তাহা ছাড়া অনেক স্থলে লাঠ লাঠি কাটাকাটী খুনাখুনি হয়।

তত্ত্ব জিজ্ঞাসু পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ সকল পৃথক হইবার মূল কে ?—অনেকেই উত্তর দিবেন, "বর্ত্তমাণ বৌমাগুলি।" ষোল আনার উপর এ উত্তরে আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না, নূতন নূতন বৌমাগুলি স্বামীগণের কর্ণে মন্ত্র দিয়া সংসার ভাঙ্গিয়া দেন, ইহা অপ্রকৃত কথা নহে, কিন্তু এক এক স্থলে বৌমাগুলিকে অপরাধিনী করা অসঙ্গত মনে হয়। একটি কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত এই স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

একটি প্রসিদ্ধ পল্লীগ্রামে একজন তালুকদার ছিলেন, তাঁহার চারি পুত্র; পিতার মৃত্যুর পর চারি সহোদরে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন, কর্ত্তার আমল হইতে প্রতি বৎসর দোল দুর্গোৎসবাদি উৎসব চলিয়া আসিতেছে, চারি সহোদরে আশানুরূপ

সদ্ভাব আছে, সংসারটি সুখময়, জ্যেষ্ঠ সহোদর সকল বিষয়ে কর্তৃত্ব করেন, ভাই গুলি তাঁহার একান্ত অনুগত,—আজ্ঞাকারি। দাদা যাহা করেন, তাহার উপর কেহই দ্বিরুক্তি করেন না, প্রকৃত ভ্রাতৃভাব যাহাকে বলে, এই সংসারে তাহা বর্ত্তমান। চারি জনেরই বিবাহ হইয়াছিল, চারিটি বধুতেও অকপট সখীভাব,—ভগ্নিভাব। বড় বধুর আদেশ মতে অপরাপর বধুরা সংসারের সকল কার্য্য করেন, দিদির অবাধ্য কেহই নহেন।

দ্বিতীয়া বধুর দুটি পুত্র, একটি কন্যা, তৃতীয়া বধুর তিনটি কন্যা, কনিষ্ঠা বধুর একটি পুত্র, বড় বধুটি অপুত্রিকা।

সকলেই এক সংসারে আছেন, সকলেই সুখী, পরস্পর সকলেরই সদ্ভাব, ব্যতিক্রম কিছুই ঘটে না। যে গ্রামে তাঁহাদের বাস সে গ্রামের অনেক পরিবার পার্থক্যের উপদ্রবে ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছিল, এই সংসারটি ভাল আছে, ছন্নছড়া পরিবারেরা তাহা দেখিয়া মনে মনে হিংসা করিত, কিন্তু উপকার পাইবার প্রত্যাশায় অন্তরের ভাব গোপনে রাখিয়া মুখে আনন্দ প্রকাশ করিত। উপকার পাইবার প্রত্যাশা কিরূপ তাহাও বুঝাইয়া দিতে হয়, লক্ষ্মীছাড়া হইলে, নিত্যই অভাব, ঐ একান্নভুক্ত সুখী পরিবারের বড় বাবুটি স্বভাবত উদার প্রকৃতি, পর-উপকারি ও দাতা ; দরিদ্রের দুঃখ মোচনে তিনি নিরন্তর তৎপর, দরিদ্র প্রতিবাসীর কষ্টের কথা শুনিলে তিনি যথা শক্তি সাহায্য করেন, সেই গুণে তিনি গ্রামস্থ সমস্ত লোকের শ্রদ্ধাভাজন। প্রতিদিন বৈকালে বড় বাবুর বৈঠকখানায় অতি কম আট দশটি গ্রাম্য লোক সমবেত হ'ন, তাঁহাদের মধ্যে দুএকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত থাকেন ; খোস গল্প হয়, তর্ক বিতর্ক হয়, শাস্ত্রের কথা হয়, তাস পাসাও চলে দিব্য আমোদ সেই লোকগুলির মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক লোকের অর্থাভাব ; স্বচ্ছন্দে সংসার চলে না, বড় বাবুর গুণকীর্ত্তন করিয়া, আপনাদের দুঃখ জানাইয়া, তাঁহারা বড় বাবুর কাছে দয়া পান। কেহ চাউল পান, কেহ ধান্য পান, কেহ বা বাগানের ফল মুল তরিতরকারী পান, কেহ কেহ কিছু কিছু নগদ পয়সাও পাইয়া থাকেন। যাঁহারা ঐরূপ সাহায্য পান বাহিরে তাঁহারা সন্তুষ্ট, মনের ভিতর কিন্তু হিংসা বিদ্বেষের খেলা হয়, তাঁহাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগেরও ঐ প্রকার ভাব

যে শ্রেণীর কথা বলা হইতেছে, সেই শ্রেণীর পরিবারের গৃহিনীরা, ঝিয়ারি কুটম্বিনীরা মধ্যে মধ্যে বাবুদের বাটীতে বেড়াইতে আইসেন। একাধিক স্ত্রীলোক এক স্থানে জমা হইলে, পরনিন্দাচলে, দুঃখের কান্না চলে, এক এক জনের কষ্টের

কথা তুলিয়া কপটে চক্ষের জল ফেলাও চলে, বাবুদের বাড়ীতে ও প্রতিবাসীদের দ্বারা এক একদিন সেইরূপ অভিনয় হয়, গ্রামের অনেক লোক উচ্ছন্ন যাওয়াতে গ্রামের মধ্যে তাঁহারাই এখন বড় মানুষ, সুতরাং তাঁহাদের বাড়ীর নাম "বাবুদের বাড়ী।"

একদিন বাবুদের বাড়ীর চারিটি বধু একটি ঘরে বসিয়া ছেলে মেয়ে গুলিকে আদর করিতেছেন, এমন সময় যুবতী প্রৌঢ়া বৃদ্ধা পাঁচটি প্রতিবেসিনী সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন, বধু গুলি তাঁহাদিগকে মিষ্ট বাক্যে আদর করিয়া বসাইলেন, কথা চলিতে লাগিল।' কথায় কথায় একজন বৃদ্ধা গৃহিনী গম্ভির ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আহা। সংসার দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। যেমন সদাশিব ছেলে গুলি তেমনি সতীল বৌগুলি অমুকের সংসার লক্ষীছেড়ে গেছে, অমুক বাড়ীর ছেলে গুলো আপনা আপনি দাঙ্গাকরে থানে থারাপ হয়েছে, অমুক বাড়ীর পূজোর দালানে। তিনটে পাঁচিল বসেছে, তিন তিন খানা রান্নাঘর হয়েছে, সকল দিন কিন্তু সন্ধ্যাকালে সকল রান্নাঘরে সন্ধ্যাপায় না, ভিটায় কেবল হান্নাহা অন্ন গণ্ড গোল। মালক্ষীর কৃপায় এই সংসারটি বেশ বজায় আছে, যে সকল বাড়ীর দুর্দ্দশা ঘটেছে, সে সকল বাড়ীর ছেলে গুলির বড় দোষ নাই, বৌ গুলিই মন্ত্রণা দিয়ে সংসার ভেঙ্গে ফেলেছে। এক এক বৌ এক এক ধিঙ্গি। যত সব হাড় হাবাতে লক্ষীছাড়া মেয়ে এসে সোণার সংসার গুলি ছার থার করে ; এবাড়ীতে সে পাপ জায়গাপায়না। এবাড়ীর বৌগুলি রূপে লক্ষী গুণে সরস্বতী। আহা ! হোক্ হোক্, জন্ম জন্ম এই রকম হোক্ এরাসব অমর হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে এমনি করে সংসার করুক।" বৃদ্ধা গৃহিণীর কথা সমাপ্ত হইলে, তাঁহার চারিটি সঙ্গিনীও একবাক্যে সেই সকল বাক্যের প্রতিধ্বনি করিলেন।

একদিন ঐরূপ হইয়াছিল, তেমন কথা বলিতেছিনা। তাহা বলিলে, মজাকি ? পাঁচ সাতটি রমণী একত্র হইলে, ঐ রঙ্গ ভূমে প্রায়ই ঐরূপ অভিনয় হইয়া থাকে। নায়িকার অভিনয় ইহাও ঠিক নহে, বৈটকখানার খোসামুদে নায়কেরাও হাসিয়া কাঁদিয়া ঐভাবের অভিনয় করে।

প্রতিবেসিনীরা যে ভাবে অপরের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, যে সকল কথা বলেন, তাহাতে তাঁহাদের আসল মতলব কি থাকে, বাবুদেরবাড়ীর বড়বৌমা তাহা বুঝিতে পারেন। এদিকে তিনি বেশ শান্ত, কিন্তু চতুরতায় বুদ্ধি অতি তিক্ষ্ণ। মনে মনে তিনি চিন্তা করিলেন, সর্ব্বদা ওরা ওরকম কথা কেন বলে, গ্রামের

বৌগুলিকেই বা ঘর ভাঙা লক্ষ্মী ছাড়া কেন বলে? পরীক্ষা করিতে হইবে।

বড় বৌমা এইরূপ চিন্তা করিয়া একটি নির্জ্জন গৃহে তিনটিদেবরপত্নীকে ডাকিলেন, তাঁহারা আসিলেন। হাস্য চাপিয়া রাখিয়া বড় বৌ বলিলেন, দেখ, একটা মজা করিতে হইবে। পাড়ার মেয়েরা প্রায়ই বলিয়া যায়, অমুকের ঘর ভেঙে গেল, বৌগুলো সর্ব্বনাশ করলে, গ্রাম খানা গরীব হয়ে গেল, এই সব কথা। কেবল আমাদের বাড়ী খানিকে ভাল বলে। বাবুদের চারিজনের মিল আর আমাদের চারিজনের মিল, দেখিয়া তাঁহারা খুসী হয়। তোমারাও তাহা শুনিয়াছ। আসল ভাবটা তোমরা বুঝিতে পার নাই। আমি বেশ বুঝিয়াছি। সে সব কেবল মায়া; মুখে মধু, হৃদে বিষ। তাই জন্য বলিতেছি, একটা মজা করিতে হইবে। আজ অবধি তোমরা একটা কাজ করিতে আরম্ভ কর। ঠাকুর পোরা রাত্রে যখন শুতে আসবে, তখন তাদের কাণে ধরে মন্ত্র দিও; ভিন্ন হও, ভিন্ন হও, ভিন্ন হও! বড় বাবু সব টাকা ফাঁকিদিয়ে নিলে! রোজ রোজ ঐরকম মন্ত্র দিও। তবুও যদি না শোনে, কান্না জুড়ে দিও। আগে তোমরা কর, তার পর আমিও বড় বাবুকে বানর বানাব।"

ছোট বৌগুলি বড় বৌমার খেলার পুতুল, সকল কাজেই আজ্ঞাকারিণী। তাঁহারা হাস্য করিয়া বলিলেন, "যেআজ্ঞে।"

ধমক্ দিয়া বড় বৌমা বলিলেন, "খবর দার হেস না। আমার কাছে হাস্লে, কিন্তু ঠাকুর পোদের কাছে খবরদার হেস না। হাসো যদি, কিছুই মজা হবে না। আমার সবফন্দী ফিকির একেবারে মাটি হয়ে যাবে।"

বৌগুলি তখন গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। সেই দিনের সূর্য্যাস্তের পর অবধি তাঁহারা বড় দিদির মন্ত্রগুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

একপক্ষ অতিক্রান্ত তিনটি ভ্রাতা বধূমাতা গুলির শিক্ষা মন্ত্রে বশীভূত হইয়া বড়ই উন্মা হইলেন, ভয়ে দাদার কাছে মনের কথা ফুটিতে পারেন না, তুষানলের মত, ভিতরে ভিতরে হৃদয় জলে। অধিক দিন ধৈর্য্য রহিল না, ভয় কিছু কমিল, একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহারা বড় বাবুর বৈঠক খানায় গিয়া বসিলেন, প্রায় দশ মিনিট চুপ।

বড় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি কিছু বলিবার আছে?"—দুটি ভ্রাতার মুখ পানে চাহিয়া নত শিরে মেজো বাবু উত্তর করিলেন, 'দাদা বলিতে ভয় হয়, একটা কথা"——

বাধা দিয়া বড় বাবু বলিলেন, "আমার কাছে তোমাদের কথা বলিতে ভয় হয়? প্রাণের অপেক্ষা আমি তোমাদের ভালবাসি, তাহা তোমরা জান, যাহা বলিতে হয় স্বচ্ছন্দে বল। নিতান্ত দুষ্কার্য্য না হইলে, তোমাদের কথায় আমি অবশ্যই সম্মত হইব। পূর্ব্ববৎ মাথা হেঁট করিয়া কিঞ্চিৎ মৃদু কণ্ঠে মেজো বাবু বলিলেন, "মেয়েদের ইচ্ছা হইয়াছে, পৃথক হয়। আমরা তো কিছুতেই রাজী হইব না, শেষ কালে আত্ম বিনাশের ভয় দেখাইয়াছে।

মেজো বাবু ও ছোট বাবু ঠিক ঐ কথায় সায় দিলেন। বড় বাবু চিন্তাযুক্ত হইলেন; ভাই তিনটিকে অনেক বুঝাইলেন; সেদিন তাঁহারা শুনিলেন কিন্তু নিত্য নিত্য নূতন নূতন আব্দার শ্রবণে আর তাঁহারা ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না; কখন দাদার অবাধ্য হন নাই, এইবার অবাধ্য হইলেন; দাদার সদুপদেশ আর শুনিলেন না। দাদা বলিলেন, "এখন বুঝিলাম, তোমাদের কথা সত্য। বড় বৌ আমাকে দুই তিন রাত্রে ঐরূপ কথা বলিয়াছে। আমি কাণপাতি নাই। তোমরা কেন কাণ পাতলা করিতেছ? আগাগোড়া মনে করিয়া দেখ, আমি পক্ষপাত জানিনা; সামান্য কথায় বুঝাই। বড় বৌকে যখন যে বস্ত্রদিয়াছি, বৌমাগুলকে তারচেয়েও বেশীদামের ভাল ভাল কাপড় আনাইয়া দিয়াছি; গহণা গড়াইবার সময় চারিবৌকে সমান সমান গহণা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি, বরং বড়বৌ কিছু কম পাইয়াছে। আরো মনে কর, ক্রিয়া কর্ম্মের সময় তোমাদের হাতে কর্ত্তৃত্বদি, যে বিষয়ে যত খরচ করিতে ইচ্ছা কর, তাহাই তোমরা কর, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হই। তোমাদের মনের ক্ষোভ আমি রাখি না। আমার সন্তান হয় নাই! তোমরাই আমার পুত্রকন্যাসদৃশ, আমার সকল স্নেহই তোমাদের উপর, তবে কেন পৃথক হইতে চাও? তবে তবে কেন ঘর মজাও!"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে তিনটি ভ্রাতাই সমস্বরে বলিলেন, "মেয়েদের বড় সাধ।"

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বড় বাবু বলিলেন, আচ্ছা, "তবে তাহাই হোক, তাঁহাদের সাধ পূর্ণ হউক। বড়বৌ আমাকে রাজী করিতে পারে নাই, তোমরা রাজী করিলে। আচ্ছা, কল্যই আমি মধ্যস্থ ডাকিয়া ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করিব।"

বাবুদের মাতা বর্ত্তমান, কানে কিছু খাটো সকল কথা শুনিতে পান না।

বৌগুলি বেলা দশটাপর্য্যন্ত ঘুমায়, গৃহিণী সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া ডাকেন; কখন কাজ কর্ম্ম হবে, কখন রান্না বান্না হবে, কখন খাওয়া দাওয়া হবে, এই সব কথা বলেন, সকল বৌ উত্তর দেন না। এক বৌ উত্তর দেন, তোমার তো আরও বৌ আছে, তাদের ডাকো না, আমার বড় পেটকামড়াচ্চে, আমি উঠতে পাচ্ছিনা।

এক বৌ উত্তর দেন, আমার ছেলের দাঁত কন্ কন্ কচ্চে, আমি এখন উঠ্‌বো না।

এই রকম উত্তর পাইয়া বৃদ্ধা কাজে কাজে সংসারের সকল কাজ করিতে বাধ্য হন। পল্লীগ্রামে দাসীরাখিবার রীতি নাই, সামান্ত সামান্ত কার্য্যও বৃদ্ধা গৃহিনীকে নির্ব্বাহ করিতে হয়।

বাবুরা পৃথক হইবেন স্থির হইল। পাড়ার লোকেরা শুনিল, বাবুরা পৃথক হইবেন। মনে মনে আনন্দ; সকলে এক হাটে চাল কিনিবেন, তাহা বুঝিয়াই পরমানন্দ।

রজনী প্রভাত হইলে বড়বাবু মধ্যস্থ ডাকিলেন, পাঁচজন মধ্যস্থ জুটিলেন, তন্মধ্যে দুইজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, তিনজন সাবেক বিষয়ী লোক। তাঁহাদের নিকটে চারিভ্রাতা উপবিষ্ট।

প্রথমে কথা উঠিল, তালুকের কালেক্টারি তৌজিভুক্ত তিনখানি তালুক। তিন খানিতে তিন জন নায়েব ও তিনজন গোমস্তা আছেন, অতঃপর এক এক তালুকে চারিজনের চারি চারিজন নায়েব ও চারি চারিজন গোমস্তা বসিবে, সিকি সিকি চারি কাছারিতে সিকি সিকি আদায়তহশীল হইবে। তাহার পর নিজ গ্রামের বাগান। সেই বাগানের চারিভাগে ভিন্ন ভিন্ন বেড়াদেওয়া থাকিবে। তাহার পর পুষ্করণী বেড়া দিয়া পুষ্করণী ভাগ করা যায় না, জেলেকে জমাদিয়া মাছের মূল্য চারি ভাগ করা হইবে, তাহার পর বাস্তুদেব শালগ্রাম শীলা। শালগ্রামঠাকুর তিন তিনমাস চারিঘরে পালা খাটিবেন। তাহার পর মাতাঠাকুরাণী। উদরান্নের জন্য তাঁহারও চারিছেলের চারি ঘরে তিন তিন মাস পালা। তাহার পর পূজার দালান। মাঝে মাঝে প্রাচীর দিয়া দালান ভাগ করা যায়, কিন্তু আপাততঃ চারিভাই যখন এক বাড়ীতে থাকিবেন, তখন আপাততঃ দালানভাগে দরকার নাই। পূজার পালাভাগ; ষষ্ঠি সপ্তমী একজন, অষ্টমী ও সন্ধি পূজা একজন, মহানবমী একজন, বিজয়াদশমী একজন। ইহার মধ্যেও কৌতুক আছে, এপ্রকার বিভাগে যাঁহার যে দিন পালাফুরায়, সে দিন তিনি প্রদীপের

অবশিষ্ট সলিতা পর্য্যন্ত নিজের ঘরে উঠাইয়া লইয়া যান। যেখানে যেখানে ঐরূপ পালা, সেখানে প্রায় সর্ব্বত্রই ঐব্যবস্থা। সেই দৃষ্টান্তে এই বাবুরা তাহাই করিবেন, মধ্যস্থেরাও তাহাই বলিলেন।

মধ্যস্থেরা আরও বলিলেন, "কর্ত্তার মৃত্যুর পর অবধি যে যে রকমে যত টাকা জমা হইয়াছে, যে যে, বিষয়ে যত টাকা খরচ হইয়াছে, বড়বাবু সেই জমা খরচের হিসাব ছোট ভাইগুলিকে দেখাইবেন, খরচের মঞ্জুরী না মঞ্জুরীর ক্ষমতা ছোট ভাইগুলির হাতে থাকিবে। শেষ দিনের কৈফিয়তে তহবিলে যত টাকা মজুত দাঁড়াইবে, চারিভাই সমান অংশে তাহা ভাগ করিয়া লইবেন।"

ভবিষ্যতের খাতায় এইরূপ ও অন্যরূপ লেখা পড়া থাকিবে, মধ্যস্থ মহাশয়েরা তৎবিষয়ের ভবিষ্যৎবাণীর ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন।

প্রথম দিনের মজলিসে এইরূপ বন্দোবস্ত, দ্বিতীয় দিনের মজলিসে বাড়ীর ভিতরের ঘর ভাগ ও জিনিষ পত্র ভাগ। বৈকালে মহাসমারোহ। গণ্ডা গণ্ডা মধ্যস্থ ও গণ্ডা গণ্ডা মধ্যস্থা সারি সারি দল বাঁধিয়া আসিলেন; পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক। নারীর মধ্যেও গৃহিনী অধিক। কোন্ ভাই কোন্ ঘরে থাকিবেন, তাহা চিহ্নিত হইল তাহার পর আসবাব।

অন্দরের বারান্দানে খাট পালন তক্তাপোষ বিছানা, ঘড়াগড়ু থালা বাটী প্রভৃতি তৈজসপত্র ও সিন্দুক বাক্স পেটরা রাশিকৃত।

রেখা দিয়া চারি খণ্ডে জিনিষের ভাগ আরম্ভ। যাহার অংশে যাহা পড়িতেছে, মধ্যস্থেরা তাহা দেখিতেছেন, দুএকজন মধ্যস্থ অগ্রবর্ত্তি হইয়া ভাগের জিনিষের সমতা করিতেছেন, দুএকজন গৃহিনী অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া অঙ্গুলি নাড়িয়া চক্ষু ঘুরাইয়া বলিতেছেন, ছোট বৌমার ভাগে ছোট ঘড়া, ছোট থালা, ভাঙা খাট পড়িয়াছে, ছেলেমানুষ ঠকিয়া গেল। বলিতে বলিতে আপনারাই গৃহিনীপনা করিয়া অন্য ভাগ হইতে বড় বড় জিনিষ ছোট বৌমার ভাগে লইয়া ফেলিতেছেন, ভাঙা খাটের কি হয়? বড় বাবু বলিলেন, ওখানা আমার থাকুক, আমার খাট খানা ছোট বৌমাকে দাও।"

এইরূপ ভাগ হইয়া গেল। মধ্যস্থ মহাশয়েরা বলিলেন, "যে যার ভাগ নিজ নিজ ঘরে লইয়া যাও।" কেবল হুকুম দিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না, নিজে নিজে এক একভাগের জিনিষ হাতে করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিলেন।

বড় বৌমা যদিও পুত্রবতী হন নাই, কিন্তু তিনি বয়োধিকা বাড়ীতে আসিয়া

অবধি বরাবর তিনি নববধুগণের ন্যায় অবগুণ্ঠনবতী ছিলেন, লজ্জা শীলতা তাঁহার অলঙ্কার; এই দিন সেই লজ্জাকে তিনি কিছু অন্তর করিলেন, কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া নিজের ঘরের চৌকাটে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "কোন জিনিষ কেহ স্পর্শ করিও না, যে ঘর হইতে যে জিনিষ বাহির হইয়াছে, সেই ঘরেই তাহা রাখিতে হইবে, যেমন যেমন ছিল, ঠিক তেমনিতেমনি থাকিবে। আমরা পৃথক হইব না, বৌগুলো ঘর ভাঙে, সকলের মুখেই ঐ কথা শুনি; কেমন করিয়া ভাঙে, তাহাই দেখাইবার জন্য আমি এই ভোজবাজী খেলিয়াছি। আমাদের সোণার সংসার কেহই ভাঙাইতে পারিবে না, দেবরগুলি আমার পুত্র তুল্য, বৌগুলি আমার কন্যা তুল্য, আমাদের অমিলন প্রাণ থাকিতে হইবে না। আপনারা মধ্যস্থ, আমার স্বামীদের দ্বারা আপনার কখন কিছু উপকার হইয়াছে, সে কথা আমি ভুলিব না, আপনারা বড় বাবুর পক্ষে না টানিয়া অন্য দিকে টানিয়াছেন, ইহা আপনাদের প্রসংশার কথা; ন্যায়রত্ন মশাই। সেজোকর্ত্তা মশাই ঘোষদাদা মশাই! থাক দিদি, ছোট্ ঠান্ খুদি পীস! বিস্তার দিদি আমাদের সংসারটি একটু ভাল আছে, তাহা দেখিয়া তোমাদের আহ্লাদ হইত না, আজ তোমরা যাহা করিতে আসিয়াছিলে, তাহা সিদ্ধ হইলে তোমাদের আহ্লাদ হইত, আমি বেহায়া নই, সত্য বলি, বাবুরা চারিটিভাই কদাচ স্নেহবন্ধন ছিন্নকরিবেন না, আমরাও "চারিটিজা" চিরজীবন মাণিক জোড়ের মতন থাকিব, গোপনে পরামর্শ করিয়া আমারা তোমাদের সকলকে চিনিয়া লইলাম।

মধ্যস্থেরা ক্রমে ক্রমে মাথা কাটাইবার চেষ্টা করিলেন, একজন বেহায়া ভট্টাচার্য্য টিকি নাড়াদিয়া বলিলেন, "বৌগুলি কুমন্ত্র দিয়া বিচ্ছেদ ঘটায়, সংসার নষ্ট করে, একথাটা কি মিথ্যা হয়? বড়বৌমা বলিলেন, মিথ্যা আমি বলিনা, অল্পবুদ্ধি দুষ্ট মেয়েরা অনর্থ ঘটায়, কুমন্ত্রণা দেয়, সে কথা সত্য, কিন্তু পুরুষেরা শোনে কেন? বাতাসে প্রতিধ্বনি হইল, পুরুষেরা শোনে কেন? সকলের পলায়ন।

জ্বরে পথ্য।

লেখক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় নন্দী।

ঋষিগণ কিজন্য সামজ্বরে দুগ্ধ নিষেধ করিয়াছেন, ইহা জানিতে হইলে, দুগ্ধের গুণ দেখা কর্ত্তব্য।

গব্য দুগ্ধের গুণ।

অন্যান্য দুগ্ধ অপেক্ষা গব্য দুগ্ধই পথ্যাদিতে অধিক ব্যবহৃত হয়, এজন্য এখানে গব্যদুগ্ধের গুণ উদ্ধৃত হইল।

বর্ণিত দুগ্ধের গুণ।

"গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রসপাকয়োঃ।
শীতলংস্তন্যকৃৎ স্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্রনাশনম্॥
দোষধাতুমলস্রোতঃ কিঞ্চিৎ ক্লেদকরংগুরু।
জরাসমস্ত রোগানাং শান্তিকৃৎ সেবিনাং সদা॥"

বিশেষতঃ অর্থাৎ অন্যান্য দুগ্ধ অপেক্ষা গব্য দুগ্ধ রসে এবং বিপাকে মধুর শীতল স্তন্যবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বাতরক্ত ও রক্তপিত্ত নাশক, দোষ ধাতুমল ও স্রোত সমূহের কিঞ্চিৎ ক্লেদ কারক, গুরু এবং নিত্য দুগ্ধ সেবন করিলে জরা ও সমস্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে। দুগ্ধের এই গুণ অস্বীকার করিলেও আমরা দুগ্ধের একটী স্বভাব এই দেখি যে, দুগ্ধ অম্লরস কিম্বা গোমুত্রাদির ন্যায় কোন পদার্থের সহিত মিলিত হইলে উহা বিকৃত ভাবাপন্ন হয়। পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, সাম জ্বরে আমাশয় আমরস দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে, আমরসের লক্ষণ—অবিপক্কমসংশক্তংদুর্গন্ধং বহুপিচ্ছিলং। সাদনং সর্ব্বগাত্রাণাং মাম ইত্যাম শব্দিতঃ। অবিপক্ক, অসংলগ্ন দুর্গন্ধ অতিপিচ্ছিল এবং সমস্ত শরীরের অবসন্নতা কারক। এই আমরসের সহিত দুগ্ধ মিলিত হইলে বিকৃত ভাবাপন্নহইয়া সর্পবিষের ন্যায় কার্য্য করে, বলকারক দ্রব্য উদরস্থ হইলে বল হয় না, জীর্ণ হইলে বল হইয়া থাকে। ঋষিপ্রোক্ত জরোৎপত্তি প্রকারের মধ্যে আর কিছু প্রত্যক্ষ হউক, বা না হউক অগ্নিমান্দ্য অবশ্য প্রত্যক্ষ এবং বোধকরি, কেহই ইহা অস্বীকার করিবেন না। এক্ষণে সহজে অনুমিত হইতেছে যে, জ্বরের অগ্নি মান্দ্যাবস্থায় যাহা দুষ্পাচ্য তাহা কুপথ্য এবং যাহা সুখপাচ্য ও দোষের অবিরোধী, তাহা সুপথ্য। উপরে গব্য দুগ্ধের গুণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, নিম্নে পেয়াদির উদ্ধৃত করা হইতেছে ইহার মধ্যে যাহা রোগীর পক্ষে উপযুক্ত বিবেচিত হইবে তাহাই অবশ্য ব্যবস্থেয়।

পেয়াদি প্রস্তুত করিবার দ্রব্য।

রক্তশাল্যাদয়ঃ শস্তাঃ পুরাণাঃষষ্টিকৈঃ সহ।
যবাগ্বোদন লাজার্থে জ্বরিতানাং জ্বরাপহাঃ॥

পুরাতন রক্তশালি ও ষষ্টিকধান্য স্বভাবতঃ জ্বরনাশক, এজন্য ঐ সকল হইতে যবাগূ, ওদন ও খৈ প্রস্তুত করিয়া জ্বর রোগীকে পথ্য প্রদান করিবে, কিন্তু প্রথমে মণ্ড বা পেয়াদিক্রম আরম্ভ করিয়া পরে অন্নদিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথমে মণ্ড, মণ্ড সহ্য হইলে পেয়া, পেয়া, সহ্য হইলে বিলেপী ইত্যাদি ক্রম অবলম্বনীয়।

মণ্ড।

"তণ্ডুলানাং সুসিদ্ধানাং চতুর্দ্দশগুণে জলে।
রসঃসিক্থৈবিবরহিতোমণ্ড ইত্যাভিধীয়তে॥
শুণ্ঠীসৈন্ধব সংযুক্তোদীপনঃ পাচনশ্চ সঃ।
মণ্ডো গ্রাহীলঘুঃ শীতোদীপনোধাতু সাম্যকৃৎ॥
জ্বরঘ্নস্তর্পণোবল্যঃ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ।"

চতুর্দ্দশ গুণ জলে (প্রয়োজন হইলে অধিক জল দিতে হইবে) উপরি উক্ত চাউল সুসিদ্ধ করিয়া সিক্থ শূন্য (সিটেশূন্য করিলে মণ্ড প্রস্তত হয়;) শুঁঠ ও সৈন্ধব সংযুক্ত মণ্ড দীপন এবং পাচন। মণ্ড ধারক, লঘু, শীতগুণ, দীপন, ধাতু সাম্যকর, জ্বরঘ্ন, তৃপ্তিকর, বলকারক, এবং পিত্ত, কফ ও শ্রমনাশক।

পেয়া।

চতুর্দ্দশ গুণেনীরে রক্ত শাল্যাদিভিঃকৃতা।
দ্রবাধিকা স্বল্পসিক্থা পেয়া প্রোক্তা ভিষগ্বরৈ॥
সাত্তিলঘ্বীগ্রাহিনী চ ধাতুপুষ্টি বিধায়িনী।

রক্তশালির গুণ।

রক্ত শালি বরস্তেষু বল্যো বর্ণ স্ত্রি দোষ জিৎ।
চক্ষুষ্যো মূত্রলো স্বর্য্যঃ শুক্রল স্তৃড়্জ্বরাপহঃ।
বিষ ব্রণশ্বাস কাসদাহনুদ্বহ্নি পুষ্টিদঃ॥

ধান্য সকলের মধ্যে রক্ত শালিধান্য শ্রেষ্ঠ, ইহাবলকারক, বর্ণ প্রসাদক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকারক, মূত্র বর্দ্ধক, স্বরপ্রসাদক, শুক্র পিপাসা এবং জ্বরনাশক, বিষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক। দাউদ খানিকে রক্ত শালি বলা হয়।

ষষ্টিক ধান্য।

ষষ্টিকামধুরাঃ শীতাল ঘবো বদ্ধ বর্চ্চসঃ।
বাত পিত্ত প্রশমনা শালিভি সদৃশা গুণৈঃ॥

ষষ্টিক ধান্য মধুর, শীতল গুণ, লঘু, ধারক ও বাতপিত্ত প্রশমক। ইহা গুণে দাউদ খানির সদৃশ।

তৃড়জ্বরানিলদৌর্ব্বল্য কুক্ষিরোগবিনাশিনী।
স্বেদাগ্নিজননী জ্ঞেয়া বাতবর্চ্চোহনু লোমনী।
শুণ্ঠী সৈন্ধব সংযুক্তা দীপনী পাচনীচসা।
আমশূলহরীরুচ্যা স্যাদ্বিবন্ধ বিনাশিনী॥

রক্তশালী প্রভৃতি ধান্যের চাউল, চতুর্দ্দশগুণ জল দ্বারাসিদ্ধ করিয়া অল্প সিটে ও দ্রবভাগ অধিক থাকিতে, নামাইলে পেয়া প্রস্তুত হয়। পেয়া লঘু, ধারক, ধাতু পুষ্টিকারক, তৃষ্ণাজ্বর বায়ু দৌর্ব্বল্য ও কুক্ষিরোগ বিনাশ করে, ঘর্ম্ম ও পরিপাক শক্তি বর্দ্ধক, বায়ু ও মলের অনুলোম কারক, শুঁট এবং সৈন্ধবসংযোগে পেয়া দীপন এবং পাচন, আম শূল নিবারক, রুচিজনক এবং বিবন্ধ বিনাশক। বাগ্ভট বলেন, "প্রাগ্লাজপেয়াং সশুণ্ঠী ধান্য পিপ্পলীম্।" শুট, ধনিয়া ও পিপুল সংযোগে প্রথমে লাজ অর্থাৎ খৈয়ের পেয়া পথ্য দিবে।

যবাগূ।

যবাগূঃ ষড়্গুণেতোয়ে সংসিদ্ধাঘনসিক্থকা।
পৃথক্ দ্রবৈস্ত বিরলৈঃ সংযুক্তা জ্বরিণে হিতা সুযুক্ত॥
যবাগূর্দীপনীলঘ্বী তৃষ্ণাঘ্নী বস্তিশোধিনী।
শ্রমগ্লানিহরী পথ্যা জ্বরে চৈবাতিসারিকে॥

ছয় গুণ জলদ্বারা রক্তশালি প্রভৃতি ধান্যের চাউল সিদ্ধ করিয়া যখন তাহাতে সিটে অধিক ও দ্রব্য ভাগ অল্প ও পৃথক ভাবে থাকে তখন যবাগূ প্রস্তুত হয়। ইহা উপযুক্তরূপে প্রযোজিত হইলে জ্বর রোগীর পক্ষে হিতকর হয়। যবাগু অগ্নিদীপ্তি কারক, লঘু, তৃষ্ণানিবারক, বস্তিশোধক, শ্রম ও গ্লানি নাশক, ইহা জ্বর এবং অতিসারে হিতকারক।

বিলেপী।

চতুর্গুণাম্বুসংসিদ্ধাবিলেপী ঘনাসিক্থকা।
পৃথক্ দ্রবেণরহিতা খ্যাতা শিথিলভক্তিকা।

বিলেপী দীপনী বল্যা হৃদগ সংগ্রাহিণী লঘুঃ।
ব্রণাক্ষিরোগিণাং পথ্যা তর্পনী তৃড়্জ্বরাপহা॥

চারিগুণ জলে চাউল অত্যন্ত সিদ্ধ, দ্রবরহিত ও ঘন সিক্‌থ হইলে বিলেপী প্রস্তত হয়। ইহা পশ্চিম দেশে "শিথিল ভক্তিকা" নামে প্রসিদ্ধ। বিলেপী বলবর্দ্ধক, অগ্নিরদীপ্তিকারক, হৃদয় গ্রাহী, ধারক, লঘু, ব্রণও চক্ষুরোগে হিতকর, তৃপ্তি কারক এবং পিপাসা ও জ্বর নাশক।

যব (বার্লি)।

রুক্ষঃ শীতো গুরুঃ স্বাদুর্বহুবাতশকৃদ্ যবঃ।
স্থৈর্য্যকৃৎসকষায়শ্চবল্যঃ পিত্ত শ্লেষ্মা বিকারনুৎ॥

যব রুক্ষ, শীতগুণ, গুরু সুমধুর অত্যন্ত বায়ু ও মল বর্দ্ধক, শরীরের স্থিরতা সম্পাদক কষায় রস বল বর্দ্ধক এবং পিত্তশ্লেষ্মা বিকার প্রশমক।

গোধুম (ময়দা ও সুজি)

গোধুমোমধুর শীতো বাত পিত্ত হরো গুরু।
কফ শুক্র প্রদো বল্যঃ স্নিগ্ধ সন্ধান কৃৎসর।
জীবনো বৃংহণো বর্ণ্যো ব্রণ্যো রুচ্যঃ স্থিরত্বকৃৎ॥

গোধুম মধুর, শীতবীর্য্য, বাতপিত্তহর, গুরু, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, ভগ্নসন্ধানকারক সংযোজক, ওজোধাতুবর্দ্ধক, শরীরের উপকারক বর্ণ প্রসাদক, ব্রণেহিতকর রুচিজনক ও শরীরের স্থিরতাসম্পাদক।

সাগু গুরু যেহেতু ইহা সাগুনামক তাল জাতীয় বৃক্ষের মজ্জা হইতে প্রস্তুত হয়, ঋষিগণ বৃক্ষের মজ্জার গুণ এইরূপ বলিয়াছেন, "নারিকেলস্তুতালস্ত খর্জ্জুরস্য শিরাংসিতু কষায় স্নিগ্ধ মধুর বৃংহনাণি গুরূণিচ।

নারিকেল তাল ও খর্জ্জুরে মস্তকের মজ্জা কষায় স্নিগ্ধ মধুর শরীরের উপচয়কারকএবং গুরু।

এক্ষণে দুগ্ধ, দাউদখানি চাউল, যব, গোম, ও সাগুর গুণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শালিতণ্ডুল দাউদখানি চাউল লঘু যব প্রভৃতি গুরু, সুতরাং শালি তণ্ডুলের মণ্ডাদি লঘু ও যবাদির মণ্ডাদি গুরু।

জ্বরের অবস্থা ও পথ্যের গুণ বিচার করিলে দেখা যায় যে সামজ্বরে দুগ্ধ, বার্লি, দুগ্ধ সাগু, পথ্য দেওয়া উচিত নয়, শালিতণ্ডুলের বা যবের মণ্ডাদি পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

বায়ু পরিবর্ত্তন।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার সন ১৩১৫ সালের ৫ম সংখ্যক জন্মভূমি নামক মাসিক পত্রিকাতে "জুড়াইবার স্থান কোথায়" নামক যে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উপসংহারে আপনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাধুজনোচিত সন্দেহ নাই। সহৃদয় চিকিৎসক মহাশয়দিগের নিজ নিজ মতামত এবিষয়ে প্রচারিত হইলে সাধারণের প্রভূত—মঙ্গল সাধিত হইবে।

আতুরের স্থান পরিবর্ত্তনরূপ চিকিৎসা বিষয়ক ইঙ্গিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনেক স্থানেই দর্শিত হইয়াছে। কিন্তু অধুনাতন যেমন মধুপুর, বৈদ্যনাথ, দার্জ্জিলিং শিমলা, মুঙ্গের মশুরী ওয়াল্টেয়ার, কটক, প্রভৃতি প্রদেশ স্থান পরিবর্ত্তনে আবিষ্কৃত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছে, বর্ত্তমান চরক সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সেরূপ নির্দ্দিষ্ট কোনও ভূখণ্ডের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সমগ্র ভূপ্রদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনটী সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যথা—"আনুপদে" "জাঙ্গল দেশ" ও "সাধারণ দেশ"।*

যে দেশে জলাভূমি, খাল বিল, নদনদী, অধিক ও ধরাতল নিম্নোন্নত, যেদেশে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয় এবং বায়ু সতত শীতল ও মন্দগতি বিশিষ্ট, পর্ব্বত ও বৃক্ষ সকল যেদেশে অত্যধিক উচ্চতা লাভ করে, মনুষ্য সকল যেদেশে হৃষ্টপুষ্ট কোমলাঙ্গ সুকুমার ও প্রায়শঃ বাত-শ্লেষ্মাজনিত ব্যাধি সমূহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, সেই দেশ "আনুপদেশে" নামে অভিহিত।

পরন্তু যে দেশে ধরাপৃষ্ঠে আকাশের ন্যায় সমতল ও বৃক্ষাদি শূন্য প্রায়, কচিৎ কোনও স্থানে দুইএকটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ বা কণ্টক বৃক্ষ দৃষ্টি গোচর হয় এবং বৃষ্টি অধিক হয় না, নির্ঝর ও কুপব্যতীত অন্য জলাশয় অতি অল্প, যেদেশে বায়ু উষ্ণ ও রুক্ষ, পর্ব্বত সকল ক্ষুদ্রকায় অথচ বিরল, মনুষ্য সকল কৃশ শরীর অথচ দৃঢ়াবয়ব এবং বাতপিত্ত জনিত ব্যাধি সমূহ যেদেশে অধিক পরিমাণে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, সেই দেশের নাম "জাঙ্গল দেশ।"

---

* দেশস্ত্বানুপঃ জাঙ্গলঃ, সাধারণ ইতি। তত্র বহূদক নিম্নোন্নত নদীবর্ষগহনো মৃদুশীতানিলো বহুমহাপর্ব্বতবৃক্ষো মৃদু সুকুমারোপচিতশরীর মনুষ্যপ্রায়ঃ কফ বাত রোগ ভূয়িষ্ঠশ্চানূপঃ॥ আকাশ সমঃ প্রবিরলাল্প কণ্টকিবৃক্ষপ্রায়ো ইল্পবর্ষ প্রস্রবণোদ পানোদক প্রায় উষ্ণ দারুণ বাতঃ প্রবিরলাল্প শৈলঃ স্থিরকৃশশরীর মনুষ্যপ্রায়ো বাত পিত্তরোগভূয়িষ্ঠশ্চ জাঙ্গল উভয়দেশলক্ষণঃ—সাধারণ ইতি॥ সুঃ সং,—৩৫ অঃ।

* আর উক্ত উভয় দেশের লক্ষণ সমূহ মিশ্রিতভাব যেদেশে লক্ষিত হয়, তাহাই "সাধারণ দেশ" বলিয়া গণ্য। "সাধারণ দেশ" নাতি উষ্ণ, নাতিশীত, এই শেষোক্ত দেশ অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দোষে দূষিত নহে, শীত বাত বর্ষা সকলই এখানে সময়ানুরূপ সমতাবিশিষ্ট, এজন্য "সাধারণ দেশবাসী মনুষ্যগণ সুস্থ সবল, সমদোষ ও সমাগ্নি।

এখানে আসলে আনুপ দেশজাত ব্যাধি বা জাঙ্গল দেশ জাত ব্যাধি কোনও ব্যাধির বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, স্থান প্রভাবে দোষের সমতা প্রযুক্ত সহজেই ব্যাধি সমূহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে, এজন্য "সাধারণ দেশ," "আনুপ" ও "জাঙ্গল দেশ" অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া উক্ত।

উল্লিখিত হইয়াছে আনুপ দেশজাত মানব সকল প্রায়শঃ বাতশ্লেষ্মা জনিত ব্যাধি সমুহের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কারণ এই "আনুপ দেশের" ভূমিভাগ স্বভাবতঃ সরস (আর্দ্র), তদ্দেশে জলকণাবাহি শীতল বায়ু সতত বহিতে থাকে, তন্নিবন্ধন আর্দ্রতা ও শীতাই মানব দেহে যুগপৎ শ্লেষ্মা ও বায়ুকে সঞ্চিত ও কুপিত করিয়া শ্বাস ও কাস, জ্বর ও শ্লীপদ, গলগণ্ড ও কুরণ্ড প্রভৃতি রোগোৎপত্তির মূলীভূত হেতু হয়। এবং ঐ সকল ব্যাধির উৎপন্নাবস্থায় কোনও ঔষধাদি দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া, যদি স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকা যায়, তবে সে স্থলে রোগের উপশম না হইয়া স্বভাবের অনুকূল সাহায্যে উত্তরোত্তর সে সকল রোগের বৃদ্ধিই সাধিত হইতে থাকিবে, কেননা তত্তৎ রোগের উৎপাদকতা উক্ত দেশের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং সে স্থলে হয় সেই সেই রোগের প্রতিকারক ঔষধাদি সেবনে স্বভাবের শক্তিকে জয় করিতে হইবে, অন্যথা সে দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত অন্য দেশের আশ্রয় লইতে হইবে।

"জাঙ্গল দেশ" "আনুপ দেশের" বিপরীত লক্ষণযুক্ত, অতএব আনুপদেশজাত মানব বাতশ্লেষ্ম জাত কোন প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে, "জাঙ্গল দেশ" তাঁহার পক্ষে স্থান পরিবর্ত্তনে প্রশস্ত। এতদ্দেশীয় জলের লঘুতা বায়ুর উষ্ণরুক্ষতা ও মৃত্তিকার শুষ্কতা নিমিত্ত আনুপদেশজাত সঞ্চিত দোষ ক্রমশঃ বিধ্বস্ত হইয়া উক্ত ব্যাধি সকলের নিবৃত্তির কারণ হইবে।

* সমাঃ সাধারণে যস্মাচ্ছীতবর্ষোষ্ণমারুতাঃ।
দোষাণাং সমতা জন্তোস্তস্মাৎ সাধারণো মতঃ॥
ন তথা বলবন্তঃ স্যুর্জলজা বা স্থলাহৃতাঃ। সুঃ সং—৩৫ অঃ।

বলাই বাহুল্য ঐরূপ জাঙ্গল দেশজাত বাতপিত্ত জনিত দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, জ্বর, গ্রহণী, তমকশ্বাস * অনিদ্রা প্রভৃতি রোগ, "আনুপদেশের" সংসর্গে আসিলে, আনুপদেশীয় স্নিগ্ধ শীত বাত সংস্পর্শে "জাঙ্গলদেশীয় রুক্ষোষ্ণগুণ কুপিত বাতপিত্ত ক্রমশঃ স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎ রোগ নিবৃত্তির হেতু হয়। পরন্তু ইহাও হইতে পারে যে, আনুপদেশ জাত ব্যাধিপীড়িত ব্যক্তি "জাঙ্গলদেশে" না গিয়া যদি উভয় দেশ গুণ সমন্বিত "সাধারণ দেশে গিয়া অবস্থান করেন, তবে তাহাতেও উক্ত উভয় দেশগত ব্যাধি সমুহ নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব। যেহেতু দোষ সমূহের সামঞ্জস্য বা সমতা বিধান করাই "সাধারণ দেশের" স্বাভাবিক গুণ।

একণে অস্মদ্দেশের (ভারত বর্ষের) কোন কোন প্রদেশ, "আনুপ" কোন প্রদেশ "জাঙ্গল" আর কোন স্থানই বা "সাধারণ"—শ্রেণীস্থ, এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে, নিম্নোক্ত প্রকারে সমাধান বা স্থান নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। যথাঃ ভারতের পূর্ব্ব দক্ষিণাংশ "আনুপ," পশ্চিমোত্তর অঞ্চল "জাঙ্গল" ও মধ্যভাগ "সাধারণ"—

পূর্ব্ব বর্ণিত আনুপাদি দেশের তাবৎ লক্ষণ, যেহেতু এই সকল দেশে প্রায়শঃ বিশেষ ভাবে অবলোকিত হইতেছে। অতএব আতুর সম্প্রদায়ের স্থান পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনার সহিত এইটুকুমাত্র লক্ষ্য রাখা উচিত, যে, গন্তব্য স্থানের সহিত বর্ত্তমান অভ্যস্ত স্থানের পার্থক্য কিরূপ? সম ধর্ম্ম, কি বিপরীত ধর্ম্ম, যদি অভ্যস্ত স্থানের সহিত গন্তব্য স্থানের লক্ষণ সমান হয় তবে তথায় আরোগ্য কামনায় গমন করা বিড়ম্বনা মাত্র? পক্ষান্তরে গন্তব্যস্থান ও অভ্যস্ত স্থান যদি বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত হয় তবে তথায় কামনা সংসিদ্ধির যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান।

উপসংহারে শেষ বক্তব্য এই যে——

অনুসন্ধানে আমরা এবিষয়ে যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে জ্বর বা যক্ষ্মা যকৃৎ বা প্লীহা, গ্রহণী বা শোথ, কাস বা শ্বাস, (তমক শ্বাস ব্যতীত) আমবাত বা শ্লীপদ (গোদ) প্রমেহ বা কুরণ্ড প্রভৃতি রোগপীড়িত ব্যক্তির পক্ষে, এলাহাবাদ, এটোয়া, ডিহিরী, মসুরী, চুণার, বিন্ধ্যাচল, মুঙ্গের, বক্সার প্রভৃতি জনপদ, স্থান পরিবর্ত্তনে প্রশস্ত।

কেবল জ্বর প্লীহা যকৃৎ পাণ্ডু রোগাক্রান্ত আতুরের পক্ষে, বৈদ্যনাথ মধুপুর শিমুলতলা, গিরিডি আরোগ্যকর স্থান। বাতরক্ত, কুষ্ঠ, পারদ বিকৃতি, রক্তদুষ্টি

* তমকশ্বাস—এই রোগ প্রতিলোম কুপিত প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক শ্লেষ্মাকে আশ্রয় করিয়া অদ্ভুত হয়।

ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগাক্রান্তের পক্ষে, দার্জ্জিলিং, শিমলা, এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণমস্তিষ্ক, বহুমূত্র, হৃদ্রোগ, বায়ুরোগ অনিদ্র ও হাঁপানি * (তমকশ্বাস) প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে, কটক, পুরী, ওয়াল্টেয়ার প্রভৃতি স্থান, স্থানপরিবর্ত্তনে হিতকর। এতদ্ব্যতীত শোননদ সমীপবর্ত্তী ও অনুগাঙ্গ প্রদেশ সমূহ প্রায়ই স্বাস্থ্যপ্রদ। কিন্তু যেস্থলে ভাগীরথীর সহিত অন্যান্য নদ বা নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তত্তৎ স্থান সেরূপ স্বাস্থ্যকর নহে। অবশ্য এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত না হইতেও পারে।

ফলতঃ যাহাই হউক, আমাদের এই নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষুদ্র প্রবন্ধের অনুকূলে বা প্রতিকূলে এই "জন্মভূমি" পত্রিকাঙ্কে অনুকম্পা পুরঃসর কেহ নিজ মতামত প্রকাশ * করিলে, আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব, প্রত্যুত, কেবল আমরাই যে অপার আনন্দ লাভ করিব এরূপ নহে, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেই এবং আপামর সাধারণে তাহাতে পরম প্রীতি ও বিশেষ উপকার লাভ করিবে।

কবিরাজ শ্রীবারাণসীনাথ গুপ্ত বৈদ্যরত্নঃ।

করুণা।

লেখক, নাট্যাচার্য্য কবিবর শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র ঘোষ।

(গান।)

হে দীন শরণ, বন্ধন মোচন, তাপেতাপ বার ত্রিতাপ বারণ।
নিঠুরতা নয়, হে করুণাময়, করুণা তোমার কলুষ হরণ!
তোমারে পাশরি, ভবে ভ্রমি হরি, বন্ধমায়া পাশে, মোহে ডুবে মরি,
ঘোর পাপপঙ্কে, কেমনে হে তরি, বিনাপাপহারী পঙ্কজ চরণ?
ভীষণ পাথার, না করি বিচার, সুখসাধে দুখ—সাগরে সাঁতার,
বাসনার ছলে, উন্মাদ চীৎকার, শাসন মত্ততা দমন কারণ।
জনম মরণ, নিয়ত ভ্রমণ, অন্ধের নয়ন নহে নিমীলন,
নিবিড় তিমির তাহে আবরণ, কভু নাহি পশে বিবেক কিরণ।
অন্ধ আঁখি পায়, তোমার কৃপায়, আলোক ঝলকে আগে ব্যথাপায়,
অন্তর নির্ম্মল আলোক প্রভায়, তাপেতে কাঞ্চন উজ্জল বরণ।

* এই রোগের পক্ষে—স্নিগ্ধ আনুপদেশ আরোগ্য কর।

* ভারতবর্ষের মধ্যে কোন গুলি আনুপ, কোন গুলি জাঙ্গল এবং কোন গুলি সাধারণদেশ, তাহা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিলে, আমরা বিশেষ উপকৃত হইব।—সম্পাদক।

নমঃশূদ্র।

(প্রতিবাদের প্রতিবাদ)

নমঃশূদ্র জাতির চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমি মহামহোপাধ্যায়কল্প শ্রীযুক্ত রাজকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছি। মৎ-কৃত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বড় দুঃখিত হইয়াছেন, তৎকৃত প্রতিবাদ পাঠে আমি এরূপই বুঝিয়াছি, এই রূপ মহাশয় ব্যক্তির মনঃপীড়ার কারণ হইয়া, আমি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত স্মৃতিতীর্থ মহাশয় তাঁহার সার বহুল প্রবন্ধে যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের মৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রতিবাদের কল্পনাও পাপ জনক। বস্তুতঃ তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ যেমনসুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে উহাকে একটী মূল প্রবন্ধ বলিলে ভাল হইত। প্রতিবাদ বিশেষণে প্রবন্ধটীর গৌরবের হানি হইয়াছে এবং প্রতিবাদের কল্পনা, স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে অসহিষ্ণু করিয়া নিন্দুকের নিন্দার অবসর করিয়া দিয়াছে।

নমঃশূদ্র জাতির জল আচরণীয় নহে। এবিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণের কোনও আবশ্যক হয় না। লোক ব্যবহারতঃ ইহা চলিয়া আসিতেছে। এই জন্য আমি কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেই নাই। লোকের পুরুষানুক্রমে গৃহীত আচার ব্যবহার বাহুবুদ্ধি পুনঃ বিচার করিবার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান নমঃশূদ্র জাতির সহিত আমাদের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা আমি সামাজিকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। এবং তৎসহ সেই জাতির বর্ত্তমান চরিত্র (আমি যেরূপ দেখিয়াছি) যথা সাধ্য বর্ণনা করিয়া ছিলাম। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বলিয়াছেন, "নমঃশূদ্র জাতির নামান্তর চাণ্ডাল।" এই সিদ্ধান্তে আমি সন্তুষ্ট হইতাম, যদি তিনি অভিধান বা শাস্ত্রীয় বচনে এই বিষয়টী প্রমাণীকৃত করিতেন। তিনি তাহা করেন নাই।

শাস্ত্রে চাণ্ডালের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কথা আছে।

> ব্রাহ্মণ্যাংক্ষত্রিয়াৎসূতো বৈশ্যাদ্বৈদেহকোমতঃ।
>
> শূদ্রাজ্জাতস্তু চাণ্ডালঃ সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য ৯৩। ১ম অধ্যায়

ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয় হইতে সূত, বৈশ্য হইতে বৈদেহক ও শূদ্র হইতে সর্ব্ব-ধর্ম্ম বহিষ্কৃত চাণ্ডাল উৎপন্ন হইয়াছে।

মনু গৌতম প্রভৃতি সংহিতাকারগণেরও এই মতঃ—

ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিত শ্চাণ্ডালো ধর্মবর্জ্জিতঃ।
কুমারীসম্ভবস্তকঃ মলোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ ॥
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিত শ্চাণ্ডাল স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥

ব্রাহ্মণ কন্যাতে শূদ্রজনিত সন্তান চণ্ডাল জাতি হয় এবং কোন ধর্মে তাহার অধিকার থাকে না। চণ্ডাল তিন প্রকার (১ম) অবিবাহিতা কন্যাতে উৎপন্ন সন্তান, (২য়) সগোত্র পত্নীর গর্ভ জাত; (৩য়) ব্রাহ্মণীতে শূদ্রজনিত।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন অনুদিত ব্যাসসংহিতা ১০ শ্লোক ১ম অধ্যায়

মনু ইহাদের বৃত্তি নির্দ্দেশ স্থলে বলিয়াছেনঃ—

চণ্ডালশ্চ পচনাস্তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাংশ্চ গর্দ্দভম্॥ ৫১॥
বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কার্ষ্ণায় সমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যাচ নিত্যশঃ॥ ৫২॥
ন তৈঃ সময় মন্বিচ্ছেৎ পুরুষোধর্ম্মাচরন্।
ব্যবহারো মিথস্তেষাং বিবাহঃ সদৃশৈঃ সহ॥ ৫৩॥
অন্নমেষাং পরাধীনং দেয়ং স্যাদ্ভিন্ন ভজনে।
রাত্রৌ ন বিচরেয়ুস্তে গ্রামেষ নগরেষু চ॥ ৫৪॥
দিবাবরেয়ুঃ কার্যাথাং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ।
অবান্ধবং শবঞ্চৈব নির্হরেয়ুরিতি স্থিতিঃ॥ ৫৫॥
বধাংশ্চ হন্যুঃ সততং যথাশাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়া।
বধ্যবাসাংসি গৃহ্লীয়ুঃ শয্যাশ্চাভরণা নিচ॥ ৫৬॥

চণ্ডালগণ গ্রামের বাহিরে বাস করিবে। তাহাদের হস্তস্থিত ভাণ্ডে কিছু দিবে না। ইহাদের ধন, গর্দ্দভ ও কুক্কুর। বসন, মৃতের কাপড়। ভোজন পাত্র, ভগ্ন ভাণ্ড। অলঙ্কার লৌহ নির্ম্মিত বলয়াদি।

ইহারা সর্ব্বদা ভ্রমণশীল হইবে। ধর্ম্মানুষ্ঠান কালে ইহাদের সহিত কোন রূপ কারবার করিবেক না। ইহাদের ঋণদান গ্রহণাদি ব্যবহার ও বিবাহ সমান জাতীয় দিগের সহিত হইবেক। ইহাদিগকে স্বয়ং অন্নদান করিবেক না। সেই অন্নও ভিন্ন ভাণ্ডে প্রদান করিবেক। ইহারা রাত্রিতে গ্রামে বা নগরে বিচরণ করিবেক-না। কার্য্যের জন্য রাজপ্রদত্ত চিহ্নধারণ করিয়া দিনে গ্রামে বা নগরে প্রবেশ করি-বেক। ইহারা বান্ধবহীন শব গ্রাম হইতে বাহিরে লইয়া যাইবে। রাজাজ্ঞা মত

বধ্য (অপরাধি) দিগকে বধ করিবে, এবং তাহাদের বসন শয্যা ও অলঙ্কার গ্রহণ করিবে।

পাঠক মহাশয় পূর্ব্ব প্রবন্ধ বর্ণিত নমঃশূদ্র জাতির সহিত এই চাণ্ডালের তুলনা করিয়া দেখিবেন। নমঃশূদ্রগণ সর্ব্বধর্ম্ম বহিস্কৃত নহে। তাহারা তাহাদের জাত্যুচিত ব্রাহ্মণ দ্বারা সৎশূদ্রগণের মত সমুদায় কার্য্যই করাইয়া থাকে। তবে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কিরূপ ছিল, তাহারা কিরূপ আচার বান্ ছিল তাহার ইতিহাস পাওয়া যায় কিনা জানি না। চাণ্ডাল বলিয়া যে জাতির উল্লেখ করা গেল, তাহা এখনও আছে। তাহাতেই বোধ হয়, চাণ্ডালত্ব লোপ করিয়া নমঃশূদ্রগণ এই অবস্থায় আসে নাই।

এই রূপ সন্দেহ সঙ্কুল স্থানে একটা জাতিকে চণ্ডাল স্থির করিয়া শ্রীযুক্ত স্মৃতি তীর্থ মহাশয় বলিয়াছেন, "চাণ্ডালের স্পৃষ্টোদক পানে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তৎপর অঙ্গিরার বলিয়া একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা বঙ্গবাসীর প্রকাশিত অঙ্গিরা সংহিতায় এই বচনটী পাই নাই। এই বচনটী কোন্ মূল গ্রন্থের তাহা স্মৃতি তীর্থ মহাশয় বলিয়া দিলে বাধিত হইব। তবে এইরূপ অঙ্গিরা সংহিতায় আছে, এবং চাণ্ডাল সম্বন্ধে ঋষিদের সকলেই একমত। কিন্তু নমঃশূদ্র জাতিকে চণ্ডাল প্রমাণ না করিয়া এরূপ কথা বলিয়া একটা জাতির উপর ঘৃণা প্রকাশ করা উচিত কি?

তৎপর তিনি মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া চাণ্ডালের যে অস্পৃশ্যত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, চাণ্ডালের পাতিত্য সম্বন্ধে তাহা যথেষ্ট। কিন্তু উক্ত শ্লোকে ভাষ্যে মেধাতিথি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই শ্লোকের চাণ্ডাল পদবাচ্য নমঃশূদ্র হইতে পারে না। মেধা তিথি বলিতেছেন—"যত্র গ্রামেতে বসন্তি নতত্র বস্তব্যম্। যস্মিন্ গ্রামেভূপংশস্তে তথা সপীলেহপি ন বস্তব্যম্॥" "যে গ্রামে পতিত, অধার্ম্মিক ও চাণ্ডাদি বাস করে সে গ্রামে বাস করিবেক না এবং কোন গ্রামে এই সকল অধিক পরিমাণে বাসকরে তাহার নিকটেও বাস করিবেক না।" নমঃশূদ্রের বেলায় তাহা হয় কি? আমি এমন বহুগ্রাম জানি, যেখানে ব্রাহ্মণাদি বিশুদ্ধ জাতির দ্বিগুণ নমঃশূদ্র। নমঃশূদ্র যদি মনুক্ত চাণ্ডালই হইত, তাহা হইলে গ্রামে নমঃশূদ্রের সংখ্যা বাহুল্য দেখিয়া ও ব্রাহ্মণেরা বাস করিত কি? এমনও গ্রাম আছে যে গ্রামে ব্রাহ্মণ ও নমঃশূদ্র কতকাল যাবৎ যে একত্র বাস করিতেছে, তাহা ঠিক নাই। এরূপ স্থলেও কি নমঃশূদ্রদিগকে চণ্ডাল বলিতে হইবে?

শ্রীযুক্ত স্মৃতিতীর্থ মহাশয় নিজের সিদ্ধান্তে নিজেই আস্থাবান্ হইতে না পারিয়া

বলিয়াছেন, "যাহারা নমঃশূদ্র জাতিকে চাণ্ডাল বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহাদিগকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ জাতি নিশ্চিত একটী পতিত অমেধ্য বা অন্ত্যজ জাতি।" নমঃশূদ্র যে এখন সমাজে পতিত তাহা কে অস্বীকার করে? তবে কখন কি কারণে পতিত হইয়াছিল এবং কোন জাতি পতিত হইয়া এই অবস্থায় আসিয়াছে, তাহার কোনও ইতিহাস নাই। এখন এই পাতিত্য দূর করা যাইতে পারে কিনা, তাহাই ত আমার প্রশ্ন। নমঃশূদ্রেরা অমেধ্য ও অন্ত্যজ কিনা তাহার একটু আলোচনা করা যাউক। শ্রীযুক্ত স্মৃতিতীর্থ মহাশয় "অমেধ্য পতিত চাণ্ডাল ইত্যাদি" যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ এখানে অমেধ্য একটী জাতি নহে। অমেধ্য ব্যক্তি বিশেষের বিশেষণ মাত্র। অমেধ্য শব্দের অর্থ এখানে অশুচি পতিত জাতি মাত্রই অমেধ্য। সুতরাং বর্ত্তমানে পতিত নমঃশূদ্রকে অমেধ্য বলায় নূতনত্ব কিছু নাই। নমঃশূদ্রেরা অন্ত্যজ কিনা এখন এখন এ বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে নমঃশূদ্রগণের শূকর ভক্ষণের কথা বলিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বলিয়াছেন "লেখক যখন এই জাতির প্রাক্তন শূকর ভক্ষণের কথা অবগত আছেন, তখন তিনি কেমন করিয়াই বা ইহাদের পাতিত্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন।" নমঃশূদ্র যে পতিত এবং এখন যে ইহাদের জল ব্যবহার্য্য নহে, ইহা আমি কোথাও অস্বীকার করি নাই। তবে শূকর ভক্ষণই যে নমঃশূদ্রগণের পাতিত্যের হেতু এমন কথা স্বীকার করিতে পারি না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি "ইহারা বন্য শূকর মারিয়া খাইত। কিন্তু শূকর পালন করিত না।" বন্য শূকর মারিয়া খাওয়া এখনও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও উড়িষ্যায় উচ্চ জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। বস্তুত শাস্ত্রে গ্রাম্য শূকর ভক্ষণই নিষিদ্ধ যথা—মনু ৫।১৯।

ছত্রাকং বিড্‌বরাহঞ্চ লশুনং গ্রাম্য কুক্কুটং।
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যাজ্জগ্ধা পতেৎ দ্বিজঃ॥

এস্থলে বিড্‌ বরাহ শব্দে গ্রাম্য শূকর বুঝায়, ইহা মেধাতিথি ও কুল্লুক ভট্টের মত। অভিধানকার জটাধরও তাহাই বলিয়াছেন।

যে সমুদায় জারজ অন্ত্যজ লোকের জাতি নির্দ্দিষ্ট নাই, তাহাদের জাতি নির্ণয় কিরূপে করিতে হইবে; তৎবিষয়ে মনু বলিয়াছেনঃ—

বর্ণাপেতম বিজ্ঞাতং নরং কলুষ যোনিজং।
আর্য্যরূপ মিব নার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ॥১০॥৫৭॥

অসর্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ নয়ং কলুষ যোনিজং॥৫৮

অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ ভ্রষ্ট কলুষ যোনিজ অন্তরূপ ধারা অসত্য মনুষ্যকে তাহার স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা জানিবে। আর্য্যতা অর্থাৎ দ্বেষ মাৎসর্য্য প্রধানত্ব, নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতাও বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই কলুষ যোনি জাত পুরুষকে প্রকাশ করিয়া দেয়। আমরা মনুর এই মত অনুসারে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই, নমঃশূদ্র জাতি এই বচনের বিষয়ী ভূত হয় না, বর্ণাপ্তে ও কলুষ যোনি জাত্দিগের যে সমুদায় দোষের কথা লিখিত হইল, নমঃশূদ্র তাহা নহে। এমত অবস্থায় ইহাদিগকে অন্ত্যজ বলা সঙ্গত কি?

তবে ইহারা কে? কোন জাতি আমি যদি নত ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি যে;ইহাদের অশৌচ বিধি দর্শন করিলে বলিতে পারা যায়—ইহারা বঙ্গদেশে নবান জাতি। ১০ দিন অশৌচ বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই। বঙ্গদেশের যে কোন অন্ত্যজ জাতি একমাস অশৌচ পালন করে। তবে পশ্চিম প্রদেশ, উড়িষ্যা ও মন্দ্রাজে ১০ দিন অশৌচ সকল জাতির যে সকল দেশে মাধবীর মত প্রবর্ণিত সেই দেশেই এই ব্যবস্থা। মাধববীয় স্মৃতিতে সর্ব্ব জাতির ১০ দিনে শুদ্ধি ব্যবস্থা আছে।

শ্রীযুক্ত স্মৃতিতীর্থ মহাশয় প্রথমত বলিয়াছেন "পশ্চিম দেশীয় কুর্ম্মী কাহারের সহিত তুলনা করিয়া লেখক না হয় নমঃশূদ্র জাতিকে উচ্চ সিংহাসনে বসাইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা দিগের জল চলন বা সামাজিক ব্যবহার্য্যতা বিধি বদ্ধ করিতে পারেন না।" যাহারা আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাহারা দেখিয়া থাকিবেন আমি এরূপ কোন বিধি দিয়াছি কিনা? এবিষয় আলোচনা করিয়াছি মাত্র। বিধি দানের অধিকার আমার নাই। তবে আলোচনার অধিকার ইহাতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়েই তিনি একথা বলিয়াছেন কি?

দ্বিতীয়তঃ তিনি বলিতেছেন কুর্ম্মী কাহারের জল পানাদি সহর বাসী সামাজিকতা অবজ্ঞাকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে বহুশঃ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু মফঃস্বলে ঐরূপ অনাচার এখনও ততটা প্রবিষ্ট হয় নাই।" শ্রীযুক্ত স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এই কথা দ্বারা এই কয়টী বিষয় স্বীকার করিতেছেন যথা—

(ক) কুর্ম্মী কাহারের জল গ্রহণ অনাচার মধ্যে গণনীয়।

(খ) এই অনাচার সহরে অধিক। (গ) এই অনাচার মফঃস্বলে কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে।

এক্ষণে শ্রীযুক্ত স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তিনি শাস্ত্র প্রমাণে বলিয়া দিবেন কি যে, এই কাহার ও কুর্ম্মীর উৎপত্তি বিবরণ কিরূপ, এবং ইহাদের জাতীয় ব্যবসায় কি ? ইহাদের জল পানাদি দ্বারা অনাচার হয় কেন !

ইনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় নাগরিকগণের ভাল মন্দ আবার নানাস্থলে পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিয়া থাকে। এবং এই প্রবেশ বেগের বাধা প্রদানে সময় সময় সুফল হয় না। সুতরাং আজ সহরের যে দোষ দেখিয়া তিনি নাগরিকগণকে সামাজিকতাবজ্ঞাকারী বলিয়াছেন, সেই দোষ পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিতে বেশী বিলম্ব হইবেক না। বস্তুত "ভতটা" বিশেষণ দিয়া শ্রীযুক্ত স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এখন যে বিষয়টাকে অবহেলনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহা প্রকৃত পক্ষে অবহেলার বিষয় নহে ; প্রত্যুত ভাবিবারই বিষয়। সহরে সৎশূদ্র বাঙ্গলী ভৃত্যের অভাবেই কাহার ও কুর্ম্মী ভৃত্য রাখিতে হয় এবং কুলটা নারীর জল পান করিতে হয়। মফঃস্বলেও যে কারণেই হউক বাঙ্গালী ভৃত্যের অভাব ঘটিতেছে, এবং তৎস্থান কাহার কুর্ম্মী দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। আমার যে পয়সা আমার গ্রামের লোকের পাওয়া উচিত সেই পয়সা একজন সুদূর দেশবাসী লইয়া যাইতেছে।

অন্য দিকে নমঃশূদ্রগণও উচ্চ জাতি সংসর্গ ও বিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়া ক্রমে উন্নত হইয়া হইতেছে, এই অবস্থায় আমরা ইচ্ছাকৃত কোনপরিবর্ত্তন আমাদের মনের মত করিয়া লইতে পারি। পক্ষান্তরে এবিষয়ে আমরা উদাসীন থাকিলে কালস্রোত বশতঃ যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা হয়ত আমাদের প্রতি কুলেই দাঁড়াইবে।

শ্মশানসৈকতে।

লেখক শ্রীবীরেন্দ্র নাথ মিত্র—

১

এই সে সৈকত, মম আশার শ্মশান,
হেথা একদিন, দিয়েছিনু বিসর্জ্জন,
পরম দেবতা পতি রমণী-জীবন,
রমণীর জীবনের চির আকিঞ্চন।

২

আজি এই সে সৈকতে করি আগমন,
মনে পড়ে আজন্মের সকল ঘটন ;
এই সে সৈকত ক্রোড়ে দিছি বিসর্জ্জন,
ছিন্ন কণ্ঠে হৃদয়ের শেষ আকর্ষণ ॥

৩

বৈতরণী নদী তীরে এইত শ্মশান,
হেথা তাঁরি তরে রয়েছি শয়ন,
নিজ হাতে বিছায়েছি চন্দন আস্তর,
শূন্য করি চিরতরে হৃদয় কন্দর ॥

৪

ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে যেতেছে সময়,
চির অমা রহে আঁধি আমার হৃদয় ;
একে একে লুকাইছে সে বিগত দিন।
অতীত কালের গর্ভে হতেছে বিলীন ;
আজো আমি আশা বাঁধে বেঁধেছি জীবন,
চিরতরে তাঁরি মুখ হই বিস্মরণ ॥

৫

যদি আমি সেই দিন দিতু বিসর্জ্জন,
মম এই ক্লেশময় কঠোর জীবন ;
তবে এ বাড়ব দাহ বুকেতে র'তো না,
ফুরাত এঘোর জ্বালা মরম বেদনা ॥

৬

যদি নাহি ভাবিতাম সাধের যৌবন,
হাসি মুখে করিতাম চিতায় শয়ন,
হতো না হইতে প্রাণে, এত জ্বালাতন,
সুখে কভু নাহি হত অসুখ দহন ॥

৭

সাধের যৌবনে হয়েছি জীর্ণ জরা,
সাধের জীবনে হ'য়েছি জীবন্তে মরা ;

সকলি ডুবিবে, আমি (কেন) রহিব পড়িয়ে,
এ দুর্ব্বহ জীবনে জীবন্মৃত হইয়ে ॥

৮

ফুটেছে কালের রেখা হৃদয় গগণে,
মিলাই জীবন স্রোত জাহ্নবী জীবনে ;
উথলিত মম, শোকে তরঙ্গ গঙ্গার,
নিরাশার পূর্ণ তান ঘেরি চারি ধার ॥

৯

মা জাহ্নবী, একমাত্র স্বর্গের সোপান,
লহ গো আমারে তুলে তব সন্নিধান,
অশান্তি পূরিত এই হৃদয়ে আমার,
সিঞ্চ তব শান্তি বারি আমার উপর ॥

* * * * * *

১০

সেই এক দিন আর এই এক দিন,
সামান্য চিতার চিহ্ন নাহিক এখন;
সামান্য ভস্মের চিহ্ন নাহিক এখন,
আছে শুধু ম্রিয়মাণ আমার জীবন ॥

১১

সেই এক দিন আর এই এক দিন,
ত্যজে ছিল পতি যবে আপন জীবন ;
আজি আমি ভয়ে ভাবি মৃত্যুর স্মরণ,
সেই দিন পুষ্প মালা দিয়েছিল বিদ্যাধরিগণ,
আজি যে পিশাচি মুখ ঘৃণায় ফিরায়,
আজি যে জাহ্নবী বারি উথলি পলায়,
সেই এক দিন আর এই এক দিন,
সকলি কালের কোলে হইতেছে লীন ॥



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৬শ বর্ষ। | ১৩১৫ সাল, কার্ত্তিক। | ৭ম সংখ্যা।

বঙ্গের নারী শিক্ষা।

লেখক, শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

পুরাকালে ভারতের সম্ভ্রান্ত আর্য্যরমণীগণ বিদ্যাবতী ছিলেন, ইতিহাসের অনেকস্থলে তৎবিষয়ের বিশেষ বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়, এখনও গুজরাট ও কর্ণাট প্রদেশে বিদুষী আর্য্যরমণীর নিতান্ত অসদ্ভাব লক্ষিত হয় না। নারী-গণের বিদ্যাশিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক; প্রাজ্ঞব্যক্তিমাত্রেই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। সমগ্র ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ দূরে রাখিয়া আমরা এই বঙ্গদেশের অবস্থা বলিব। শতবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিলনা, স্ত্রীলোককে লেখা পড়া করিলে, বিধবা হয়, এই ভয় দেখাইয়া আমাদের কুলকন্যাগণকে বিদ্যারসাস্বাদনে বঞ্চিতা রাখা হইত। পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বেও আমাদের

অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ লেখা পড়ায়, অনুরাগিনী ছিলেন না। একেবারেই ছিলেন না, এ কথা বলিতেও কিছু কিছু সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। শুনিয়াছি, দু-টি পাঁচটি বিধবা বর্ষীয়সী ঘরে বসিয়া বর্ণপরিচয় করিয়া, কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত সুর করিয়া পাঠ করিতেন, আট দশটি প্রতিবাসিনী তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া, প্রতিদিন অপরাহ্ণে সেই সকল ধর্ম্ম কথা শ্রবণ করিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে যুক্তি তর্কের সহায়তায়, বঙ্গনারীদিগের শিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে হয় না, এক্ষণে দেশের সুশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—অতঃপর মিশনার সাহেবদিগের উৎসাহে, প্রদেশের স্থানে স্থানে দুটি একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, গণনায় অল্প হইলেও কতিপয় হিন্দুবালিকা সেই সকল বিদ্যালয়ে দু-একখানি পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করে, সেরূপ শিক্ষায় আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ হয় নাই, একথা বলাই বাহুল্য। ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশীয় শিক্ষিত পুরুষগণের যত্নে কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে, আজ কাল অনেক স্থলে বালিকা বিদ্যালয়ের আধিক্য হইয়াছে বলিয়া, মিশনারী বিদ্যালয় গুলি উঠিয়া গিয়াছে, এমন মনে করিতে হইবে না, অবশ্যই মিশনারী বিদ্যালয় আছে; হিন্দু বালিকারাও সেই সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, সেই সকল বিদ্যালয়ে যেরূপ শিক্ষা হয়, বাস্তবিক তাহা আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে। ভিন্ন ধর্ম্মের মহিমা গীত করিয়া হিন্দু বালিকার কিরূপ জ্ঞানলাভ করে, তাহা আমরা বুঝি না, সেরূপ শিক্ষায় বরং আমাদের বংশ পরম্পরাগত সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসে বালিকাদের মন টলে, স্পষ্টতই ইহাই উপলব্ধি হয়। কোন কোন বিদ্যালয়ে কিছু কিছু সূচিকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই পশমের কাজ। পঞ্চবর্ণের গলাবন্ধ, মোজা, জুতা, মণিব্যাগ ইত্যাদি। সাধারণ গৃহস্থ সংসারে ঐ সকল জিনিষে বিশেষ উপকার সাধিত হয় না।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা বীটন (বেথুন) রাজধানি মধ্যে প্রথম বেথুনস্কুল (এখন কলেজ) স্থাপনা করেন। সেখানে শিক্ষালাভ করিয়া হিন্দু বালিকারা (শ্রীবিষ্ণু) হিন্দু যুবতীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি প্রাপ্ত হয়। তাহারা আমাদের সমাজের কি কি উপকারে আইসে তাহা বুঝাইয়া দিবার উপযুক্ত লোক পাওয়া

যায় না। আমাদের বিবেচনায় স্ত্রীজাতির তাদৃশী উচ্চশিক্ষা আমাদের সমাজমঙ্গলের বিশৃঙ্খলা বিধায়িনী।

কেবল আড়ম্বর—কেবল আড়ম্বর? দেশের প্রচলিত সাধারণ কথায় স্ত্রীজাতিকে অবলা বলা যায়; ঐরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সেই অবলারা তর্ক বিতর্কে যেরূপ বাচালতাপ্রদর্শন করে, তাহা শুনিয়া অনেকেরই লজ্জা হয়। বাবু দীনবন্ধু মিত্রের একখানি নাটকে আছে "পুরুষ জ্যাটা সওয়া যায়, মেয়ে জ্যাটা বড় বালাই!" এ কথাঠিক। এখনকার উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়ে জ্যাটারা আমাদিগকে লজ্জায় অধোমুখ করিয়া ফেলে।

এই গেল এক কথা, ইহা ছাড়া আরও আছে। স্বধর্ম্মে অবিশ্বাস, ধর্ম্মপ্রসঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা, সেই সঙ্গে বেজায় ব্যাপকতা। বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার সুস্পষ্ট কুফল লজ্জাহীনতা, বিলাসিতা আড়ম্বর প্রিয়তা ও ভোগ পরায়ণতা। লজ্জা নারীজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ, সংযম শিক্ষার উপদানই লজ্জা। শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থে আছে—

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা॥

আর্য্যসমাজের উজ্জ্বল বাক্য এই যে, লজ্জাই কুলকামিনীগণের প্রধান ভূষণ। এখনকার ব্যাপিকা বিদ্যাবতীরা সেই লজ্জাভূষণকে নির্দ্দয় ভাবে বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত নহেন। এখন দেখিতে হইবে, আমাদের স্বদেশহিতৈষী বিদ্যানুরাগী সহৃদয় বন্ধুগণ যে সকল, বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার ফল কিরূপ হইতেছে? হইতেছে নিতান্ত মন্দ নয়; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বধোদয়, কথামালা, অক্ষয়কুমারের চারুপাঠ ও প্রসন্নকুমারের পাটিগণিত, যাদুগোপালের পদ্যপাঠ এবং শশীভূষণের ভূগোলপরিচয় ইত্যাদি পাঠ করিয়া বালিকারা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে, সমাজের রীত্যনুসারে হিন্দু কন্যারা বিবাহের পর, সিঁথায় সিন্দুর পরিয়া পাঠশালায় যায় না; এই কারণেই পরিত্যাগ; সেই পর্য্যন্তই বিদ্যা সমাপ্ত। ঐরূপ সমাপ্তির পর, সেই সকল অবলা নানাবিধ নভেল নাটক ও পাঁচালী পাঠ করিয়া আমোদ অনুভব করেন, অনেকে আবার অনিত্য বিলাস-ব্যসনে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। হিন্দু অন্তঃপুরের নারী সুলভ গৃহকর্ম্মে দারুণ অবহেলা; গৃহকর্ম্ম শিক্ষা হয় না বলিয়াই অবহেলা। তাঁহাদের সুখের জীবন সে সকল শ্রমসাধ্য কার্য্য শিক্ষা করিতেও চায় না।

আমরা তবে চাই কি? স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা চাই, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতে পারে, রন্ধনাদি গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে, গৃহস্থ সংসারের ব্যবহার উপযোগী মোটামুট বস্ত্রাদি শেলাই ও শিল্প কার্য্য জানিতে পারে, মোটামুটি হিসাব রাখিতে পারে, গুরুজনের সেবা ও শিশু পালনাদির পদ্ধতি জানিতে পারে; পতিব্রতা ধর্ম্মের মহিমা বুঝিতে পারে ইহাই আমরা চাই হিন্দু সতীর পতিব্রতা ধর্ম্মের লক্ষণ এই :—

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥"

অর্থাৎ স্বামী বিপন্ন হইলে, যিনি আপনাকে বিপন্না জ্ঞান করেন, স্বামী আনন্দিত হইলে আনন্দিত হন, স্বামী প্রবাসে যাইলে, যিনি মলিনা ও কৃশা হন এবং স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন, তিনিই যথার্থ পতিব্রতা। ইহাই পতিব্রতার ধর্ম্ম; স্ত্রীজাতির লেখা পড়ায় এইরূপ শুভফল আমাদের প্রার্থনীয়।

রমণীগণের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম এবং শিশুপালন, গুরুজনের সেবা প্রভৃতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুমোদিত বহুবিষয় গৃহিণীপনা শিক্ষা করিতে হইবে; সেই সঙ্গে গৃহস্থাশ্রমীর ন্যায়ানুমোদিত যাবতীয় কর্ম্মই রমণীর কর্ত্তব্য। রমণীর উপর জ্ঞান বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও অর্থোপার্জ্জনের ভার অর্পণ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে।

"শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের" পক্ষ হইতে মাননীয় জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহাশয় বর্ত্তমান বঙ্গে নারীশিক্ষার অভাব অনুভব করিয়া স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে একটি প্রস্তাব সাধারণ সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমরা প্রসঙ্গানুরোধে এই স্থলে সেই প্রস্তাবটী উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি:—

"অধুনা স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নূতন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই উহার অভাব অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর একাঙ্গ অবশ হইলে যেমন সমস্ত শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে, আমাদের সমাজ শরীরও স্ত্রীশিক্ষার অভাবে তেমনি ব্যবহারাক্ষম হইয়া আছে; পুরুষের সুশিক্ষাও কোন কাজে লাগিতেছে না। কারণ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লইয়াই সমাজ, কাহাকেও বাদ দিবার উপায় নাই। কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র ও কর্ত্তব্য সীমা স্বতন্ত্র বলিয়া উভয়ের শিক্ষা প্রণালীও বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক। যাহাতে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নামের যোগ্য হয়, যে উপায়ে বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া উপযুক্ত রূপে কার্য্যে পরিণত হইবার উপযোগী হয়, যাহাতে বর্ত্তমান

স্ত্রীশিক্ষা তাহার সঙ্কীর্ণ গতি ছাড়াইয়া সমুদায় সমাজে ব্যাপ্তি লাভ করে ও অন্তঃপুরবর্ত্তীনী স্ত্রীলোকদিগেরও সুশিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করা এক্ষণে আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে স্ত্রীশিক্ষার যে অত্যল্প আয়োজন ও অনুষ্ঠান আছে, তাহা আশানুরূপ ফলদান করিতেছে না। তাহার কারণ প্রথমতঃ সে গুলি সামান্য ও সঙ্কীর্ণ; সমস্ত সমাজকে নিয়মিত করিবার পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ সম্প্রদায় বিশেষের অনুকূল হইলেও বিস্তৃত হিন্দুসমাজের সংস্কার সাধন পক্ষে কোনমতেই যথেষ্ট নহে। তৃতীয়তঃ অধিকাংশ স্থলেই সেগুলি সুশিক্ষার উপায় না হইয়া পরন্তু অশিক্ষা বা কুশিক্ষারই হেতুভূত। এই সকল কারণে শিক্ষা স্রোতহীন শৈবালাক্রান্ত বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় সাধারণের ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষার যে সকল সহজ উপায় ছিল, তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। কীর্ত্তন, কথকতা, পুরাণপাঠ, ভাগবৎব্যাখ্যা, যাত্রা, পাঁচালি, ব্রতাদি পালন প্রভৃতি যে সকল উৎকৃষ্ট উপায়ে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা শিক্ষার অবকাশ পাইতেন, তাহা লুপ্তপ্রায়, তৎপরিবর্ত্তে এক্ষণে সাধারণতঃ থিয়েটার গমন ও নভেল পাঠ শিক্ষার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। রন্ধন, আলিম্পন, গুরুজনের সেবা, রোগীর শুশ্রূষা, অতিথিসৎকার, প্রভৃতি হিন্দুরমণীর নিত্য ও নৈমিত্তিক গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য সকল এক্ষণে অনেক পরিমাণে অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

অবরোধ প্রথা অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের লজ্জা ও বিনয় রক্ষণ পক্ষে সমধিক উপযোগী বলিয়া হিন্দু সমাজে উহা এতাবৎকাল প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রদায় বিশেষ আজকালকার পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী শিক্ষার পক্ষপাতী হইলেও সাধারণে ইহার প্রতিকূল; ফলে স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া সঙ্কীর্ণসীমানায় আবদ্ধ আছে। যাহাতে অবরোধ প্রথা অক্ষুন্ন রাখিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে, সহজেই স্ত্রীশিক্ষা হিন্দুসমাজে বিস্তৃতি লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে। দেশে বালিকাদের শিক্ষার জন্য যে কয়েকটী বিদ্যালয় আছে, তাহাতে পুরুষ শিক্ষকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। যে সকল অভিভাবক বালিকাদিগকে তথায় শিক্ষার্থ পাঠাইয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ৩।৪ বৎসর মাত্র বালিকাদের তথায় রাখিয়া শিক্ষাকার্য্য সমাপ্ত করেন। কারণ এ দেশে সচরাচর ১২ বৎসরের পূর্ব্বে মেয়েদের বিবাহ হয়, সুতরাং বিদ্যালয় শিক্ষা তৎপূর্ব্বেই বাধ্য হইয়া বন্ধ করিতে হয়। যাহাতে এই শিক্ষা উপযুক্ত কাল পর্য্যন্ত

চলিতে পারে; তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, শিক্ষকের স্থানে এরূপ শিক্ষয়িত্রীর ব্যবস্থা করিতে হয়, যাঁহারা গৃহে গৃহে গিয়াও অন্ততঃ শিার্থিনীদের শিক্ষা ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম মিশনারিদিগের অপেক্ষা সুন্দরতর উপায়ে শিক্ষার সুব্যবস্থা হইতে পারে, অথচ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভের আপত্তির কারণও অন্তর্হিত হয়। এমন কি ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশেও শিক্ষয়িত্রী দ্বারা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে; উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে পুরুষ অধ্যাপকে কোন কোন বিষয়ে অধ্যাপনা করেন মাত্র।

এই শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করনই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয় কার্য্য। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী পাইলে, স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ব্যাপার অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইয়া আইসে এবং অতি অল্প আয়াসেই স্ত্রীশিক্ষা সমস্ত হিন্দুসমাজে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। এমন একটি "স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী পাঠশালা" স্থাপন করা উচিত, যাহাতে অনাথ বিধবা বর্ষীয়সী ও উচ্চবংশীয় স্ত্রীলোকগণ উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষাদানের উপযুক্ত হইতে পারেন। তাহা হইলে একই উপায়ে তাঁহাদের নিজেদের সদুপায়ে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থিনী দিগেরও সুশিক্ষার ব্যবস্থা উভয়ই সংসাধিত হইতে পারে। অবশ্য এই সকল শিক্ষার মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের সনাতন প্রথানুযায়ী যাবতীয় সুশিক্ষার ব্যবস্থা থাকে, যাহাতে তাঁহারা গর্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে অধিকতর উপযোগিনী হইতে পারেন, যাহাতে সন্তানের শিক্ষাকার্য্যে অধিকতর উপযুক্ত হইতে পারেন, এবং একাধারে গৃহিণী ও মাতৃপদ অধিকার করিয়া হিন্দুসমাজ ও হিন্দুগৃহকে কল্যাণে ও পবিত্রতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারেন।

সাহিত্য, ললিতকলা, অল্লাধিক ইতিহাস ও ভূগোল, বিজ্ঞান, সামান্য কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত অঙ্কশাস্ত্র, সীবন, অলিম্পন, রন্ধন প্রভৃতি প্রয়োজনীব শিক্ষা সকল যাহাতে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার পথে সাহার্য্য করিতে পারে এবং সর্ব্বোপরি নৈতিকশিক্ষার এমন সুব্যবস্থা থাকে, যাহাতে তাঁহারা আর্য্য ঋষিগণের বিধি বর্ণিত গৌরবময়ি আর্য্য নারীর মহিমা লাভের উপযুক্ত শিক্ষালাভে বঞ্চিত না হন।

এই সকল অভাব কিয়ৎ পরিমাণে মোচন করিবার নিমিত্ত একটি নির্দ্দিষ্ট উপায় অদ্য শিক্ষিত সুধিগণের সম্মুখে আমরা উপস্থাপিত করিতেছি, সুবিচার পূর্ব্বক সকলে এই পথটিকে গন্তব্য পথে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করুন।

(ক) পূণ্যতীর্থ কাশীধামে (১) কাশী বিধবাশ্রম-যেখানে আশ্রয়হীনা কুল-কামিনীগণের নিমিত্ত আশ্রয় স্থান, ভোজন স্থান এবং সৎশিক্ষা প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকিবে, এই সকল রমণীর মধ্য হইতে যাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ করিতে পারিবেন, তাঁহারাই শিক্ষায়িত্রী হইয়া সমাজ উন্নতি, স্ত্রীশিক্ষা এবং ধর্মপ্রচার করিতে পারিবেন। (২) কাশী বিধবাশ্রম ও শিক্ষায়িত্রীশালা আশ্রম নামে একটি বিধবা পালন ও স্ত্রীশিক্ষায়িত্রী পাঠশালা স্থাপিত হইবে, তাহাতে দরিদ্র, বিধবা ও অনাথা বর্ষীয়সী সদ্বংশজা রমণীরা শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিবেন।

(খ) বিশুদ্ধ হিন্দুভাব ও সনাতনধর্ম্মের আদর্শ ইহাতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইবে। এবং কেবল স্ত্রী উপযোগী শিক্ষাই দেওয়া হইবে।

(গ) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার স্থাপনা হইবে। হিন্দু-জাতির বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কর্তৃপক্ষগণ এই ধর্ম্ম কার্য্যের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব উক্ত মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার স্থাপনা হইবে।

(ঘ) ইহার সম্পাদকের নাম পরে প্রকাশিত হইবে।

(ঙ) এই আশ্রমের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ লইয়া পরিদর্শক সমিতি (কার্য্য আরম্ভ হইলে এই সমিতি গঠিত হইবে) অর্থাৎ একটী Cenetral Committee নির্ব্বাচিত হইবে, এবং কাশীতে উক্ত আশ্রম পরিদর্শনার্থ একটী Sub Committee নির্ব্বাচিত হইবে।

(চ) সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, ও আদর্শ জীবনী, ভূগোল, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, সীবন আলিম্পন রন্ধন, পৌরাণিক ইতিবৃত্ত, নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা ব্রতাদিপালন শিক্ষা, প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়।

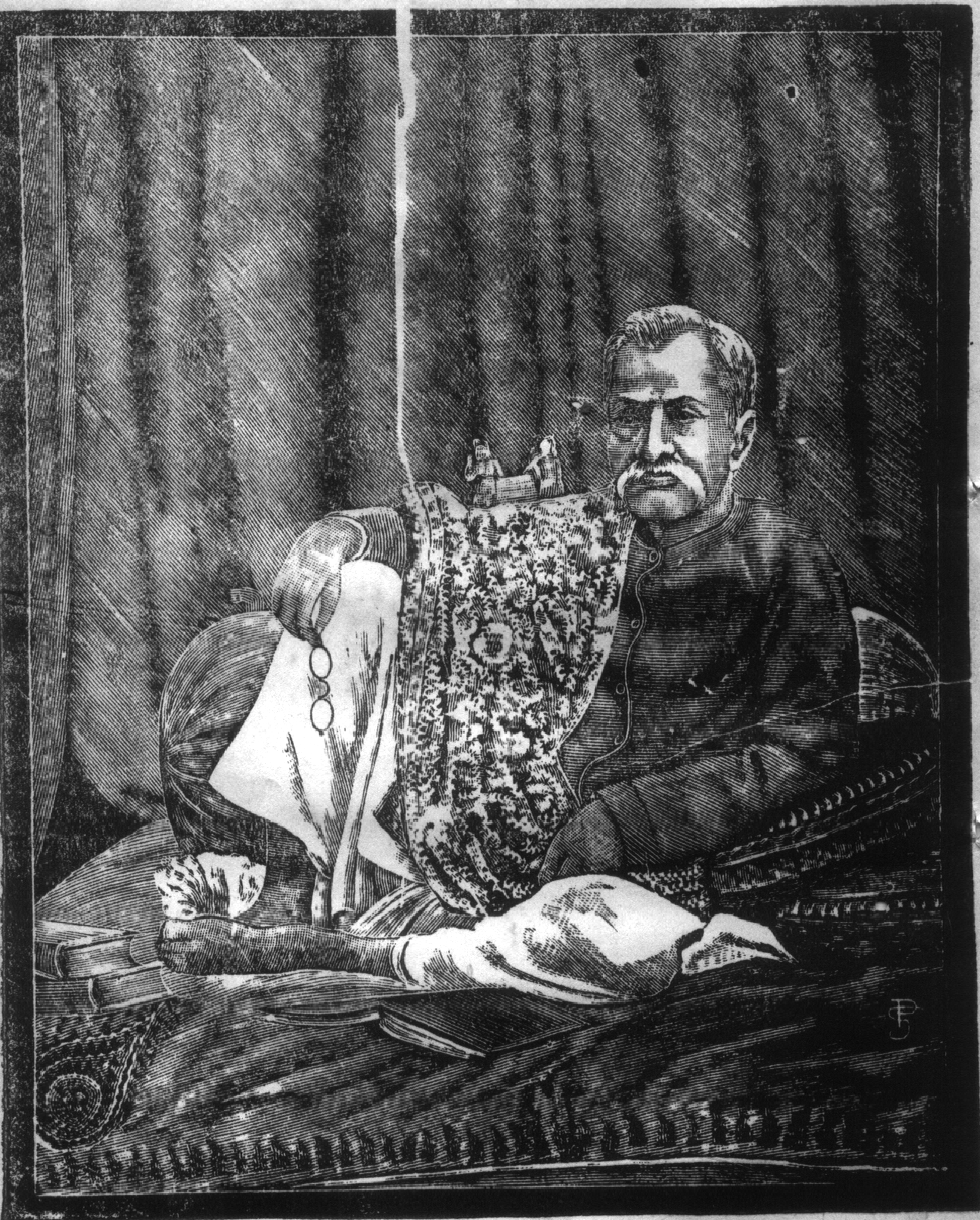
সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী, মৈত্রেয়ী, গার্গী, খনা, লীলাবতী, প্রভৃতির যে দেশে জন্ম, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নত:" যে দেশের বাক্য, সে দেশের বালিকাগণ কি সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে না, এবং দেশের অভিভাবক ও মুখপাত্রগণ কি সে আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে নিষ্ঠার সহিত সচেষ্ট হইবেন না?

কয়েক বৎসর হইল, কর্ণাট নিবাসিনী অসাধারণ সৎবিদ্যাবিভূষিনী পরম পূজনীয়া স্বর্গীয়া মাতাজী ঠাকুরাণী এই মহানগরীর ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে "মহাকালী পাঠশালা" নামে কয়েকটি পাঠশালা স্থাপন করিয়া আমাদের বালিকাগণকে যেরূপ শিক্ষাদান করিবার উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন,

তাহা আমাদের সবিশেষ আনন্দপ্রদ। "মহাকালী পাঠশালায়"—সুশিক্ষা-দানের সঙ্গে সঙ্গে দেব দেবীর পূজা পদ্ধতি বিশুদ্ধ স্তোত্র পাঠ গুরুজনের প্রতি ভক্তি শিষ্টাচার, মিষ্টভাষ রন্ধনাদি গৃহকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐপ্রণালী বিশেষ আদরণীয়। ঐ প্রণালীতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সুশিক্ষা দান করিলে, বিশেষ উপকার লাভ হইতে পারিবে। ঐ সঙ্গে বহুল পরিমাণে সীবন কার্য্য শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। বালিকারা ব্যাকরণ দুরন্ত সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিয়া পণ্ডিতবর্গের সহিত বিচার করিতে শিখুক; তাহা আমাদের বাঞ্ছনীয়, নহে। বাঙ্গালির মেয়েরা বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় বাক্যালাপ করিয়া সকলের নিকটে বিনম্রভাব প্রদর্শন করিলেই আমরা তুষ্ট হইব।

পুত্রহারা জননী।

কে তুমি দুখিনী, চেয়ে আকাশের পানে,
ফেলিছ নয়ন বারি কি বেদনা প্রাণে ?
সুধালে না কথা কও, আপনা ভুলয়ে রও ;
কি যাতনা তব প্রাণে বুঝিব কেমনে।
বুঝিয়াছি পাগলিনী, পুত্রহারা কাঙ্গালিনী,
তাই তুমি ভাষিতেছ বিষাদ-সলিলে॥
শুনায়ে কুহক বুলি, পুত্র তব গেছে চলি ;
দলি আশালতা, ছিঁড়ি স্নেহের-বন্ধন।
কত আশা ছিল মনে, পুষেছিলে স্বযতনে,
সকলি কালের হাতে দিলে বিসর্জ্জন॥
মা বলে ডাকে না আর, করে না সে আবদার,
আকাশের চাঁদ ধ'রে দিতে হবে বলি।
মনে হলে সবকথা, অন্তরে উপজে ব্যাথা ;
যাও এবে সেই সব সুখস্বপ্ন ভুলি॥
নিয়তির কর্ম্মফলে, সকলেই যায় যে চলে ;
ফেরেনাকো একবার এ জীবনে আর।
ধৈরজ ধরহ মনে, ভুলে যাও বাছাধনে ;
কি ফল লভিবে বল করি হাহাকার॥
দেখিতেছ এ জগতে, কে না জ্বলে এ জ্বালাতে ;
পুত্রহারা কত মাতা করেন রোদন।
কিন্তু জল-বিম্বপ্রায়, জলেতে মিশায়ে যায়,
তাইবলি কেঁদনা মা, শান্ত কর মন॥



স্বর্গীয়

মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর

কে, সি, এস, আই।

শোকোচ্ছ্বাস।

লেখক, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত।

হায় একি আজি শুনিনু হঠাৎ।
বিনা মেঘে যেন অশনি-পাত ॥
কার মুখ হেরি উঠিনু আজ।
কেন না সে মুণ্ডে পড়িল বাজ॥
(অহো !)—বড় মহারাজ জগতে নাই !
(হায় !)—যতীন্দ্রমোহন জগতে নাই !!!
সে মুরতি আর হেরিব নাই !
মধুর মূরতি হেরিব নাই !
(সেই)—প্রসন্ন মূরতি হেরিব নাই !
সস্মিত সে মুখ হেরিব নাই !
এ জগতে আর হেরিব নাই !
কি বড় বিষম বিপদ ভাই !!!

আঁধারি প্রাসাদ আঁধারি তাবৎ।
আঁধারি ভারত আঁধারি জগৎ ॥
আঁধারি কুমার আত্মীয় জন।
আঁধারি সবার হৃদয় মন॥
উপবনে করি কণ্টক বন।
গিয়াছেন চলি হৃদয় ধন ॥
(অহো !)—বড় মহারাজ জগতে নাই !
(হায় !)—যতীন্দ্রমোহন জগতে নাই !!!
সে মুরতি আর হেরিব নাই !
মধুর মূরতি হেরিব নাই !
(সেই)—প্রসন্ন মূরতি হেরিব নাই !
সস্মিত সে মুখ হেরিব নাই !
এ জগতে আর হেরিব নাই !
কি বড় বিষম বিপদ ভাই !!!

যতীন্দ্রমোহন জগতী-মোহন।
বিপুল বঙ্গের অমূল্য রতন॥
ভারত-মাতার ভাস্বর ভূষণ।
মহীমণ্ডলের মহামূল্য ধন॥
এ জগতে আর নাহিক এখন !!!
(অহো !)—বড় মহারাজ জগতে নাই !
(হায় !)—যতীন্দ্রমোহন জগতে নাই !!!
সে মূরতি আর হেরিব নাই !
মধুর মূরতি হেরিব নাই !
(সেই)—প্রসন্ন মূরতি হেরিব নাই !
সস্মিত সে মুখ হেরিব নাই !
এ জগতে আর হেরিব নাই !
কি বড় বিষম বিপদ ভাই !!!

সম্রাট-পূজিত সমাজ-নেতা।
বিধবা-বান্ধব দরিদ্র-ত্রাতা॥
বড় মহারাজ জগতে নাই !
সে মূরতি আর হেরিব নাই !!!
ইত্যাদি।

দয়ার সাগর উদার মতি।
গুণের আগার বিনয়ী অতি॥
যতীন্দ্রমোহন জগতে নাই।
সে মূরতি আর হেরিব নাই !!!
ইত্যাদি।

স্বধর্ম্ম-তৎপর সমাজপতি।
শাস্ত্র-আলোচনে সদাই রতি॥
বড় মহারাজ জগতে নাই !
সে মূরতি আর হেরিব নাই !!!
ইত্যাদি।



মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত প্রোত্যোতকুমার ঠাকুর বা

কে, সি, এস, আই।

সঙ্গীতে নিপুণ সুকবি অতি।
পর-উপকারে সদাই ব্রতী॥
যতীন্দ্রমোহন জগতে নাই।
সে মূরতি আর হেরিব নাই!!!
ইত্যাদি।

পণ্ডিতমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত।
গায়ক-বাদক সভাধিষ্টিত॥
(অহো!)—বড় মহারাজ জগতে নাই।
(হায়!)—যতীন্দ্রমোহন জগতে নাই!!!
সে মূরতি আর হেরিব নাই!
মধুর মূরতি হেরিব নাই!
(সেই)—প্রসন্ন মূরতি হেরিব নাই!
সস্মিত সেমুখ হেরিব নাই!
এ জগতে আর হেরিব নাই!
এ বড় বিষম বিপদ ভাই!!!

সকলের প্রিয় সকল-সার।
জগতে কভু কি হেরিব আর!!
হায় আজি একি হলো আমার।
ভাল কিছু নাহি লাগিছে আর॥
যতীন্দ্র বিহনে সব আঁধার!
আঁধার! আঁধার!! সব আঁধার!!!
হৃদয়-উচ্ছ্বাস এই শোক-উপহার।
লহ কৃপা করি স্যার প্রদ্যোতকুমার॥
২৫শে পৌষ—১৩১৪।

এবে মহারাজ মহারাজের কুমার।
এবে মহারাজ স্যার প্রদ্যোতকুমার॥
পিতৃগুণে বিভূষিত প্রদ্যোতকুমার।
পরম সুন্দর যেন সাক্ষাৎ কুমার॥

নবীন বয়স কিন্তু জ্ঞানেতে প্রবীণ।
বুদ্ধিতে প্রবীণ কিন্তু উৎসাহে নবীন ॥
সদা হাস্যমুখ সদা অমিয়-বচন।
সুন্দর প্রকৃতি সদা স্নিগ্ধ দরশন ॥
রাজনীতি-বিশারদ বহুগুণাকর।
সুহৃদ-রঞ্জনে সদা যথেষ্ট তৎপর ॥
রূপ গুণ বদান্যতা জ্ঞান আর মান।
একাধারে প্রদ্যোতকুমারে বিদ্যমান ॥
মহারাজ পুত্রসম পাল প্রজাগণ।
যথাযোগ্য সম্ভাষ আত্মীয়বন্ধু জন ॥
কর দান পাত্র আর সামর্থ্য সম্মত।
থাক সদা পর উপকার কর্ম্মে রত ॥
সত্ত পুত্র পিতার সমান গুণবান।
[illegible]শ তোমারে সদা করুন কল্যাণ ॥
পিতার অধিক তুমি হও গুণবান।
সুস্থ কলেবরে কর ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ॥
মনে করি নিজে যাহা করেছ স্বীকার।
পূর্ণকর এবে, এই প্রার্থনা আমার ॥
যশোধর্ম্ম এতে তব হবে দ্বিগুণিত।
সাহিত্য জগতে রবে চির বিরাজিত ॥
আমিও কৃতার্থ হব পূর্ণ-মনস্কাম।
করিবে তোমারে কৃপা নবঘনশ্যাম ॥
অধিক কি কব আর তুমি বুদ্ধিমান।
কর বিবেচনা করি, হইবে কল্যাণ ॥
কমলার বরপুত্র তুমি গুণবান।
বুদ্ধিমান জ্ঞানবান বিদ্বান শ্রীমান ॥
তোমায় অধিক কি করিব নিবেদন।
কৃপা করি কর যাহা লয় তব মন ॥

৫ই মাঘ,—১৩১৪ সাল।

মিস্ লুসিয়া।

এই কুমারিটী পরমা সুন্দরী। যে দেশে তাঁহার জন্ম, সে দেশের রূপ বর্ণনার যে প্রকার পদ্ধতি, আমরা তাহার সীমা লঙ্ঘন করিব না। কি বলিয়া রূপ বর্ণনা করিব? স্বর্ণকেশী, নীলনেত্রা, হংস গ্রীবা, বিম্বাধরা, শুভ্র প্রস্তরবর্ণা, শুভ্রবসনা, মুক্তাদশনা, অন্য পক্ষে গজেন্দ্রগামিনী, মধুরভাষিনী।

লুসিয়া যখন যৌবনে প্রথম পদার্পণ করে, সেই সময় তাহার পিতৃবিয়োগ হয়, শুভ্রবসনা সেই সময় কৃষ্ণবসনা হইয়াছিল। ছয়মাস পরে মাতৃবিয়োগ। হিন্দু বিধবার ন্যায় অন্যান্য বিধবাগণের একাদশীর যাতনা নাই, তথাপি লুসিয়ার জননী ছয়মাসের অধিক বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করেন নাই। লুসিয়া তাঁহাদের একমাত্র কন্যা, বার্ষিক অন্যূন সহস্র পাউণ্ড উপস্বত্বের পৈত্রিকসম্পত্তির লুসিয়াই অধিকারিণী হয়।

এই সময় হইতে লুসিয়ার পানিগ্রহণ আকাঙ্ক্ষী হইয়া অনেকগুলি যুবাপুরুষ আগ্রহে আগ্রহে বর হইবার উমেদারি করিতে থাকে। আমাদের দেশের কবিরা স্বর্গীয় অপ্সরাদের সঙ্গে সুন্দরী কামিনীদের উপমা দেন, লুসিয়ার প্রেমাকাঙ্ক্ষিরা লুসিয়াকে বলিত স্বর্গের এঞ্জেল। লুসিয়া কিন্তু সেই সকল উমেদারের মধ্যে একজনকেও মনোনীত করে নাই। লুসিয়ার বয়ঃক্রম তখন চতুর্দ্দশ বর্ষ। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে কুমারি লুসিয়া অনেক পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

সুমধুর সপ্তদশী, বিদ্যাধরি সাদৃশী লুসিয়ার পানিগ্রহণ করিবার অভিলাষে একজন প্রতিপাত্তশালী সুশিক্ষিত রূপবান চিকিৎসকউমেদার হন; প্রায় মাসাবধি উপাসনা করিয়া, "আমার হও আমার হও" বলিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া, কুমারির চন্দ্রবদন হইতে চমৎকার উত্তর পাইয়াছিলেন। লুসিয়া বলিয়াছিল, "তুমি ডাক্তার, তোমার হৃদয়ে দয়ার অধিকার অল্প, নিতান্ত দারিদ্র রোগীকেও তুমি কণামাত্র দয়া দেখাও না, অর্থই তোমার উপাস্য দেবতা; ঈশ্বর প্রসাদে দয়া আমার চির সঙ্গিনী,—চির আদরিণী;—বুঝিয়া দেখ, উভয়ের স্বভাবে কতদূর বৈপরীত্য; অতএব ক্ষমা কর, আমি তোমাকে পানিদান করিতে পারিব না।"

ডাক্তারটী হতাশ হইবার পর, একজন সদ্বক্তা আইন ব্যবসায়ী পরম উৎসাহে উমেদারি করেন। তাঁহার মন্ত্রগুলির সদ্ উত্তরে লুসিয়া বলিয়াছিল, "আপনি আইন ব্যবসায়ী সম্ভ্রান্ত (হয়ত অজ্ঞানত) আপনাকে মিথ্যা মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়া আশাতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে মিথ্যাকে সত্য

সপ্রমান করিবার জন্য আপনাকে প্রাণপণে লড়াই করিতে হয়; আমি জন্মাবধি মিথ্যা কথা শিখি নাই, অতএব আপনি আমার পতি হইবার অযোগ্য। লোভ দেখাইয়া হয়ত আপনি বলিবেন, আপনি প্রচুর ধনরাশির অধিশ্বর; কিন্তু জানিয়া রাখুন, আমি প্রচুর অর্থের অভিলাষিনী নহি।"

তৃতীয় উমেদার একজন ধর্ম্ম জাজক। প্রেম গদ্‌গদ্ স্বরে তিনি বলিয়াছিলেন, "একটি বার বল, তুমি আমার হইবে; তোমার সুধা মুখে সেই কথাটি শুনিলেই আমি তোমাকে ইহ-পরলোকের নিত্য সুখ সমর্পণ করিব।" মুখে এই সকল কথা বলিয়া, তিনি বারম্বার প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়া ছিলেন।

লুসিয়া বলিয়াছিল, "আপনি মুক্তি মন্ত্রদাতা ধর্ম্ম পুরোহিত ধর্ম্মমন্দিরে বেদীসংস্পর্শে অধিষ্ঠিত হইয়া বৈবাহিক মন্ত্রে নব নব দম্পতির মিলন করিয়া দেন, ইহলোকের ও পরলোকের সুখের ব্যবস্থা বলিয়া দেন, কিন্তু আপনার নিজের ইহলোকের ধর্ম্ম কতদূর অনুষ্ঠিত হইতেছে, পরলোকের জন্য কি সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন, তাহা আপনি জানেন না। ঈশ্বরের বেদীর সম্মুখে যে ভঙ্গিতে বসিয়া উপাসনা করেন, একটা সামান্য স্ত্রীলোকের জন্য সেই ভঙ্গিতে বসিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিবাহ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। কপটতাকে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে ঘৃণা করি, আপনাকে আমি বিবাহ করিতে পারিব না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি লুসিয়ার বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই? প্রথম প্রত্যাখ্যাত হইয়াছ, পঁচিশজন; তাহারা অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উমেদার পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হইলেন, তিনজন উচ্চ শ্রেণীর বিদ্বানযুবক; এমন অবস্থায় কোন শ্রেণীর পাত্রের সহিত তবে আর বিবাহ হওয়া সম্ভব?—এ প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারি না। বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে কি না, সে কথা লুসিয়া নিজ মুখে না বলিলে, কাহার সাধ্য কে বলিবে? একজনের ইচ্ছার কথা অপরে বলিতে পারে না, অপরে জানিতে পারে না।

লুসিয়ার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বর্ষ। একদিন অপরাহ্নে লুসিয়া আপন বাসভবনের সম্মুখস্থ কুসুম উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছে, বিবিধ বর্ণের বিবিধ কুসুম বিকশিত হইয়াছে, সমীরণ সেই স্বর্গীয় কুসুমের সৌরভ হরণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, বিহঙ্গ কুল সেই সুবাসের সহিত সুমধুর স্বর লহরী মিশাইয়া অন্তঃরিক্ষে পথে উড়াইয়া দিতেছে, এমন সময় একটি রূপবান যুবা সেই পুষ্প উদ্যানের ফটকের দ্বারে দণ্ডায়মান।

কুমারি অন্য-মনস্ক হইয়া বিনম্রবদনে পাদচারণ করিতেছিল, দৃষ্টি ছিল ভূমির দিকে ; প্রস্ফুটিত প্রসূনের সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর যেমন সেইদিকে উড়িয়া উড়িয়া যায়, লুসিয়ার নয়ন রূপ ভ্রমর দুটী সেই রূপে এক একবার পক্ষ উত্তোলন করিয়া এক একটি সুন্দর ফুলের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, সহসা সেই নেত্র সম্মুখস্থ কণ্টকের দিকে বিনিক্ষিপ্ত।

কণ্টকের নিকটেই সেই যুবা। সকৌতুকে মন্থর গতিতে নিকটে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া মধুর বচনে কুমারি জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি যুবক, অনিমিষে এদিকে চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিতেছ ? এই উদ্যানে কি তোমার বেড়াইতে ইচ্ছা হয় ?—যদি হয়, দ্বার অনাবৃত আছে, প্রবেশ করিতে পার।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব উমেদারগণকে হতাশ করাতে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, কুমারি লুসিয়া নিতান্ত মদগর্ব্বে পরিক্ষিতা ; কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, গর্ব্ব নহে, নারী-গৌরব। গর্ব্বই হউক, অথবা গৌরবই হউক, এখন কিন্তু ভাবান্তর। একজন আগন্তুক যুবা পুরুষকে বিজন উপবনে প্রবেশ করিবার অনুমতি।

যুবকের হৃদয় প্রেমানন্দে নাচিল। সুমধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণে তাহার কর্ণ জুড়াইল, প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ পুলকিত হইল ; সে তৎক্ষণাৎ প্রহৃষ্ট চিত্তে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল।

আগন্তুকের সহিত যে ভাবে আলাপ করিতে হয়, কুমারি সেই ভাবে অভ্যর্থনা করিয়া যুবার সহিত যথাসম্ভব মিষ্ট সম্ভাষণ করিল।

আনন্দের উপর অতুল আনন্দ। উভয়েবাক্যালাপ করিতে করিতে কুসুম কাননের পরিষ্কার বর্ত্মে বর্ত্মে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, কুসুম সৌরভ তাহাদের নাসারন্ধ্র আমোদিত করিয়াছিল, সুবাসিত সুশীতল সমীরণ তাহাদের অঙ্গ শীতল করিল।

থাকিয়া থাকিয়া কটাক্ষ বিক্ষেপে উভয়ে উভয়ের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কে যে কি বুঝিল, তাহাদের চক্ষুই তাহা বলিতে পারে। প্রায় দশ মিনিট কাল উভয়েই মৌন। সহসা মৌন ভঙ্গ করিয়া লুসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সহচর পাইলে সম্ভাষণ করিতে হয় ; তোমাকে আমি কি বলিয়া সম্বোধন করিব ?

হর্ষ কম্পনে কম্পিত হইয়া সকৌতুকে যুবা উত্তর করিল, "হনিমুন।"

অলক্ষিতে হাস্য করিয়া লুসিয়া বলিল, "সম্বোধনে বিশেষত্ব আছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ আমি ভাল বুঝি না, বর্ত্তমান ভাবেই আমার চিত্ত বিভোর।"

প্রশান্ত বদনে যুবা বলিল, যদি ইচ্ছা হয়, মানিয়া লও, উহাই বর্ত্তমান।

লুসিয়া যে দিকে সারি সারি পুষ্পতরু, সেইদিকে গমন করিয়া গুটিকতক সুন্দর সুন্দর কুসুম চয়ন করিল।

যেখানকার যুবা, যেন প্রস্তর মূর্ত্তির স্থায় ঠিক সেই খানেই স্থির। ফুলগুলি হস্তে লইয়া, ফিরিয়া আসিয়া, লুসিয়া সেই যুবার হস্তে সেই গুলি সমর্পণ পূর্ব্বক আধ আধ স্বরে বলিল, দেখ দেখি হনিমুন, এই ফুলগুলি কেমন ?—

নাশাগ্রে পুষ্পস্পর্শ করিয়া হনিমুন বলিল, ভাল নয়।

মুখ ভারি করিয়া লুসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া, অকস্মাৎ কুমারি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি বিবাহিত ? নিশ্বাস-ফেলিয়া যুবক উত্তর করিল, সে সুখ বোধ হয় আমার ভাগ্যে নাই।

আফিসের আমি একজন ক্লার্কমাত্র ; নির্ধন ক্লার্ককে বিবাহ করিতে কোন কামিনী ইচ্ছা করে ?

সচকীতে যুবার মুখপানে চাহিয়া লুসিয়া বলিল, ফুলগুলি আমাকে দাও ; আর বেলা নাই, দিনকর প্রায় অস্তগত, চল ফিরিয়া যাই।

বেহুলা।

লেখক, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

কার শাপ ফলিল কে মোরে দিল গালি।
বংশে কেহ না রহিল দিতে জলাঞ্জলি ॥
সনকা কান্দিয়া দেয় বেহুলাকে গালি।
সিঁতার সিন্দুরে তোর না পড়িল কালি ॥
পরিধান বস্ত্রে তোর না ধরিল মলি।
পায়ের আলতা তোর না পড়িল ধূলি ॥
খণ্ড কপালিনী তুই চিরুণদাঁতী।
বিভা দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি ॥

পুত্রের নিধনবার্ত্তাশ্রবণে চাঁদ উন্মত্তের স্থায় হইলেন, মনসার কোপে উপর্য্যুপরি ছয় পুত্রের বিনাশ সাধন হইয়াছে, পুত্রশোকে তাঁহার অস্থি ছিদ্রময় হইয়া গিয়াছে, প্রাণমাত্র আছে, তাহার পোষণ নাই; দেহমাত্র আছে, তাহাতে শক্তি সম্বন্ধ নাই, মন আছে সংযম নাই—হর্ষবিষাদের যুগপৎ আবির্ভাবে চাঁদ আত্মহারাঃ—

নেড়া গিয়া ধাইয়া বলে শুন সদাগরে।
দুর্ল্লভ নখাই মৈল লোহার বাসরে॥
শুনিয়া যে চাঁদ বেণে হরষিত হইল।
স্কন্ধে হেঁতালের বাড়ী নাচিতে লাগিল॥
ভাল হৈল পুত্র মৈল কি তার বিষাদ।
চেঙ্গমুড়ি কাণী সনে ঘুচিল বিবাদ॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, চাঁদ মনসার দেবত্ব স্বীকার করিতেন না—তাঁহাকে চেঙ্গমুড়ী-কাণী বলিয়া গালি দিতেন।

পুত্রশোকে অধীর সনকার রোদন বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ কোমল প্রকৃতি-তাহাতে নিদারুণ পুত্রশোকে দুটী একটী নয়, ছয়টী পুত্রের শোক, তাহার পর একটী পুত্রলাভ, দুঃখের সূচীভেদ। অন্ধকারমধ্যে একটী দীপশলাকা,-তাহাই নিভিল; যেন মুমূর্ষুর দেহে খড়্গাঘাত, অথবা দাবদগ্ধা হরিণার উপর বজ্রপাত হইল:—

পুত্রের মরণ শুনি, বজ্রাঘাত মনে গণি,
সনকা কান্দয়ে উভরায়।
পুত্রসম নাহি স্নেহ, প্রবোধিতে নারে কেহ,
তার তিশা কি দিলে জুড়ায়॥
মনসা হইল বাম, সোণার নখাই নাম,
পুত্র মৈল লোহার বাসরে।
যত কিছু মনে ছিল, বিধি তাতে বিড়ম্বিল,
পাপ মুখ দেখাইব কারে॥
তোমার বিষম হট, ভাঙ্গিলে দেবীর ঘট,
অবিরত ভাবে দেহ গালি।
আগে ছয় পুত্র মৈল, তবে সে নখাই হৈল,
হেন পুত্র কারে দিনু ডালি॥
দেবমন্যু মনস্তাপে, সাত-পুত্র-খাইল সাপে,
আমি বড় তাপের তাপিনী।
দেবতা-সহিত বাদ, কত কৈনু অপরাধ,
পাপচক্ষে তাঁরে নাহি চিনি॥

নিদারুণ পুত্রশোকে, মুখ দেখাইব কাকে,
বড় লাজ হইল আমার।
সাতপুত্রশোকে আমি, পাইলে প্রবেশি ভূমি,
কমিবে ক্ষিতির মহাভার॥
ধূলায় লোটায় রামা, কান্দে মনে নাহি ক্ষমা,
ছার খার মাথার কুন্তল।
না কান্দ না কান্দ বলি, কেহ তারে ধরে তুলি,
কেহ তার মুখে দেয় জল॥

বেহুলা সতী সাধ্বী পতিব্রতা পতিগতপ্রাণা, পতিশোকে কাতরা, অসাধারণ মনস্বিনী, আপনার সততায় যারপর নাই বিশ্বাসিনী, প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপে পারেন পতির পুনর্জ্জীবন লাভের উপায় করিবেন, না পারেন-আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিবেন।

বেহুলা কান্দিয়া বলে, প্রাণনাথে লৈয়া কোলে,
জলেতে ভাসিয়া আমি যাই।
দেবী মনসার ছটে, এতেক প্রমাদ ঘটে,
তাহার উদ্দেশ যথা পাই॥
কান্দিয়া বেহুলা কয়, ব্যগ্র হৈয়া অতিশয়,
ঝাট কর কলার মান্দাস।
জীয়াইব মৃত পতি, রাখিব কুলের খ্যাতি,
শুনি নাহি কর উপহাস॥

চরিত্রবল কেবল সততার উপর নির্ভর করে। যাহার চরিত্রবল আছে, সংসারে সেই দেব তুল্য-তাহাকে কিছুতেই বিপন্ন করিতে পারে না। যতই আপদবিপদ উপস্থিত হউক না, সতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আঘাতে তাহা লয়প্রাপ্ত হয়, সততায় মানুষকে নির্ভীক ও নিরাপদ করে। সৎকে সকলে ভয় করে, বেহুলা সতী,—তিনি যমকেও ভয় করিতেন না, তিনি অকাতরে প্রতিজ্ঞা করিলেন, মৃতপতিকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন, একবারও ভয় পাইলেন না, কিরূপ সে অসম্ভব ব্যাপার সম্ভাবিত হইবে, একবার তাহা চিন্তা করিবার অবসরও লইলেন না; ইহা মনের বলশালিত্বের পরিচয়, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপেই হউক, আপনার সাধব্য রক্ষা করিবেন, কিছুতেই বৈধব যন্ত্রণা ভোগ করিবেন না, তাঁহার মনের অসীম সাহস এই যে, যেহেতু তিনি সতী, পতিভিন্ন অন্য চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থানদান করেন না। অতএব ঈশ্বর তাঁহার

সহায় হইবেন, ঈশ্বরের নিয়মাধীনতা প্রযুক্ত মনুষ্য, জন্ম ও জরা-মরণাদির বশীভূত। স্বামীর অকালমৃত্যুনিবারণে তিনি প্রসন্ন হইবেন, তাঁহার কৃপায় সকলই হইতে পারে। বেহুলার এই অসাধারণ বিশ্বাস-ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার ঐশী শক্তির নিকট কিছুই অসম্ভব নহে, তাঁহার ইচ্ছায় সব হয়। তিনি সতের একমাত্র সহায়, তবে কেন না তাঁহার প্রতিজ্ঞারক্ষা হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি শ্বশুরকে বলিলেন,

আমার বচন শুন,　　　কেহ না ভাবিও আন,
　　শুনহ শ্বশুর সদাগর।
নিশ্চয় কহিনু দৃঢ়,　　　কলার মান্দাস (ভেলা) গড়,
　　জীয়াইব কান্ত নখিন্দর॥

যাহাদের আত্মবিশ্বাস নাই, নানা কু-চিন্তায় চিত্ত কুলষিত-তাহারা সদাই সংশয়াকুল। প্রাকৃত স্ত্রীলোকেরা বলিতে লাগিল,—

বেহুলার কথা শুনি,　　　কহে যত কুল-ধনী,
　　কোথায় না দেখি হেন রতি।
দারুণ দেবীর গতি,　　　মরিল তোমার পতি,
　　পুন প্রাণ পায় কদাচিত॥
তুমি শিশু-সীমন্তিনী,　　　জলে ভেসে যাবে কেনি,
　　প্রাণহীন পতি লৈয়া কোলে।
কালসর্প যারে খায়,　　　সে বা কোথা প্রাণ পায়,
　　প্রতীত হ'য়েছ কার বোলে॥
চির-কালের দুঃখিনী,　　　তুমি বড় অভাগিনী,
　　বিধবা হইলে বাল্যকালে।
দেখিয়া তোমার মুখ,　　　বিদরিয়া যায় বুক,
　　অবনী তিতিল চক্ষুজলে॥
নগরের যত লোকে,　　　হাহাকার করে শোকে,
　　দেখিয়া লাগয়ে চমৎকার।
বিষম সাধুর হটে,　　　আমা সবা কিবা ঘটে,
　　ভালর চরিত্র নাহি আর॥
যতেক কুল-কামিনী,　　　বেহুলার কথা শুনি,
　　আপন শ্রবণে দেয় হাত॥

উচ্চ কপালিনী, চিরণদাঁতিনী,
বাসরে খাইলি প্রাণনাথ।
প্রভুশোকে তনু দহে, সর্ব্বলোক তোরে কহে,
তুমি বড় খণ্ড-কপালিনী।
তোরে বিড়ম্বিল ধাতা, বিপরীত কহ কথা,
জলেতে ভাসিয়া যাবি কেনি॥

এই সকল তিরস্কারবাক্যে বেহুলার মনে রাগ হইল না, ইহাও তাঁহার মনের উচ্চতার পরিচয়, প্রাকৃত স্ত্রীলোক হইলে তিনি কটিতে অঞ্চল বাঁধিয়া তাহাদিগকে দশ কথা শুনাইয়া, আপনার সতীত্বগৌরবের গরিমা করিয়া কলহে প্রবৃত্ত হইতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি বিনয়সহকারে বলিতে লাগিলেন,—

কান্দিয়া বেহুলা বলে, প্রাণনাথে করি কোলে,
যাব আমি ছমাসের গন।
পূর্ব্বের সাধনফলে, ঈশ্বরীর অনুবলে,
যদি কান্ত পায় প্রাণদান॥
রাখিয়া কুলের ধর্ম্ম, শত অভিলাষ কর্ম্ম,
ইথে কেহ না করিহ মানা।
নিবেদন অবশেষ, তবে যে আসিব দেশ,
পূর্ণ হবে মনের বাসনা॥
ঘটিল দেবীর দায়, বিধি কি লিখিল তায়,
আমার কপালে কদাচিত।
কলার মান্দাসখানি, মোরে গড়ে দেহ আনি,
তবে সে আমার কর হিত॥

বেহুলার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মন্দার মান্দাশ প্রস্তুত হইল, গাঙ্গুড় নদীর জলে ভেলা ভাসিল। শাশুড়ী সনকা আসিয়া বেহুলাকে বুঝাইতে লাগিলেন,

সনকা কান্দিয়া বলে ওলো অভাগিনি।
এ তিন ভুবন মাঝে কোথাও না শুনি॥
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যার পতি মরে।
বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে॥
কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে।
প্রতীত কাহার বোলে কান্ত জীয়াইবে॥

ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক, মৃত দেহে কখন জীবন সঞ্চার হয় না, মরিলে কেহ কখন বাঁচে না, ইহাই সৃষ্টির সনাতন নিয়ম। বেহুলা তাহার এই মাত্র উত্তর করিলেন—অসম্ভব যে সম্ভব হইবে তাহা অন্তাবধিই বুঝিতে পারিবে,—

বেহুলা বিনয়ে বলে সনকার তরে।
মরা পুত্র জীয়ন্ত পাইবে নিজ ঘরে॥
কড়ার তৈলেতে বামা প্রদীপ জ্বালিয়া।
শাশুড়ীর তরে কহে বিনয় করিয়া॥
কড়ার তৈলেতে দীপ ছ-মাস জ্বলিবে।
তবে সে জানিবে তব নখিন্দর জীবে॥
বাসরের অন্ন তুমি তুলি হেম থালে।
পুতিয়া রাখহ নিয়া দাড়িম্বের তলে॥ ইত্যাদি।

বেহুলা অপ্রবোধনীয়া, অনেকে অনেক বুঝাইল, কিছুতেই কিছু হইল না—সতীর বিশ্বাস স্বামী জীবিত হইবেন. এ বিশ্বাস কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে, এই অনড় অটল বিশ্বাসের বলে প্রহ্লাদ স্ফাটিক স্তম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন, ধ্রুব পদ্মপলাশ লোচন শ্রীহরিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—এরূপ বিশ্বাস সংসারে কয় জনের আছে, যাঁহাদের আছে তাঁহারা ইষ্টলাভে কখন বঞ্চিত নহেন। তাই তিনি পতির পুনর্জীবন লাভে নিশ্চিত হইয়া, শ্বাশুড়িকে বাসরের অন্নমৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত রাখিবার অনুরোধ করিলেন, তাঁহার মনের বিশ্বাস স্বামীকে পুনর্জীবিত করিয়া সেই অন্ন ভোজন করাইবেন, এ বড় সহজ কথা নহে।

যাহা হউক বেহুলা সমাগত সকলের নিকট এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন, যেন তাঁহার পতি জীবিত হয়েন, শ্বশ্রূ সনকার পদতলে পতিত হইয়া নির্ব্বন্ধ সহকারে তাঁহাকে গৃহ প্রতিগমনের জন্য অনুরোধ করিলেন।

বিনয়ে প্রণতি করি সর্ব্বলোক কাছে।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে কান্ত যেন বাঁচে॥
শুনিয়া সকল লোক বিষাদিত মন।
অশ্রুজলে সবাকার তিতিল বসন॥
সনকার পায়ে পড়ি করেন স্তবন।
আর না কান্দিহ ঘরে করহ গমন॥

অতঃপর তিনি মনসা স্মরণে পতির মৃতদেহ কলার ভেলার উপর তুলিয়া লইয়া গাঙ্গুর নদীর স্রোতমুখে ধাবিতা হইলেন। এমন সময় দেবী মনসা শ্বেত

কাকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বেহুলার সমীপবর্ত্তী হইলেন। শ্বেত হস্তী শ্বেত কাক শ্বেত মক্ষি আধুনিক শঙ্খচিলের ন্যায় বড়ই পবিত্র জন্তু বলিয়া প্রাচীন কবিগণের দ্বারা কীর্ত্তিত। অধুনা এ দেশে শ্বেত কাকের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না; জানি না দেশান্তরে আছে কি না। যাত্রাকালে বেহুলা গাঙ্গুর নদী তীরবর্ত্তী চম্পক বৃক্ষ মূলে শ্বেতকাক দেখিয়া তাহার নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেনঃ—

মনসা সহিত বাদ করে সদাগর।
কাল সাপে খাইল মোর কান্ত নখিন্দর॥
প্রাণনাথ লৈয়া কোলে জলে ভেসে যাই।
এক নিবেদন আমি করি তব ঠাঁই॥
জলেতে ভাসিয়া যাই তাহে নাহি তাপ।
অতি দেশ দেশান্তরে আমার মা বাপ॥
এমন ব্যথিত হেথা নাহিক আমার।
আমার বাপের বাটী দেয় সমাচার॥

শ্বেতকাক সম্মত হইল কিন্তু জিহ্বায় ভাষা নাই, কেমন করিয়া সংবাদ জানাইবে। তজ্জন্য বেহুলা পিতৃদত্ত স্বামীর হস্তের অঙ্গুরী তাহাকে নিদর্শন স্বরূপ দিয়া বলিয়া দিলেন—

মাণিক অঙ্গুরী লৈয়া,
নিছনী নগরে গিয়া,
অমলা আমার মায়,
অঙ্গুরী দিওরে তায়,
উড়িয়া বসিও চালে,
জ্ঞান*হইবে সেই কালে,
তথা মোর ছয় ভাই,
কহিও তাঁদের ঠাঁই,
প্রাণনাথ লৈয়া কোলে,
আমি ভেসে যাই জলে,
ভাই বহিনে না হইল দেখা,
দেবী মোর মাত্র সখা॥

* তৎকালে তুমি বাক্‌শক্তি পাইবে, ইহা বলাই কবির উদ্দেশ্য কেন না দেখা যাইতেছে নিছনী নগরে গিয়া কাক ভাষায় সকল কথাই খুলিয়া বলিয়াছিল।

শ্বেতকাক নিছনী নগরে গিয়া অমলার নিকট বেহুলার অবস্থা সম্বন্ধীয় সকল কথাই সবিস্তারে জানাইল, এই দুঃসংবাদ পাইয়া মেলানী ভার লইয়া তিন ভ্রাতা যাত্রা করিল,—

চিপিটক মুড়কী তাহে উত্তম সন্দেশ।
রসাল পানের বিড়া ভোগাদি বিশেষ॥
ডাগর ঝালের লাড়ু চিনি চাঁপা কলা।
তিন ভাই গেল তারা আনিতে বেহুলা॥

সেকালের ইহাই উপাদেয় খাদ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। আর দেখা যায় যে দুঃখে সুখে যে অবস্থাতেই হউক আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা করিতে যাইলেই তৎকালে "মেলানী অর্থাৎ আত্মীয় মিলনের জন্ম সুভক্ষ্য দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে হইত। বেহুলার তিন ভাই চাঁপাতলার ঘাটে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল গৃহে ফিরিবার জন্য অনেক বুঝাইল, সমাগত ব্যক্তিগণও অনেক অনুরোধ করিল, কিন্তু বেহুলার প্রতিজ্ঞা টলিল না, বেহুলা সাশ্রু নয়নে বলিল,

পুনর্ব্বার প্রাণ যদি পায় প্রাণেশ্বর।
তবে সে ফিরিব আমি শ্বশুরের ঘর॥
তোমা সবাকার ঘরে আর নাহি সাজে।
সকল ভাজের সঙ্গে নিত্য দ্বন্দ্ব বাজে॥
দারুণ বিধাতা মোরে কৈল কড়ে রাড়ি।
কত বা ফেলিব নিত্য নিরামিষ হাঁড়ি॥
কহিবে মায়েরে মোরে আশীশ করিতে।
পরিশ্রমে পারি যদি কান্ত বাঁচাইতে॥
বেহুলা বলেন দাদা না কান্দিহ আর।
চাঁপা তলায় পুতি রাখ মেলানীর ভার॥
প্রভুরে জীয়াতে পারি তবে সে আসিব।
খাইয়া মেলানী তবে মায়েরে দেখিব॥

বেহুলা আর কাহার কোন কথার অপেক্ষা করিলেন না, পতিপ্রাণা ললনা প্রতিজ্ঞা পূরণার্থ জগৎকে সতী ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য গাঙ্গুর নদীর জলের

স্রোতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথি মধ্যে তাঁহাকে অনেক আপদ বিপদ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

মনসা কৃপায় যায় মনের নিঃসন্ধে।
চাঁপাতলা এড়াইয়া গেল কুমাবন্দে॥
ত্রিদিন বেহুলা ভাসে ভুবরাজ পুর।
নবখণ্ড এড়াইয়া গেল বহুদূর॥
প্রাণহীন স্বামী তার কোলে নখিন্দর।
ভাসিয়া ভাসিয়া পাইল বাঁকা দামোদর॥
গুঝটী গোবিন্দপুর বর্দ্ধমানে ভাসি।
আলো গঙ্গাপুরে ভাসি উত্তরিল আসি॥

শেষোক্ত স্থানে উপস্থিত হইলে বেহুলার বিষম বিপদ উপস্থিত হইল, কলার ভেলা খুলিয়া পৃথক হইয়া পড়িল-স্বামীর মৃতদেহ লইয়া বেহুলা বড়ইবিপন্ন হইলেন, সকাতরে করজোড়ে তিনি মনসার নাম জপ এবং তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে করিতে দৈবশক্তিতে কলার ভেলা জোড়া লাগিল। তৎপর গোবিন্দপুর ছাড়াইয়া দেপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলে নখিন্দরের দেহ পচিয়া পূঁতিগন্ধ নির্গত হইতে লাগিল।, বেহুলা সেই নক্কার জনক পূাতগন্ধকে পদ্মগন্ধ বোধে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বেহুলার মন নির্ব্বিকার, পূতিগন্ধে বিরক্তি নাই—তাহাই যদি থাকিবে তবে আর সতীধর্ম্মের পরীক্ষায় কিরূপে উত্তীর্ণ হইবেন।

দেপুর হইতে নেয়াদার ঘাটে উপস্থিত হইয়া তিনি নর্ম্মদা নাম্নী ক্ষুদ্র সরিৎ সঙ্গম স্থলে ভেলা হইতে নামিয়া কেয়ুরার কমলাদেবীর পূজা করিবার জন্য তথায় তিন দিন অবস্থিতি করিলেন, কেউরায় আকাশবাণী হইল সুরপুরে নখিন্দর প্রাণদান পাইবে। এখান হইতে আদমপুরে আসিয়া তাঁহার এক অভিনব বিপদের সুত্রপাত হইল, একজন শ্রীপদী (গোদা) নদীতে ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতে ছিল সে বেহুলার অপরূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া কামাসক্তি প্রযুক্ত তাঁহাকে প্রলোভন বাক্যে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, অবশেষে বলপ্রয়োগের ভয় প্রদর্শনেও ক্ষান্ত হইল না, শালতমালাদি সরল বৃক্ষ নমিত করিবার চেষ্টা করিলে তাহা যেমন ভাঙ্গিয়া বা সমূলে উৎপাটিত হয় তথাপি নমিত হয় না, বেহুলাও সেইরূপ অনন্যা রহিলেন, গোদা সাঁতার দিয়া ভেলা ধরিবার প্রয়াস পাইল, বেহুলা তাহাকে শাপান্তর করিলেন সে কুম্ভীর দ্বারা আক্রান্ত হইল, তখন সেই গোদা স্তব

স্তুতি দ্বারা সতীর অনুগ্রহ লাভে কুম্ভীর মুখে অব্যাহতি পাইল। ক্রমে তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই নূতন নূতন বিপদ তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল।

গোদাঘাট পশ্চাৎ করিয়া সীমন্তিনী।
জলেতে ভাসিয়া যায় দিবস যামিনী॥
পথের পথিক যত পথবয়ে যায়।
বেহুলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায়॥
ত্রিজগৎ মোহিনী কেন মড়া লৈয়া কোলে।
কলার মান্দাসে ভাসে জলের হিল্লোলে॥
গহনকাননে লোক সমাগম নাই।
নিচ্ছুল গভীর জল কোলেতে সথাই॥
বেহুলা ভাসেন তাহে জপিয়া মনসা।
তোমার চরণ মাত্র কেবল ভরসা॥

ঈশ্বরের কি অপূর্ব্ব লীলা, তিনি পরীক্ষার্থ ধার্ম্মিককে কতই যন্ত্রণা দিয়া থাকেন। আমরা স্থূল বুদ্ধিতে তাঁহার কার্য্য পরম্পরা মধ্যে প্রবেশ লাভে সমর্থ না হইয়া ইহ সংসারে ধর্ম্মাত্মাগণের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার বিচার বৈচিত্রে সময়ে সময়ে কতই দোষারোপ করিয়া থাকি, পাপীর অভ্যুদয়ে তাঁহার অস্তিত্বেও সন্দিহান হইবার ত্রুটী করি না।

ইন্দুপ্রভা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কে তুমি?

মেঘমুক্ত নির্ম্মল নীলাকাশে পূর্ণজ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রগণ মৃদু-মধুর হাসিতেছে, সেই হাসি দেখিয়া দেখিয়া কুমুদবান্ধবের মুখেও হাসির তরঙ্গ খেলিতেছে; চাঁদের সেই সুমধুর হাস্য যে দেখিতেছে, সেই প্রাণে প্রাণে মুগ্ধ হইতেছে; কতই মধুর, কতই তৃপ্তিকর; করস্পর্শমাত্রেই তপ্তহৃদয় শীতল হইয়া আনন্দরসে আপ্লুত হয়। হাস্যমুখী তারামালা-মাঝে তারাপতির হাস্য দর্শনে নদ, নদী, শৈলচূড়া, নিবিড় অটবী, পল্লবিত বিটপী ও গৃহপ্রাঙ্গন হাস্য করিতেছে; নবীন কবির হৃদয়ার্ণবে কল্পনা-তটিনী স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, নব নব ভাব ভোরে বিভোর কবি তদ্গত চিত্তে জগতে আপনাকে কত সুখী বলিয়া অনুভব করিতেছেন।

রজনী অধিক হইয়াছে, নৈশ সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, রজনীর গম্ভীরতায় জীব কোলাহল কমিয়া গিয়াছে, কেবল সময় সময় দূরস্থিত তরুশাখে পাপীয়ার চোক্ গেল চোক্ গেল রব, ধরাতলে ঘোর গভীর ঝিল্লীরব, মধ্যে মধ্যে দূরস্থিত বেকার কুকুরের ভেউ ভেউ রব, মধ্যে মধ্যে শৃগাল কুলের ঐকতান ধ্বনি, গম্ভির পেচকের কর্কশ কলরব; ইহা ব্যতীত অন্য কোনও শব্দ কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে না।

এই নিশীথ সময়ে একটী যুবক এক উদ্যানস্থ সরোবর সোপানে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ঊর্দ্ধদৃষ্টে শশাঙ্কের বিমল ছটা সন্দর্শন করিতেছেন। চাঁদের কাছে কাছে সুধাআশে চকোর চকোরী ঘুরিতেছে, সুধাকর সুধা দান করিতেছেন না; সুধা পিপাসী চিরভক্ত চকোরদম্পতি তথাপিও আশা ছাড়িতেছে না।

দেখিতে দেখিতে সহসা আকাশ মণ্ডলে বাষ্পাকারে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ দেখা দিল, ক্রমে ক্রমে নিবিড় নীরদমালা দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শশধর সেই নিবিড় মেঘের অন্তরালে লুকাইলেন। প্রকৃতি এইমাত্র হাসিতে ছিলেন, শশধরের অদর্শনে কৃষ্ণবসনে অবগুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে বসিলেন।

আর সেই যুবক? যুবকের আর পরিতাপের সীমা রহিল না। পরিবর্ত্তন শীল জগতের আকস্মিক পরিবর্ত্তন দর্শনে তিনি যেন উন্মত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এইরূপই কি সব? বাহ্য প্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির কি এইরূপ সৌসাদৃশ্য? নূতন, পুরাতন, ভূত, ভবিষ্যৎ, সবই কি এই পরিবর্ত্তনের অধীন?

যুবকের পশ্চাৎ হইতে উত্তর হইল, "সবই এক। যাহা দেখিবে, সমস্ত বস্তুতেই এক নিয়ম। বিধাতার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হয়। তোমার আমার ইচ্ছায় কিছুই হয় না। কেন না, বিধাতার ইচ্ছায় উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, কার্য্য স্বার্থে জড়িত, স্বার্থের আশা ক্ষণ ভঙ্গুর, সুতরাং আমরা সকল সময় সকল কর্ম্মে ফললাভ করিতে পারি না।"

পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া যুবক দেখিলেন, একটী প্রশান্ত নরমূর্ত্তি। যুবকের গাত্র রোমাঞ্চিত হইল। বাপীতীর নির্জ্জন, সেই নির্জ্জনে যুবা অনিমেষ নেত্রে সেই আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

আগন্তুকের মূর্ত্তি গম্ভীর, চক্ষু আরক্তিম, শরীর জ্যোতির্ম্ময়, বক্ষোদেশ চন্দন চর্চ্চিত, তাহার উপর রাধাকৃষ্ণের নাম অঙ্কিত, সহসা দর্শনে হৃদয় ভক্তিভাবে পূর্ণ হয়।

যুবক অনেকক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, "আপনি কে? কেমন করিয়াই বা আপনি এই দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচয় পাইলেন? আমার বোধ হয়, আপনি নিশ্চয়ই অন্তর্যামী, দেবতা হইবেন; কেন না, হৃদয়ের কথা অন্তর্যামী দেবতা ব্যতীত কে আর

জানিতে পারে? একজনের অন্তরে যে ভাব উঠে সে ভাব পরিজ্ঞাত হওয়া মানবের সাধ্যাতীত। অন্তরে দেবতার বাস, আপনি অন্তর বাসী দেবতা, তাই আমার অন্তরের উচ্ছ্বাসময়—গূঢ় ভাবটী আপনি জানিতে পারিয়াছেন,। বিষম যন্ত্রণা পূর্ণ আমার এ হৃদয়ে সুখ দুঃখের একত্র সমাবেশ, এ হৃদয় ব্যতীত অন্য হৃদয়ে তাহা নাই। বলুন! মহাত্মন, আর কতদিন এ যন্ত্রণায় আমি এই হৃদয় ভার বহন করিব? এই অসার সংসারে আর আমার থাকিতে আর্দৌ প্রবৃত্তি নাই। এই সংসারে নিত্য নূতন পাপাভিনয় হয়, পাপের সংসারে বাস করিলে পাপস্পর্শ অবশ্যম্ভাবী। যাহা করি, তাহাই পাপ; ভালমন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কাহাকে বলে, জানি না। যাহা ভাল বলিয়া স্থির করি, তাহা মন্দ রূপে পরিণত হয়, যাহা মন্দ বলিয়া জানি, সময়ে ভ্রান্তিবশে তাহাই যেন ভাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। প্রভু! কিসে আমার হৃদয় শান্ত হয়, কিসে আমার প্রতি ভগবান শান্তিময় কৃপাদৃষ্টি করেন, কিসে আমি সংসারের পাপপুণ্য বুঝিতে পারি উপদেশ করেন।"

গম্ভীরে উত্তর হইল, "প্রেমিক হৃদয়ে প্রেমময় বিরাজিত; সুধু প্রেমিক হৃদয়ে নহে, পঞ্চভূতাত্মক দেহ মাত্রেই তাঁহার বিকাশ. অনন্ত আকাশে অনন্ত কোটি তারামধ্যে একমাত্র চন্দ্রকান্তি যেমন সুপ্রকাশ, সেইরূপ প্রত্যেক আত্মাতেই তিনি নিত্য প্রকাশ; তাঁহার বিধি অখণ্ডনীয়। তাঁহার কার্য্যও অখণ্ডনীয়, ইচ্ছা হিতকরী, দেহীর উপর তাঁহার যেমন দয়া, স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত পদার্থের উপরেও ঠিক তদ্রুপ দয়া; ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে তিনি জীব ও পদার্থ পুঞ্জ সৃজন করিয়াছেন।"

যুবক অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া উত্তর করিলেন, "প্রভু! কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; এ সব কি কথা? যে কথা শ্রবণে আমার হৃদয় শান্ত হয়, সেই কথা বলুন; সেই শান্তি কথা শ্রবণ করা আমার বাসনা।"

গম্ভীর স্বরে আগন্তুক কহিলেন, "বুঝিলাম, তোমার হৃদয়ে অসার চিন্তা স্থান পাইয়াছে, তুমি বোধ হয়, বাহ্য মোহে মুগ্ধ হইয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের চিন্তা করিতে সময় পাইতেছ না, নতুবা কেন তুমি আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ না? কেনই বা এমন বিমর্ষ নয়নে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছ? বল তোমার মনের অভিপ্রায় কি?"

যুবা নিরুত্তর। আগন্তুক পুনরায় কহিলেন, "বুঝিলাম, তুমি কোন রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছ। কেমন সুন্দরী সে নারী?"

যুবক লজ্জিত হইলেন; অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "প্রভু! সে নারী অপরূপ সুন্দরী। তেমন রূপ আর কাহারও নাই।"

গম্ভীর স্বরে আগন্তুক কহিলেন, "যাহাকে অপরূপ সুন্দরী বলিয়া জানিয়াছ, যাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া বিভু-চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিতে পারিতেছ না, ভাব দেখি, সেই অপরূপ সুন্দরী যাঁহার সৃষ্টি, তিনি কত বড় রূপবান? সেই পরম সুন্দর

পুরুষকে ভাল বাসিতে কি তোমার ইচ্ছা করে না? তাঁহার প্রেমে মজিতে কি তোমার একটীবারও বাসনা হয় না?" যুবক নীরব।

ঐ মহাবাক্য বলিতে বলিতে আগন্তুক পুরুষ কাঁদিয়া আকুল হইলেন। যুবক কোথায়?

যুবক অদৃশ্য। পূর্ব্ব গগণে উষা দেখা দিল। পক্ষীগণ উষা কালীন কাকলী রবে সকলের মন হরণ করিতে লাগিল। প্রকৃতি দেবী হাসিয়া উঠিলেন, জগতের সমস্ত পদার্থই হাসিতে লাগিল।

উষা চলিয়া গেল, সূর্য্যদেব উদয় হইল। যুবা এক নদীতীরে গিয়া দাঁড়াইলেন; প্রভাত সমীর হিল্লোলে নদীর জলে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ খেলিতে ছিল, যুবা সুস্থির নয়নে সেই তরঙ্গ ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অপরূপ বালিকা।

আবার রজনী আগত। খর প্রবাহিনী একটী নদী। নদীতীরে এক ভীষণ শ্মশান। একদিকে প্রকাণ্ড প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে, তথায় একটি বৃক্ষও নাই; যতদূর পর্য্যন্ত মানব-দৃষ্টি যায়, ততদূর কেবল কুয়াসায় দিক সমূহ আচ্ছাদিত দৃষ্ট হয়। শ্মশানে একটী অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি জ্বলিতেছে, কুণ্ড সমীপে একটী-মানব নির্ভীক চিত্তে শবারূঢ় হইয়া ধ্যানমগ্ন; জ্বলন্ত অনলে মধ্যে মধ্যে ঘৃতাহুতি দিতেছে; মধ্যে মধ্যে তন্মুখ-নিসৃত মা-মা শব্দ কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে।

নদীবক্ষে একখানি তরণী। তরণীতে দুইজন মাল্লা আর একজন মাঝি। মাঝির নাম—হীরালাল। নিকটে শ্মশান দেখিয়া হীরালাল সভয়ে রাম নাম উচ্চারণ করিতেছে।

আরোহী একটি যুবক; বয়স অনুমান ২২।২৩ বৎসর; উন্নত-ললাট, আয়ত-নেত্র, অঙ্গ সৌষ্ঠব সন্দর্শনে তাহাকে বীর পুরুষ বলিয়া মনে হয়। শ্মশানের প্রজ্বলিত চিতানল দর্শনে যুবক ভীত না হইয়া অবিচলিত চিত্তে হীরালালকে নৌকা বাঁধিতে কহিলেন। হীরালাল বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত কুসংস্কার বর্জ্জিত যুবকবৃন্দের মত নহে, হীরালাল ভুত মানিত, ভুতের নামে ভয় পাইত, কিন্তু কি করে, জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত মানুষকে অনেক ভয় বিসর্জ্জন দিতে হয়, হীরালাল শিঘ্র শীঘ্র ভুতের ভয় বিসর্জ্জন দিতে পারিল না, আরোহীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হুজুর! ক্ষমা করুন, এখানে নয়।"

আরোহী শুনিল না; জোর করিয়া বলিল, নৌকা বাঁধো। মাঝি পুনরায় বলিল, "এখানে নয়" সে কথাও রক্ষা হইল না। হীরালাল তখন কি করে, অগত্যা সেই স্থানেই নৌকা বাঁধিল। আরোহী একাকী নৌকা হইতে নামিয়া সেই ভীষণ শ্মশানে যাইতে লাগিল। রজনী তিমিরাচ্ছন্ন; পথ দেখা যায় না; যাইতে যাইতে

কণ্টকে তাহার পদযুগল ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধিরাপ্লুত হইতে লাগিল; কিন্তু স্পর্শমণি যেমন লোহ আকর্ষণ করে, শ্মশান তাহাকে সেই রূপে আকর্ষণ করিল। যুবক নির্ভয়ে শ্মশানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। শবারূঢ় লোকের মুখে কেবল মা মা শব্দ। আমরাও মাকে মা বলিয়া ডাকিয়া থাকি, কিন্তু এ সে প্রকার সম্বোধন নহে। শবারূঢ় ব্যক্তি যে ভাবে ডাকিতেছে, সেই ভাবে ডাকিতে পারিলে মা শুনিতে পান, মা তখন স্থির থাকিতে পারেন না, উত্তর দেন।

শবারূঢ় লোকটীর সন্ন্যাসী বেশ। সন্ন্যাসী কখন মা বলিতেছে, কখন আপন মনে হাসিয়া বিভোর হইতেছে। শিশু যেমন মায়ের নিকট আব্দার করিয়া অভীষ্ট প্রার্থনা করে, সেইরূপ আধ আধ ভাষায় আপনা আপনি কত কি কহিতেছে।

যুবক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সন্ন্যাসীর সেইসকল সুপবিত্র ভাব দর্শন করিতে ছিল, সহসা সন্ন্যাসীর দৃষ্টি তাহার উপর নিপতিত হইল; সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল, "কেন তুমি এই পুণ্যভূমি কলুষিত করিতে আসিয়াছ? এ দেবতার স্থান, এখানে সর্ব্বদা দেবাগম হয়; যাও, অন্যত্র গমন কর।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী পুনরায় নয়ন মুদিয়া ধ্যানমগ্ন হইল। যেন পূর্ব্ব পরিচিত কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া যুবক সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে, আবার তাহার প্রতি সন্ন্যাসীর দৃষ্টি পতিত হইল। সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে বলিল, "এখনও যাও নাই?"

যুবক উত্তর করিল, "দেব! বুঝিলাম, সংসার কিছুই নয়, কেবল মায়া-কুজ্ঝটিকাময়, নৈরাশ্যের প্রতিচ্ছবি। ইহা কেবল উদ্ভ্রান্তের মন ব্যাকুল করে; সেই মায়া ব্যাপ্ত পরিধি মধ্যে চিন্ময় চিদানন্দ বিভু বিশ্বনাথ কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া এই বিশ্ব ক্রীড়া দর্শন করিতেছেন। কি যে কেমন, সে মোহমায়া বুঝিয়াও বুঝিতে পারা যায় না, মায়া আচরেই সমস্ত ভুলাইয়া দেয়। আমি যেন সেই দয়াময় দীনবন্ধুর সুন্দর ছবি অপেক্ষাও সেই মুখখানি অধিক সুন্দর দেখি; যেন কতই সুন্দর; নিত্যই যেন নূতন বলিয়া বোধ হয়। যদি আমার চক্ষু লইয়া আপনি তাহাকে দেখিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, সে কত রূপসী।

গম্ভীরস্বরে সন্ন্যাসী কহিল, "এখন যাও, অন্য সময়ে আমার সাক্ষাৎ পাইবে।" যুবক স্তম্ভিত হইল। ক্ষণ পরেই উঠিয়া দাঁড়াইল; কত কি ভাবিয়া তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিতে ছিল।

নদীতীরে অরণ্য; সেই অরণ্য মধ্য হইতে পশ্চাতে কে যেন আসিয়া তাহার গাত্রস্পর্শ করিল, যুবক পশ্চাতে চাহিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মনে মহাভীতি সঞ্চারিত হইল। এক কিম্ভুত কিমাকার ভীষণ মূর্ত্তি! তাহার মস্তকে দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ, হস্তে একটা সুদীর্ঘ বংশদণ্ড, পরিধান ছিন্ন মলিন বসন কলেবর কৃষ্ণবর্ণ।

যুবক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। কাহারও মুখে বাক্য নাই। সহসা যুবক অচৈতন্যাবস্থায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল! আগন্তুক তাহাকে নিজ পৃষ্ঠদেশে লইয়া নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে অরণ্যে পশুগণ সুখে সচ্ছন্দে বিচরণ করে। সেই নির্জ্জন গহণকানন মধ্যে লতা জড়িত একটী নিভৃত প্রদেশে কঙ্কাল মালিনী চতুর্ভুজ কালিকামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। কালীর এক হস্তে কৃপাণ, এক হস্তে ছিন্নমুণ্ড, অপর দুই হস্তে বরাভয়।

রাত্রি গভীর। সেই নিবিড় নির্জ্জন বনমধ্যে অন্য কোন শব্দ নাই, প্রকৃতি দেবী যেন নিদ্রিতা। সহসা যুবার চৈতন্য হইল। হস্তপদে বন্ধন, ভূতলে পতিত। যুবা ভাবিতে লাগিল, কোথায় আসিলাম? কে আমাকে এখানে আনিল! কোথা সেই নদী পথ? এখানেত কোনও মনুষ্য দেখিতেছি না! তবেকি ইহা কোন প্রকার মায়া? দেখিতেছি, কালীমূর্ত্তি; একজন লোক পূজা করিতেছে, হোম কুণ্ডে আগুণ জ্বলিতেছে। কে এ লোক? শ্মশানে যে বিকট মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, এই কি সেই?

যুবক এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় তথায় একটী নবীন বালিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। কে এ বালিকা? দেবী না মানবী মানবী যদি হয়? তবে কি দস্যুবালা?

বালিকা হঠাৎ যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "যুবক আমি তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া বালিকা কালী প্রতিমার অদূরস্থিত একখানা খড়্গ লইয়া যুবকের হস্তপদের বন্ধনছেদন করিয়া দিল। বন্ধনমুক্ত হইয়া যুবক সেই উপকারিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তুমি কে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। স্বপ্ন?

বালিকা বলিল, "বুঝিবার এখন সময় নয়। যাও, যত শীঘ্র পার, তুমি চলিয়া যাও! এটা কাপালিকের আশ্রম; কাপালিকেরা যারপর নাই নির্দ্দয়; কাপালিক তোমাকে দেখিতে পাইলে আর তোমার নিস্তার থাকিবে না। শীঘ্র পলায়ন কর।"

যুবক নির্ব্বাক হইয়া দ্রুতপদে ছুটিতে লাগিল। কোথায় পথ, কোন দিকে যাইলে প্রাণ রক্ষা হয়, মনে মনে কেবল ইহাই চিন্তা। কতক দূর গিয়া প্রকৃতির ভাব দেখিয়া বুঝিল, রাত্রি আর অধিক নাই। পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া যুবক একটি প্রাচীন বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল। অদূরে এক প্রান্তর; জল প্রাপ্তির আশায় যুবক গাত্রোত্থান করিয়া সেই প্রান্তরাভিমুখে চলিল। তখন প্রায় উষা। প্রান্তর সীমায় একটি খাল; পিপাসার্ত্ত যুবক সেই খালের স্বচ্ছ জলপান করিবার অভিলাষে দৌড়িয়া যাইতেছে, এমন সময় এক ভীম মূর্ত্তি কাপালিক তাহার সম্মুখে উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া যুবার দেহের শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল। তৃষ্ণা মাথায় উঠিল, আবার সেই বিপদ?

জননী।

জননি! তোমার চরণ কমলে—
এই ভিক্ষা মাগি জুড়িয়া পাণি,
কৃপাময়ী, দেবী, তুমি ঠাকুরাণি,
কৃপা ছায়া যাচি চরণ তলে।

দশমাস করি গরভে ধারণ,
প্রসব করেছ স্নেহের ধন,

কত যে যতন, কত যে বেদন,
ধারণা করিতে পারে না মন।

আঁচড় লাগিলে তনয়ের গায়,
শেলসম বাজে মায়ের প্রাণে,
কি যে সে যাতনা, কেইবা তা জানে,
কারে বা বুঝাব, কহিব কায়?

জননি! তোমার স্নেহের আধার,
প্রাণের কুমার পাইয়া কোলে,
মুখে চুমো খেয়ে, আয় যাদু বলে,
ভেবেছ মরতে সুখের সার।

হায় হায় দেবি! অধম সন্তান,
সুধিতে তোমার স্নেহের ধার,
অক্ষম জীবনে রহে অনিবার,
ধরে শুধু দেহে বিফল প্রাণ।

পুত্রের অসুখে হইয়া অসুখী,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে কাতরা হয়ে,
পীড়িত শিশুরে কোলে তুলি লয়ে—
অশ্রুধারে ভাসি সতত দুখী।

অর্চ্চনা করিতে তোমার চরণ,
অবসর পেয়ে ভুলিয়ে থাকি,
মুখে মুখে শুধু মা মা বলে ডাকি,
আসল কাজেতে না থাকে মন।

হায় হায় হায়, গিয়েছে সে দিন,
যেদিনে মা তুমি জগতে ছিলে,
সে দিনে চরণে পরাণ সঁপিলে—
সন্তাপে হত না হইতে লীন।

পশেছ স্বরগে স্বরগ বাসিনী,
কাঁদিতেছি আমি তোমার শোকে,
কি ছার রোদন ছার ইহলোকে,
হরণ সন্তাপ ভবেশী যিনি।

উদ্দেশে তোমারে করি মা প্রণাম,
বরিষন করি নয়ন জল,
অভাগার কিছু নাহি মা সম্বল,
সম্বল কেবল তোমারি নাম।

স্বর্গাসনে বসি জননী আমার,
দয়া করি চাও ধরণী পানে,
চরিতার্থ কর আশীর্ব্বাদ দানে,
ঘুচে যাক সব যাতনা তার।

বিশ্বময় পিতা, বিশ্বময়ী মাতা,
তোমারে করুণা করেন তাঁরা,
পূর্ণাময়ী তব করুণার ধারা,
ধারণ করিব পাতিয়া মাথা।*

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

সমালোচনা।

আলি বাবার গানের স্বরলিপি।—বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর সুপরিচিত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহার একখণ্ড উপহার পাইয়াছি। দর্শন করিয়া আমাদের হৃদয়ে নূতন প্রকার প্রীতি সমুদ্ভূত হইল। ভূমিকার একস্থলে লিখিত হইয়াছে, "আমাদের দেশে স্বরলিপি দৃষ্টে সঙ্গীত শিক্ষা করিবার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে কয়েক খানি পুস্তক প্রচারিত আছে; দুঃখের বিষয়, তাহাতে স্থল বিশেষে শিক্ষার্থীদিগের সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধাই অধিক পরিলক্ষিত হয়; কারণ সাধারণ শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে ঐ সকল বিভিন্ন প্রণালী হইতে সরল শিক্ষা প্রণালীর পুস্তক নির্ব্বাচন করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও নিতান্ত সুবিধা জনক নহে।—" এই টুকু পাঠ করিয়াই আমরা বুঝিলাম, প্রকৃত কথাই এই।

রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আন্তরিক যত্নে স্বর্গীয় ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী মহোদয় যে অভিনব স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, পরন্তন অন্যান্য স্বরলিপির প্রণালীর সহিত তাহার মিলন দৃষ্ট হয় না। বিভিন্ন বিভিন্ন প্রণালী থাকাই অসুবিধার প্রধান কারণ।

আমাদের সম্মুখস্থ পুস্তকে যে প্রণালীটি অবলম্বিত হইয়াছে, সেই প্রণালীকে আদর্শ স্থলে গ্রহণ করিয়া আধুনিক স্বরলিপি প্রচারকেরা যদি একই প্রণালীতে স্বরলিপি প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে সঙ্গীত সংসারের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। সুনাম লব্ধ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় এই স্বরলিপির সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন, ভূমিকায় ইহা পাঠ করিয়া আমরা অধিকতর আনন্দিত হইলাম। বর্ত্তমান স্বরলিপি প্রণেতা যিনিই হউন ধন্যবাদপাত্র সন্দেহ নাই; তাঁহার প্রতি আমাদের অনুরোধ যে তিনি আমাদের সঙ্গীত রত্ন ভাণ্ডারের প্রতি কৃপা দৃষ্টি দান করিবেন। গুরুদাস বাবু এই পুস্তক খানি প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

* গত ১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার (ষষ্ঠী তিথি) পরমারাধ্যামাতাঠাকুরাণীর ১ম বার্ষিক সপিণ্ডীকরণ উপলক্ষে বিরচিত। লেখক।



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৬শ বর্ষ। ১৩১৫ সাল, অগ্রহায়ণ। ৮ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রী মহাপ্রভু চৈতন্যদেব।

প্রথম অধ্যায়।

ভক্তাভিধানে চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতার। বলরামের অবতার প্রভু নিত্যানন্দ। কেবল কৃষ্ণবলরাম গৌর বপু ধারণ করিয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন. পাঠক মহাশয়েরা তাহাই মনে করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিবেন না; "গৌর-গণোদ্দেশ" গ্রন্থে চৈতন্য অবতারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছিলেন, "নদীয়ায় আমি একাকী কলিযুগে অবতীর্ণ হইব না, ব্রজধামের শ্রীবৃন্দাবনের

ও মথুরার ভক্তবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। অক্রূর ও উদ্ধবাদি মদ্‌ভক্ত, শ্রীদামসুবলাদি রাখাল সখা ও শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজবাসিনী গোপিনীগণ গৌড়ে অবতীর্ণ হইবেন। পুরুষেরা পুরুষ হইবেন, গোপীগণও পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহারা সকলেই পণ্ডিত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব মহিমা প্রচার করিতে থাকিবেন। আমার অতি প্রিয়া শ্রীরাধিকা গদাধর পণ্ডিত, প্রিয়সখী মধুমতী নরহরি পণ্ডিত, প্রিয় সখী বৃন্দাদেবী মকুন্দরাম পণ্ডিত, প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী সদাশিব কবিরাজ, মুখ্যসখী ললিতা জনার্দ্দন পণ্ডিত, প্রিয় সখী বিশাখা দামোদর পণ্ডিত, প্রিয়সখী বিমলা বনমালী কবিরাজ, সখী রঙ্গদেবী রঘুনাথ ভট্ট, সখী সুদেবী গদাধর ভট্ট, প্রিয়সখী তুঙ্গবিদ্যা প্রবোধানন্দ পণ্ডিত, প্রিয়সখী চম্পকলতা রাঘব গোস্বামী, সখী ইন্দুলেখা ভূগর্ভ গোস্বামী, সখী শশিরেখা কাশী মিশ্র, সখী রূপমঞ্জরী রূপ গোস্বামী, প্রিয়সখী রতিমঞ্জরী রঘুনাথ দাস, সখী রাগমঞ্জরী দ্বিতীয় রঘুনাথ, সখী অনঙ্গ মঞ্জরী শ্রীগোপাল ভট্ট, সখী লবঙ্গ মঞ্জরী লোকনাথ পণ্ডিত, প্রিয়সখী যোগমায়া জীব গোস্বামী, সখী কলাবতী গোবিন্দ পণ্ডিত, সখী লীলাবতী মাধব পণ্ডিত, প্রিয়সখী ইন্দুমতী বাসুদেব ঘোষ, প্রিয়সখী যজ্ঞপত্নী জগদীশ পণ্ডিত।”

ভগবান বলিয়াছেন, “এইরূপে আমার দ্বাপরাবতারের সখা, সখী ও ভক্তবৃন্দ কলিযুগে গৌড়ভূমে আবির্ভূত হইবেন।”

গৌরগণোদ্দেশের ভবিষ্যদ্বাণী অন্তরে রাখিয়া আমরা এখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সুপবিত্র জীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা-রজনীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব পুণ্যধাম নদীয়ায় জগন্নাথ মিশ্রের ধর্ম্মপত্নী শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; সেইদিন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা, আকাশে চন্দ্রগ্রহণ। প্রকৃত গ্রহণ সময়েই চৈতন্যচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। সেই মহোৎসবে নদীয়াধামে সেই সময়ে গৃহে গৃহে হরিধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, সিংহ লগ্নে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে চৈতন্যদেবের জন্ম।

সচরাচর নবপ্রসূত শিশুগণের যে প্রকার অঙ্গায়তন হইয়া থাকে, এই শিশুর অঙ্গায়তন তদপেক্ষা বৃহৎ হইয়াছিল। কারণ এই যে, চৈতন্যদেব ত্রয়োদশ মাস জননী জঠরে বাস করিয়াছিলেন। প্রতিবাসিনী কামিনীগণ সেই বালকের রূপ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন। সুললিত দেহ, সুবিশাল বক্ষ, সুকোমল বাহু, চন্দ্রতুল্য

বদন, সুপ্রশস্ত ললাট, বিম্বরাগযুক্ত অধর, নীলোৎপল তুল্য নয়ন; নয়নের তারকা-প্রান্তে আলোহিত রেখা; সেই নিলোৎপল নেত্রের দৃষ্টিতে অপরূপ জ্যোতিঃ। স্থবিরারমণীগণ চৈতন্যদেবের চক্ষু দর্শনে বিমোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এ ছেলে কখনও মানুষ নয়, অবশ্য ইহাতে দেবতার অংশ আছে।" জগন্নাথ মিশ্র স্বয়ংও এই কথা বলিয়াছিলেন, "আমার এই পুত্রের অভ্যন্তরে গোপাল আছে।"

সূতিকাগৃহের নিকটে একটি নিম্ববৃক্ষ ছিল, সেই কারণে শচীদেবী পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন, নিমাই; জগন্নাথ মিশ্র নাম রাখিয়াছিলেন, বিশ্বম্ভর; উপনয়নের সময় নাম হইয়াছিল, গৌরহরি। গোরা, গৌরাঙ্গ, গোরাচাঁদ, ইত্যাদি নাম উক্ত গৌরহরি শব্দের অপভ্রংশ। ভ্রান্তজীবগণকে চৈতন্য দান করিবার নিমিত্ত আবির্ভাব, সেই জন্য তাঁহার নাম চৈতন্য দেব; সন্ন্যাসদীক্ষার সময় নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যলীলার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। জননীদত্ত নাম নিমাই, তৎপ্রমাণে এই শিশুকে অনেক স্থলে নিমাই বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাল্যলীলায় এই নামটি অতি মধুর।

নিমাই হামাগুড়ি দিতে শিখিলেন। প্রতিবেশিনীমণ্ডলী প্রায় সর্ব্বদাই নিমাইকে কোড়ে লইয়া স্নেহ রসে অভিষিক্তা হন; কে বলিবে কেন, স্নেহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তি রসের সঞ্চার হয়। যিনি নিমাইকে কোলে করেন, তাঁহারই হৃদয় সুশীতল হয়।

নিমাই প্রায় সর্ব্বক্ষণ কুলবালাগণের কোলে কোলে বেড়ান; এমন কি, জননী শচীদেবীও তাঁহাদের ক্রোড় হইতে নিমাইকে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হন না। কুলাঙ্গনাগণের নিকটে নিমাইধনের এত আদর, নিমাই ধন তথাপি চঞ্চল হইয়া, ক্রোড় হইতে নামিয়া হামাগুড়ি দিয়া বেড়ান। পদাবলি কর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ নিমাইয়ের হামাগুড়ির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

"এক মুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি দেয় নানারঙ্গে শচীবালা॥
লালামুখে ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর॥

অঙ্গদ বলয় শোভে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু, বাঘ নখ গলে॥
সোণার শিকলী পিঠে, পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনী আপনা॥"

নিমাই যখন হামাগুড়ি দিতেন, তখন শীঘ্র কেহ তাঁহাকে ধরিতে পারিত না। বলবান শিশু হামা দিয়া এত দ্রুত ধাবিত হইতেন যে, ক্লেশ হইবে ভাবিয়া শচীদেবী তাঁহাকে ধরিতে যাইতেন, কৌতুকে বালকের হামার বেগ আরও বাড়িয়া উঠিত; এক একবার বক্রগ্রীবায় মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্ভাগে জননীর দিকে চাহিতেন, বিধুমুখে হাস্য রেখা দেখা দিত। জননী অগ্রবর্ত্তিনী হইতেন, খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া শিশু পুনর্ব্বার অতি দ্রুতবেগে হামাদিয়া দৌড়তেন। অনেক কষ্টে শচী তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিতেন।

নিমাই যখন হাটিতে শিখিলেন, মাতাপিতা প্রভৃতি সকলেই তখন মহা ব্যতিব্যস্ত হইলেন। কখন কোন্‌দিকেছুটিয়া যাইবে, নগরের জনতামধ্যে হয়ত হারাইয়া যাইবে, সর্ব্বদা তাঁহাদের সেই ভয়। অধিকন্তু নিমাই একদিন একটা সর্প ধরিয়াছিলেন, তদবধি তাঁহারা আর নিমাইকে একাকী ছাড়িয়া দিতেন না; নিমাই তথাপি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের অগোচরে একাকী ছুটিয়া বাহির হইতেন। আর একদিন আর একটাবিপদ ঘটিয়াছিল। শিবগীতাগ্রন্থে লিখিত আছে, মেষমালীনামে একজন তস্কর অলঙ্কার ভূষিত নিমাইকে একদিন রাজপথে একাকী পাইয়া চুরি করিয়া লইয়া যায়, শিশুকে বধ করিয়া অলঙ্কার হরণ করা তাহার অভিলাষ; কিন্তু আশ্চর্য্য, শিশুকে স্কন্ধে তুলিয়া লইবামাত্র তাহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়; সে ভাবিল, "তুচ্ছ ধন লোভে এমন সুন্দর কোমল শিশুর প্রাণ বিনাশ করিব, এমন নিষ্ঠুর আমি? ধিক্ আমাকে!"

এইরূপে আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিয়া মেষমালী তৎক্ষণাৎ মিশ্র মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া নিমাইকে পিতৃ ক্রোড়ে সমর্পণ করিল; কোন কথা কহিবার কিংবা শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিল। কেবল ইহাই কি তাহার কার্য্য? না, কেবল ইহাই নহে; তস্কর মেষমালী তদবধি সাধু হইল, সংসারে তাহার ঔদাস্য জন্মিল; সংসার ত্যাগ করিয়া মেষমালী পরম সাধনায় প্রবৃত্ত হইল।

জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী নিমাইয়ের শরীরে নানাপ্রকার অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিতেন। একদিন শিশু নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময় জগন্নাথ দেখিলেন, শিশুর

বক্ষের উপর চন্দ্রের উদয়; আর একদিন নিমাইকে তিনি সৌদামিনী-পরিবেষ্টিত দর্শন করিয়া ছিলেন। শচীদেবী একদিন গৃহমধ্যে নিমাইকে অন্বেষণ করিতে গিয়া দেখেন, চতুর্দ্দিকে অপরূপ রূপ, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। একবার তিনি ভাবিয়া ছিলেন, হয় ত উপদেবতার খেলা; আবার ভাবিয়া ছিলেন, হয় ত ডাকিনী। ভয় পাইয়া তিনি ঈশ্বরের নিকট মঙ্গল কামনা করিয়া পুত্রের মস্তকে রক্ষা বাঁধিয়া দিয়া ছিলেন।

একদিন রজনী যোগে জননীর ক্রোড়ে নিমাই ঘুমাইয়া ছিল, শচী সেই সময় হঠাৎ দর্শন করিলেন, অনেকগুলি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি নিমাইকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ভয় পাইলেন না, শিশুকে জাগাইয়া সস্নেহ বচনে বলিলেন, "নিমাই! তুমি তোমার পিতার গৃহে গিয়া শয়ন কর।" পুত্রকে এইকথা বলিয়া শচী অতঃপর স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দ্বার খুলিয়া দাও, নিমাই যাইতেছে।"

নিমাই পিতৃগৃহে যাইতেছেন, আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়াছেন, শচীদেবী আপন গৃহের দ্বার দেশে দাঁড়াইয়া আছেন, ওদিকে জগন্নাথ মিশ্র শশব্যস্তে পুত্রকে লইতে আসিতেছেন, এমনসময় তাঁহাদের উভয়ের কর্ণে সুমধুর নূপুরধ্বনি প্রবেশ করিল; শচীদেবী বিস্ময়ান্বিতা; নিমাইকে লইয়া তিনি পতির নিকটে উপস্থিত হইলেন। নিমাই ঘুমাইলে তিনি পতিকে বলিলেন, "নিমাইয়ের পায়ে নূপুর নাই, অথচ আমি সুস্পষ্ট নূপুরের ধ্বনি শুনিলাম; একি আশ্চর্য্য?" জগন্নাথ বলিলেন, "পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, এই শিশুর হৃদয়ে গোপাল বিরাজ করেন।" এইরূপ কথপোকথনে তাঁহারা উভয়েই বিস্ময়রসে পরিপ্লুত।

তৃতীয় অধ্যায়।

ক্রমশই বৎসর অগ্রসর। শিশু নিমাই পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলেন। শুভদিন দেখিয়া জগন্নাথমিশ্র তাঁহার হাতে খড়ি দিলেন। হাতে খড়ি হইল বটে, নিমাই কিন্তু পাঠশালায় যান না, লেখাপড়ায় কিছু মাত্র মনোযোগ দেন না, সম বয়স্ক দুষ্ট বালকগণের সহিত সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ান; গঙ্গাতীরে স্ত্রীলোকেরা নৈবেদ্য সাজাইয়া শিবপূজা করেন, নিমাই ছুটিয়া গিয়া পূজার অগ্রে সেই সকল নৈবেদ্যের ফলমূল ও মিষ্টান্ন ভোক্ষণ করেন। পুত্রের কল্যাণ কামনায়শচীদেবী একদিন অঞ্চলা বরণে—নৈবেদ্য লুকাইয়া ষষ্ঠী পূজা দিতে যাইতে ছিলেন, নিমাই তাহা জানিতে পারিয়া সেই নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইয়া ছিলেন। এইরূপ উপদ্রব অনেক।

নিমাই অত্যন্ত দুরন্ত হইলেন। মাতার নিকট তিরস্কার পাইয়া নিমাই ছুটিয়া ছুটিয়া পালান; ধরিবার জন্য শচীদেবী সঙ্গে সঙ্গে ছুটেন; নিমাই তখন এক একটা অশুচী স্থানে অথবা উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া করতালি দিয়া হাস্য করিতে থাকেন। শচীদেবী অতিশয় শুচিবাই ছিলেন, অপবিত্র স্থানে যাইতে পারিতেন না, সুতরাং নিমাইকে ধরিতেও পারিতেন না।

নিমাই দুরন্ত হইলেও কিন্তু তাঁহার কয়েকটি অসাধারণ শক্তি জন্মিল; নয়নে, হাস্যে ও মধুরবচনে তিনি সর্ব্বজনের চিত্তহরণ করিতে পারিতেন, বালকগণের সঙ্গে মিলিয়া বাহু তুলিয়া হরিনাম করিতে করিতে তালেতালে নৃত্য করিতেন; নৃত্যের সময় বালকের মধুর অঙ্গভঙ্গি দর্শনে সকলেই মোহিত হইতেন; যাঁহাদের হরি-ভক্তি প্রবলা, নৃত্য দেখিয়া তাঁহাদের নেত্রে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত। একজন বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, "নিমাইয়ের নৃত্য দেখিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে আমারও নৃত্য করিতে অভিলাষ হয়।" কেবল অভিলাষ মাত্র নয়, বাস্তবিক হরিবোল বলিয়া তিনি নাচিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাকালে শচীদেবী নিমাইকে লইয়া খেলা করিতেন; মাতা পুত্রে চমৎকার খেলা হইত। বাসুদেব ঘোষ সেই খেলার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

"শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ অপরূপ জগমনো লোভা॥"

নিমাই একদিন একটি কুকুর ছানা আনিয়া আপন গৃহে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, শুচিমতী শচীদেবী সেই কুকুর ছানা ছাড়িয়া দিবার জন্য নিমাইকে বিস্তর তাড়না করেন, নিমাই কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে চাহেন না; শচী অবশেষে পুত্রের অলক্ষিতে সেই কুকুর ছানা ছাড়িয়া দেন। বয়স্য মুখে সেই কথা শুনিয়া নিমাই বাড়ীতে আসিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঙ্গিনায় গড়াগড়ি দিতে থাকেন; "আর একটি ভাল ছানা আনিয়া দিব" বলিয়া শচী বহুকষ্টে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন।

নিমাই কেবল বাহিরে বাহিরে নৃত্য করিয়া তৃপ্ত থাকিতেন না, বাটীর আঙ্গিনায় শচীদেবীর সম্মুখেও হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেন। শচীদেবী সেই নৃত্য দেখিতেন, প্রতিবেশিনী কামিনীরাও দেখিতেন; দেখিয়া দেখিয়া তালে তালে করতালি দিতেন; বালকের নৃত্যের দোলনে কামিনীগণের হৃদয় দুলিত। বাসুদেব ঘোষ এইরূপে সেই নৃত্যের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যথাঃ—

"কিযে হাম পেখনু কনক পুতলিয়া।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি ধুসরিয়া॥
চৌদিকে দিগম্বর বালকে বেড়িয়া।
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া॥"

বালক বেষ্টিত নিমাই এক একদিন নিত্য করিতে করিতে আশ্চর্য্য ভাবাবেশে ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতেন। কবি বলরাম দাস সেই নৃত্যের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

"সব শিশু মেলি গলে বনমালা পরেছে।
করতালি দিয়া হরি হরি বলে নাচিছে॥
শিশুধরি কোলে, নিমাই আধ বলে,
আলিঙ্গন পেয়ে, উঠয়ে মাতিয়ে,
নাচে বলে হরিবোল॥
মাঝে পড়ি যায়, নিমাই ধুলায়,
হরি বলে উভরায়।
নিমায়েরে ঘিরি, কর ধরা ধরি,
শিশুরা নাচিয়া যায়॥"

যশোদা যেমন তাঁহার নীলমণিকে অলকা তিলকা পরাইয়া মাথায় চুড়া বাঁধিয়া দিতেন, শচীদেবীও সেইরূপে তাঁহার নিমাইকে সাজাইয়া দেন। নিমাই সেই মনোমোহন বেশে বালকগণের সহিত মিলিত হইয়া "হরিবোল হরি বোল" বলিয়া নৃত্য করেন। সে নৃত্য দেখিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই মোহিত হইয়া যাইতেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বালকগণের সেইরূপ নৃত্যের সময় একদা একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত—সেই দলে মিশিয়া হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া তালে তালে নৃত্য করিয়াছিলেন।

ইন্দু-প্রভা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কোথায় যায়?

প্রাতঃকাল। সূর্য্য উদয় হয় নাই, পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ হইয়াছে, আকাশের শোভা সুন্দর দেখাইতেছে, পক্ষিগণ কলরব করিয়া পক্ষ ঝাড়া দিয়া নিজ নিজ কুলায়ে বসিয়া, কোন্ স্থানে যাইবে, ভাবিয়া ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে।

সূর্য্য উঠিল। গভীর বনমধ্যেও অল্প অল্প করিয়া রবিকর প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। যুবক তথায় বসিয়া বসিয়া আকুল প্রাণে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় সম্মুখে একটী পরমাসুন্দরী বালিকা আসিয়া দাঁড়াইল। যুবক এতই চিন্তায় মগ্ন যে, তাহাকে দেখিতে পাইল না। বালিকা যুবকের সম্মুখে যেন স্বর্গীয় অপ্সরার ন্যায় দণ্ডায়মানা হইয়া সরলপ্রাণে হাসিতে লাগিল; সে হাসির উদ্দেশ্য কি, জানি না; জানিতে পারিলে ভালই হইত।

সহসা যুবার দৃষ্টি সেই বালিকার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল; "এসো," "এসো," বলিয়া যুবক সেই বালিকাকে অভ্যর্থনা করিল। বালিকা মুখখানি গম্ভীর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একাকী এই নির্জ্জন বনমধ্যে বসিয়া তুমি কি ভাবিতেছ?" উত্তর হইল,—"কি করিব, কেমন করিয়া দেশে যাইব, তাহাই ভাবিতেছি। এখন দেখিতেছি, এই স্থানটিই আমার সুখের।"

বলিতে বলিতে যুবা কাঁদিয়া ফেলিল। বালিকা বলিল, "কাঁদো কেন? বরাবর চলিয়া যাও; যাইতে যাইতে পথিমধ্যে অবশ্যই মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইবে, সেই সঙ্গে অনায়াসে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিতে পারিবে। কাপালিক আমার পালক পিতা, তাহাকে ভয় করিয়া চলিতে হয়, তোমাকে আমি আর কত বার রক্ষা করিতে পারিব? জানিতে পারিলে হয় তো তিনি আমাকেও তোমার মত মহামায়ার নিকট বলি দিতে কৃতসংকল্প হইবেন। তাই বলিতেছি, ভাবিলে আর কি হইবে, কাঁদিয়াই বা কি করিবে? চলিয়া যাও।"

যুবকের কর্ণকুহরে বালিকার একটী কথাও প্রবিষ্ট হইল না। যুবক উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিল, "ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কি, কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না। কিজন্য রজনীযোগে নৌকারোহণে যাইব, কেনই বা ভীষণ শ্মশানে প্রজ্বলিত আলোকদর্শনে সেই দিকেই ধাবিত হইব? হীরালালের কি হইল? তাহারও কি আমার মত অবস্থা ঘটিল?"

বালিকা উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল, যুবকের কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না। যুবক গম্ভীরবদনে পুনর্ব্বার বলিল, "তোমরা হাসিবে না কেন, তোমরা হাসিবার

জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছ। একজন হাসিল, কাহাকেও হাসাইতে পারিল না, এবার দেখিতেছি, তোমার খালা। হাসাও, কাঁদাও, যাহা ইচ্ছা কর, তোমরা সব পার, আমি কিন্তু পারি না। এই দীর্ঘ দেহের মধ্যে প্রাণ ত সেই টুকু, তাহার অস্তিত্বের উপর কতক্ষণ বিশ্বাস?"

"তুমি কি উন্মত্ত হইয়াছ?" এই বলিয়া বালিকা আবার বলিল, "কে তোমার সরল প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রচালন করিল? আমি তোমাকে প্রাণে বাঁচাইয়া ভাল কাজই করিয়াছি, তবে এ সব কি কথা? কাপালিকের ভয়ে ভাবিত হইতেছ কেন? তিনি তোমার কিছু অনিষ্টকরেন নাই, করিতে পারিবেন, এমনও বোধ হয় না। দেখিতেছি, তুমি নিজে ইচ্ছা করিয়া নিজের বিপদ্ ডাকিয়া আনিতেছ। যদি একাকী পথ না চিনিতে পার, চল, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া পথ চিনাইয়া দিতেছি। এমন করিয়া উন্মত্তের ন্যায় চিন্তা করিলে কি হইবে?"

"হইবে যাহা, তাহা অনেকক্ষণ মনে মনে স্থির করিয়াছি। তাই চিন্তা করিতেছি, কেমন করিয়া দেশে যাইব?" যুবক এইরূপ বলিতে বলিতে বালিকার সহিত গমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে এক স্থানে একটী বিলের জলে সুন্দর সুন্দর কতকগুলি পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা দেখাইয়া বালিকা বলিল, "ঐদিকে বরাবর চলিয়া যাও, তোমার পথ তুমিই চিনিতে পারিবে।" এই বলিয়া বালিকা যুবককে পথ দেখাইয়া দিয়া নিজের গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল।

যুবক কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে পথিমধ্যে বসিয়া পড়িল। যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্য্যন্ত দেখিতে দেখিতে বালিকা তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। অদর্শনে কি যে হইয়া গেল, যে কখনও এমন অবস্থায় পতিত হইয়াছে, সে ব্যতীত তাহার সূক্ষ্ম মর্ম্ম আর কেহ বুঝিতে পারিবে না। সকলেই বুঝিতে পারিলে, এ গরলে অমৃতের উৎপত্তি হইত, কল্পনায় স্বর্গসুখ উপলব্ধি হইতে পারিত।

যুবক কখনও কয়েক পদ হাঁটে, কখনও বসিয়া পড়ে, কখনও বা কাঁদে। এইরূপ করিয়া যাইতে যাইতে "দূর হউক আর ফিরিয়া যাইব না, দেখি অদৃষ্টে আরও কি আছে!" বলিয়া যুবক আবার যে দিক্ দিয়া বালিকা গমন করিয়াছে, ধীরে ধীরে সেই দিকেই গমন করিতে লাগিল; পথ চিনিতে পারিল না, কিয়দ্দূর গমন করিয়া বসিয়া পড়িল। তখন অনেক বেলা হইয়াছে, প্রখর-কর অংশুমালী সুতীক্ষ্ণ করজাল বিস্তার করিয়া পৃথিবীর স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত পদার্থকে দগ্ধ করিতেছে। সেদিকে যুবার আদৌ লক্ষ্য নাই। সে, কেবল সেই যুবতীকেই

চিন্তা করিতেছে ;—"পরম রূপবতী, সে রূপের উপমা বুঝি পৃথিবীতে আর নাই! সৌন্দর্য্যের চরম ছটা, জগতের পরম রত্ন।" সেই চিন্তায় যুবক একেবারে উন্মত্ত, বাহ্যজ্ঞানহীন। পাঠক! এই অবসরে আপনাদিগকে যুবকের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি।

বন্দিপুর গ্রামে যুবার বহুকালাবধি পৈতৃক নিবাস। বন্দিপুর একখানি গণ্ডগ্রাম, সেই গ্রামে সদাশিব মুখোপাধ্যায় নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার একটীমাত্র পুত্র; পুত্রে নাম হরেন্দ্রকুমার। অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দ্বাদশবর্ষীয় হরেন্দ্রকুমারকে রাখিয়া সদাশিব ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী অতি কষ্টে হরেন্দ্রকুমারকে লালন পালন করেন। বড়ই কষ্ট; দুই বেলা আহার জুটিত না। হরেন্দ্র শান্ত, সুশীল ; যৌবনে যে সকল দোষ সম্ভাবিত, যৌবনে পদার্পণ করিয়া হরেন্দ্রকুমার সে সকল দোষে লিপ্ত হয় নাই। দরিদ্রতাপ্রযুক্ত তাহার উচিত মত বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই, সে নিজে প্রতিভাবলে যাহা কিছু শিখিয়াছে, তাহাই পর্য্যাপ্ত। বাটীর সন্নিকটস্থ একটী জমিদারতনয়কে হরেন্দ্র নিত্য নিত্য পড়াইতে যায়। বালকের সহিত তাহার একটি ভগিনীও পাঠাভ্যাস করে। ভগিনীটি সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, অকস্মাৎ সেই জমিদারপুত্রের মৃত্যু ঘটে, সুতরাং হরেন্দ্র আর জমিদারের বাটীতে যায় না। জমিদারকন্যাটী হরেন্দ্রের অদর্শনে কাঁদে ; সুতরাং জমিদার তাঁহার স্নেহের পুত্তলী কন্যার চিত্তবিনোদনার্থ পুত্র-বিয়োগ-শোকহৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া হরেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠান, কন্যার শিক্ষার জন্য আবার তাহাকে নিযুক্ত করেন।

সর্ব্বদা ঘনিষ্টতা বশতঃ বয়োবৃদ্ধি সহকারে শিক্ষক ও ছাত্রী উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর সঞ্চারিত হইল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে ক্রমে বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, এই প্রেম-সূচনাবৃত্তান্ত জমীদারের কর্ণগোচর হইল। তিনি নিজবাড়ীতে হরেন্দ্রের আগমন একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন। হরেন্দ্র তাহার প্রেম-মালঞ্চের অপূর্ব্ব কুসুমকে দেখিতে না পাইয়া, কতই আক্ষেপ করে, আর আপনা আপনি বলে,

"সেও যে না ভাবে, এমন নয়"। অভীষ্ট দেবতাকে চিন্তা করিতে করিতে নয়ন-জলে হরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হয় ; আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সে কেবল সেই-বালিকার মনোহর মূর্ত্তি দিবানিশি ভাবিয়া থাকে ; এইরূপে তাহার দিনাতিপাত হয়।

একদিন কন্যাকে উন্মত্তের ন্যায় দর্শন করিয়া, তাহার মুখে হরেন্দ্রের নাম শুনিয়া ... হইলেন। তিনি যে-কোন লোক পাছে কন্যা

কুলত্যাগিনী হয়, সেই ভয়ে তাহাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দেন। ওদিকে, হরেন্দ্র ঐ সংবাদ পাইয়া, লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, তাহার অনাথিনী জননীকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া নৌকা আরোহণে বাহির হয়, যে গ্রামে জমিদারকন্যার মাতুলালয়, জলপথে সেই গ্রামাভিমুখে যাত্রা করে।

এতক্ষণ আমরা যে যুবাটীকে বনমধ্যে দেখিয়া আসিতেছি, ঐ যুবাই সেই হরেন্দ্র-কুমার। পাঠক মহাশয়! আপনাদের সহিত হরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছে। হরেন্দ্র-কুমার একটী রত্নের অন্বেষণে আসিয়া আর একটী রত্নদর্শনে সেই রত্নলাভের নিমিত্ত আশার সাগরে ভাসিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভাব প্রকাশ।

সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। যিনি যে কার্য্যেই নিযুক্ত থাকুক না কেন, সময় তাহা দেখিতে চায় না। সময় সমভাবে অবিশ্রান্ত চলিয়া যায়। প্রাতঃকাল আইসে, পক্ষিগণ কলরব করে, সূর্য্যদেবের উদয় হয়, ধীরে ধীরে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া যায়, সন্ধ্যা হয়; রাত্রি আইসে। সে দিনটীও সেই রূপে গত হইল। আবার রাত্রিকাল ফিরিয়া আসিল। নক্ষত্রেরা দেখা দিল, চন্দ্র উদয় হইল না, চন্দ্রবিরহে তারকামালা তাদৃশী ফুল্লমুখী হইল না।

যুবক পালাইল; কাপালিক তাহাকে মহামায়ার নিকটে দেখিতে না পাইয়া, ইন্দুপ্রভা ইন্দুপ্রভা বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ইন্দুপ্রভা তখন বনমধ্যেএক নিভৃত কুঞ্জে দাঁড়াইয়া, জোনাকী পোকা ধরিয়া ধরিয়া, সুকুঞ্চিত কুন্তল জাল সাজাই-তেছিল, সে তখন সেই আনন্দেই নিমগ্ন, কাপালিকের আহ্বানবাক্য তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। কাপালিক একবার দুইবার তিনবার ডাকিল, কোন উত্তর পাইল না; তখন বিরক্ত হইয়া দ্রুতপদে সেই কুঞ্জাভিমুখে ধাবিত হইল; কুঞ্জসমীপে উপস্থিত হইয়াই ইন্দুপ্রভাকে দেখিতে পাইল। কাপালিককে সম্মুখে দেখিয়া, ইন্দুপ্রভা তখন লজ্জায় জোনকীগুলি ফেলিয়া দিতে লাগিল। কাপালিক তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাগলি! আজ আবার এ কি ভাব? তোমার কি আজও পাগলামী সারিল না? তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে আমার যে কণ্ঠ শুকাইয়া গেল, তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে জোনাকী লইয়া খেলা করিতেছ!"

লজ্জাবনত-বদনে ইন্দুপ্রভা কহিল, "কেন পিতা, এ সময় তো তুমি আমায় কোন দিন ডাক না? আমি বনে বনে বেড়াই, যাহা-ইচ্ছা, তাহাই করি। তুমিতো কোন কথা বল না; আজ কেন এমন কথা বলিতেছ?"

আরক্তবদনে কাপালিক জিজ্ঞাসা করিল, "সেই যুবক কোথায় ? তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কি ?"

"দেখিয়াছি।" বলিয়া ইন্দুপ্রভা সেই পরমলাবণ্যময় সুন্দর মুখখানি একবার আকাশের দিকে তুলিল, আবার অবনত বদনে বনভূমি দর্শন করিল। যুবকের নাম শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য তাহার প্রাণে যেন কি অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক ক্রীড়া হইয়া গেল।

কাপালিক বোধ হয়, বাহ্যভাবদর্শনে ইন্দুপ্রভার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মনে মনে কি চিন্তা করিল, মনে মনে বলিতে লাগিল, "আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিব। আর কেন? ইন্দুপ্রভাকে বলিদান করি। কি করিব ? ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় ইন্দুপ্রভাকে প্রতিপালন করিয়াছি, সেই ইন্দুপ্রভাকে বলি লইতে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হইল ! না না, জগজ্জননীর এমন ইচ্ছা হইতে পারে না। কি করি, যা থাকে ভাগ্যে, আজ আমি মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিব ; ইন্দুপ্রভাকে অবশ্যই মহামায়ার নিকট বলি দিব। অবশেষে সেই খড়্গে আত্মমস্তক ছেদন করিব। না, তাহা হইবে না। ইন্দুপ্রভা আপন পাদমূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে, আর তাহাকে বলি দিতে পারিব না ? ইন্দুপ্রভার বলি মায়ের অভিপ্রেত নয়। ইন্দুপ্রভা মরিয়াছে, প্রণয়ডোরে জীবন বান্ধিয়াছে, ইন্দুপ্রভাকে বলি দিতে পারিব না।"

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কাপালিক হুঙ্কার করিয়া বলিল, "ইন্দু আর লজ্জা করিলে কি হইবে ? সত্য করিয়া বল, কি হইয়াছে ?"

ইন্দুপ্রভা কহিল, "পিতা নিত্য নিত্য আমি কত পাপকর্ম্ম করি, তাহার ইয়ত্তা নাই ; এবার এ কি পাপ করিলাম ! আমি নিজেই তাহা বুঝিতে অক্ষম, যুবককে দেখিয়াছি, উদ্ধারও করিয়াছি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ইন্দুপ্রভা আবার বলিল, "আহা ! যুবক যৎপরোনাস্তি বিপদে পড়িয়াছিল, বিপন্নকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করা কি পুণ্য নয় ? আমার বোধ হয়, যে পুণ্যকার্য্যে তুমি শুভ্রমস্তক হইয়াছ, বিপন্নের প্রাণ রক্ষা করিলে তদপেক্ষা অধিক পুণ্য। যুবাকে উদ্ধার করিয়া আমি অনেক দূরে রাখিয়া আসিয়াছি। সে দূর অধিক দূর নয়, যখন দেখিতে ইচ্ছা করি, তখনিই দেখিতে পাই। এই চক্ষের সম্মুখেই সেই যুবা,—যুবা না হয়, বুঝি যুবার ছায়া-মূর্ত্তি হইবে। পিতঃ! কেন এমন হয় ? তাহাকে আর একবার দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। এখন আর এই বনভূমি ও লতাবৃক্ষাদি কিছুই আমার ভাল লাগিতেছে না। পিতঃ ! আমার এ ভাবান্তর কেন হইল ?

বলিতে বলিতে কালিকার চক্ষের কোণে অশ্রু দেখা দিল। কাপালিক একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "ইন্দুপ্রভা! যাহা হইয়াছে! তাহা ভালই হইয়াছে। মহামায়া যাহা করেন; তাহা মানবের মঙ্গলের জন্যই। আমি কত আশা করিয়া, কতদিন ধরিয়া, কতকষ্ট সহ্য করিয়া তোমাকে মানুষ করিলাম, শেষে কি তার এই প্রতিফল? ভাবিয়া কি করিব, শেষে কি দাঁড়ায়, তাহাই দেখি।

এই কথা বলিয়া কাপালিক উদ্ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় একদিকে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভূতের ভয়!

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা বুঝিতে পারা যায় না। আমরা যাহা করি, তাহা প্রকাশ হয়; কেহ না কেহ জানিতে পারে। কারণ, মানুষ চিরদিন প্রাণের কথা গোপন রাখিতে পারে না। ঈশ্বর যাহা করেন, অনেক দিন ধরিয়া গড়েন, প্রকাশ হইবার হইলে লোকসমাজে তাহা প্রকাশ পায়। আমরা একটী কথাও মনে রাখিতে পারি না, প্রকাশ করিবার জন্য মহাব্যস্ত হই। প্রকাশ হইলে যেন একটা ভারলাঘব মনে করি; বিধাতার ইচ্ছা, আমাদের মত একটী নয়, ভাবনাও একটী নয়; তোমার আমার মত কোটি কোটি জীবের ভাবনা তাঁহাকে প্রত্যহ ভাবিতে হয়। আমরা আগাগোড়া ঠিক্ রাখিয়া একটী কার্য্যও করিতে পারি না, কি আশ্চর্য্য! তিনি অনন্তবিশ্বের কোটি কোটি মানবের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান হিতাহিত চিন্তা করিতেছেন; কেহই সেই চিন্তামণির চক্রের গতি বুঝিতে পারে না। এত দেখিয়া শুনিয়াও নাস্তিকেরা তবু বলে, ঈশ্বর নাই, জগতের সমস্তই প্রাকৃতিক কার্য্য। এ প্রকার নাস্তিকের স্থান কোথায়?

ওদিকে নদীর কিনারায় নৌকার উপর হীরালাল। নৌকাখানি সমস্ত রাত্রি নঙ্গর করা ছিল। আরোহী ফিরিল না, হীরালাল অতি উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। উদ্বেগে উদ্বেগে উষা কালে তাহার একটু তন্দ্রা আসিল, ক্রমশঃ নিদ্রার আবির্ভাব। সে নিদ্রা স্বপ্নময়। হীরালাল স্বপ্ন দেখিতেছে, সে যেন আর ইহলোকে নাই, সে যেন কোন অজ্ঞাত লোকে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে যেন রাজা হইয়া রাজ-সিংহাসনে বিরাজ করিতেছে, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিকটদর্শন শ্বাপদেরা রাজ-পারিষদের ন্যায় তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে, এক কোণে একটি ষষ্ঠীবাহন বিড়াল বসিয়া মিউ মিউ রব করিতেছে।

হীরালাল যেমন সেই সকল পশুকে দূরীভূত করিবার উপক্রম করিতেছিল, অমনই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। যে হীরালাল, সেই হীরালাল। নিদ্রাভঙ্গে হীরা-

লালের আর পরিতাপের সীমা রহিল না। সে ভাবিতে লাগিল, "ভাগো রাজা হইয়াছিলাম, বিধি বাদ সাধিল!" তাহার তখন এইরূপ আক্ষেপ।

জীবনে যাহারা সুখের মুখ দেখিতে পায় না, সুখস্বপ্ন দেখিয়া তাহারা আনন্দ-অনুভব করে। ক্রমে বেলা হইল, আকাশেসূর্য্যদেবউদয় হইলেন। নৌকায় বসিয়া মনিবেরমুখ চাহিয়া, আশাপথনিরীক্ষণ করিয়া করিয়া, হীরালাল অনেকক্ষণ অনেক প্রকার ভাবিল। বেলা প্রায় চারি দণ্ড। ধীর সমীরে নদীক্রোড়ে তরঙ্গশিশু নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে। রবিকর ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইতেছে। গোপালসঙ্গে গোপাল বালকেরা মাঠে মাঠে বিচরণ করিতেছে।

বেলা প্রায় একপ্রহর। আরোহী ফিরিল না। "দূর হউক, আর কাজ নাই!" এই বলিয়া হীরালাল নৌকা খুলিয়া দিল, তরঙ্গের প্রতিকূল স্রোতে গা ঢালিয়া নৌকা খানি মন্থরগতিতে ভাসিয়া চলিল। এক স্থানে একটী মোহানা। সেইখানে অন্যান্য নৌকার মাঝি-মাল্লারা মধুর স্বরে সারি গাহিতেছে—একটী গীত হীরালালের কর্ণে প্রবেশ করিল।

আয়রে আর কোকিল পাখী আমার নায়ে আয়।
আমার প্রেমের তরি ভেসে যায়॥
(হোঃ হোঃ হোঃ)
বউ কথা কও চোখ গেল রা তোর সুরেতে গায়,
ধার-করা সুর চাই নে আমার আসল সুরে প্রাণ জুড়ায়॥
(হোঃ হোঃ হোঃ)
তোর কুহুরবে সাঁঝের বেলা কচি ছেলের ঘুম পাড়ায়,
বিরহীদের প্রাণ জুড়ায়ে রসিক লোকের প্রেম জাগায়॥
(হোঃ হোঃ হোঃ)

সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া হীরালাল মোহিত হইয়া গেল। তাহার মনে মনে বাসনা হইল, তাহাদের সুরে সুর মিলায়। তাই জোরে জোরে কাশিতে লাগিল; গলা শানাইল; কিন্তু গীত বাহির হইল না; অনেক কষ্টে বেসুরা আওয়াজে হীরালাল গাহিয়া উঠিল,

গোয়ালাদাদা কি দই দিলি ছ্যা ছ্যা ছ্যা।
নন্দ ঘোষের ছাওয়াল নাচে তা ধিন্না-তা॥
কোকিল পাখী গান গেয়েছে তাই রে নারে না।

বল তোরা ভাই মাখাল ঠাকুর,
বল তোরা ভাই বদর বদর
ভাসলো আমার না॥
হোড়্‌র হোঃ হোঃ হোঃ

সেই সময় অপর একখানি নৌকা হইতে একজন আরোহী বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা বাবা, খুব গাহিয়াছ! কি মিষ্ট গলা রে! যেন লক্ষ কোকিলের ঝঙ্কার! বেশ দাদা! খুব ফুর্ত্তির সহিত গাও!'

নির্ব্বোধ হীরালাল উৎসাহ পাইয়া ভাবিল, তাহার গান বুঝি বড়ই চমৎকার হইতেছে; তখন মহানন্দে আবার গলা শাণাইয়া খুব জোরে জোরে পুনরায় গলার কায়দা দেখাইতে লাগিল। অন্য নৌকার আরোহীরা এবার বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "আর ভাঙ্গা কাঁসী বাজাতে হবে না" তখন হীরালালের লজ্জা হইল। সে ভাবিল, এরা আবার কি বলে! এই বল্লে কোকিল, আবার এখন বলে ভাঙ্গা কাঁসি! ইহার মানে কি!" থাক্ আর বে রসিকদের কাছে গান গাওয়া হবে না।

হীরালালের তরণী ভাসিয়া চলিল, বন্দিপুরের ঘাটে উপস্থিত হইল। হীরালাল ঘরে গেল। একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে হীরালালের গৃহিণী; পতির অদর্শনে সে চতুর্দ্দিক্ আঁধার দেখিতেছিল।

জাতিতে হীরালাল ধীবর, মাছ ধরা ছাড়া মধ্যে মধ্যে নৌকার মাঝিগিরী করে। পরিবারের মধ্যে কেবল ঐ একটীমাত্র স্ত্রী, দুটী চুনা মাছ ধরিয়া দিয়া উপকার করে, তেমন অভিভাবক আর কেহই ছিল না। হীরালাল যে দিন ঘরে আসিল, সেদিন তাহার স্ত্রীর উপবাস; পূর্ব্বদিন কোন প্রকারে উদরে দুটি অন্ন দিয়াছিল, এদিন আর জোটে নাই।

দুঃখিনী কাঁদিতেছিল। পত্নীকে কাঁদিতে দেখিয়া হীরালাল কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল গিন্নীরে! এবারে মারা গেছলাম আর কি! ভাগ্যে ভাগ্যে বেঁচে এসেছি! বাবা রে! বামুনদের সেই পাগলা ছেলেটাকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছলো!

ভূতের কথা শুনিয়া ধীবর-পত্নী কাঁপিয়া উঠিল, রাম রাম বলিয়া হায় হায় করিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে বাবারে! আমাকে তবে বিধবা হতে হয়েছিল!" কথার সঙ্গে সঙ্গে আরও ক্রন্দন।

রোগের মুষ্টিযোগ।

লেখক, কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরি।

১। পারদদোষে নাটার ডগা। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আবিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত পারদ, চিকিৎসাজগতে একটী প্রধান ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আর্য্য ঋষিরা শোধিত পারায় কঠিন পীড়া আরোগ্য করিতেন। অনেকের বিশ্বাস, কাঁচা পারা খাইলে গায়ে চাকা চাকা দাগ হয় ও মুখে গায়ে পারা ফুটিয়া বাহির হয়। এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক। কারণ, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা কাঁচা পারা বিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মরা পারা বা অন্য কোন প্রকারে পারদ দোষ ঘটিয়া রক্তবিকৃতি হইলে নাটার ডগা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কতকগুলি নাটার ডগা লইয়া খানিকটা জল দিয়া তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। সিকি আন্দাজ জল থাকিতে নামাইতে হইবে। তৎপরে সেই জল অর্দ্ধ ছটাক আন্দাজ প্রত্যহ খাইতে হইবে এবং বনমুলা গাছের রস দিয়া গায়ের ক্ষতস্থানগুলি ধুইয়া দিতে হইবে। এইরূপ এক সপ্তাহ করিলে পারদঘটিত দোষ অন্তর্হিত হইয়া দেহ সবল হইবে।

২। অম্লরোগে ঘুঁটের ছাই।

অজীর্ণ রোগ হইতে অম্ল রোগের উৎপত্তি, দুষ্পাচ্য দ্রব্যাদিভক্ষণে অজীর্ণ রোগ জন্মে, আজ কাল বাজারের দুষিত ঘৃতপক্ব দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া অনেকে অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন। এই সমস্ত কারণে যে, অম্লরোগ উৎপন্ন হয়, তাহা সামান্য টোট্‌কা দ্বারা আরোগ্য হয়; কিন্তু অতিরিক্ত বীর্য্যক্ষয় জন্য যে অজীর্ণ রোগ হইতে অম্ল রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা শীঘ্র নিরাকরণ না করিলে অম্লশূল রোগে পরিণত হয়। তখন তাহা দুরারোগ্য হইয়া উঠে। অম্লরোগের কয়েকটী কারণ লিখিত হইল। এই কারণগুলি দূর করিয়া ঔষধ ভক্ষণ করিয়া অম্লশূল পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়াছে।

১। গুরুপাক দ্রব্যাদি ভক্ষণ।

২। অনিয়মিত সময়ে স্নান ও ভোজন।

৩। রাত্রিজাগরণ।

৪। পরিশ্রমের অভাব ও অত্যাধিক পরিশ্রম।

৫। অত্যন্ত ক্রোধ ও অত্যন্ত শোক।

৬। অতিরিক্ত বীর্য্যক্ষয়।

সাদা ঘুঁটের ছাই উত্তম রূপে পেষণ করতঃ পাতলা কাপড়ে চালিয়া লইয়া তাহাতে অল্প পরিমাণে সৈন্ধব লবণ সংযোগ করিয়া ৵০ এক আনা আন্দাজ উক্ত ছাই চূণের জলের সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিতে হইবে, রোগ কঠিন হইলে একটু দীর্ঘকাল সেবন করিতে হইবে, সেই কয় দিন তরল দ্রব্য ও লঘু পাকদ্রব্যাদি খাইতে হইবে। অনেকে ভাত না খাইয়া অম্লরোগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন। চূণের জল প্রস্তুত করিবার নিয়ম অনেকে জানে না। নিম্নে প্রস্তুত প্রণালী লিখিয়া দিলাম।

চূণের মাল্সায় খানিকটা জল দিয়া ২।১ দিন রাখিয়া সেই জল আস্তে আস্তে অন্য একটী পাত্রে ঢালিয়া তাহাকে আবার একদিন সেই পাত্রে রাখিতে হইবে। এইরূপে ৩ বার করিয়া যে জল পাওয়া যাইবে, তাহাই চূণের জল; সেই জল ব্যবহার করিতে হইবে।

চা খড়ি চূর্ণও অম্লরোগের ভাল ঔষধ। চা খড়ি (ফুল খড়ি) উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া পাতলা ন্যাকড়া দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া সৈন্ধব লবণ সংযোগে কিছুদিন খাইলে অম্ল রোগের উপকার হয়।

অম্লোদ্গারে যখন বুক জলিতে থাকে তখন খানিকটা সোডা জলে গুলিয়া খাইলে জ্বালা নিবারণ হয়। কিন্তু সোডা বেশী দিন খাইলে পাথুরী পীড়া হইতে পারে।

মুড়ি জলে ভিজাইয়া সেই জল খাইলে অম্লের উপকার হয়, ঝুনো নারিকেলের জল বা ডাবের জল অম্লরোগের পক্ষে উপকারী, অম্লরোগী আহারের পর খানিকটা লবণ মুখে দিয়া জল খাইলে, পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি হইয়া তাহাকে অম্ল রোগের হস্ত হইতে মুক্ত করে।

স্বপ্ন লব্ধ অনেক দৈব ঔষধ দ্বারা অম্লরোগ ও অম্লশূলের শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতায় রামবাগানের মাদুলী অম্লরোগের আশ্চর্য্য ঔষধ তাঁহারা বিনামূল্যে প্রদান করেন। একটী পয়সা গ্রহণ করেন না। তবে সে ঔষধে অনাচার লাগিলে তাহার আর আরোগ্য করিবার গুণ থাকে না।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতোক্ত
শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ। *

প্রভুপাদ পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত।

১। মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি আসি তোমা-স্থান॥
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি।
অতএব তোমারে দিলাঙ দেখা আমি॥ আদি ৩অঃ৩৮পৃষ্ঠা

২। দাস বিনু অন্যে মোর না দেখে প্রকাশ॥ আঃ ৩।৩৯

৩। সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে আমার অবতার।
করাইমু সর্ব্বদেশে কীর্ত্তন প্রচার॥ আঃ ৩।৩৯

৪। যথা মোর স্থিতি-সেই সর্ব্ব পুণ্যস্থান।
গঙ্গা-আদি সর্ব্বতীর্থ তহিঁ অধিষ্ঠান॥ আঃ ৫।৫৩॥

৫। প্রভু বোলে-কৃষ্ণ পোষ্টা করিব পোষণ। আঃ ৬।৬১॥

৬। অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়॥ আঃ ৭।৭২ পৃষ্ঠা॥

৭। বহির্ম্মুখ-সম্ভাষা করিতে না জুয়ায়॥ আঃ ৭।৭৮॥

৮। প্রভু বোলে—ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দেখে—দোষ সেই পাপী জন॥
ভক্তের কবিত্ব যে-তে-মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥
মূর্খে বোলে—বিষ্ণায়, বিষ্ণবে বোলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥
ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ।
ভক্তের বর্ণন মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥আঃ ৭।৮১ পৃষ্ঠা॥

৯। শুন ভাইসব! এই কহি তত্ত্বকথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
যে যে-গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥

---

* পৃষ্ঠাকগুলি শ্রী অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের

হৈহয়, নহুষ, বেণ, নরক, রাবণ।
মহা দিগ্বিজয়ী শুনিঞাছ যে যে জন॥
বুঝ দেখি—কার গর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়ে।
সর্ব্বদা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সহে॥আঃ ৯।৯৪ পৃষ্ঠা।।
১০। 'দিগ্বিজয় করিব'—বিদ্যার কার্য্য নহে
ঈশ্বরে ভজিলে সে বিদ্যায় সভে কহে॥
মন দিয়া বুঝ—দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ—সঙ্গে কেহো নাহি চলে॥
এতেকে মাহন্ত-সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বরসেবা দৃঢ় চিত্ত করি॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র! সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবত সেবহ কৃষ্ণ—করিয়া নিশ্চয়॥
সে-ই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি হয়'॥
মহা উপদেশ এই কহিল তোমারে।
সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য—অনন্ত সংসারে,॥আঃ ৯।১০০॥
১১। প্রভু বোলে—বিপ্র! সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ—সর্ব্বভূতে দয়া করি॥ ঐ॥
১২। বেদগুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু ক্ষয়।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয়॥ ঐ
১৩। গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম—।
অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশু-পক্ষী হইতেও অধম বলি তারে॥
যার বা না-থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্টদোষে।
সেহো তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে॥

সত্য বাক্য কহিবেক করি পরিহার।
তথাপি অতিথি শূন্য না হয় তাহার॥
অকৈতবে চিত্তসুখে—যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি, অতিথির ভক্তি,॥ আঃ ১০।১০২॥
১৪। প্রভু বোলে—মাতা! দুঃখ ভাব কি-কারণে?
ভবিতব্য যে আছে সে ঘুচিব কেমনে?
এইমত কালগতি—কেহো কারো নহে।
অতএব 'সংসার অনিত্য' বেদে কহে॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ—কে করিতে পারে আর?॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
হইল সে কার্য্য,—আর দুঃখ কেনে তায়?॥
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তারে বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী?॥ আঃ ১০।১০৮॥
১৫। প্রভু বোলে—কেনে ভাই! কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে,—কি যুক্তি ইহার?॥
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
তবে তারে 'শ্মশান-সদৃশ' বেদে বোলে॥
বুঝিলাম—আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি ভাই! তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা॥
চল—সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পড়িবার॥ আদি ১।১০৯ পৃষ্ঠা
১৬। পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি নিলে॥ আঃ ১০।১১২॥
১৭। সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক পানে॥ আঃ ১২।১৩১
১৮। (ঈশ্বরপুরীর প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গ—)
প্রভু বোলে—গয়াযাত্রা সকল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহো যারে পিণ্ড দিয়ে—তরে সেই জন॥

তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥ আঃ ১২।১৩৩

১৯। প্রভু বোলে—সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বোলয়ে আন॥
কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি-যত কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে॥
আগম বেদান্ত-আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে—কৃষ্ণপদে ভক্তি ধন॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি—অন্যপথে যায়॥
করুণাসাগর কৃষ্ণ জগতজীবন।
সেবকবৎসল নন্দগোপের নন্দন॥
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতিমতি।
পড়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র—তাহার দুর্গতি॥
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥
এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার—সেই-দুঃখ পায়॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম—অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি মরে॥
পড়িয়া-শুনিঞা লোক গেল ছারখারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥
পূতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তি দান।

হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোক করে অন্য ধ্যান ॥
অঘাসুর-হেন পাপী যে কৈল মোচন।
কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন ॥
যে কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র।
না বোলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র ॥
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা ছাড়ি নৃত্য-গীত করয়ে মঙ্গল ॥
অজামিল উদ্ধারিল যে কৃষ্ণের নামে।
ধন-কুল-বিদ্যা-মদে তাহা নাহি জানে ॥
শুন ভাই-সব! সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-ধন ॥
যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ।
যে চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধ দাস ॥
যে চরণ হইতে জাহ্নবী-পরকাশ।
হেন পাদপদ্মে ভাই! সভে হই দাস ॥ মধ্য ১।১৪৫,১৪৬॥

২০। প্রভু বোলে—আজি পড়িয়াও কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণধাম ॥
সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন ॥
সে-ই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায় ॥
চণ্ডাল চণ্ডাল নহে—যদি 'কৃষ্ণ' বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র—যদি অসৎ পথে চলে ॥ মঃ ১।১৪৭

২১। শুনশুন মাতা! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ ॥
কৃষ্ণের সেবক মাতা! কভু নহে নাশ।
কালচক্র ডরায়েন দেখি কৃষ্ণদাস ॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ—জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা! কিছুই না জানে ॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ,—যে না ভজে বাপ।

পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মজন্ম তাপ ॥
চিত্ত দিয়া শুন মাতা! জীবের যে গতি।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি ॥
মরিয়া-মরিয়া পুন পায় গর্ভবাস।
সর্ব্ব-অঙ্গে অমেধ্য-পঙ্কের পরকাশ ॥
কটু-অম্ল-লবণ—জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার,—মহামোহ পায় ॥
মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেড়ি খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি—মরয়ে জ্বালায় ॥
নড়িতে না পারে তপ্ত-পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে ॥
কোন অতিপাতকীর-জন্ম নাহি হয়।
গর্ভেগর্ভে হয় পুন উৎপত্তি-প্রলয় ॥
শুনশুন মাতা! জীবতত্ত্বের সংস্থান।
সাত-মাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান ॥
তখন সে সঙরিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে—ছাড়িয়া ঘনশ্বাস ॥
রক্ষ কৃষ্ণ জগতজীবন প্রাণনাথ!
তোমা বই জীব দুঃখ নিবেদিব কা'ত ॥
যে করয়ে বন্দী প্রভু!—ছাড়ায়ে সে-ই সে।
সহজ-মৃত্যোরে প্রভু! মায়া কর কিসে ॥
মিথ্যা ধন-পুত্র-রসে বঞ্চিলুঁ জনম।
না ভজিলুঁ তোর দুই অমূল্য চরণ ॥
যে পুত্র পোষণ কৈলু অশেষ বিধর্ম্মে।
কোথা বা সে সব গেল মোর এই কর্ম্মে ॥
এখন এ দুঃখে মোরে কে করিবে পার।
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার ॥
এতেকে জানিনু সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ প্রভু কৃষ্ণ! তোর লইনু স্মরণ ॥
তুমি-হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া।

ভুলিলাঙ অসৎপথে প্রমত্ত হইয়া ॥ ১৪৭ পৃষ্ঠা
উচিত তাহার এই শাস্তি যোগ্য হয়—।
করিলা ত,—এবে কৃপা কর মহাশয় ! ॥
এই কৃপা—আর যেন তোমা না পাসরি।
যেখানে-সেখানে কেনে না জন্মি না মরি ॥
যেখানে তোমার নাঞি যশের প্রচার।
যথা নাঞি বৈষ্ণবগণের অবতার ॥
যেখানে তোমার মহামহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥
গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু ! এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল ॥
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর প্রভু ! না ফেলিবা তথা ॥
এইমত দুঃখ প্রভু ! কোটিকোটি জন্ম।
পাইলুঁ বিস্তর প্রভু ! সব মোর কর্ম্ম ॥
সে দুঃখ-বিপদ প্রভু ! রহু বারেবার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে—সর্ব্ববেদসার ! ॥
হেন কর কৃষ্ণ ! এবে দাস্যযোগ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসীনন্দন করিয়া ॥
বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার।
তোমা বই তবে প্রভু ! না গাইলুঁ আর ॥
এইমত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহো ভাল বাসে কৃষ্ণস্মৃতির কারণ ॥
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে ভূমিতে আপন অনিচ্ছায় ॥
শুন শুন মাতা ; জীবতত্ত্বের সংস্থান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় আগেয়ান ॥
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে ক্ষণে কান্দে শ্বাসে।
কহিতে না পারে—দুঃখ সাগরেতে ভাসে ॥
কৃষ্ণের সেবক জীব—কৃষ্ণের মায়ায়।

কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত দুঃখ পায়॥
কতদিনে কালবশে হয় বুদ্ধি জ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ—সেই ভাগ্যবান্॥
অন্যথা ভজে কৃষ্ণ,—কৃষ্ণ সঙ্গ করে।
পুন সেইমত মায়া পাপে ডুবি মরে॥ ১৪৮ পৃষ্ঠা
অনায়াসে মরণ,—জীবন দুঃখ-বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে॥
এতেকে, ভজহ কৃষ্ণ—সাধুসঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা! মুখে বোল হরি॥
ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তি হীন,—পরহিংসা যায়॥ ম০ ১।১৪৭—১৪৯॥
২৩। প্রভু যোগে—সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মভর॥ ম০১।১৪৯॥

—:০:—

রাঁচি ভ্রমণ।

লেখক, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ জ্যোতিষী।

হাওড়ায় সন্ধ্যার সময় বিএন আর রেলের গাড়িতে চড়িলে পরদিন অপরাহ্নে রাঁচি পৌছান যায়। কিন্তু আমার অপর আবশ্যক থাকায় আমি মুর্শিদাবাদ হইয়া নবচালিত সাইথিয়া অণ্ডাল শাখা হইয়া বীরভূমির পথে রাঁচি গিয়াছিলাম। মুর্শিদাবাদ হইয়া সাইথিয়া ষ্টেসন পর্য্যন্ত আসিলেই বাঙ্গালার সমতলক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া একটু একটু পাহাড় শ্রেণী দেখা যায়, বীরভূমির জমি কঠিন কাঁকর যুক্ত ও নতোন্নত কোথা কোথাও এক একটা পাথরের ঢিবি। তাহার পরেরই জেলা মানভূম কতকটা সমান ধর্ম্মাক্রান্ত। সেই নতোন্নত ভূমি ও দুই একটি দূর দূরান্তরে পাথরের ঢিবি পাহাড় মাথা তুলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শস্যক্ষেত্র ও শালবন। কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্তুল শিলাস্তূপ ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিতেছে। অস্থ যে শিলা অণ্ডাকারে আছে এ পশত বা দ্বিশত বর্ষ করে তাহা হস্তীর মত বৃহৎ হয়, এবং কালে আবার তাহাই বাড়িয়া পর্ব্বতাকার ধারণ করে। পুরুলিয়া যাইতে যে সকল কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর স্তূপ দেখা যায়, তাহা দেখিলে মনে হয় যেন বৃহৎ বৃহৎ হস্তী হাঁটু

গাড়িয়া বসিয়া আছে। মেঘ দূতের 'বপ্রক্রীড়া পরিণত গজপ্রেক্ষনয়ং" ইত্যাদি কালিদাসের কল্পনা এইরূপ প্রস্তর স্তূপ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই কৃষ্ণবর্ণ স্তূপ গুলি স্লিরেট গোল কাজেই ইহাদের উপর কোনও বৃক্ষাদি জন্মে না। যে পর্ব্বত শ্রেণীর উপর বৃক্ষাদি জন্মে তাহা দূর হইতে মেঘের মত দেখায়। একটি কৃষ্ণস্তূপ মন্দিরাগ্র দেখিলে বাঙ্গালা দেশের বৃহৎ বৃহৎ মন্দির বলিয়া মনে হয়, বা ভগ্ন দেবালয়ের শিরোদেশে যেরূপ বৃক্ষাদি জন্মে ইহাও তদ্রূপ দেখায়।

কলিকাতায় সন্ধ্যাকালেগাড়ি চড়িলে বিএন রেলেরগাড়িতে উত্তমনিদ্রা দিয়া প্রাতে পুরুলিয়া পৌছান যায়। পুরুলিয়া উত্তম স্বাস্থ্য প্রদ স্থান। কলিকাতার অনেকেই এখানে স্বাস্থ্যলাভের আশায় বাস করিতেছেন। পুরুলিয়া একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুখনা খট্ খটে নূতন সহর। সুজল সুফল ও মলয়জ শীতল ও শস্য শ্যামল। এই বর্ষে পুরুলিয়ায় উত্তম ধান্য হইয়াছে, নতোন্নত পুরুলিয়ার এক একস্থানে মনুষ্য স্কন্ধ প্রমাণ ধান্য শীষ উন্নত হইয়াছে। কাজেই পুরুলিয়া অসাধারণ শস্য শ্যামল। আমি ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত হইয়া স্বাস্থ্য লাভের আশায় রাঁচি যাইতেছি। পুরুলিয়ায় নামিয়া পুনরায় ছোট গাড়িতে চড়িয়া রাঁচি যাইতে হয় কাজেই এখানে কয়েক দিন অবস্থান করিলাম।

পুরুলিয়ার সাহেব বাঁধের কি উত্তম জল, সেই জল পান করিয়া আমার ছয় বর্ষ ব্যাপি কঠোর ম্যালেরিয়া বিনা ঔষধে পঞ্চম দিনে আরোগ্য হইল। আমার উত্তপ্ত দেহ শীতল হইল। দেহে বল পাইলাম। দুই মাইল বেষ্টন যুক্ত একটা নিম্নভূমির একধারে একটা বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। বাঁধটা একতলা ঘরের পরিমাণে উচ্চ। সেই বাঁধের মধ্যস্থলে জল জমিয়া একটা বড় পুকুর হইয়াছে। দুই মাইল পরিধি বিশিষ্ট একটা বড়পুকুর যাহার মধ্যে দুইটি দ্বিপ আছে। জল কাঁচের মত স্বচ্ছ। স্নান করিলে দেহ মন প্রাণ শীতল হয়। বাঁধের পশ্চিম দিকে কলিকাতার বাবুদিগের উত্তম বাঙ্গালা। এমন একটা হেঁদুয়া পুস্করিণীর নাম সাহেব বাঁধ। সাহেবী ভাষায় ইহার নামLake বা সরোবর। পুরুলিয়ায় আরও একটি পুকুর আছে। তাহার নাম পোকা বাঁধ। স্থানীয় লোকে ঐ পুকুরের জল খায়। পুরুলিয়ায় আর একটি নদী আছে তাহার নাম "কাঁসাই" যাহা উড়িষ্যা গিয়া কংশাবতী হইয়াছে। কাঁসাই পুরুলিয়া সহর হইতে এক মাইল দূরে। কাঁসাইর জলের কথা আর কি লিখিব। স্বর্গে অমৃত পাওয়া যায় শুনিয়াছি, কিন্তু অমৃত পার্ব্বত্য নদীর জল। একদিন কাঁসাই দেখিতে গিয়া তাঁহার বালুকা বিধৌত জল

অমৃত পিপাসায় পান করিলাম আর পিতৃপুরুষের উদ্দেশে অঞ্জলি অঞ্জলি জল দিলাম। তৃষ্ণা না থাকিলেও অঞ্জলি অঞ্জলি জল খাইলাম। যদি বাঁধিয়া আনিবার হইত, তবে কলিকাতায় বাঁধিয়া আনিতাম। শরৎকালে কাঁসাই নদীর জল স্থানে স্থানে দুই হাত আড়াই হাত হইবে। এইস্থলে যেখানে দুই হস্তের অধিক জল হয় সেখানে মাছ জন্মে।

পুরুলিয়ায় কোনও ঋতুর প্রশংসা শুনিলাম না। কিন্তু পুরুলিয়া মলয়জ শীতল। পুরুলিয়ার শরৎকাল কলিকাতার বসন্ত কাল। এখানে শরতে শিশির পড়ে না। এঅঞ্চলের শীতকে শুষ্কহিমDvycold বলে প্রাতে শরৎকালে ভোরে ৫টায় উঠিতাম এবং ঐ সাহেব বাঁধের একপার্শ্বে বসিয়া থাকিতাম। ৮টায় বাসায় ফিরিতাম। এবং সন্ধ্যা ৫ টায় বেড়াইতে বাহির হইতাম, ৭ টায় ফিরিতাম এত হিম লাগাইয়াও একদিন কথা লাগে নাই। কলিকাতার মত ধূলি ধূসর আকাশ ও ধূমাচ্ছন্ন সন্ধ্যা এখানে নাই। এখানে নির্ম্মল আকাশ ও নির্ম্মল বায়ু। কেবল বড় বড় রাস্তা।

পুরুলিয়া সহরের নিকটে কোনও প্রস্তর স্তুপ নাই। শ্যামা পূজার দিন পুরুলিয়ার সব ডিভিজন রঘুনাথ পুরে যাই। সেখানে গ্রামের পার্শ্বেই একটি সুন্দর প্রস্তর স্তুপ আছে। আমি প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাহার শিরোদেশে বসিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতাম। এই পাহাড়টি ৭।৮ তলবাড়ির মত উচ্চ হইবে। ইহার উপর বসিয়া বসিয়া ভাবিতাম—"যে করেছে কোন দিন গিরি আরোহণ, সে জানে ভূধর শোভা বিচিত্র কেমন" কালিদাসের দুষ্মন্তের পুষ্পক রথে সত্যে আগমন ও তাহার বর্ণনা মনে করিতাম। এ পর্ব্বতের উপর উঠিয়া রঘুনাথ পুর গ্রাম খানি যেন একটি ক্ষুদ্র বাটীর মত বলিয়া মনে হইত, নিচের মানুষ গুলিকে যেন বকের মত বলিয়া মনে হইত। মন্দির উদ্যান অট্টালিকা প্রভৃতি যেন একটি চিত্র পটের মত মনে হইত। যত উচ্চ হইতে নিচে নামিতাম তত যেন তাহাদিগকে বৃহৎ হইতে বৃহৎতর দেখিতাম।

পুরুলিয়ায় আসিবার সময় পথে একস্থানে একজন সাঁওতাল আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তোমাদের কলকত্তা কেওবড় সহর আছে! আমি—বড় ভারি সহর আছে। সাঁওতাল পুরুলেসে? সাঁওতালের কথায় আমি পরাজিত হইয়া স্বীকার করিলাম—না পুরুলের অপেক্ষা কলিকাতা ভারি সহর নহে। সাঁওতাল খুসী হইয়া গেল। একবার ঢাকাতে এইরূপ প্রশ্ন হয়। আমার দুর্বুদ্ধি যে আমি প্রশ্ন কর্ত্তাকে বুঝাইতে গিয়াছিলাম যে ঢাকা কলিকাতার অপেক্ষা বড়সহর নহে। কিন্তু

এখানে সুবুদ্ধি হইয়া স্বীকার করিলাম কলিকাতা অপেক্ষা পুরুলে বড় সহর। রঘুনাথ পুর সম্বন্ধে ঐরূপ প্রবাদ সাঁওতাল মুখে শুনায়—"সহর ত রঘুনাথ পুর, ইবির চিড়া ইঘির গুড়।" রঘুনাথ পুরে খুব চিড়া কুটিতেছে দেখিলাম, কিন্তু গুড়ত দেখিলাম না। রঘুনাথ পুরে উত্তম মটকা কাপড় জন্মে ঐ কাপড়ের অনেক তাঁত দেখিলাম। তাঁতিরা কলিকাতা পর্য্যন্ত ঐ কাপড় চালান দেয়। এক স্থানে পাহাড়ে উঠিবার সময় একটা সাঁওতালকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বাঘ আছি? সে উত্তর দিল—দুটা একটা। দুই দশটা থাকিলে বোধ হয়, সে তাহাদের সহিত লড়াই করিত। আমি বাঘের ভয়ে সে পাহাড়ে উঠিলাম না। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার পর দিন দিবা ১০টার সময় বিএন রেলের ক্ষুদ্র আকারের নবউদবটীত রাঁচি পুরুলিয়া শাখায় চড়িয়া রাঁচির অভিমুখে চলিলাম। ছোট মাপের যতগুলি গাড়ি এপর্য্যন্ত খুলিয়াছে, তাহার মধ্যে রাঁচি পুরুলিয়া উত্তম লাইন। গাড়ি গুলি অতি সুন্দর ও সুদৃশ্য। কোনও প্রকার কষ্ট নাই কোনও শব্দ নাই। গ্যাসের আলোক শোভিত। যথা সম্ভব দ্রুতগামী। দুই ফুট গাড়ির সকলের মধ্যে ইহাই উত্তম। বাঙ্গালী গৌরব বি,পি রেলের মত ঝন ঝন শব্দ করে না। আমাদের সেই নিঃশব্দ যনে সুখী হইবার কিছুই নাই।

সেই গাড়িতে চড়িয়া ১০।১২ ক্রোশ পথ আসিলে মানভূমের অপর উপবিভাগ ঝলদা পাওয়া যায়। এই ঝলদা ষ্টেশন অতিক্রম করিলেই বিন্ধ্য পর্ব্বত শ্রেণী আরম্ভ হইল। ঝলদহে একজন কলিকাতার ছোকরাবাবু সাঁওতালী লৌহ হইতে ছুরি কাঁচি ক্ষুর দা প্রভৃতির কারখানা করিয়াছেন। যাত্রীগণ অনেকেই তাহা ক্রয় করিল। বিন্ধ্য পর্ব্বত শ্রেণীর সহিতই রাঁচি জেলার সিমানা আরম্ভ। পুরুলিয়ার পথে যেমন ২।১০ ক্রোশ পথ অন্তে দুই একটা পাথরের ডিপি দেখা যাইত এই ঝলদার পর হইতে অসংখ্য শিলাস্তূপ চতুর্দ্দিকেই মস্তক উত্তোলন করিয়া কি দেখিতেছে। রঘুনাথ পুরে একটি প্রস্তর স্তূপ দেখিয়া কতই আনন্দ হইয়াছিল, আর ঝলদা ষ্টেসনের পর অসংখ্য প্রস্তর স্তূপ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া গেলাম। ঝলদার পর ৫ মাইল পথ এইরূপ অসংখ্য বৃক্ষ প্রস্তর স্তূপে পর্ব্বতমালায় আসিয়া পড়িলাম। এইবারে একটি উচ্চ দেওয়ালের মত পর্ব্বতমালা উত্তরাংশে আর দক্ষিণাংশে আমাদের গাড়ি চলিয়াছে। ক্ষণিক পরেই উভয় পার্শ্বে সমোন্নত পর্ব্বত শ্রেণী মধ্যে ক্ষীণা ও শীর্ণা তরঙ্গিণী সুবর্ণ রেখা ও তাহার উত্তর পার্শে আমাদের গাড়ি। এই ভাবে ৫ ক্রোশ পথ আসার পর আমরা সিল্লি ষ্টেসনে আসিলাম।

এইখানে আমাদের গাড়ির গতি আর একরূপ হইল। আমরা সুবর্ণ রেখা পার হইয়া দক্ষিণ পারে আসিলাম এইখান হইতে আমাদের গাড়ি দক্ষিণের পর্ব্বত শ্রেণীর উপর উঠিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ২০০।৩০০ হাতউচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া আমাদের গাড়ি চলিয়াছে; নিচে রেখা মাত্র সুবর্ণ রেখা। এইস্থানে যাইতে যাইতে প্রকৃতির শোভায় আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়, এই পথে যাইতে ২ ভাবিতে লাগিলাম যদি এখান হইতে পড়ে তবে কি হয়। এইরূপ ৫ মাইল আসিয়া গঙ্গা ঘাট ষ্টেসন পাইলাম এই ষ্টেসন সমুচ্চ পর্ব্বতের উপরেই। তাহার পর ক্রমে নামিয়া সমতল ক্ষেত্রে আসিলাম। টাটি সিল্লী ষ্টেসন হইতেই রাঁচির শীত বুঝিতে পারিলাম। রাচিতে কার্ত্তিকে যে শীত, কলিকাতার পৌষেও তাহা হয় না। দিবা ৪টায় রাঁচি পঁহুছিলাম। পথে চাবাগিচা দেখিলাম।

রাঁচি ষ্টেসন হইতে রাঁচি সহর প্রায় এক ক্রোশ দুরে অবস্থিত। একটি সমতল অধিত্যকার উপরে একটি সুন্দর সুপরিস্কৃত নগর। দীর্ঘ প্রশস্ত দূর প্রসারী রাজ পথ। স্থির ছায়া ক্রমাসীর্ণ, পারিজাত প্রসূনের গন্ধা মোদিত। উদ্যান অট্টালিকা আরাম সুশোভিত। ১০।১২ বা ১৫ বিঘা জমি লইয়া এক একটা বাড়ি। এক কথা রাঁচি যাইতে পারে। যে দিকে চাই সেই দিকেই কেবল বাঙ্গালা। ১৫০।২০০ সাহেবদের বাঙ্গালা আর দিকে বাঙ্গালী বাবু বা কলিকাতার বাবুদের বা বিলাত ফেরত দের বাঙ্গালা।

শান্তি।

লেখক, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র।

১

শান্তি দেবি! এ সুন্দর উদ্যান মাঝে,
তোমার সুন্দর মধুর মূরতি রাজে;
পবিত্রতা স্নেহময়ি ভগিনী তোমার,
হাঁসিতে ছুটায় তার লহরী অপার॥

২

হেথা মলয়ের শ্বাস বহিয়া মৃদুল।
সোহাগে দোলায় তব চাঁচর কুন্তল;

হেথা ফুলের সুরভি সমীরে মিশিয়া,
পড়িছে সুধীরে তব সর্ব্বাঙ্গ ছাপিয়া॥

৩

চারি ধারে তরু-কোলে ছায়ারা শুইয়া,
তুষিছে অতিথি হৃদি তোমারি হইয়া,
শাখায় শাখায় পাখী মধুরে গাহিয়া
আমোদে তোমার কোলে পড়িছে লুঠিয়া॥

৪

বিটপীতে ফোটে ফুল, লতায় লতায়,
গাঁথিয়া শান্তির মালা পরাতে তোমায়;
কচি কচি শ্যাম তৃণ ধরণী উপরে
তোমার শয়ন রচে যতনে সুধীরে॥

৫

শ্রান্ত হয়ে এত দিন খুঁজেছি তোমায়,
সংসারের কোলাহলে হেথায় হোথায়,
নিরাশায় খুঁজিয়াছি সবার দুয়ারে।
শেষে উপনীত হেথা অদৃষ্টের ফেরে॥

৬

এতদিনে পাইয়াছি তোমার পরশ,
হৃদয়ে উঠেছে জাগি অপার হরষ,
বুঝেছি সংসার কভু নহে গো-আশ্রয়,
পবিত্র শান্তির কভু সে নহে নিলয়॥

সমালোচনা।

অভিব্যক্তি বাদ। ইহা একখানি পুস্তক। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবংশের অন্যতম বংশধর শ্রীযুক্তবাবু ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর, বি, এ, তত্ত্বনিধি প্রণীত। অভিব্যক্তি কাহাকে বলে, সকলে হয় ত তাহার স্বরূপ অর্থ অবগতি না থাকিতে পারেন। সংক্ষেপে আমরা স্থূলার্থে এই টুকু বলিয়া রাখি, জীবের ক্রমোন্নতির নাম অভিব্যক্তি এবং যে শাস্ত্রে উহার উপপত্তি আছে, তাহার নাম অভিব্যক্তিবাদ।

বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ যেরূপ অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন, এই স্থলে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি লিখিয়াছেন, "বৃক্ষ বীজ হইতে প্রকাশিত হইল, ডিম্ব হইতে পক্ষি শাবক উদ্ভূত হইল, বরফ হইতে জল, জল হইতে ধুম হইল, ধুম হইতে জল হইল, জল হইতে বরফ হইল, ইহাকেই আমরা অভিব্যক্তি বলে।"

এই দৃষ্টান্তে জগতের নিকৃষ্ট জীব হইতে উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই অভিব্যক্তি বাদ। বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ইহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অধ্যাপক ডার্ব্বিণ সাহেব বহু চিন্তার ফলে স্থির করিয়াছিলেন, বানর হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি; মানুষের পিতৃ পিতামহেরা পূর্ব্বে বানর ছিল, ইয়োরোপের অনেক পণ্ডিত এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই; অনেকে উপহাস করিয়াছিলেন। সেই সময় আরও তর্ক উঠিয়াছিল, বানর হইতে মনুষ্য সৃষ্টি, ইহা যদি ঠিক হয়, তবে কোন জীব হইতে বানরের সৃষ্টি, তাহার মীমাংসা কেন হইবে না? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটানু হইতে ক্রমে ক্রমে মুক্ষিকা, ভেক, পক্ষী, বিড়াল, কুক্কুর, শৃগাল, ছাগ, মেষ, গো, অশ্ব, হস্তি, সিংহ, ব্যাঘ্র, ইত্যাদির নাম উল্লেখ না করিয়া এককালে বানরকেই মনুষ্যের পিতামহ স্থির করা সদ্যুক্তি সিদ্ধ হয় কি না, তাহাও অবশ্য বিবেচ্য। কেবল ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরাই যে ঐরূপ তর্ক উত্থাপন করিয়াছিলেন, এমন নহে আমেরিকা ও এসিয়া খণ্ডের কতিপয় বহুদর্শী পণ্ডিত, নানা তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন। একজন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, রামায়ণের বানরেরা মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিত, এইরূপ বর্ণনা আছে; পুরাণে লাঙ্গুলের উল্লেখ না থাকিলে হনুমান প্রভৃতিকে বীর্য্যবান মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিত; কবি কল্পনা বলিয়া কেহ কেহ তর্কমুখে ঐ কথার উপর অধিক জোর রাখেন নাই। যাহা হউক, অভিব্যক্তি-বাদ সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত ক্ষিতীন্দ্র বাবু বহু গ্রন্থ আলোচনা করিয়া বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

ডারবীণ এবং ওয়ালেসের নূতন কথা দূরে রাখিয়া আমরা আমাদের শাস্ত্রের কথা আনয়ন করিতে পারি, এক একজন পুরাণ কবি ঋষি স্থানে স্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে অশীতি লক্ষযোনি পরিভ্রমণ করিয়া জীব অবশেষে মনুষ্য জন্মলাভ করে; সাধু মনুষ্যেরা তৎপরে দেবত্ব প্রাপ্ত হন।

এইত গেল এক প্রকার বর্ণনা কিন্তু পুরাণ বর্ণিত জগৎ সৃষ্টি প্রকরণে দৃষ্ট হয়, বিধাতা ক্রমে ক্রমে স্থাবর জঙ্গমাদি সৃষ্টি করিয়া পরিশেষে মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন,

পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে এক্ষণে আমাদের শাস্ত্রাদির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি রাখেন না, তাঁহারাও বোধ হয়, ডারবীণ সাহেবের মতে সায় দিতে কিছু সঙ্কুচিত হইবেন; কেন না বাইবেল শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টি প্রকরণে লেখা আছে, জগদীশ্বর নিজের মূর্ত্তির আদর্শে মানব সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এই সকল প্রমাণে বুঝিয়া লইতে হয় সৃষ্টি কর্ত্তার জীব সৃষ্টির প্রথম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। বিষয়টি বড় সচ্ছন্দ নহে, যাঁহারা এ বিষয় লইয়া তর্ক উত্থাপন করিতে চাঁন তাঁহারা বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ প্রনয়ণ না করিলে কিছুতেই প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না, ইহা নিশ্চয়। একটা কিছু নূতন-মতের কথা শুনিলেই হাস্য করিয়া উপেক্ষা করা জ্ঞান পিপাসু বুদ্ধিমান ব্যক্তি বর্গের উচিত কার্য্য নহে। বাবু ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বহু গ্রন্থ আলোচনায় বহু পরিশ্রমে, বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আমাদের সাহিত্য সমাজে এই অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন, অনুরোধ করি প্রত্নতত্ত্ব জিজ্ঞাসু সাহিত্যসেবকগণ সুস্থির চিত্তে এক একবার এই পুস্তকখানি পাঠ করিবেন। জন্মভূমির পাঠক মহাশয়েরা বোধ হয় এই গ্রন্থকারের পরিচয় জানিতে উৎসুক হইতে পারেন। পরিচয় এই যে, ইনি স্বর্গীয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রপৌত্র, স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহা-পৌত্র; ইহাঁর পিতা ছিলেন, অকাল প্রস্থিত সুপণ্ডিত বাবু হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর। পুস্তকের মূল্য আড়াই টাকা।

শিবাজীরভবানী পূজা।—মহারাষ্ট্র পতি মহারাজ শিবাজী মহাপুরুষ গুরুদেব রামদাস স্বামীর সম্মুখে মহামায়া ভবানীদেবীর নিকটে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া, ভক্তিপূর্ণ করুন স্বরে দেবীর পূজা ও স্তব করিয়াছিলেন; পুস্তকখানি সেই পূজার মহিমা প্রচার করিতেছে, আদ্যোপান্ত সুললিত কবিতায় বিরচিত। কবিতা গুলি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইলাম। শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ইহার প্রনয়ণ কর্ত্তা। কবিতায় দিব্য কবিত্বের পরিচয় আছে। মূল্য দুই আনা মাত্র শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এই কাব্যখানি প্রচারের ভার লইয়াছেন।

সরল ভৈষজ্য তত্ত্ব। ডাক্তার শ্রীরাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এই নামের আদি পুস্তক ইতিপূর্ব্বে জন্মভূমি পত্রিকায় সমালোচিত হইয়াছে, এখানি তাহার পরিশিষ্ট ভাগ ইহাতেও অনেক নূতন নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকটিত হইয়াছে। মূল্য আট আনা।



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৬শ বর্ষ। | ১৩১৫ সাল, পৌষ। | ৯ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুচৈতন্যদেব।

চতুর্থ অধ্যায়।

নিমাইয়ের বয়ঃক্রম ছয়বৎসর। তাঁহার জ্যেষ্ঠসহোদর বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ। বিশ্বরূপ তত অল্প বয়সে বহুশাস্ত্রঅধ্যায়ন করিয়া সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, প্রেমভক্তিতে তাঁহার হৃদয়পবিত্র হইয়াছিল, সেই পবিত্রতার ফলে মনে মনে সংসার বৈরাগ্য আসিয়াছিল। ইহাই মাতা পিতার ক্ষোভের কারণ।

নবদ্বীপের বেলপুকুরিয়া পল্লিতে লোকনাথ নামে একটি বালক ছিল। লোকনাথটি বিশ্বরূপের মাতুল পুত্র। উভয়ে সহোদর তুল্য সদ্ভাব। একত্র অধ্যয়ন একত্র পর্য্যটন, একত্র ভক্তিচর্চ্চা, সমস্তই অভেদ। লোকনাথ অপেক্ষা বিশ্বরূপের

বয়স অল্প, তথাপি ভক্তি প্রবাহ দর্শনে লোকনাথ বিমুগ্ধ হইয়া বিশ্বরূপকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিত।

এই সময় আর একটি ভক্ত আসিয়া নবদ্বীপ উজ্জ্বল করেন। শান্তিপুরের বারেন্দ্র শ্রেণীর এক ব্রাহ্মণের গৃহে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, সেই পুত্রের নাম কমলাক্ষ। শাস্ত্রজ্ঞানে ও ভক্তিভাবে কমলাক্ষের অসাধারণপ্রতিভার পরিচয় হইয়াছিল; শাস্ত্রে আচার্যোর স্বরূপ হইলেন বলিয়া, কমলাক্ষের উপাধি হয়, অদ্বৈতাচার্য্য।

শান্তিপুরে নিবাস; নবদ্বীপেও কমলাক্ষের পিতার একখানি বাড়ী ছিল; কমলাক্ষ সময় সময় নবদ্বীপে আসিয়া সেই বাড়ীতে বাস করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে, সে সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য নবদ্বীপেই ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে ভক্তি আলোচনার সভা হইত; বিশ্বরূপ ও লোকনাথ সেই সভায় দিবারাত্রি অবস্থান করিতেন। এমন কি, এক একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ের কথাটা বিশ্বরূপের মনেই থাকিত না; বাড়ী আসিতে বিলম্ব হইলে শচীদেবী এক একদিন তাঁহাকে ডাকিবার জন্য নিমাইকে অদ্বৈত সভায় পাঠাইতেন। সভার মাঝখানে নিমাই গিয়া মধুর বচনে বলিত, "দাদা! মা ডাকৃছেন, ভাত খাবে।" সেই মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থ লোকেরা মোহিত হইয়া থাকিতেন। ভ্রাতার আহ্বানে বিশ্বরূপ যেমন গৃহে আসিবার জন্য পথে বাহির হইতেন, তখন যুগল সহোদরে হাত ধরাধরি; পদব্রজে অধিক দূর চলিতে নিমাই কিছু ক্লান্ত হইলে বিশ্বরূপ তাঁহাকে চুম্বন করিয়া কোলে তুলিয়া লইতেন। ভ্রাতৃস্নেহের চমৎকার আদর্শ। আরও একটি উল্লেখ যোগ্য বিষয় এই যে, চঞ্চল নিমাই বিশ্বরূপের কাছে, দিব্য শান্ত হইয়া থাকিত; একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিত না।

জগন্নাথমিশ্র ধনাঢ্য লোক ছিলেন না; পরিবার পালনের অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত প্রতিদিন তাঁহাকে গ্রামের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে হইত, বিশ্বরূপের সহিত তাঁহার প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ ঘটিত না। একদিন দৈবযোগে পথিমধ্যে বিশ্বরূপকে দেখিতে পাইয়া, গৃহে আসিয়া মিশ্রমহাশয় শচীদেবীকে বলেন, "বিশ্বরূপ বিবাহ যোগ্য হইয়াছে, সম্বন্ধস্থির করিয়া শীঘ্রই আমি উহার বিবাহ দিব।" অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের নিকটেও সেইরূপ আভাষ দেওয়া হয়। লোকমুখে বিশ্বরূপ তাহা শুনিতে পাইয়া মহাবিভ্রাটে পড়েন। শাস্ত্রজ্ঞানে সংসার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, দারপরিগ্রহে অভিলাষ নাই, বিবাহ করিবেন না, দৃঢ় সংকল্প; ওদিকে

তিনি একান্ত মনে মাতাপিতার বশম্বদ ; তাঁহারা যদি বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন, তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে পাপ হইবে। উভয় সঙ্কট। কি করা কর্ত্তব্য ? লোকনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইল, অলক্ষিতে গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। কল্পনা তখন মনেই রহিল, বিশ্বরূপ একদিন শচীদেবীর হস্তে একখানি পুঁথি সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "মা! এই পুঁথিখানি নিমাইকে দিও, নিমাই বড় হইলে পাঠাভ্যাস করিবে।"

শচীদেবী বলিলেন, "কেনবাছা, তুমি ত নিজেই নিমাইকে দিতে পার।" বিশ্বরূপ বলিলেন, "এখন সময় হয় নাই! আমি যদি পারি, আমিই দিব, কিন্তু শরীর ক্ষণভঙ্গুর, সেই জন্য তোমার হস্তে রাখিলাম, আমি না পারিলে, তুমিই দিবে।"

সে প্রসঙ্গে তখন আর কোন কথা হইল না, পুঁথি খানি শচীদেবী রাখিয়া দিলেন। তাহার পরেই প্রচার হইল, বিশ্বরূপ ও লোকনাথ এক রাত্রে সন্ন্যাশ্রম গ্রহণ করিবার জন্য পলায়ন করিয়াছে। জগন্নাথ ও শচীদেবী অতিশয় শোকাকুল হইলেন। ষোল বৎসরের ছেলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, তাহা শুনিয়া অন্য পিতা মাতা হইলে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, কিন্তু মিশ্র দম্পতি সে চেষ্টা করিলেন না। বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী (১) হইলেন।

মাতা পিতার শোক কমে না। দিন দিন তাঁহারা অধিক কাতর হইয়া পড়িলেন। তৎকালে নবদ্বীপে বৈষ্ণবের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞ, তাঁহারা আসিয়া প্রবোধ দিলেন, "বৃথা কেন শোক কর ? শাস্ত্রে আছে, যে বংশে একজন সন্ন্যাসী হয়, সে বংশ উদ্ধার হইয়া যায়।" মাতা পিতার মন তাহাতেও প্রবোধ মানিল না।

নিমাই শুনিল, দাদা সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে, দাদা আর গৃহে আসিবে না, দাদাকে আর দেখিতে পাইব না ? ছয় বৎসরের বালক ইহা ভাবিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শচীদেবী বহু কষ্টে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। সেইদিন অবধি তাঁহারা বিশ্বরূপের শোক চাপিয়া রাখিয়া নিমাইকেই অধিকতর আদর-যত্ন করিতে লাগিলেন। নিমাই আর একদিন ঠাকুর পূজার নৈবেদ্যের একটী তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, চৈতন্য পাইবার পর মাতা পিতাকে বলিয়াছিল, "মা! বাবা!-দাদা আসিয়াছিলেন, আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন, আমাকে বলিয়া-

(১) ঈশ্বর পুরীর নিকটে সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বিশ্বরূপ নানাদেশে ভ্রমণ করেন ; দুই বৎসর পরে পুনানগরে হঠাৎ তিনি অদৃশ্য হন, এইরূপ কিম্বদন্তী।

ছেন, তুমি আমার মতন সন্ন্যাসী হও।” আমি বলিয়াছি, “আমার বয়স অল্প, আমি এখন সন্ন্যাস ধর্ম্মের কি বুঝিব ?”

বালকের ঐ কথা শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্র ভয় পাইয়াছিলেন। নিমাই তাঁহার নিকট পাঠাভ্যাস করিত, একরাত্রে তিনি আপন কল্পনায় স্থির করিয়াছিলেন, নিমায়ের পাঠ বন্ধ করিয়া দিব। একটা ত শাস্ত্র পাঠ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গেল, আবার এটাও শাস্ত্র শিক্ষা করিলে সন্ন্যাসী হইয়া পলাইবে; ইহাকে মুর্খ করিয়া রাখাই ভাল।

প্রভাতে উঠিয়া মিশ্র মহাশয় নিমাইকে ডাকিয়া বলিলেন, “নিমাই! আজ অবধি তোমার পাঠ বন্ধ। আমার দিব্য, আজ অবধি তুমি পুঁথি স্পর্শ করিও না।”

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পর চঞ্চল নিমাই কিছুদিন শান্ত হইয়াছিলেন, পাঠবন্ধ হওয়াতে পুনরায় দুরন্ত হইয়া উঠিল। পল্লির অলস বালকগণের সহিত সারাদিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া বহুক্ষণ বিলম্ব করিতেন; তাঁহার জল ক্রীড়ার উপদ্রবে ভদ্র ভদ্র স্ত্রীপুরুষেরা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। নিমাই ডুবদিয়া কাহারও কাহারও পা ধরিয়া টানিতেন, কাহারও কাহারও কাপড় খুলিয়া লইতেন; তীরে উঠিয়া অন্য লোকের পূজার ফল পুষ্পাদি কাড়িয়া লইয়া নিজেই পূজা করিতে বসিতেন, পূজার নৈবেদ্যের সামগ্রী গুলি নিজেই ভক্ষণ করিতেন। শচীদেবীর নিকটে নিত্য নিত্য এই প্রকারের অনেক অভিযোগ হইতে লাগিল; তিরস্কার করিয়া পুত্রকে তিনি ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না, অবশেষে প্রহারের ভয় দেখাইলেন। একদিন নিমাইকে মারিবার জন্য বেত্র হস্তে লইয়া তিনি ধাইয়া যাইতেছেন, নিমাই সর্ব্বাঙ্গে উচ্ছিষ্ট মাখিয়া, উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির স্তুপের উপর দাঁড়াইয়া করতালি দিয়া হাস্য করিতেছেন; শুচিব্রতা শচীদেবী উচ্ছিষ্ট অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না, সুতরাং ধরিতেও পারিবেন না, মারিতেও পারিবেন না, সেই ভরসাতেই নিমাই চাঁদের আনন্দ। মাতা বারম্বার তাড়না করিতে লাগিলেন, উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া নিমাই বলিলেন, “আমাকে মূর্খ করিয়া রাখিতেছ, আমি মুর্খের মত উপদ্রব করিব না ত কি করিব ?”

শচীদেবী সে কথার মর্ম্ম বুঝিলেন। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে তিনি স্বামীকে অনুরোধ করিতেন, ফল হইত না; এইবার নিমাইয়ের ঐরূপ উক্তির উল্লেখ করিয়া স্বামীকে তিনি বিশেষ রূপে মিনতি করিয়া বলিলেন, জগন্নাথের মন ফিরিল;

তদবধি নিমাইচাঁদ পুনর্ব্বার অধিক মনোযোগের সহিত পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। একবার বলিয়া দিলেই নিমাই তাহা অভ্যাস করিয়া লয়, কদাপি বিস্মৃত হয় না। বালকের বুদ্ধির প্রাখর্য্য দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। শ্রীহট্ট নিবাসী মুরারি গুপ্ত তৎকালে নবদ্বীপে ছিলেন, তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বয়স্যগণের সহিত পন্থা বিহার কালে মুরারি হস্তমুখ ভঙ্গি করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন, নিমাই অলক্ষিতে পশ্চাতে পশ্চাতে সেইরূপ ভঙ্গির অনুকরণ করিয়া কৌতুক করিত, মুরারি পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলে নিমাই তখনও সেইরূপ ভঙ্গি করিয়া উচ্চ রবে হাসিয়া উঠিতেন। মুরারি গুপ্ত তাহাতে বিরক্ত হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিতেন, "জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে একটা অকালকুষ্মাণ্ড জন্মিয়াছে। নিমাই বলিয়াছিলেন, আহারের সময় মজা দেখাইব। বাস্তবিক সেইদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় নিমাই চাঁদ মুরারির বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভোজন পাত্রে প্রস্রাব করিয়া দিয়া ছিলেন। মুরারি তাহাতে আরও অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু বালকের নেত্র জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া তাঁহার ভয় হইয়াছিল; বিস্মৃত হইয়া তিনি ভাবিয়া ছিলেন, যে, কে এই নিমাই? মনুষ্য না দেবতা? নিমাই বলিয়াছিলেন, "অঙ্গ ভঙ্গির আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া সুস্থির ভাবে হরি ভজনা কর; ভণ্ডামী দেখিলেই আমি বার বার তোমার ভোজন পাত্রে প্রস্রাব করিয়া দিব।"

মুরারি গুপ্ত ক্রমে ক্রমে নিমাই চাঁদের অমানুষিক ব্যবহার বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতি ভক্তিমান হইয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

নবম বর্ষ বয়সে জগন্নাথ মিশ্র নিমাই চাঁদের উপনয়ন প্রদান করেন। বিষ্ণু পণ্ডিত ও সুদর্শন পণ্ডিত প্রভৃতি অনেকগুলি অধ্যাপক তদুপলক্ষে আহুত হন। মস্তক মুণ্ডনের পর রক্ত-বস্ত্র পরিধান করাইয়া জগন্নাথ যখন নবীন ব্রহ্মচারির কর্ণে গায়ত্রী মন্ত্র উপদেশ করেন, নিমাই চাঁদ সেই সময় মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন; চৈতন্য সম্পাদনের পর শ্রীচৈতন্যদেবের উপনয়ন ক্রীড়া সুসম্পন্ন হয়। তৎকালে তাঁহার অঙ্গে অপরূপ জ্যোতিঃ বিকাশ পাইয়াছিল। সকলে ব্রহ্মচারিকে ইচ্ছামত ভিক্ষা দান করিলে পর একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া একটি সুপারি ভিক্ষা দেন। ব্রহ্মচারি তৎক্ষণাৎ সেই সুপারিটি ভক্ষণ করিতে করিতে গম্ভীরস্বরে হুঙ্কার করিয়া জননীকে আহ্বান করেন; শচীদেবী নিকটে আসিয়া দেখেন, পুত্রের শরীরে দেবোপম

জ্যোতিঃ, পুত্র মূর্চ্ছাগত। পরক্ষণে চৈতন্য পাইয়া জননীকে তিনি বলিলেন, "মা! আমি আসিয়াছিলাম, এখন চলিলাম, আবার আসিব। এই যে দেহটি রহিল, এইটিই তোমার পুত্র, ইহাকে যত্ন পূর্ব্বক লালন পালন করিও।" পুত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণে শচীদেবীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কে আসিয়াছিল, কে গেল, কে আবার আসিবে, এ সমস্যার মীমাংসা করা সহজ নহে।

নিমাইচাঁদের যখন একাদশ বর্ষ বয়ক্রম, সেই সময় জগন্নাথ মিশ্রের ভয়ানক জ্বর হয়, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। শচীদেবী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, নিমাই তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "মা! এখন রোদনের সময় নয়, পিতার যাহাতে সদ্‌গতি হয়, তাহারই বিধান করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া মাতা পুত্র উভয়ে খট্টাশায়িত মিশ্র ঠাকুরকে সুরধুনি তীরে লইয়া গেলেন। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরা সঙ্গে রহিলেন, কিন্তু নিমাই তাঁহাদের কাহাকেও খট্টাস্পর্শ করিতে দিলেন না। গঙ্গাতীরে পিতৃদেবের যুগল চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া সাশ্রু নয়নে গদ্‌গদ্ স্বরে নিমাই বলিলেন. "বাবা। আজ অবধি আমার বাবা বলা ফুরাইল! বাবা! আমাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলে? কে আমাকে যত্ন করিবে? কে আমাকে বিদ্যাশিক্ষা দিবে?"

অর্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে শয়ন করিয়া জগন্নাথ বলিলেন, "বৎস! আমি তোমাকে রঘুনাথের চরণে সঁপিয়া দিলাম। তুমি আমাকে ভুলিও না।"—জড়িত স্বরে এই কয়টি কথা বলিয়া মনে মনে ইষ্টদেব রঘুনাথের নামজপ করিতে করিতে বৃদ্ধ জগন্নাথ মিশ্র ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রীয়া অবসানে শচীদেবী অতি শোকে কাতরা হইলেও পুত্রের মঙ্গল বাসনায় কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিলেন, নিমাই চাঁদের বিদ্যাশিক্ষার কি উপায় হইবে, সেই চিন্তাই তখন বলবতী হইল। একদিন তিনি নিমাইকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, পণ্ডিতের হস্তে নিমাইকে সমর্পণ করিয়া কাতর বচনে কহিলেন, ঠাকুর! এই পিতৃহীন পুত্রটিকে আমি আপনার হস্তে সঁপিয়া দিলাম; আপনি ইহাকে যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা দান করিবেন। ইহাকে শিক্ষাদান করিলে আপনার যশ ও ধর্ম্ম অর্জ্জিত হইবে।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত শচীদেবীর অনুনয়ে সম্মত হইয়া নিমাইচাঁদের বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। নিমাই চাঁদ তাঁহার নিকটে ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যায়ন করিতে লাগিলেন। তিন বৎসরে ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত হইলে নিমাইচাঁদ বাসুদেব

সর্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠিতে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কমলাকান্ত, কৃষ্ণদাস মুরারি গুপ্ত ও রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি অধিক বয়স্ক ছাত্রগণ তথায় ন্যায় শাস্ত্র পাঠ করিতেন। বাসুদেব প্রথমে নিমাইকে সামান্য বালক জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন, শেষে যখন দেখিলেন, চতুর্দ্দশ বর্ষিয় বালক ত্রিশ বত্রিশ বয়স্ক ছাত্রগণকে প্রতিভাবলে পরাস্ত করিল, তখন তাঁহার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল; তিনি মনে করিলেন, এ কি ব্যাপার! নিমাই ত সামান্য মনুষ্য নহে।

ব্যাকরণ অধ্যয়ন সময়ে নিমাই একখানি ব্যাকরণের টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থ খানি নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছিল। ন্যায় শাস্ত্র অধ্যায়ন কালে নিমাই চাঁদ ন্যায় দর্শনের একখানি টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করেন, রঘুনাথ ভট্ট লোকমুখে সেই কথা শুনিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি নিজেই বিশ্বজয়ী পণ্ডিত, এই অহঙ্কার তাঁহার মনে ছিল; সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্ব লোকে তাঁহার সমাদর করিবেন, স্বগর্ব্বে হৃদয় মধ্যে সেই আশা তিনি পোষণ করিতেন। চৈতন্যদেবের প্রতিভার উজ্জ্বল প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সেই আশালতা ক্রমে ক্রমে শুকাইতে লাগিল, একদিন তিনি নিমাইকে বলিলেন, "নিমাই! তুমি নাকি ন্যায় শাস্ত্রের টিপ্পনী লিখিতেছ?" নিমাই উত্তর করিলেন, মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু লিখিয়া রাখিতেছি।" রঘুনাথ বলিলেন, "সে খানি কি আমি একবার দেখিতে পাই?"—নিমাই বলিলেন, "অবশ্য পাইবেন। কল্য যখন আসিব, তখন সেই খানি সঙ্গে করিয়া আনিব, নৌকা যোগে গঙ্গাপার হইবার সময় পাঠ করিয়া আপনাকে শুনাইব।"

পরদিন নৌকায় পার হইবার সময় নিমাই চাঁদ সেই টিপ্পনী পাঠ করিতে লাগিলেন, একাগ্র মনে রঘুনাথ তাহা শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে ক্রমশই তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। হিংসা ও ক্ষোভ একত্র। নিশ্বাস ফেলিয়া নিমাইকে তিনি বলিলেন, "দিধিতি" নামে আমি একখানি ন্যায় গ্রন্থ লিখিয়াছি, সেই গ্রন্থ অপেক্ষা তোমার এই গ্রন্থ সুগভীর ভাব পূর্ণ হইয়াছে; এ গ্রন্থ প্রচার হইলে আমার গ্রন্থ আর কেহই পাঠ করিবে না।"

চকিত নেত্রে চাহিয়া নিমাই বলিলেন, "এই কথা? এই আপনার ক্ষোভ? তবে আর লিখিব না।" এই বলিয়া উদারাশয় নিমাই চাঁদ তাঁহার স্বহস্ত লিখিত সেই গ্রন্থের আদর্শ খানি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন।

রঘুনাথের আহ্লাদ হইল। তিনি বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, ন্যায় শাস্ত্রের যে ভাব ব্যক্ত করিতে তাহার আট দশ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে, দুই এক ছত্রে নিমাই সেই ভাব

আরও অধিক পরিস্কার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ গঙ্গাজলে বিসর্জ্জিত হইল, উভয়ে প্রসন্ন মনে সদালাপ করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন।

চতুষ্পাঠিতে সমুদয় ছাত্রের সহিত নিমাইচাঁদের সদ্ভাব, কেবল মুরারি গুপ্তের সহিত মধ্যে মধ্যে কলহ হইত। সে কলহের নাম শাস্ত্র বাক্যের তর্কযুদ্ধ। তর্কে মুরারি গুপ্ত পদে পদে পরাভুত হইতেন।

নিমাইচাঁদ সমস্ত খেলা ধুলা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেবল অধ্যয়ন ভিন্ন তাঁহার আর অন্য দিকে মন নাই। শাস্ত্রীয় তর্কে তাঁহার অধিক আমোদ, অধিক অনুরাগ। ছাত্রগণের সহিত তর্ক হইত, পথে কোন পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার সহিত তর্ক হইত, গঙ্গাতীরে স্নানের ঘাটে তার্কিক পণ্ডিতগণের সহিত তর্ক হইত; তাহা ছাড়া, গঙ্গাপার হইয়া গিয়া পর পারের পণ্ডিতগণের সঙ্গে তিনি ঘোরতর তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। বৈষ্ণবগণের সহিত তর্কে তাঁহারি অধিক উৎসাহ বৃদ্ধি পাইত; এমন কি পিতার সমবয়স্ক প্রবীণ প্রবীণ বৈষ্ণবগণের সঙ্গে তর্ক করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। সকল যুদ্ধেই নিমাই চাঁদের জয়। ন্যায় শাস্ত্রের এক একটা ফাঁকির তর্ক তুলিয়া বড় বড় পণ্ডিতকে তিনি ঠকাইতেন। পণ্ডিতেরা পরাজিত হইতেছেন, তাহা দেখিয়া তিনি শ্লাঘা মানিতেন না, মিষ্টবাক্যে সকলকে তুষ্ট করিয়া প্রফুল্ল বদনে হাস্য করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, বাসুদেব সর্ব্বভৌম তাঁহার ছাত্রগণকে যে সকল ফাঁকির মীমাংসার জন্য প্রশ্ন দিতেন, বড় বড় ছাত্রেরাও দিবারাত্রি চিন্তা করিয়া তাহা পুরণ করিতে পারিতেন না, কিন্তু একবার শ্রবণ মাত্র প্রতিভাশালী চৈতন্যদেব তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব ফাঁকির মন্ত্রে সেই সকল ফাঁকি উড়াইয়া দিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চৈতন্যদেবের ন্যায় পড়া সমাপ্ত হইল, চতুষ্পাঠির পাঠ সমাপ্ত হইল, চৈতন্যদেব এখন অধ্যাপক, তিনি নিজে একটি টোল করিলেন, নাম হইল নিমাই পণ্ডিত। পণ্ডিতের বয়স তখন ষোল বৎসর মাত্র। তত অল্প বয়সে কেহ কখন কোন স্থানে টোলের অধ্যাপক হন নাই। কেবল টোল করা নহে, আরও মহিমা আছে। নবদ্বীপের ন্যায় শাস্ত্র প্রধান প্রদেশে বড় বড় পণ্ডিতের বড় বড় টোল থাকিলেও নিমাই পণ্ডিতের টোলে অধিক ছাত্র জুটিতে লাগিল; নিমাই পণ্ডিত সকলকেই নিয়মিত রূপে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

স্বভাব শীঘ্র পরিবর্ত্তন হয় না। নিমাই চাঁদ পিতার মৃত্যুর পর কিছুদিন শান্ত হইয়াছিলেন, এই সময় আবার চাঞ্চল্য বাড়িল। জলক্রীড়াতেই অধিক

চাঞ্চল্য। নিত্য নিত্যছাত্র দলসহ গঙ্গাজলে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক সাঁতার দিয়া কুন্দন করিতে করিতে তিনি গঙ্গাপার হইতেন, গঙ্গায় যাহারা স্নান করিত, সেই উপদ্রবে তাহারা অতিশয় ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল; নিমাই তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, বার বার দলবলসহ সন্তরণ করিয়া তিনি ইতঃস্তত জল ছড়াইয়া মনের সাধে ক্রীড়া করিতেন। জলেও যে প্রকার, স্থলেও সেই প্রকার চাঞ্চল্য। টোলের অধ্যাপক হইয়াছেন, তথাপি মল্লবেশে পথে পথে দৌড়িয়া বেড়াইতেন। তাঁহাকে দেখিলেই লোকে বলিত, ঐ সেই চঞ্চল নিমাই আসিতেছে। ছোকরা যখন এত চঞ্চল, তখন টোল করে কিরূপে? পড়ায় বা কতক্ষণ?

যাহারা বিশেষ তত্ত্ব জানিত না; তাহারাই ঐরূপ অযথা কথা বলিত। নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা কার্য্যে আদৌ শিথিল যত্ন ছিলেন না, নিয়মিত সময়ে নিয়মিত রূপে ছাত্রগণকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দান করিতেন। টোলে তাঁহার অপরূপ গম্ভীর সৌম্য মূর্ত্তি সকলেই দর্শন করিত। মুকুন্দ সঞ্জয় নামে একজন ধনশালী ব্যক্তির বৃহৎচণ্ডী মণ্ডপে নিমাই পণ্ডিতের টোল হইয়াছিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

অনুবাদক প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

(১)

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

মানস-দর্পণ যেই করয়ে মার্জ্জন।
ভব-মহা-দাবানল করে নির্ব্বাপণ॥
কল্যাণকুমুদে করে জ্যোৎস্না-বিতরণ।
বিদ্যারূপা-বধূটীর যে হয় জীবন॥
আনন্দ-সমুদ্র যিনি করেন বর্দ্ধন।

যাঁর পদে-পদে পূর্ণ সুধার স্বদন ॥
সকল আত্মায় যিনি করান স্নপন।
জয়জয় সেই শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ॥

(২)

নাম্নামকারি বহুতা নিজ-সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥
ভিন্নরুচি জীবে দেখি ওহে ভগবন্।
কত নাম প্রচারিলে—নাহিক গণন ॥
নিজ সর্ব্বশক্তি তাহে করিলে অর্পণ।
নিয়মও না রাখিলে করিতে স্মরণ ॥
এত দয়া তব ; মম দুর্দ্দৈব ঐছন।
অনুরাগ না জন্মিল নামেও এমন ॥

(৩)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
তৃণের অপেক্ষা নীচ-অতিনীচ হৈয়া।
বৃক্ষসম সহ্গুণ আশ্রয় করিয়া ॥
নিজে মান নাহি চাহি, অন্যে দিয়া মান।
শ্রীহরিকীর্ত্তন সদা কর্ত্তব্য-বিধান ॥

(৪)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥
ওহে জগদীশ! নাহি চাহি ধন-জন।
সুন্দরী কবিতা কিংবা না করি কামন ॥
হে ঈশ্বর! তোমা লাগি যে ভক্তি তোমায়।
সে ভক্তি আমার যেন জন্মে-জন্মে হয় ॥

(৫)

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিত-ধূলী-সদৃশং বিচিন্তয়॥

তোমার কিঙ্কর আমি হে নন্দনন্দন!।
বিষম-ভবাব্ধি-মাঝে পতিত এখন॥
কৃপা করি তব ঐ কমল-চরণে।
সংলগ্ন ধূলির মত মোরে কর মনে॥

(৬)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

অজস্র অশ্রুর ধার নয়নে গলিবে।
বদনে গদ্গদে বাণী নাহি নিঃসরিবে॥
পুলক-কদম্বে অঙ্গ পূরিয়া যাইবে।
তব নাম নিতে নাথ! কবে হেন হবে॥

(৭)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

গোবিন্দবিরহে মোর একি হৈল দায়।
একটি নিমেষ যায় কত-যুগ-প্রায়॥
নয়নে ঝরিছে বারি বরিষার মত।
দশদিক শূন্যময় হেরি অবিরত॥

(৮)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো

মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥
তাঁর চরণেতে রতি মোর অনুক্ষণ।
মোরে আলিঙ্গিয়া হয় করুন পেষণ ॥
কিংবা নাহি দেখা দিয়া মর্ম্মেতে আমার ॥
দিউন প্রবল পীড়া যত ইচ্ছা তাঁর ॥
লম্পট—করুন্ নাকো যেমন-তেমন।
মোর প্রাণনাথ কিন্তু সে-ই—অন্য ন'ন ॥

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-গগণের আর একটি নক্ষত্রপাত হইয়া গেল। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক বাবু যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় গত ১৬ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যাকালে অকস্মাৎ ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন! প্রকাশ্য রূপে তাঁহার শরীরে কোন প্রকার ব্যাধি ছিল না, দেহ স্বভাবতঃ সবল ও সুস্থ ছিল, উক্ত শুক্রবার রজনী যোগে তাঁহার ভবনে মিত্র-ভোজন হইবার কথা, বৈকালে আয়োজন হইতেছিল, যোগেন্দ্র নাথ স্বয়ং একটি লোক সঙ্গে করিয়া উত্তম উত্তম মিষ্টান্ন খরিদ করিবার জন্য বাজারে বাহির হইয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিবার সময় হ্যারিসন রোডের এক খানি দোকানে বসিয়া ছিলেন, তথায় তাঁহার একবার মাথা ঘুরিয়া পড়ে, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখেন, তৎক্ষণাৎ গাড়ি ডাকাইয়া গাড়িতে আরোহন পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে আসিতে থাকেন। কৃষ্ণদাসপালের প্রতিমূর্ত্তির কাছে গাড়ি পৌছিলে; তাঁহার বক্ষে একটা বেদনা অনুভুত হয়, বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া কাতর স্বরে চিৎকার করিয়া তিনি বলিয়া উঠেন, "মরিলাম মরিলাম! মরিলাম প্রাণ যায়! চাঁপাতলার দীঘির নিকটে গাড়ি পৌছিলে, আবার তাঁহার মাথা ঘুরিয়া পড়ে, তখন তিনি জীবনে হতাশ হইয়া বলেন, "হায়, হায়, হায়!! ধীরেনের সঙ্গে আর দেখা হইল না।"

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের রামহরি ঘোষের লেনের মধ্যে তাঁহার বাড়ী; গাড়ি সেই বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে উচ্চকণ্ঠে "ধীরেন-ধীরেন" বলিয়া তিনি দুইবার ডাকেন, ধীরেন্দ্র নাথ ছুটিয়া বাহির হইয়া আইসেন। শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র নাথ তাঁহার একমাত্র পুত্র; পুত্রের গলা জড়াইয়া ক্ষণকাল তিনি নীরব হইয়া থাকেন, তাঁহার নেত্র যুগল অশ্রু পূর্ণ হইয়া আইসে, দুই বিন্দু অশ্রু ধীরেন্দ্রের মস্তকে পতিত হয়; তাহার পরেই যোগেন্দ্রনাথের শেষ নিশ্বাস বহির্গত! সমস্ত লীলার অবসান!

তাঁহার বিয়োগে সমস্ত বঙ্গের সাহিত্য সংসার নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছেন, আমরাও অপার শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি।

বাবু যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ১২৬৫ সালের বৈশাখ মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাণ্ডা গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম ছিল গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. শিশুর যখন ছয় মাস বয়ক্রম তৎকালে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়; নয় বৎসর বয়সের সময় তিনি কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পিতৃব্য ৺প্রসন্ন কুমার চট্টোপাধ্যায়ের চাঁপাতলার বাসায় থাকিয়া ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন, ১২৮২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তির্ণ হইয়া জেনারল এসম্বিলিজ কলেজে এফ, এ, শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করেন, পঠদ্দশা হইতেই তাঁহার সাহিত্যানুরাগ জন্মিয়াছিল, ১৯ বৎসর বয়সের সময় সুধাকর নামে তিনি এক খানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন, ১২৮৫ সালে কল্পনা নামে তিনি আর একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন, জাতীয় সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ থাকাতে তিনি ক্রমান্বয়ে ২৯ খানি উপন্যাস পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, সকল গুলিই সুপাঠ্য বিশেষতঃ কোণে বৌ ও খুড়িমা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বঙ্গীয় সমাজকে তিনি উত্তম রূপে চিনিয়া ছিলেন, তৎপ্রণীত সামাজিক উপন্যাস গুলি প্রকৃত প্রকৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে, সমস্ত পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও সুললিত।

সাহিত্যের সেবা ব্যতিরেকে যোগেন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে অনেকগুলি অসাধারণ গুণ ছিল, পর দুঃখ কাতরতা ও পর উপকার ব্রতে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, কেহ বিপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে দৈহিক সামর্থ্যে তিনি যথা সাধ্য উপকার করিতেন, আত্মীয় বিয়োগ শোকে সহায় শোকার্ত্ত পরিবারের ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না, যাঁহাদের মৃত্যু দেহ বাহির করিবার লোকাভাব তাঁহাদের আহ্বানে অথবা অনাহ্বানে জাতিনির্ব্বিশেষে তিনি মৃত্যুদেহ স্কন্ধে লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইতেন, বিশেষজ্ঞ বৃদ্ধলোকের মুখে আমরা শুনিয়াছি, তিনি অতিক্রম দুই হাজার শবদাহ করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনি জাতি-বিচার করিতেন না, অধিক কথা কি দুরন্ত প্লেগ ও বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগে যাহাদের মৃত্যু হয়, অনেকে তাহাদের দেহ স্পর্শ করিতে ভয় করে, কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ অম্লান বদনে সেই সকল পুঁতিগন্ধময় শবদেহ স্কন্ধে লইয়া নিমতলার শ্মশান ঘাটে আসিয়া স্বচ্ছন্দে সৎকার করিয়া গিয়া-

ছেন, এমন কি তাঁহার যত্নে বেওয়ারিস ভিখারী ফকিরেরও সদ্গতি হইয়াছে। তাদৃশ উদার প্রকৃতি সহৃদয় বন্ধু বৎসল পরউপকারী নির্ম্মল স্বভাব সজ্জন বন্ধু অধুনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়াযায়।

৫০ বৎসর বয়সে গৃহস্থজীবনে তিনি সপ্তাধিক সৎকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা কায়মন বাক্যে প্রার্থনা করি, আত্মারামের শান্তিময় চরণে যোগেন্দ্র নাথের আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। তদীয়সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র নাথ চট্টো-পাধ্যায় চিকিৎসাবিজ্ঞানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া যশের সহিত বিবিধ রোগের সুচিকিৎসা করিতেছেন, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া পিতৃ নামের গৌরব রক্ষা করেন ইহাও আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

ইন্দুপ্রভা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

এক বাড়ীর একটি নির্জ্জন কক্ষে প্রতিভা উপবিষ্টা। করতলে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া সুধামুখী চিন্তায় নিমগ্না। চিন্তা করিতে করিতে তাহার অন্তর সাগরে কত প্রকার তরঙ্গ উঠিতেছে। তাহাকে গণনা করে?

পাঠক! প্রতিভাকে কি চিনিতে পারিয়াছ? নন্দিপুরের সেই জমিদার তনয়ার নাম প্রতিভা সুন্দরী। তাহার পিতা তাহাকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন, হরেন্দ্রকুমার তাহার অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল।

হরেন্দ্রকুমারের প্রতি প্রতিভা আন্তরিক অনুরাগিনী। অনুরাগ সমান রহিয়াছে, কিন্তু এখন আর পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ নাই। বিচ্ছেদ যদিও প্রেমিক প্রেমি-কার প্রণয় পথের বিষম কণ্টক, তথাপি যেন অতি মধুর। আপনাকে ভুলিয়া পরকে ভাল বাসিতে হয়। যাহারা প্রকৃত প্রেমিক বিচ্ছেদ তাহাদিগকে নিতান্ত অভিভূত করিতে পারে না। তাহারা জানে ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছেদ অকপট ভাল বাসার পথে বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না। প্রকৃত প্রেমিক হৃদয়ে বিচ্ছেদ ক্ষণ ভঙ্গুর। প্রেমিকের ভালবাসা অটল; কিন্তু সেরূপ প্রেমিক জগতে বিরল।

প্রতিভা কতই ভাবিতেছে। আপনা আপনি কত কথাই বলিতেছে; অবলার দুঃখ বিমোচনের লোক জগতে কি নাই? যদি প্রতিভার তখনকার সে ভাব কেহ

দেখিত, তবে কি সহানুভূতি দেখাইত না? ভালবাসা লইয়াই স্রষ্টার সৃষ্টি! সৃষ্টিকর্ত্তা ভালবাসার নিগূঢ় সূত্রে সংসার বাঁধিয়া দিয়াছেন, সে বন্ধন কখন ছিন্ন হইবার নহে।

ভালবাসা বিবিধ; যাহার উপর যেমন সাজে, তাহার উপর সেইরূপ ভালবাসা স্থাপন করিতে হয়। নতুবা অমৃতে গরল উঠিয়া থাকে।

ভাবিয়া ভাবিয়া প্রতিভা আপন মনে আপনি প্রবোধ দিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সাঁধে বাদ।

প্রতিভা সুন্দরী তাহার মাতুলালয়ে বাস করে; তাহার পিতা মধ্যে মধ্যে তাহাকে দেখিতে যান। পিতা-পুত্রিতে সাক্ষাৎ হইলে, পিতার মনে অপত্য-স্নেহের উদয় হয়, মন প্রাণ শীতল হয়; প্রতিভার কিন্তু সেরূপ হয় না। পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে মনানলে পুড়িতে থাকে; সে মনে করে, পিতা হইতেই আমার মন সাধে বাদ পড়িল। পিতা জন্মদাতা, অবশ্য আমার উপর পিতার ক্ষমতা অধিক; কিন্তু মন যে স্বতন্ত্র পদার্থ; মনের উপর কাহারো প্রভুত্ব নাই। পিতাতো আমার মনের কর্ত্তা নয়, মনের কর্ত্তা কে? যাহার ইচ্ছায় স্বর্গ দর্শন হইতে পারে, নরকদর্শন হইতে পারে, ভুত ভবিষ্যৎ বিপর্য্যস্ত হইতে পারে, তিনিই মনের কর্ত্তা।

এই গুলি প্রতিভার মনের ভাব। প্রতিভা সংসারিক কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারে না। নির্জ্জনে বসিয়া ভাবে, নির্জ্জনে কাঁদে, নির্জ্জনে বিশ্বপ্রেম উথলিয়া উঠে। নির্জ্জনে চিন্তার বেগ বৃদ্ধি হয়।

প্রতিভার মামার বাড়ীর খিড়কীর সরোবর তীরে একটী বকুল বৃক্ষ। যখন বকুল ফুল ফোটে, তখন লক্ষ লক্ষ মধুলোভা মধুকর আসিয়া শাখায় বসিয়া জুটে, কোকিল কুল কুহু রবে সুমধুর কূজন করে, প্রতিভা বিষাদিত নেত্রে তাহাদের আনন্দ দর্শন করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। একদিন পূর্ণিমার শশী সন্ধ্যাকালে পূর্ণ জ্যোতিতে প্রকাশ হইতেছে। প্রতিভা সেই বকুল বৃক্ষতলে উপবিষ্টা। মৃদু মন্দ সমীরণে বকুলের পাতাগুলি ধীরেধীরে কাঁপিতেছে। প্রতিভা উন্মাদিনীর ন্যায় ব্যাকুল নয়নে তাহাই দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই বকুল পল্লবের মধ্য দিয়া পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর মধুর মুর্ত্তি তাহার নয়ন মুকুরে প্রতিভাত হইল। প্রতিভা ভাবিল পূর্ণচন্দ্র সুন্দর কিম্বা তাহার ভালবাসার মুখচন্দ্র সুন্দর?

ভাবিতে ভাবিতে সিদ্ধান্ত হইল পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা তাহার ভালবাসার মুখচন্দ্র বড়ই সুন্দর; যারপর নাই তৃপ্তিকর। ইহাই কেন না, শশীতে কলঙ্ক আছে, তাহার ভালবাসার মুখচন্দ্র অকলঙ্ক! তাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। প্রতিভা কতদিন কতবার সেই বকুল তলায় আসিত। একদিন স্বপ্নে হরেন্দ্রের জন্য প্রতিভা কাঁদিতেছে। হরেন্দ্র কোন অজ্ঞাত পরীরাজ্যে গিয়া পরীর বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিতেছে। ভালবাসা বুঝি ভাসিয়া গেল। প্রতিভা মনে মনে ভাবিতে ছিল, হরেন্দ্রকে যে ভুলাইয়াছে, সে হয়ত স্বর্গের অপ্সরা হইবে।

প্রতিভার! স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। প্রতিভা যেন পাগলিনী, সংসার বিরাগিনী; কখন হাসে কখন কাঁদে, কখন আপন মনে যেন কাহার সহিত কথা কয়। প্রতিভা উন্মাদিনী হইয়াছে, ইহা মনে করিয়া পরিবারস্থ লোকেরা হা হুতাশ করে, ভুতে পাইয়াছে ভাবিয়া কেহ কেহ ওঝা আনিয়া দেখায়; ওঝা তাহার নাসিকায় ধূলাপড়া ধরে, মুখে ফুৎকার দেয়, পৃষ্ঠে সরষে পড়া ছুড়িয়া মারে, অনেক চেষ্টার পর অকৃত কার্য্য হইয়া বিমর্ষ বদনে চলিয়া যায়।

একদিন গ্রামের মধ্যে মহা হুলস্থুল। প্রতিভা অদৃশ্য। অনেকেই বলিতেছে, "পাগলিনী এবার কোন্ দেশে ছুটিয়া গিয়াছে। আহা! কোথায় কোন বনে হয়ত বাঘে ভাল্লুকে মারিয়া ফেলিবে!"

প্রতিভার আর সন্ধান হইল না। প্রতিভা যেখানে গিয়াছে, সে স্থান তাহার পক্ষে কতই রম্যস্থান। প্রেম রাজ্যের রাজ পথে প্রতিভা বিচরণ করিতেছে। প্রতিভার মত কেহ কি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া এই পথাবলম্বী হইতে পারে, যদি পারে, পাঠক তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ঐরূপে সেই রাজ্যে বিচরণ করিতে পার, তবে বিচ্ছেদকে জয় করিবার জন্য প্রিয় অন্বেষণে বাহির হও।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চিত্ত বিকার।

একটি পার্ব্বত্য প্রদেশ। মানব সমাগম অল্প। অন্যস্থান অপেক্ষা লোক জনের বাসও খুব কম; কেবল জঙ্গল, স্থানেস্থানে নানাপ্রকার জঙ্গল এক এক; জঙ্গল এক রকমের। সমতল অনাবৃত ক্ষেত্রকচিৎ দেখা যায়; তাহাও গিরিমালা বেষ্টিত। তন্মধ্যে গারো, ভীল ও সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য পাহাড়ীগণের বাস। তাহারা হরিণ বরাহ শশক প্রভৃতি বন্য জন্তুর মাংসে উদর পূর্ণ করে। তাহাদের আকৃতি

প্রকৃতিগত ভাব দেখিলে মানবের আদিম অবস্থার কথা মনে পড়ে। কিম্ভূত কিমাকার চেহারা, মাথায় খুব ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, আকার দীর্ঘ কলেবর কৃষ্ণবর্ণ।

এই প্রদেশের খুব উচ্চ একটী পর্ব্বত শিখরে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী যুবক উপবিষ্ট। যুবক পর্ব্বতবাসী নয়, তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, কোন লোকালয় হইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। মূর্ত্তি গম্ভীর! ক্রন্দনের পর চক্ষু যেমন রক্তবর্ণ হয়, সেইরূপ আরক্ত চক্ষু; নেত্র অশ্রুসিক্ত, পরিধান ছিন্ন বাস। যুবা যেন কি ভাবিতেছে। সময় গোধূলি, স্থানে স্থানে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে; কিন্তু তখনও অধিত্যকা পর্য্যন্ত মসীময় হয় নাই, পক্ষীগণ স্ব স্ব কুলায়ে উড়িয়া আসিতেছে। বন্য পশুরা প্রশস্ত সময় খুঁজিতেছে। যুবক সহসা কি ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। উচ্চকণ্ঠে সখা সখা বলিয়া সম্বোধন করিল একটী বালক গুহা হইতে বাহির হইয়া সখা—সখা; বলিয়া প্রতিধ্বনি করিতে করিতে যুবকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বালকটি পরম সুন্দর; বয়স অনুমান ষোড়শ বর্ষ; মুখখানি হাসি ভরা, নেত্র পলক শূন্য, নয়নের এক অনির্ব্বচনীয় ভাব! হস্তপদ স্থূল পরিধান একটী আপাদলম্বিত আলখাল্লা; উহা গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত।

যুবক সেই বালককে কহিল, সখা! আজ সূর্য্য অস্ত দেখিতে দেখিতে মন কেমন হইল, যেন সেই সুবর্ণ জ্যোতির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে আমার কি যেন কি ভাবভরা মনজ্যোতি কমিয়া গেল। এই যেমন অন্ধকার গুহাদেশ আচ্ছন্ন করিয়াছে, সেইরূপ আমার মনমধ্যে কেমন তমিশ্র দেখা দিতেছে; সখা আমার সম্মুখে ব'স; আমার চিত্ত কেমন ব্যাকুল হইয়া আসিতেছে।

যুবককে সম্বোধন করিয়া বালক বলিতে লাগিল,—"সে কি সখা, ও কথাকি বলিতে আছে? জনহীন পর্ব্বতে আমরা এই দুইটী প্রাণী ব্যতীত আর মানব সমাগম নাই; নির্জ্জনে দু-জনে কত সুখে আছি, এখানে কেন তোমার চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। যেখানে একজনের মন বেদনায় অপরের সমবেদনা, সেখানে একি কথা সখা? দুর্ব্বল আমরা, প্রখর রবিকর বড়ই অসহ্য, তাই বোধ হয়, তোমার মন কেমন হয়েছে, ভয় কি? এস গুহার মধ্যে যাই। নিভৃতে গুহাদেশে বসিলে শরীর শীতল হইবে। এ স্থানের বায়ু এখনও পর্য্যন্ত শীতল হয় নাই; গুহায় প্রবেশ করিলে সত্বর সমস্ত কষ্ট দূর হইবে।"

যুবক কহিল, "সখা! তোমার কথা গুলি অতি মধুর, দিবানিশি শুনিলেও কর্ণের পিপাসা শান্তি হয় না। এই দেখ, আজ আমার এত অসুখ, তোমার সুধা

বাক্যে প্রাণ শাতল হইল। যে সংসারবিরাগী, সে যেন তোমার মত সঙ্গী পায়, জীবনের বৈরাগ্য আর তার থাকিবে না। শুভক্ষণে তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি; আমার আর সংসারে কোন বস্তুরই প্রয়োজন নাই। আমাতে আর পরমাত্মাতে যেন এখন আর কোন প্রভেদ নাই; এখন এই শূন্য জীবনে কেবল তোমার সংসর্গই একান্ত বাঞ্ছনীয়।”

বালক কহিল, “দেখ সখা,—তুমি মনে যা ভাব, যা তোমার মনে আসে, সেই কথাগুলি তুমি যেমন বলিতে পার, আমি তো তেমন পারি না! একদিকে মন কাতর, কাতরতা প্রকাশের জন্য ব্যাগ্র, কিন্তু প্রকাশে স্ফুরিতে পারে না; যেনপাষাণ দিয়া অবরোধ করে। তুমি নিশ্চয়ই দেবতা, তাই তোমার বাক্য ও কার্য্য দেবতার তুল্য! মনও পবিত্রতাময়; স্বরলহরী বিণাবিনিন্দিত। আমি যখনি তোমার কথা শুনি, তখনি যেন কেমন আত্মহারা হইয়া যাই। সখা, আমিও তোমার মত বন্ধু না পাইলে এতদিন কোথায় থাকিতাম। কোথায় যাইতাম, কিছুই কি করিতাম বলিতে পারি না। বিধাতা দয়ালু তাই তোমাকে সঙ্গী মিলাইয়া দিয়াছেন। আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। লোকে ভাল বাসে কিন্তু ভাল বাসিতে দেয় না, ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি তো বলি সখাকে ভাল বাসি, সখাও আমাকে ভাল বাসুক; ভাল বাসিলে অন্তর কখনো অন্তর হয় না। যেমন তেমনি থাকে। ভালবাসার অর্থ কি? যোগীরা বলেন—সম্বন্ধ ঘণীভূত করণ। পরকে আপন করিবার নাম ভালবাসা। এই ভালবাসা স্থান বিশেষে শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়াছে, আবার স্থানে স্থানে পবিত্র ভাব অপবিত্রত মিশ্রিত হইয়াছে। সেখানে প্রেম অনন্ত; কিন্তু প্রেমিক নাই। যে আছে সে স্বার্থের দাস; সে কেবল আপন সুখ বুঝে, পরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে না। অভাব পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, সে প্রেমের দৌড়। তাই প্রেমও অপূর্ণ রহিয়াছে; কেবল বিরহের উপদ্রব বাড়িয়া গিয়াছে। যেখানে ভালবাসা, সেই খানেই লাঞ্ছনা; কেন না কোন কারণে সম্বন্ধগত হইয়া মিশাইয়াছে। তাই প্রেমের কথা তুলিয়া মানব হাস্য পরিহাস করে। প্রেম কি একটা সামান্য খেলার সামগ্রী? বিধাতার সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ, তাই এত বাধা বিঘ্নসত্বেও প্রেম জন্মে। কিন্তু উপযুক্ত স্থানাভাবে মলিনত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রেমিকের কিন্তু দোষ দেখা যায় না। কোন নিকট আত্মীয় বা ক্ষমতাপন্ন অভিভাবকের দ্বারা বাধ্য হইয়া কেহ কেহ প্রেমে জলাঞ্জলি দেয় সহস্র ক্রন্দনে, সহস্র অনুনয় বিনয়েও প্রেম সেখানে স্থান পায় না। আমি কি

বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি। সখা! পর-হৃদয় নিজের কাছে, যে ভাল হয়, উদারতা ও কোমলতা গুণে সে পরকেও আপন করিয়া লয়।

যুবক অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। পরে একটী দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল, "সখা তুমি এই অল্প বয়সে এমন নিগূঢ় তত্ত্ব কোথায় পাইলে? বয়সে আমি তোমার অপেক্ষা বড়, আমি কিন্তু প্রেমের তত্ত্ব কিছু—জানি না; তোমার মুখে প্রেমের তত্ত্ব অবগত হইলাম। না জানি কত তপস্যার ফলে তোমাকে আমি পাইয়াছি। যোগীঋষিরা বলেন, মায়াশূন্য না হইলে প্রকৃত বৈরাগ্য উদয় হয় না। আমি তো বিরাগী হইতে পারিব না; আমি সাধু হইতেও চাহি না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কিছুরই আমি প্রয়াসী নহি! যদি তোমাকে সঙ্গে রাখিলে ধর্ম্ম সাধন করা না হয়, মায়া যদি ত্যাগ করিতে না পারি, নাই পারিলাম, কিছুতেই আমার প্রয়োজন নাই। আমি এই যাহা পাইয়াছি, তাহাই আমার পরম ধন! তোমাকে সঙ্গী করিয়া জীবন অতিবাহিত করিব। হয় আমার ধর্ম্ম অর্জ্জন হইবে, না হয় না হইবে, কিছুই চাহি না।

একটু মধুর হাস্য করিয়া মধুর বচনে বালক বলিল, 'তুমি ধর্ম্ম চাও না, আমায় চাও! ওহো! তুমি যোগী হইতে পারিলে না, আমি একথা সন্ন্যাসীদের বলিয়া দিব।"

বালক এই কথা বলিয়াই দ্রুতপদে গুহাভিমুখে চলিয়া গেল।

যুবক ভাবিতে লাগিল, বালকটী কে? এমন বালক ত কখনও দেখি নাই! আমি সন্ন্যাসী হইতে পারিব না, তাহাতে বালকের এত আনন্দ কেন?

ভাবিতে ভাবিতে যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি অনেক, অনন্ত আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র। পর্ব্বতের যে স্থানে সেই নির্ম্মল গগণের দীপ্তি পড়িয়াছে সেই স্থানটীতে বেশ আলো, সেই স্থানটী ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই অন্ধকার।

যুবক ভাবিতেছে, সখা তো চলিয়া গেল, এখন এই ভীষণ অন্ধকারে আমি যাই কোথা?

বালক পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত। বালক কেন অন্তর্যামী, অন্তরের কথা অবগত হইয়াছে। যুবকের মুখে আত্ম-সুখ্যাতির কথা প্রেমের কথা শুনিতে শুনিতে চলিয়া গিয়াছিল, গুহাভ্যান্তরে প্রবেশ করে নাই, অন্তরালে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিতে ছিল; "ভীষণ অন্ধকারে যাই কোথা?" যুবকের মুখে সেই কথা শুনিবা মাত্রই তৎক্ষণাৎ পুনরায় প্রকাশ।

বালককে সম্মুখে দেখিয়া সবিস্ময়ে যুবক বলিয়া উঠিল, সখা তুমি কি সর্ব্বব্যাপী? অহো! তুমি আমার আঁধার হৃদয়ের সমুজ্জ্বল মণি, কেন আমি তোমার ভালবাসায় মুগ্ধ হইলাম? এক ভালবাসায় জলাঞ্জলি দিয়া আবার কেন মমতা নীরে নিমজ্জিত হইলাম?

বালক এইবার মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিতে লাগিল, "সখা! তুমি কাহার প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়াছিলে? ভালবাসিয়া তবে এমন নির্দ্দয়ের পরিচয় দিলে কেন? তাকে কাঁদান ভাল হয় নাই, তোমার সে নিষ্ঠুরতা ধর্ম্ম সহিবে কেন? তুমি ত আজীবন বিচ্ছেদে জ্বলিবেই তাকেও জ্বালাইবে বল সখা কে সে প্রেমিকা?"

যুবক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথাই কহিল না, দর দর ধারে তাহার নয়ন যুগলে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল, পরে একটু কি চিন্তা করিয়া বালককে হৃদয়ে ধরিয়া যুবক তাহার বদন মণ্ডল চুম্বন করিয়া বলিল, "সখা প্রেমের কথা আর বলিও না, আর সে কথা তুলিও না। যাহা হইয়া ছিল, আর একদিন তাহা বলিব, রাত্রি অধিক হইয়াছে। বালক তুমি, নিদ্রা যাইবে চল।

বালকের হস্ত ধারণ করিয়া যুবক ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

বনফুল বনেই ফোটে, বনেই সৌরভ ছড়ায়, বনেই বিলীন হইয়া যায়। কেহই দেখে না, কেহই তাহার সৌরভে আমোদিত হয় না; বনফুল কেবল বনবিহারী অলিবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করে।

সৃষ্টি কর্ত্তার সৃষ্টি রহস্য বোঝাভার। তিনি কি উদ্দেশ্যে কোনটী কি ভাবে সৃজন করিয়াছেন, কাহার দ্বারাই বা কোন্ কার্য্য সাধিত হয়, তিনিই তাহা জানেন।

শুনিয়াছি ইন্দুপ্রভা যখন অষ্টম মাসের, সেই সময়ে কে তাহাকে এক বনমধ্যে ফেলিয়া গিয়াছিল; দিবাভাগে ফেলিয়াছিল, তাহাতেই রক্ষা; রাত্রে ফেলিলে শৃগালে খাইত, তাহা হইলে বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইত না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা তাই ইন্দুপ্রভা বাঁচিয়া ছিল।

কাপালিক তাহাকে তথা হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়া অনেক কষ্টে লালন-পালন করিয়াছিল, ক্রমশঃ মাসের পর মাস অতীত হইতে লাগিল, ইন্দুপ্রভা ক্রমশঃ বড় হইল। ইন্দুপ্রভা হাসিতে শিখিল, বসিতে শিখিল, হাটিতে শিখিল, আধ আধ মা

মা বাবা বাবা বুলি বলিতে শিখিল, ক্রমে ক্রমে সকল কথাই বলিতে শিখিল। বর্ষের পর বর্ষ, এক দুই করিয়া ইন্দুপ্রভা নবম বর্ষে উপনীতা।

বিশ্বচিত্র-করের চিত্রের কি সুন্দর চিত্র খানি। ছবি যেন বিপিনবিহারে আসিয়াছে, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল।

নবমবর্ষে উপনীত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ইন্দুপ্রভা কাপালিকের পূজার ফুল আহরণ করে, কাপালিককে পিতা বলিয়া ডাকে। কাপালিক যখন নিজ প্রয়োজনে বাহির হয়, ইন্দুপ্রভা তখন দিবাভাগে পাখীর গান শুনে বনমধ্যে তণ্ডুলাদি ছড়াইয়া দেয়, পাখিরা তাহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়। রাত্রিকালে ইন্দুপ্রভা নির্ভয়ে নিকটস্থ বনে বনে বেড়ায়; কুঞ্জবনের বৃক্ষলতা হইতে জোনাকী ধরিয়া মাথার পরে, ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে নভমণ্ডলে নক্ষত্র পুঞ্জের বিচিত্র শোভা দেখে, শুক্লপক্ষ রজনীতে হাঁ করিয়া এক দৃষ্টে সুধাকরের অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করে।

ইন্দুপ্রভা এখন দ্বাদশ বর্ষিয়া। সেই নির্জ্জন বিপিনে সে এক কাপালিক ব্যতীত অন্য নর নারী কখন দর্শন করে নাই।

কাপালিক কুরূপ, কিম্ভুত কিমাকার; ইন্দুপ্রভা ভাবিত, বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব সৃষ্টিতে মানব মাত্রই বুঝি ঐরূপ। কাপালিক সেই বনমধ্যে কেবল ইন্দুপ্রভা দেখিত, আর দেখিত পাষাণময়ী, কালীমূর্ত্তি।

গভীর নিশীথে কাপালিক কালীপূজা করিত। কাপালিক ধর্ম্মে নরবলি প্রশস্ত। যে দিন কাপালিক কোন মনুষ্য ধরিয়া আনিতে পারিত, সেদিন আরও অধিক রাত্রে মায়ের পূজা হইত, পূজান্তে নরবলি। কেবল নরবলিতেই পূজা সমাপ্ত হইত না, ছাগ মেষাদি পশু বলিও হইত।

যাহাকে বলি দিবার ইচ্ছা, কাপালিক তাহাকে গুপ্ত স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া পূজার পূর্ব্বে অন্য কার্য্যে যাইত। ইন্দুপ্রভা নর-কঙ্কাল ও পশু-কঙ্কাল দেখিতে পাইত, কুটীরে আসিয়া কাপালিককে জিজ্ঞাসা করিত, "বাবা দেখিতে পাই, বন্য পশুরা অন্য পশু মারিয়া মাংস ভক্ষণ করে, সে সকল কি ?"

কাপালিক নানাপ্রকার অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া অবলা সরলা বালিকাকে ভুলাইয়া রাখিত।

কাপালিক যেদিন হরেন্দ্রকে ধরিয়া আনে, সেই দিন ইন্দুপ্রভা তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারে। হরেন্দ্রকে বন্ধন করিয়া রাখিয়া কাপালিক ইন্দুপ্রভাকে দেখিতে যায়; ইন্দুপ্রভা তখন নিদ্রার ছলনা করিয়া চক্ষু বুজিয়াছিল।

কাপালিক তখন অতি ব্যস্ত, অতি সত্বর নরবলি দিয়া মহামায়ার পূজা করিবে, সেই আনন্দে প্রায় জ্ঞান শূন্য, ইন্দুপ্রভার নিদ্রা সত্য কিংবা ছল, তাহা পরীক্ষা করিবার অবসর পাইল না, ততটা আবশ্যকও বোধ করিল না।

ইন্দুকে তদবস্থায় রাখিয়া কাপালিক ফিরিল, কালীপূজা করিল, যাহাকে বলি দিবে, তাহার হস্ত মুখ বন্ধন পূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া একটু দূরে খড়্গ আনিতে গেল, মায়া নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ইন্দুপ্রভা সেই অবকাশে বলিটিকে সরাইয়া ফেলিল। তাহার পর যাহা হইয়াছে, পাঠক মহাশয় তাহা অবগত আছেন।

ইন্দুপ্রভা যে দিন হরেন্দ্রকুমারকে বন্ধন মুক্ত করিল, সেই দিন সর্ব্ব প্রথম তাহার বিপুরুষ দর্শন। হরেন্দ্র পরম রূপবান ইন্দুপ্রভা কিন্তু তখনও সে রূপমোহে মোহিত হয় নাই ; প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, ইন্দুপ্রভার বয়স প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষ। যৌবনের প্রথম অঙ্কুর, লাবণ্য মনোহর, মস্তকে চাঁচর কৃষ্ণবর্ণ কুন্তল, ভ্রুযুগল যেন তুলিকা চিত্রিত, চক্ষু দীর্ঘাআয়ত, নাসিকা খগচঞ্চু, ওষ্ঠ পুট যেন বিম্ব ফল রঞ্জিত মুক্তাবলী, হস্তপদ সুডৌল, চরণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, মস্তকে সুচারু কৃষ্ণবর্ণ কুন্তল, করতল যেন রক্ত জবা, অঙ্গুলিগুলি চম্পককলিকা সদৃশ তনু সুকোমল; ইন্দুপ্রভা পরমা সুন্দরী।

ইন্দুপ্রভাকে খুঁজিতে খুঁজিতে বনমধ্যে যাইয়া কাপালিক কি করিল, তাহাই এখন দেখিতে হইবে। ইন্দুপ্রভা কুঞ্জের জোনাকী ধরিয়া নিজ কুন্তলে পরাইতে ছিল, সহসা কাপালিককে দেখিতে পাইয়া লজ্জিত হইল, কাপালিককে সম্বোধন করিয়া কহিল "কেন পিতা, অসময়ে এখানে আসিলে ?"

কাপালিক সে কথায় উত্তর দিল, আরও কত কথা কহিল, তাহার পর অন্য দিকে চলিয়া গেল।

ভয়ানক বন, বনের আদি অন্ত নাই বলিলেও হয়। সেই বনে কাপালিক সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া কঠোর যোগ সাধন আরম্ভ করিল। শাস্ত্রে সেই সাধনাকে পঞ্চতপা বলে। দিবাভাগে যোগ সাধনা, রাত্রিকালে বিশ্রাম কালে অমুতাপে বিমর্ষ ভাবে অবস্থিতি, এইরূপ নিয়ম। দিবাভাগে মাথার উপর প্রখর রবিকর, চারি পার্শ্বে প্রজ্বলিত অনল, মধ্যস্থলে কাপালিক মহাযোগে নিমগ্ন। যোগাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মধ্যে মধ্যে তাহাতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইতেছে, হুতাশন ক্রমেই প্রবল বেগে গর্জ্জিয়া উঠিতেছে, দিবাভাগে যোগ হয়, রাত্রে অনল নির্ব্বানোন্মুখ হইলে মাকালীর পবিত্র নাম উচ্চারিত হয়। ঐরূপ

যোগ সাধন করিয়াও কাপালিক কোন বিশেষ ফল পাইল না, দেবী কোনরূপ আশ্বাস দিলেন না, বরং রাজসিক পূজায় কোন ফল নাই, আকার ইঙ্গিতে ইহাই জানাইয়া দিলেন।

কাপালিকের চমক হইল, কিন্তু হিংসা ভুলিল না; কি উপায়ে কেমন করিয়া সেই যুবককে ধৃত করিবে, কতদিনে তাহাকে মায়ের নিকট বলি দিতে পারিবে, ইহাই তাহার ধ্যান জ্ঞান হইয়া রহিল। সে বাসনা পূর্ণ করা সহজ সাধ্য নয়। যুবক এত দিনে কোথায় কোন দিকে গিয়া পড়িয়াছে, শীঘ্র তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন। যদি বিশেষ অন্বেষণে তাহাকে পাওয়া যায়, ইন্দুপ্রভা তখন কোথায় থাকিবে কে জানে, একবার ইন্দুপ্রভা যুবার বন্ধন মোচন করিয়া দিয়াছে। পুনরায় যদি কোন সুযোগে মুক্ত করিয়া দেয়, ইহাও ভাবিতে হয়। কাপালিক একবার ভাবিয়াছিল, ইন্দুকে সঙ্গে লইয়া যুবার অন্বেষণে যাইবে, এই ভাবনা মনে উদয় হওয়াতে শেষে ভাবিল না, তাহা হইবে না, ইন্দুপ্রভাকে সঙ্গে লওয়া হইবে না; ইন্দুপ্রভা এই খানেই থাকুক, মহামায়ার সেবা করুক।

কাপালিক ইহাই স্থির করিল। কয়েক দিন পরে কি ভাবিয়া আর একবার কুটীরের দিকে গেল, ইন্দুপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইন্দুপ্রভা ভূতলে শয়ন করিয়াছিল, কাপালিককে দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া মুখখানি একটু গম্ভীর করিয়া কহিল, "বাবা! তোমার আদরিণী কন্যাকে একাকিনী ফেলিয়া এতদিন কোথায় ছিলে? তোমার প্রতিষ্ঠিত দেবী মহামায়া আজ ক-দিন একটুও জল পান নাই, তুমি উপদেশ দিয়াছ, স্ত্রী জাতির দেব দেবীর পূজায় অধিকার নাই; কারণ তুমিই জান, আমি অবলা, কি জানিব! দেবীকে আমি একটু জল দান করিতেও পারি নাই, জগতে আমাপেক্ষা অভাগিনী পাপিনী আর কে আছে, জানি না।" বলিতে বলিতে ইন্দুপ্রভা নীরব হইল; অভিমানে তাহার অধরওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল।

কাপালিক কহিল, "মা আমি অন্যত্র যোগে বসিয়া মাকে জল দিয়াছি, মা আমার পূজা পাইয়াছেন, সে জন্য তোমায় দুঃখ করিতে হইবে না, এখন আমি তোমাকে যাহা বলিতে আসিয়াছি, শ্রবণ কর। কোন বিশেষ কারণে আমি কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইতেছি, তুমি এইখানেই থাক, মা রহিলেন, মায়ের সম্মুখে কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা থাকিবে না। শীঘ্রই আমি ফিরিয়া আসিব। ভাবিও না মা।"

কাপালিক নীরব হইল। অভিমানে অধোমুখী হইয়া ইন্দুপ্রভা কহিল, "তুমি পিতা, যাহা করিবে, তাহাই হইবে। যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই কর।

তুমি যোগ করিতে যাইবে, বাধা দিতে নাই, বাধা দিব না। যাবে যাও, দুঃখিনী কন্যাকে মনে রাখিও।”

কাপালিক বুঝিল, ইন্দুপ্রভা রাগ করিয়াছে, ভালই হইয়াছে, এই সময় যাওয়াই ভাল, রাগের সময় না গেলে ইন্দুপ্রভা যাইতে দিবে না, অপত্য স্নেহে বাঁধা পড়িতে হইবে। ধর্ম্মার্জ্জনে জীবনঅতিবাহিত করিতেছি, আর কি স্থির থাকিতে পারি?” ইন্দুপ্রভার ভাগ্যে যাহা হয় হইবে, আমি চলিলাম। “না, ভুলিব না, শীঘ্রই আসিব।”

এই বলিয়া, কন্যার মস্তকে একটু পদধূলি দিয়া, তারাপদস্থিত বিল্বপত্র কন্যার ললাটে স্পর্শ করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া, কাপালিক চলিয়া গেল।

ইন্দুপ্রভা একবারমাত্র সেই দিকে চাহিল, উদ্দেশে বলিল, “আচ্ছা, দেখিব, তুমি কেমন করিয়া সেই যুবককে মায়ের নিকট বলি দাও।”

দয়াময়ী বালিকা তখন যুবকের উদ্ধারে কৃত সংকল্প হইল।

প্রেরিত পত্র।

সম্পাদক মহাশয়!—ইতি পূর্ব্বে জন্মভূমি পত্রিকায় আমাদের “বিবাহ না বাণিজ্য” শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া পরমপ্রীতিলাভ করিয়াছি। না মহাশয়, ক্ষমা করিবেন, কি বলিতে কি বলিলাম? তাদৃশ উপকারী প্রবন্ধ পাঠে কেবল প্রীতিলাভ করিয়া পত্রিকা দু-খানি তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়াছি, হয়ত ইহা মনে করিয়া আপনি আমাকে ঘৃণা করিতে পারেন। আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ, আলিবাবার তস্কর, অথবা আবুহোসের কেচ্ছা, পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম, স্বচ্ছন্দে এ কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু যে বিষয় আমাদের হিন্দু সমাজের প্রাণ, তাহার আলোচনায় প্রীতি অপ্রীতি প্রকাশ করাতে কেবল নিজেরই অসারতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র।

এই পর্য্যন্ত আমার ভূমিকার বিশ্রাম। এখন কাজের কথা ধরি। আমাদের বরকর্ত্তারা বিবাহ রূপ বাণিজ্য ব্যাপারে বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করিয়া অহঙ্কারে ফুলিতেছেন, ওদিকে কিন্তু গরীব কন্যা কর্ত্তারা সর্ব্বস্বান্ত মাথায়হাত দিয়াক্রন্দন করিতেছেন; বরের মূল্য সংগ্রহ অভাবে আপনাদের কন্যাগুলিকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখিতে বাধ্য হইতেছেন। যৌবন কাল পর্য্যন্ত কুমারী একথা বলিলেও উক্তি হইবে না। মর্ম্মান্তিক পরিতাপ? গৌরবান্বিত

আর্য্যসমাজ যদি একেবারে অধঃপাতে যায়, তাহাও বরং মঙ্গল, তথাপি ঐ প্রকার মর্ম্মভেদী পরিতাপ সহ্য করা যায় না।

আমাদের দেশের সমাজ সংস্কারক নামধারী বক্তা মহাশয়েরা কিছুদিন পূর্ব্বে উচ্চ কণ্ঠে ধূয়া ধরিয়া ছিলেন, "বাল্য বিবাহ দূর কর, বাল্য বিবাহ দূর কর?"- বহুৎ আচ্ছা,—বহুৎ আচ্ছা!—আমিও উচ্চ কণ্ঠে মঞ্জুর করি, "তথাস্তু—তথাস্তু।

"রোষে হউক, তোষে হউক, বলিলে জামাই।
ধর্ম্ম সাক্ষী, কাটিবারে আর পার নাই॥"

কবিবর ভারতচন্দ্র কবিবরসুন্দরের মুখদিয়া মশানে রাজা বীরসিংহকে এই কথা বলিয়াছিলেন। আমি স্বয়ং কবি না হইলেও সেই সকল বক্তা মহাশয়ের উদ্দেশে প্রতিধ্বনি করিতেছি, তাঁহাদের সমাজ সংস্কারিণী বক্তৃতায় ঐ অংশটি রোষে তোষে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। বিবাহ-বাণিজ্যের দৌরাত্ম্যে ভদ্র সমাজস্থ গরীব গৃহস্থের ঘরে বাল্য বিবাহ রহিত হইয়াছে। আরও একটু উচ্চে আরোহণ করি। বাল্য বিবাহ ত গেলই, যৌবন বিবাহও বন্ধ হইবার উপক্রম; শাস্ত্র যেখানে বলে, দম্পতিরচিরজীবন ধর্ম্ম বন্ধন, সেখানে এখন সেই বন্ধনের প্রধান অঙ্গ হইয়াছে, স্তুপাকার রজত চক্র?—কেবল টাকা—কেবল টাকা—কেবল টাকা?—

বাল্য বিবাহ কার নাম, কত বয়সে হিন্দু বালিকার বিবাহ হওয়া যুক্তি সঙ্গত, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই, প্রাচীন ব্যবহারে মনুসংহিতার মতে ব্যবস্থা ছিল, কন্যার দ্বাদশ ও পুত্রের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ শুভবিবাহের যোগ্য কাল; সেই একটা বাঁধাবাঁধি ছিল, এখন আমাদের শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম বন্ধন গুলি প্রায় সমস্তই শিথিল; দিন কতক পূর্ব্বে দুগ্ধ পোষ্য বালিকারও বিবাহ হইত, পঞ্চবর্ষ বয়স্কা বালিকাও এক জনের ধর্ম্মপত্নী হইত, দশ একাদশ দ্বাদশ বর্ষীয়া কুমারীরাও বিবাহ গ্রন্থী বন্ধন করিয়া লইত, বয়সের কোন প্রকার ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। প্রশ্ন উঠিতে পারে, এখন কি তবে ধরা বাঁধা নিয়ম হইয়াছে?—কিছুই হয় নাই, বরং আরও অনিয়ম বাড়িয়াছে। বিবাহ বাজারের সওদাগর মহাশয়েরা সেই অনিয়মের হুতাশনে আরও অধিক পরিমাণে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছেন।

কন্যার বয়ঃক্রম হইল দশ বৎসর, টাকা নাই, বিবাহ হইল না, বরের মূল্যের দাবি মায় অলঙ্কার ছয় সহস্র মুদ্রা, কন্যার পিতার সম্বল বার্ষিক বড় জোর এক সহস্র মুদ্রা, এরূপ স্থলে কিরূপে তিনি বরকর্ত্তার দাবি পুরণ করিতে পারেন? সুতরাং দশ বৎসরে বিবাহ হইল না। একাদশ বর্ষেও ঐ বাধা, দ্বাদশ বর্ষেও ঐ

বাধা, ত্রয়োদশ বর্ষেও ঐরূপ সমান বাধা। বরং আরও বেশী। কন্যা যত বড় হয়, বিলক্ষণ দাঁও বুঝিয়া বরকর্ত্তারা ততই টাকার দাবি বাড়াইয়া তোলেন।

বলিয়াছি, কন্যা কর্ত্তার বার্ষিক আয় বড় জোর এক সহস্র মুদ্রা। পরিমাণটা অনেক বেশী বলা হইয়াছে। এমন কন্যা কর্ত্তা অনেক আছেন, তাঁহাদের বার্ষিক আয় মাসিক বার টাকা হিসাবে একশত চুয়াল্লিশ টাকা। তাঁহারা কি প্রকারে বরের মূল্য পাঁচ ছয় সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন, সমাজ হিতৈষী লোকেরা সে বিবেচনাকে মনের কোণেও স্থান দেন না। কন্যা অথবা কন্যার পিতার ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, তাহা হইলেও দুই সহস্রের ন্যূনে বিবাহ মণ্ডপে শঙ্খ বাজিবে না,—বাজিতে পারিবেই না?

টাকা নাই, কন্যার বিবাহ হয় না। কন্যা যুবতী হইয়া উঠিল, টাকা নাই, যৌবন কালেও হিন্দু গৃহস্থের কন্যাটিকে কুমারী অবস্থায় থাকিতে হইল। যুবতী কুমারীর বরের মূল্য কত হইলে মন স্তুষ্টি সম্পাদিত হয়, ঔদরিক বরকর্ত্তারা তাহা হিসাব করিয়া উঠিতে পারেন না!

আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, এ দেশের "বিবাহ বাজারে আগুণ লাগিয়াছে"? আগুণ ত লাগিয়াছে, কিন্তু ইহার পরিণাম ফল কি হইবে?—আমি এই বিষয় একটু চিন্তা করিয়াছি। চিন্তা কল্পিত মীমাংসাটা ব্যক্ত করিতে হইলে, অঙ্গ শিহরিয়া উঠে? অথচ প্রকাশ না করিলেও আমার এই প্রস্তাবটি অঙ্গ হীন থাকিয়া যায়। অতএব সূক্ষ্ম কথায় ব্যক্ত করিতে বাধ্য।

সমাজের অবস্থজ্ঞ বিজ্ঞ লোকেরা সকলেই জানেন, বড় বড় কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে ৩০।৪০।৫০ বর্ষ বয়স্কা প্রৌঢ়া কন্যারা এখনও অবিবাহিতা রহিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের পরে বিবাহ হইবে, তাহাও কি নিশ্চয়? কে বলিবে নিশ্চয়।—এই বয়সে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অশতী বর্ষীয়া কুলীন কুমারী,—চির কুমারী!

কেন এমন হয়? ঘর বর ঠিক পাওয়া যায় না। আমাদের সমাজের সাধারণ অবস্থা কি ঐ রকম?—আমাদের সমাজে কি প্রয়োজন মত বর পাওয়া যায় না? অভাব কি?—যত বর, তত কন্যা, বিধাতার সৃষ্টি। বরের অপ্রতুল নাই; অপ্রতুল কেবল টাকার।—হৃদয় শূন্য, নির্ম্মম, অর্থলোভী বর কর্ত্তারা অর্থ লোভে সাধ করিয়া বর গুলিকে আমানত জমার ঘরে জমা করিয়া রাখিয়াছেন? কল্পনায় যাহা আমি পাইয়াছি, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা যদি সত্যফলে পরিণত হয়, তবে এদেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে ঘরে প্রাচীনাচির কুমারীপণিত হইতে থাকিবে।

কি বিবেচনা করেন ?—সেরূপ অবস্থা দাঁড়াইলে গৃহে গৃহে কি ধর্ম্ম রক্ষা হইবে ? ভাবিতে হৃদয় কম্পিত হয়, স্থূলে ব্যাভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "সংগ্রামে যদি আমি এই সকল সমবেত জ্ঞাতি ও রাজগণকে সংহার করি, তাহাহইলে রাজ্যে রাজ্যে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, অনেক রমণী অপর পুরুষের সঙ্গ কামনা করিবে, দেশে বহুল পরিমাণে বর্ণ-সঙ্কর উৎপন্ন হইবে, আমি সেই মহাপাপের প্রবর্ত্তক হইব, পাপের ফল আমাকেই ভোগ করিতে হইবে। অতএব আমি যুদ্ধ করিব না।"

এখন আমার আশঙ্কার বিষয় এই যে, আমার কল্পনাবৃক্ষে সত্য ফল ফলিলে এই পবিত্র সমাজে বর্ণ সঙ্করের হাট বসিয়া যাইবে ? জগত পিতা কি আমাদের সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন ? কথনই করিবেন না। হে ধন লোলুপবরকর্ত্তা মহাশয়গণ ? আপনাদের দারুণ অর্থ লোভের ফলাফল চিন্তা করুন। সমাজটিকে যদি একেবারে মহাপাপানলে দগ্ধ করা অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে কিয়ৎ পরিমাণে বিবেকের পরামর্শ লইয়া অল্পে অল্পে লোভ সম্বরণ করুন ; গুণবান পুত্র গুলির মূল্য কিয়ৎ পরিমাণে কমাইয়া দিন। এখনও সময় আছে। মনে করুন, জিনিষ সস্তা হইলে সকলেরই সুখের বিষয় হয়। সামান্য একটা দৃষ্টান্ত দেখাই, গত বৎসর দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে এক টাকায় পাঁচ সাতটি বিলাতী কুষ্মাণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল, এবৎসর সেই কুষ্মাণ্ড এক টাকায় বার তেরটা পাওয়া গিয়াছে। সস্তা হওয়াতে পূজাবাড়ীর কর্ম্ম কর্ত্তারা অল্প টাকায় অধিক লোকের ভোজ্য ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইবার সুবিধা বুঝিয়া এক একজন শতাধিক কুষ্মাণ্ড ক্রয় করিয়াছেন। সস্তার বড় আদর। জিনিষ সস্তা হইলেই গৃহস্থ লোকের স্বচ্ছল, দুর্ম্মূল্য হইলেই দুর্ভিক্ষ। হে বর কর্ত্তা মহাশয়েরা ? এই দুর্ভিক্ষের বাজারে আর আপনারা বরের বাজারে দুর্ভিক্ষ আনয়ন করিবেন না। রাখ রাখ অনুরোধ, এ মর্ম্ম মিনতি।

বশম্বদ।

কন্যাদায় গ্রস্থ পিতা।

যোগেন্দ্র নাথ। *

লেখক, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দত্ত।

যে স্বর্গীয় ঔপন্যাসিকের পবিত্র স্মৃতি পূজার উদ্দেশে এই শোক সভা আহূত হইয়াছে, তাঁহার সহিত আমার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করি। আমি তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় সম্মান করিতাম, সুহৃদের ন্যায় ভাল বাসিতাম, গুরুজ্ঞানে উপদেশ গ্রহণ করিতাম, কি সম্পদে, কি বিপদে, কি বিনোদে, কি বিষাদে একত্রে বসিয়া হৃদয় খুলিয়া, জীবনের অনেক সুখ দুঃখের কথা কহিতাম। এক মুহূর্ত্তের জন্য কখনও মনে হয় নাই, তিনি ব্রাহ্মণ আমি কায়স্থ, তিনি পূজ্য আমি পূজক, তিনি দেবতা আমি সাধক। কোন রূপ ব্যবধান কোন রূপ সামাজিক বন্ধন, কোন কিছু ভাবের অভাব আমাদের মধ্যে ছিল না। আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ। পরোপকার ব্রত তাঁহার জীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য ছিল, অন্তরঙ্গ মিত্রের কথা দূরে থাকুক, যাহার সহিত এক দিনের দেখা এক দিনের আলাপ, মুখের পরিচয় মাত্র, তাহার যদি কখন বিপদের কথা শুনিতেন, শত কর্ম্ম ফেলিয়া, সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া যোগেন্দ্র নাথ উন্মাদ হইয়া ছুটিতেন। বুক দিয়া সে বিপদ দূর করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেন। স্বার্থের তাড়নায় তাঁহাকে কখন কাতর দেখি নাই, নিজের ভাবনা কখন তাঁহাকে ভাবিতে দেখি নাই, পরের জন্য জন্ম গ্রহণ, পরের কার্য্যে জীবন অর্পণ, পরের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া হাসিতে হাসিতে নশ্বর সংসার হইতে মহাপ্রস্থান! যোগেন্দ্রনাথের জীবন বিচিত্রতায় পূর্ণ। প্রায় সকল সাহিত্যসেবীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, সকল সমাজেই তাঁহার যাতায়াত ছিল, উচ্চ, নিচ, ধনী গৃহস্থ, সকলের সহিত তিনি সমভাবেই মিশিতেন, অথচ তাঁহার কোন শত্রু ছিল না। যোগেন্দ্র নাথের নিন্দা আমি কখন কাহারো মুখে শুনি নাই, তাঁহাকেও কখন কাহারও নিন্দা করিতে দেখি নাই। পর নিন্দা পর চর্চ্চা যে স্থানে হইত; যোগেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিতেন; সর্ব্বদাই বলিতেন, "ভাই—দুদিনের জন্য সংসারে আসা! দোষ গুণ কার নাই, পরের কথায় মাথা ঘামাইবার কি প্রয়োজন।" বর্ত্তমান জগৎ ব্যাপার যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে এরূপ প্রকৃতির লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়; এ কথা বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

আমার প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ও অনুরাগের অন্ত ছিল না; আমার নাম শুনিলেই তিনি আনন্দে বিগলিত হইতেন, কেহ আমার প্রশংসা করিলে তাঁহার উল্লাসের অবধি থাকিত না, আমার সম্বন্ধে কেহ অপ্রিয় বলিলে, তাঁহার

---

* শোক সভায় পঠিত।

চক্ষু রক্তবর্ণ হইত। তিনি যে আমায় প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতেন, তাঁহার সরল, স্বার্থহীন ভ্রাতৃপ্রেম যে প্রকৃত অন্তরের সামগ্রী ছিল, তাহা আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছি। কবি বলিয়াছেন—

"প্রাণ বোঝে কোথা তার টান।
সাগর লঙ্ঘিয়া পরস্পরে করে দেখা।"

একথার প্রভূত প্রমাণ আমি যোগেন্দ্র নাথের চরিত্রে ও ব্যবহারে পুনঃ পুনঃ পাইয়াছি ও দেখিয়াছি। যখনি আমার তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা যাইত, কোনরূপ কার্য্যোপলক্ষে যখনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রয়োজন হইত, পবিত্র স্বপ্নের ন্যায় সেই মুহূর্ত্তেই যোগেন্দ্রনাথ কোথা হইতে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। হয় ত' প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিয়াছি, কয়েক জন বন্ধুবান্ধব মিলিয়া একটু সাহিত্য চর্চ্চা হইতেছে, কথায় কথায় যোগেন্দ্র নাথের নাম উল্লেখ হইল; চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে দেখি—সম্মুখে আমার বড় আদরের যোগেন দাদা! সেই চিরহাস্য বদনে চির প্রফুল্লতা বিরাজিত, স্মিতমুখে ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, কি ভায়া কি হ'চ্ছে! আবার এমনও হইয়াছে' যে কোন দিন গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপে সূর্য্যের প্রখর কিরণে ক্লিষ্ট হইয়া আপন মনে গন্তব্য স্থানে চলিয়াছি, পথে দেখিলাম, বড় বড় অক্ষরে প্লাকার্ড ছাপা রহিয়াছে, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্র বাবুর নূতন একখানি নভেল বাহির হইয়াছে; যোগেন্দ্র নাথের নাম যে মুহূর্ত্তে আমার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল, সেই দণ্ডে দেখি শ্রান্ত ক্লান্ত যোগেন্দ্রনাথ একটি ছাতা মাথায় দিয়া আমার গাড়ির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে তুলিয়া লইলাম নানাবিধ গল্প করিতে করিতে দুইজনে চলিতে লাগিলাম। আবার এমনও ঘটিয়াছে যে কোন দিন অভিনয় রাত্রে অভিনয়ের গুরু পরিশ্রমে অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি, একজন মনের মত সঙ্গীর অভাবে ক্লেশ অনুভব করিতেছি, বলিয়া মনে হইতেছে এমন সময় যদি যোগেন দাদা আসিতেন, দুইটা কথা কহিয়া প্রাণটা জুড়াইয়া শ্রান্তির অবসান করিতাম। কি ভোজবাজী না প্রহেলিকা? ঠিক সেই সময়ে মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে ক্ষীণ বপুখনি দোলাইতে দোলাইতে স্নেহের উৎস ছড়াইত ছড়াইতে শিশু হৃদয় দেবপ্রকৃতি যোগেন্দ্র নাথ আমার সজ্জাগৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি বিস্ময় বিপ্লুত হইয়া বলিলাম, যোগেন দাদা এইমাত্র আপনার নাম মনে হইতেছিল। তিনি উত্তর করিলেন, তাইত ভায়া আমিও

ঠিক এসে উপস্থিত। জানি না এরূপ প্রাণের সম্বন্ধ যোগেন্দ্রনাথের আর কাহারও সহিত ছিল কি না? তাঁহার মৃত্যুতে আমার প্রাণে যে শোকশেল বাজিয়াছে, তাহা বুঝাইবার শক্তি আমার নাই, আমি ভাই হারাইয়াছি, বন্ধু হারাইয়াছি, উপদেশষ্টা হারাইয়াছি; জীবনের একটি প্রধান অবলম্বন বিসর্জ্জন দিয়াছি, জানিনা কেন আমার মনে হয় যোগেন্দ্রনাথ মৃত নহে, যোগেন্দ্রনাথ জীবিত! তিনি কিছুদিনের জন্ত প্রবাসে যাত্রা করিয়াছেন, আবার আসিবেন, আবার প্রাণের হাসি হাসিয়া আমাদের কোলে টানিয়া লইবেন, আবার ভাষার ঝঙ্কারে ত্রিভুবন কাঁপাইয়া চরিত্র সৃষ্টির অপূর্ব্ব প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া সাহিত্য গগণের পুর্ণশশী আবার ষোলকলায় উদিত হইবে। নচেৎ ব্যথিতের বেদনা মুছাইতে রহিল কে? পরের কান্নায় অশ্রুজল ফেলিবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কই? পরোপ্রকার ব্রতে আত্মোৎসর্গ করিবার সে সামর্থ্য আর কাহার আছে? নাই-নাই! বিশ্বকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, যোগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নাই! যোগেন্দ্রনাথের স্থান পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা, বোধ হয় এ যুগে আর নাই! যোগেন্দ্র নাথের অভাব মোচন নূতন সৃষ্টির অঙ্কুর না হইলে আর হইবে না! যদিও আমরা তাঁহার লোকান্তর উপলক্ষে এই সভায় শোক প্রকাশ করিবার জন্ত উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু তথাপি আমার মনে হইতেছে, যোগেন্দ্রনাথ আমাদের ছাড়িয়া যান নাই, তিনি করুণারআদর্শএরূপ কঠোর কার্য্য কখনই তাঁহার দ্বারা সম্ভব নয়; হয়তো তিনি কোথায় লুকাইয়া আছেন, আমাদের উপর অভিমান করিয়া তিনি কোথায় প্রচ্ছন্ন ভাবে ভ্রমণ করিতেছেন; আমাদের পরীক্ষা করিবার জন্ত তিনি লোক চক্ষুর অন্তঃরালে রহিয়াছেন প্রাণের ডাক ডাকিলেই তিনি আসিবেন, সাড়ার মত সাড়া লইতে পারিলেই তিনি আবার আসিয়া ধরা দিবেন, বুকের ধন বুক পাতিয়া লইতে পারিলেই আবার আসিয়া ধরা দিবেন। নির্ম্মমতার রেখা সে হৃদয়ে নাই, আমাদের ছাড়িয়া স্বর্গেও কি তিনি সুখী হইবেন। বন্ধু বর্গ যে তাঁহার জীবনছিল, বন্ধু বৎসলতা যে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বস্ব ছিল, সুহৃদ প্রেম যে ঐশ্বরিক প্রেম অপেক্ষা তাঁহার নিকট ঐশ্বর্য্যশালী ছিল।

সাহিত্য জগতে তাঁহার কিরূপ প্রতিষ্ঠা ছিল সে বিচার করিবার সামর্থ্যও আমার নাই, প্রয়োজনও দেখিনা। কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার প্রণয় পরিণাম, প্রেমপ্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা, কনেবৌ, খুড়িমা, সংসার চিত্র প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে বিরাজিত। এমন বাঙ্গালী কে আছে যিনি

যোগেন্দ্র নাথের উপন্যাসের আদর না করেন। শুধু বাঙ্গালী বলিয়া নয় মুসলমান সমাজেও তাঁহার গ্রন্থের বিশেষ আদর দেখিয়াছি। ঢাকার বর্ত্তমান নবাব বাহাদুরের বাটীতে অভিনয় করিবার জন্য যখন আমি দল বল লইয়া যাই সেই সময়ে একদিন কথার প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলিয়া ছিলেন, যোগেন্দ্র বাবুর কর্ণে-বৌ বহিখান, আপনি নাটকাগারে পরিণত করিয়া অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করুন, অমন বই আমি আর কখনও পড়ি নাই। তাই বলিতেছি কেবল মাত্র বঙ্গবাসীর গৃহেই নহে, মুসলমান সম্প্রদায়েও যোগেন্দ্র নাথের প্রতিভার পূজা হয়। তাঁহার শেষ গ্রন্থ শোভাসিংহ। এ গ্রন্থের শেষ ভাগ যখন লিখিত হয়, তখন আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আমি আগ্রায়গমন করি। আমার অনুরোধে যোগেন্দ্র নাথও আমার সঙ্গী হইয়া ছিলেন, সেইখানে তিনি এক একটী করিয়া পরিচ্ছেদ লিখিতেন, আর আমায় শুনাইতেন। নাটকীয় উপাদান "শোভাসিংহে" এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে যে, যদ্যপি কোন রঙ্গালয়ের সত্বাধিকারী বা অধ্যক্ষ উক্ত উপন্যাস খানিকে নাটকাকারে পরিণত করিয়া অভিনয় করেন তাহা হইলে তাঁহার রঙ্গ ভূমির গৌরব প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশেষ লাভবান হইবেন, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। শোভাসিংহ নাটকাকারে অভিনয় করিবার আমার নিতান্ত ইচ্ছা আছে, সে সংকল্প কতদূর কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব, সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারে না।

উপসংহারে সভাস্থ সকলের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ যোগেন্দ্রনাথের কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হয়, এ উদ্যোগে সকলেই বদ্ধপরিকর হউন, সকলেরই দিন আছে, যাঁহারা মানির মান দান করিবার জন্য মুক্ত হস্ত হইবেন, তাঁহাদিগের সম্মান ভগবান রক্ষা করিবেন। আপনারা একান্ত মনে প্রার্থনা করুন, যোগেন্দ্র নাথের স্বর্গীয় আত্মা যেন সেই পরম শান্তিময়ের কোলে গিয়া চির-শান্তি লাভ করে এবং তাঁহার এক মাত্র বংশধর শ্রীমান ধীরেন্দ্র নাথ যেন তাঁহার আদর্শ পিতার কীর্ত্তিপথ অনুসরণ করিয়া সংসারের দশজনের একজন হইতে পারেন।

সমালোচনা।

বনৌষধিদর্পণ। কোচবিহারের রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত বিরজাচরণগুপ্ত কবিভূষণ প্রণীত, জগতপিতার সংসার উদ্যানের উদ্ভিজ্জবলী ভিন্ন ভিন্ন ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু অধুনা যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উদ্ভিজ্জের প্রাচীন নামের সহিত আধুনিক নামের সম্বন্ধ রাখিতে সন্দিহান হন, নামানুসারে উদ্ভিজ্জ গুলি চিনিয়া লইতে অনেকে বেদিয়া নামে পরিচিত নীচ শ্রেণীর লোকের উপরেই নির্ভর করিয়া অনেক উদ্ভিজ্জ সংগ্রহ করেন। একথা বলিলে আমাদিগকে বোধ হয়, অপরাধি হইতে হইবে না। শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিরজা চরণ গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয় বহু পরিশ্রম সহকারে প্রকৃত উদ্ভিজ্জ নির্ব্বাচনের প্রকৃষ্ট উপায়বিধানে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন কোন উদ্ভিজ্জের কি কি নাম পূর্ব্বে ব্যবহার হইত, আর কোন কোন দেশের লোকেরা কি কি নামে সকল উদ্ভিজ্জের পরিচয় জ্ঞাত আছেন, কোন উদ্ভিজ্জের কি গুণ, কোন কোন রোগাধিকারে কোন কোন উদ্ভিজ্জ প্রযোজ্য তাহার মাত্রার পরিমাণ কিরূপ, কবিভূষণ মহাশয় অতি পরিস্ফুট রূপে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। অকারাদি বর্ণানুক্রমে সুপ্রণালী মতে উদ্ভিজ্জের নামগুলি সজ্জিত হইয়াছে, প্রত্যেক উদ্ভিজ্জের এ দেশ প্রচলিত নামের সহিত লাটিন নাম সংযোজিত হইয়াছে। ধন্বন্তরি নির্ঘন্টু, রাজ নির্ঘন্টু, ভাবপ্রকাশ, বাগভট চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া অতি বিস্তারিত এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। এতৎ গ্রন্থ সংগ্রহে কবিভূষণ মহাশয়কে যে কত সংস্কৃত ও ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিতে হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার যে কত পরিশ্রম হইয়াছে, পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই বিজ্ঞলোকেরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এতৎ পাঠে চিকিৎসক মহাশয়গণের বিশেষ উপকার লাভ হইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সংগ্রহকর্ত্তা কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত মহাশয় সর্ব্বসাধারণের মহোপকার সাধন করিয়া বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথমেই ৬৮ পৃষ্ঠায় আয়ুর্ব্বেদ ইতিহাস লিখিত হইয়াছে।

কুমার টুলির সুবিজ্ঞ কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় বিজয় রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহাশয় এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশের সারভাগ আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থ পাঠের অগ্রে উপক্রমণিকা পাঠ করিলেই গুণজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা এই গ্রন্থের জীবনী শক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। কবিরঞ্জন মহাশয়ও আমাদের ধন্যবাদ ভাজন; উপক্রমণিকার একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, উদ্ভিজ্জ গুলির প্রতিরূপ চিত্র করিয়া দিলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারিত! আমরা আশাকরি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে কোচবিহারের মহারাজ এ বিষয়ে মনযোগী হইবেন।

—:o:—



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৬শ বর্ষ। | ১৩১৫ সাল, মাঘ। | ১০ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব।

সপ্তম অধ্যায়।

বলা হইয়াছে, নিমাইচাঁদের বয়ঃক্রম ষোল বৎসর। এই সময় বনমালী আচার্য্য নামে একজন ঘটক শচীদেবীর নিকটে আসিয়া নিমাইচাঁদের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, "বল্লভাচার্য্যের একটি পরমাসুন্দরীকন্যা আছে, নাম লক্ষ্মী প্রিয়া, সেই কন্যার সহিত নিমাইয়ের বিবাহ দিলে সুন্দর মিলন হইতে পারে। নিমাইকে কন্যাদান করিতে বল্লভাচার্য্য প্রস্তুত।"

শচীদেবী আহ্লাদ পূর্ব্বক সম্মতি দিলেন, সম্বন্ধ স্থির হইল, বিবাহের দিনও সমাগত, কুলকন্যাগণকে বাটীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া শচীমাতা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমার নিমাইচাঁদের বিবাহ, মঙ্গল কামনায় তোমরা মঙ্গলাচরণ কর; আশীর্ব্বাদ কর নিমাই যেন চিরজীবী হয়!"

গাত্রোহরিদ্রাপ্রদানেরনিমিত্ত শচীদেবীনিমাইকেডাকিতে গেলেন; দেখিলেন, নিমাই কাঁদিতেছে। অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া জননী বলিলেন, "এ কি হইল? তুমি কাঁদিতেছ কেন? এমন শুভ দিনে কি কাঁদিতে আছে? বাপধন! সংসারের সর্ব্বস্ব! চুপ কর, শান্ত হও; শুভ দিনে কাঁদিতে নাই।"

নিমাই বলিলেন, "মা! আমি শান্ত হইতে পারিতেছি না; পিতাকে আর দাদাকে মনে পড়িতেছে! এই শুভ দিনে তাঁহারা উপস্থিত থাকিলে কতই সুখের বিষয় হইত, তাহা ভাবিয়াই আপনা হইতে আমার চক্ষে জল আসিতেছে।

মনোবেগ সম্বরণ করিয়া শচীদেবী বলিলেন," ভগবান যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য অনুতাপ করা বৃথা। তুমি শান্ত হইয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর।" এই বলিয়া বসনাঞ্চলে পুত্রের নেত্রজল মুছাইয়া দিলেন।

মাতৃস্নেহে মুগ্ধ হইয়া নিমাই শান্ত হইলেন, মঙ্গলাচরণে গাত্র হরিদ্রা হইয়া গেল, শুভদিনে শুভক্ষণে লক্ষ্মী প্রিয়ার সহিত চৈতন্য দেবের শুভ পরিণয় সম্পাদিত হইল। বর বধূ গৃহে আসিলেন, সংসারে নূতন সুখ উথলিল শোকসন্তপ্ত শচীদেবী পরমরূপবতী নববধূকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে ভাসিলেন! নিমাইচাঁদও সুখী হইলেন, কিন্তু স্বভাব সমভাব রহিল; বিবাহ হইলেও তাঁহার চাঞ্চল্য বিদূরিত হইল না। টোলের কার্য্য কিন্তু সমভাবেই চলিতে লাগিল।

এই সময় ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন; তিনি হরিভক্তিপরায়ণ পরম পণ্ডিত; পৈত্রিক নিবাস ২৪ পরগণা জেলার হালি সহরের নিকটবর্ত্তী কুমারহট্ট; তিনি সুপ্রসিদ্ধ মাধবেন্দ্র পুরীর প্রিয়শিষ্য। নবদ্বীপে আসিয়া ঈশ্বরপুরী প্রথমে গদাধর মিশ্রের সহিত আলাপ করেন। "শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত" নামে তিনি একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, গ্রন্থ খানি তাঁহার সঙ্গেই ছিল; সেইখানি পাঠ করিয়া তিনি গদাধরকে শুনাইতেন। দৈবযোগে নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁহার একদিন সাক্ষাত হয়। উভয়ের সহিত উভয়ের এই প্রথম সাক্ষাত। ঈশ্বরপুরী বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত! আমি ইতিপূর্ব্বে তোমার যশোখ্যাতির সবিশেষ পরিচয় শ্রবণ করিয়াছি, তুমি অধুনা নবদ্বীপের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, আমি একখানি কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, তাহাতে যে যে দোষ আছে, শ্রবণ করিয়া তাহা তুমি বলিয়া দাও" নিমাই বলিয়াছিলেন, "একেত কৃষ্ণকথা, তাহাতে ভক্তের রচনা, সে গ্রন্থে দোষ ধরে, এত সাধ্য কাহার? গ্রন্থখানি শ্রবণ করিয়া নিমাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; কেবল ব্যাকরণের একটী ধাতু প্রয়োগে উভয়ের মতভেদ হইয়াছিল।

উপনয়নের সময় নিমাইচাঁদের নূতন নাম হইয়াছিল, গৌরহরি। আমরাও সময় সময় তাঁহাকে গৌরহরি বলিব। ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর গৌরহরি কতিপয় শিষ্য সমভিব্যবহারে পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে যাত্রা করেন; তথাকার গণনীয় পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার হয়; বিচারে তিনিই জয়ী হন। গৌরহরি গাঢ় অনুরাগে হরিসংকীর্ত্তন করিয়া ছয় মাসের মধ্যে তৎপ্রদেশবাসীগণকে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে নবদ্বীপে তাঁহার দ্বারা সেইরূপ হরি সংকীর্ত্তণ আর হয় নাই।

গৌরহরি পূর্ব্বদেশ হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে তপনমিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তপন মিশ্র সাধু প্রেমিক অকপট কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ। সাষ্টাঙ্গে গৌরহরিকে প্রণাম করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, তুমি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন; সংসারার্ণব হইতে উদ্ধার পাইবার বাসনায় আমি তোমার নিকট আসিয়াছি।" হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া গৌরহরি বলিয়াছিলেন, "ও কথা বলিতে নাই; জীবে ভগবৎ জ্ঞান করিলে পাপ হয়। তুমি বারানসী ধামে যাত্রা কর, দশ বৎসর পরে সেই পুণ্যতীর্থে আমার সহিত তোমার দেখা হইবে, সেই স্থানে আমি তোমাকে উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিব।"

তপন মিশ্র সস্ত্রীক কাশীধামে যাত্রা করিলেন, গৌরহরিও নবদ্বীপের প্রত্যাগমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাগত হইয়া গৌরহরি শুনিলেন, তাঁহার নবপরিণিতা সহধর্ম্মিনী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই অশুভ সংবাদে অবশ্যই তিনি শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ধৈর্য্যগুণে শোক সম্বরণ করিতে অসমর্থ হন নাই; শচীদেবী শোকাভিভূতা ছিলেন, জ্ঞানবান গৌরহরি সমুচিত প্রবোধ বাক্যে জননীকে সান্ত্বনা করিয়া ছিলেন।

এক বৎসর পরে নবদ্বীপ নিবাসী রাজপণ্ডিত সনাতনমিশ্রের পরমাসুন্দরী কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত গৌরহরির দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। এই বিবাহের পর দুই বৎসর কাল চঞ্চল নিমাই দিব্য শান্তভাব ধারণ করিয়াছিলেন, সেই দুইবৎসর শচীদেবীও নিরুদ্বেগে সংসার সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে নিমাই একদিন জননীর নিকট উপবিষ্ট হইয়া গয়াধামে যাত্রা করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। পুত্র পিতৃকার্য্য করিতে যাইবেন, শচীদেবী নিষেধ করিতে পারিলেন না, প্রফুল্লবদনে অনুমতি প্রদান করিলেন।

শুভ দিন দেখিয়া গৌরহরি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; সঙ্গে রহিলেন, চন্দ্র শেখর ভট্টাচার্য্য এবং কতিপয় শিষ্য। কিয়দ্দূরে গমন করিয়া মন্দার নামক স্থানে গৌরহরির জ্বর হইল। জন্মাবধি তাঁহার কোন পীড়া হয় নাই, জ্বরও কঠিন, সুতরাং সকলেই চিন্তিত হইলেন; চিকিৎসকেরাও ভয় পাইলেন। পরিশেষে গৌর হরি তথাকার বিপ্রগণের পাদোদক পান করিয়া অচিরে আরোগ্যলাভকরিলেন।

গৌরহরি যথাসময়ে গয়াধামে উপস্থিত হইলেন, ভক্তিভাবে কৃতাঞ্জলি পুটে, সেই পবিত্র ধামকে প্রণাম করিলেন; অনন্তর ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া যথাবিধি পিতৃকার্য্য সম্পাদন করিলেন। কার্য্য শেষ হইলে তিনি পুনরায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিতে গেলেন। ভগবান বিষ্ণু সেই স্থানে গয়াসুরের মস্তকে পাদপদ্ম অর্পণ করিয়া ছিলেন, সেই পদাঙ্ক অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। নিমাই একদৃষ্টে সেই পাদপদ্ম দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন আর তাঁহার চাঞ্চল্য রহিল না, হাস্য কৌতুক রহিল না, মুখে বাক্য রহিল না, বদন মণ্ডল প্রফুল্ল রহিল, ওষ্ঠদ্বয় অল্প অল্প কম্পিত হইতে লাগিল, প্রেমাশ্রুধারায় উভয় নেত্র পরিপ্লুত হইয়া আসিল, ক্রমে ত্রিধারায় প্রবাহিত হইয়া তাঁহার উপবীত উত্তরীয় ও পরিহিত বসন অশ্রু প্রবাহে সিক্ত হইয়া গেল। নিমাই তখন অপরূপ শ্রীধারণ করিলেন। দর্শক মণ্ডলী তাঁহার সেই অপরূপ ভাব অনিমিষে দর্শন করিতে ছিলেন; প্রেমভাবে চৈতন্যদেবের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, কেহই ধরিতে সাহস করিলেন না। দৈব ঘটনা সূত্রে ঈশ্বরপুরিও সেই সময় গয়াধামে আসিয়া ছিলেন, জনতার পশ্চাতে থাকিয়া তিনি একদৃষ্টে গৌরহরির নবভাব নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন। তিনি নিমাইকে দেখিতে ছিলেন, কিন্তু নিমাই তাঁহাকে দেখিতে পান নাই।

ক্ষণেকের মধ্যে চৈতন্যের বাহ্য চৈতন্য তিরোহিত, মূর্চ্ছা হইবার সম্পূর্ণ লক্ষণ; ঈশ্বর পুরি তখন নিকটে আসিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন; কৃষ্ণ ভক্তের হৃদয় স্পর্শে চৈতন্য দেবের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল. ঈশ্বর পুরিকে দর্শন করিয়া তিনি তখন প্রেমানন্দনীরে অভিষিক্ত হইলেন, উভয়ে উভয়ের কণ্ঠধারণ পূর্ব্বক অবিরল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঈশ্বর পুরির নির্ম্মল মুখ মণ্ডলে দৃষ্টি দান করিয়া প্রেম গদ্ গদ্ কণ্ঠে গৌর হরি বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার গয়াযাত্রা সফল হইল। গোঁসাই! তোমার পাদ-পদ্ম দর্শনে আমি আনন্দ সাগরে ভাসিলাম, আজি অবধি আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস হইলাম। ভবসাগরে পতিত হইয়া আমি কূলহারা হইয়াছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর।"

ঈশ্বর পুরি বলিলেন, "যে দিন আমি নবদ্বীপে তোমাকে প্রথম দর্শন করি, সেই দিন অবধি তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছ, সেই দিন অবধি আমি সর্ব্বক্ষণ তোমাকে হৃদিপদ্মে দর্শন করিতেছি। আমরা উভয়েই কৃষ্ণদাস, ক্ষণমাত্র তোমার বিচ্ছেদ আমার প্রাণে সহ্য হয় না।"

উভয়ে এইরূপ প্রেম সম্ভাষণ করিবার পর, নিমাই বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বাসায় আসিয়া রন্ধন করিতে বসিলেন। রন্ধনকার্য্য প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে, এমন সময় ঈশ্বরপুরি তথায় আসিয়া উপস্থিত। ঈশ্বরপুরি সংসারের সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াও নিমাই চাঁদের প্রেমবন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছেন, কিছুতেই সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিতেছেন না; সেই কারণেই রন্ধন শালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরহরি তাঁহাকে দর্শন করিয়া সানন্দে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

ঈশ্বর পুরি বলিলেন, "পণ্ডিত! তোমার রন্ধনকার্য্য শেষ হইয়াছে, আমিও ক্ষুধার্ত্ত আছি। গৌরহরি বলিলেন, " সমস্তই প্রস্তুত, ভোজন কর।"

ঈশ্বর পুরি বলিলেন, "আমি একাকী ভোজন করিব? সে কি কথা? তাহা হইবে না। আইস, তোমার অন্ন বিভাগ করিয়া উভয়ে এক সঙ্গে ভোজন করি।"

চৈতন্যদেব সে কথা শুনিলেন না, সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন ঈশ্বরপুরিকেই ভোজন করাইলেন, তাঁহার আহারান্তে স্বয়ং পুনরায় রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেন।

অতঃপর একটী শুভ দিন দেখিয়া সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরি চৈতন্যদেবকে দশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন। মন্ত্র গ্রহণের পর চৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরিকে আলিঙ্গন করিয়া, ভগবত প্রেমে বিভোর হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; উভয়ের প্রেমাশ্রুধারে উভয়ের অঙ্গ সিক্ত হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঈশ্বর পুরি মহাত্মা মাধবেন্দ্র পুরির শিষ্য। মাধবেন্দ্র পুরি যে ভক্তি বীজ বপন করিয়াছিলেন, সেই বীজে যে অঙ্কুর জন্মিয়াছিল, সেই অঙ্কুর উৎপন্ন বৃক্ষ এই গৌরাঙ্গ দেব।

গৌরাঙ্গের সহিত ঈশ্বরপুরির সেই শেষ দেখা। নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতকে দেখিয়া অবধি ঈশ্বরপুরির বিশ্বাস হইয়াছিল, এই গৌরাঙ্গদেব পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন; সেই গৌরাঙ্গদেব তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল; কিন্তু গৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে গুরু বলিয়া প্রণাম করেন, তিনি তাহাতে অতিশয় কুণ্ঠিত হন, সুতরাং গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া গয়াধাম হইতে তিনি প্রস্থান করিলেন। কোথায় গেলেন, গৌরাঙ্গদেব তাহা জানিতে পারিলেন না।

গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনাবধি গৌরাঙ্গের প্রকৃতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, ভক্তি বাড়িতে লাগিল; তিনি অপরের সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিলেন, দৈহিক চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন, একাকী নির্জ্জনে বসিয়া উর্দ্ধমুখ হইয়া কি চিন্তা করেন, কখন বা আপন মনে কথা কহেন, কখন বা একাকী বিরলে বসিয়া রোদন করেন। তাঁহার হৃদয়ে যে কি তরঙ্গের খেলা, তাঁহার সঙ্গীগণ কেহই বুঝিতে পারেন না, জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হয় না।

গৌরাঙ্গ একদিন নিভৃতে গুরু দত্ত মন্ত্র জপ করিতেছেন, হঠাৎ "কৃষ্ণ কোথায়," বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণ পরেই চৈতন্য লাভ। চৈতন্য হইল বটে, কিন্তু তিনি শান্ত হইতে পারিলেন না; উঠিয়া বসিয়াছিলেন, পুনরায় ভূতলে ঢলিয়া পড়িলেন; উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কৃষ্ণ! তুমি আমার প্রাণ! তোমার বিরহে আমি ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না; তুমি আর লুকাইয়া থাকিও না। কৃষ্ণ! তুমি দয়াময়; দয়া করিয়া দর্শন দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।"

সঙ্গীগণ তাঁহার সেই ভাব দর্শনে নানা প্রবোধ বাক্যে শান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু প্রবোধ মানে কে? প্রভু গৌরাঙ্গ অবিরল অশ্রুপাত করিতে করিতে ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আর তাঁহার প্রবোধ? — যাঁহারা প্রবোধ দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার যুগল নেত্রে প্রেমাশ্রুধারা দর্শন করিয়া আপনারাই কাঁদিতে লাগিলেন, শিষ্যগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া গৌরাঙ্গদেব মধুর বচনে বলিলেন, "তোমরা বাড়ী যাও, আমি আর বাড়ী যাইব না, কৃষ্ণের উদ্দেশে আমি বৃন্দাবনে যাইব। তোমরা আমার জননীকে প্রবোধ দিয়া বলিও, তোমার নিমাই কৃষ্ণের উদ্দেশে বৃন্দাবনে গিয়াছে।" এই বলিয়া তিনি ক্ষিপ্তের ন্যায় বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবার উদ্যম করিলেন, শিষ্যেরা ব্যাকুল হইয়া ধরিয়া রাখিলেন।

গৌরহরি আর গৃহে ফিরিবেন না, এইনিদারুণ কথা শুনিয়া শিষ্যগণ ও চন্দ্রশেখর মহাসঙ্কটে পড়িলেন, অবশেষে বিবিধ প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া, কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিলেন। পৌষ মাসের শেষে তাঁহারা নবদ্বীপে প্রত্যাগত হইলেন।

নিমাই গৃহে আসিতেছে, এই শুভ সংবাদ শ্রবণ মাত্র শচী দেবী পুলকিতাঙ্গে — গৃহের বহির্ভাগে ছুটিয়া আসিলেন, বিষ্ণু প্রিয়াও লজ্জা পরিহার করিয়া পতিবদন দর্শন-বাসনায় বহির্দ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জননীকে আলু থালু বেশে পথিমধ্যে দর্শন করিয়া গৌরহরি সাষ্টাঙ্গে তাঁহার যুগল চরণে প্রণিপাত করিলেন। নিমাইয়ের প্রত্যাগমনে প্রতিবাসীগণের আনন্দসিন্ধু উথলিল। সনাতন মিশ্র ও তদীয় পত্নী জামাতার প্রত্যাগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

ক্রমশঃ

ইন্দু প্রভা।

দশম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মে মাত।

" কই বল্লে না ? সেই তখন বল্বে বলে গুহার মধ্যে লয়ে গেলে, রাত্রিও অনেক হলো, আমিও ঘুমিয়ে পড়লেম, সে কথা আর শোনা হলো না; আজ বল।"—

সেই পর্ব্বত গুহায় বালক বারংবার যুবককে ঐ কথাই বলিতে লাগিল। যুবক কি করে; কেমন করিয়াই বা মনের কথা বলে ? অনেক ভাবিল শেষকালে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, কেমন করিয়া প্রতিভার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল, কেন যৌবনে সন্ন্যাসী সাজিয়া, জগত সংসারের মায়া একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, বনে উপবনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে ছিল, একে একে বালকের নিকট সমস্তই বর্ণনা করিল। বালক বুঝিল, বিষস্থ বিষমৌষধ না বিষে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছে। কাজ গুরুতর হইলেও একেবারে মন্দ হয় নাই। ঔষধে ব্যাধি আরোগ্য হইতে পারে। বালক তখন অন্য কথা উত্থাপন করিল। কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, কিন্তু যুবকের তিমিরময় মানস কন্দরের তিমির দূর হইল না। বালক কহিল, "সখে আগে যদি বুঝিতে পারিতাম, এ সব কথা শুনিলে তোমার মন এমন হইয়া যাইবে, যাতনার অসহ্য পীড়নে তুমি এমন কাতর হইবে, তোমার মুখখানি এমন মলিন হইবে, তোমার নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিবে, তাহা হইলে কখন আমি ওকথা জিজ্ঞাসা করিতাম না, কবে কি হইয়া গিয়াছে, বহু সহস্র ক্রন্দনেও ফিরিবে না, যাহার সহিত এখন আর কোন সম্বন্ধ নাই, যাহা আছে তাহা কেবল মনের সহিত ; তাহার আন্দোলন নিস্ফল; আমিবলি, তুমি আর দুর্ব্বলতার পরিচয় দিওনা। মন দৃঢ় কর। কেন সে সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না ? মন তোমার অপর কাহার নহে, তোমার মন তুমি নিজেই দৃঢ়কর। তোমার মনের উপর তোমার যত ক্ষমতা, এত কি তাহার ? তুমি যুবক এই বয়সে মনকে এত নিস্তেজ করিলে, কেমন করিয়া বাঁচিবে ? তুমি যদি একা ভাল বাসিতে, সে যদি তোমায় না চিনিত, তাহা হইলে তোমাকে একেবারে নিষ্ঠুর হইতে বলিতাম। তাহাকে ভুলিলে ক্ষতি ছিল না, আর তাহাতে প্রয়োজন নাই, যাহা আছে, সব মনে মনে রাখ, আবার যাহা এখন করিতে হইবে, তাহা স্থির কর। আমি জানি প্রেমে অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে এইরূপ প্রেমে অনেক যুবক এককালে পাগল হইয়াগিয়াছে, সং সাজিয়া পথে পথে বেড়াইতেছে। আমি বালক হইলেও আমার কথায়

তুমি তাচ্ছিল্য করিও না, আমি বলি অনেক অবস্থায় দেখা যায়, দশবৎসরের বালকেও অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধকে অনেক মহৎ উপদেশ দিয়াছে। বৃদ্ধ সেই বালকের কথায় সৎকার্য্যে সফলতা লাভ করিয়াছে, তোমার এই তরুণ বয়সে এভাবে এমন করিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে সন্ন্যাসীদের মত বেড়াইলে, কি তুমি যোগী হইতে পারিবে ? যোগী হওয়া বড় শক্ত কথা। যার ভাগ্যে যোগ জীবন লাভ আছে, সেই হইতে পারে। তোমার আমার মত লোকের অদৃষ্ট সেরূপ নয়, সাধনাও তদ্রূপ নয়। অবশ্য যোগ জীবন জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানা যায়, কিন্তু সেরূপ ধর্ম্মজীবন পাওয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অনেক পুণ্যের ফল, ইহা কেনা স্বীকার করে ? তুমি দেশে যাও যখন আজিও তোমার মন এত দুর্ব্বল, তখন এরূপভাবে বেড়াইলে কখনই তুমি ধর্ম্মার্জ্জন করিতে পারিবে না, বরং অধর্ম্ম হইবে। যাও দেশে যাও, জনসমাজে মিলিত হও, তাহাতে এক দিনে না হউক দশ দিনে তোমার সহিত এমন কোন লোকের সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, যাঁহার নিকটে তুমি হিতোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবে।

সাধু লোকের উপদেশে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়া সুকর্ম্মের সুখাবহ সরল পথ চিনিয়া লইতে পারিবে। আর এক কথা—মন বিকৃত করিয়া পথে পথে বেড়াইলেইযে, ধর্ম্ম পালন করা হয়, তাহা নয় ; সংসারে বসিয়া আত্মীয় পরিজন প্রভৃতির মধ্যে থাকিয়াও কত লোক ধর্ম্মকর্ম্ম করে ; তুমিও তাহাই করিতে পার। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমাকে ভাল না লাগিতে পারে, তথাপি একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ, এ কথাগুলি তোমার হিতকর কি না ? অধিক আর বলিতে চাহি না। আরও এক কথা—কি জন্য দুর্ল্লভ মানব জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহাও ভাবিয়া দেখ। কত জন্মের পর মনুষ্যজন্ম; এ জন্মের সার্থকতা কি ? সংসার ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া উদাসী হইতেই কি তোমার জন্ম হইয়াছে ? অগ্রে সংসারে থাকিয়া যতদূর সম্ভব, ধর্ম্মার্জ্জন কর, পরে শেষ জীবন ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত করিও। যাহা করিতে হয়, দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া করাই কর্ত্তব্য। তুমি গোড়ায় গলদ রাখিয়া শেষপাকা করিতে যাইলে পাকা হইবে না। দেশে ফিরিয়া যাও, বিবাহ কর ; স্ত্রীকে সহধর্ম্মিনী বলে, ধর্ম্মের সহায় হইতে পারে, লক্ষণ দেখিয়া তাদৃশী রমণীর পাণিগ্রহণ করিও। তাহাহইলে মঙ্গল হইবে, তোমার যোগজীবন সার্থক হইবে। আরও এককথা—যাঁহারা যোগী, তাঁহারা কি জন্মিয়াই যোগী হইয়াছেন ? ভেকধারী বৈষ্ণবেরা যেমন গোঁড়া বৈষ্ণব হয়, ভেকধারী সন্ন্যাসীরাও সেরূপ ভণ্ড সন্ন্যাসী হইয়া থাকে। প্রকৃত সন্ন্যাসীরা বিবাহ করেন না।

প্রকৃত সন্ন্যাসী কিন্তু জনসমাজে দুর্ল্লভ ; কোন কোন পর্ব্বতে দুই একটী প্রকৃত সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মাথার উপর নৈদাঘ সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ, বর্ষার বারিধারা, হেমন্তের হিম, অনশন, কত বৎসর ধরিয়া যোগী এইরূপে একাসনে যোগে মগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বল্মিক তাঁহার শরীরে জন্মিয়াছে, যোগীর ভ্রুক্ষেপও নাই, মহাযোগী মহাযোগে নিমগ্ন।

আর এক সম্প্রদায় যোগী আছেন, তাঁহারা গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে করিতে স্থবিরাবস্থায় ধর্ম্মোপাসনার্থ দেহমন সংযত করেন। রাজর্ষি জনক এই সম্প্রদায়ের যোগী। তুমি রাগ করি ও না, তোমাকে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি, কথাগুলি মনোমত কি না, একবার ভাবিয়া দেখ।"

এই সকল কথা বলিয়া বালক নীরব হইল। যুবক অনেকক্ষণ কোন কথাই কহিল না, কেবল অনিমিষ লোচনে বালকের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে করিতে মনে মনে ভাবিল, এত অল্প বয়সে এ বালক এত তত্ত্বকথা কোথা হইতে পাইল? বিধাতা কৃপাময়, তিনি আমার কষ্ট বুঝিয়াই বুঝি তাহা নিবারণ করিবার জন্য এই বালককে মিলাইয়া দিয়াছেন। এই বালকটীকে না পাইলে, আমি এত দিন কোথায় যাইতাম? হয়ত আমার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র থাকিত না। যুবক এইরূপ ভাবিয়া বালককে কহিল, "আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতেছে। বালক! তোমার এত জ্ঞান? বয়সে যদিও তুমি বালক, কিন্তু জ্ঞানে তুমি অনেক বড়, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে আচার্য্যের ন্যায় মান্য করিব, সাধ্যমত তোমার হিতোপদেশ পালন করিতে যত্ন করিব। সখা! আমার ভাল করিবার আশায় তোমার এত আনন্দ হয় কেন? আমি দেশে গিয়া দার পরিগ্রহ করিলে যদি তুমি সুখী হও, অবশ্য আমি তাহা করিতে সচেষ্ট হইব, কিন্তু ভাই আর যে আমার সংসার ধর্ম্ম করিতে মন চায় না; আমি কেমন করিয়া পুনরায় গৃহী হইব? আমার চেষ্টার ত্রুটি হইবে না, কিন্তু কতদূর যে অগ্রসর হইতে পারিব, তাহার স্থিরতা নাই। তুমি প্রেম পণ্ডিত, পরম প্রেমিক। আমার মত প্রেম লাঞ্ছিত হতভাগ্য যুবকের একমাত্র সৎবন্ধু তুমি। ইহজন্মে না হউক পূর্ব্বজন্মে আমি কত তপস্যা করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যফলে তোমার মত পরম সুহৃদ পাইয়াছি। আমার জীবনের অনেক আকাঙ্ক্ষা ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভাই, থাকিয়া থাকিয়া তথাপি যেন সেই ইপ্সিত রত্নময়ী অনুপমা অলোক সামান্যা রমণী মূর্ত্তি মনে পড়ে, সেই মূর্ত্তি যেন সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই। যখন তোমার মুখে উপদেশগুলি শ্রবণ

করি, যখন মন বেশ শান্ত হয়, তখন যেন সেই প্রেমপ্রতিমা মনোরাজ্যের রাণি প্রতিভাকে ভুলিয়া যাই। সখে! আবার যখন তোমার সুধামুখের সুধালহরী আমার শ্রবণবিবর হইতে দূরে যায়, আমি তখন অজ্ঞান হই, কিছুই আমার মনে থাকেনা। আমার চিত্ত পরিবর্ত্তনে তোমার যত্নের ত্রুটি নাই, যতদূর সাধ্য ততদূর তুমি আমার হিতসাধনের চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু আর পারি না, আমি যেন পাগল হইয়া পড়িয়াছি।

যুবকে বালকে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় অকস্মাৎ তথায় একটী পার্ব্বতীয় লোক আসিয়া বলিল, "ওগো! তোমরা অদৃষ্ট গণনা করাবে? একজন যোগী এসেছেন, তিনি ভূতভবিষ্যৎ গণনা জানেন, ভবিষ্যতের শুভাশুভ বলিয়া দিতে পারেন। চমৎকার গণনা! কার্য্য দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি।"

বালক আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি তোমার কি উপকার করিয়াছেন?" [illegible] "ওগো! তিনি আমার বড় উপকার করেছেন। তিনি আমার মরা ছেলেটীকে প্রাণদান করেছেন। সর্পাঘাতে ছেলেটীর মৃত্যু হয়েছিল, সেই যোগী হঠাৎ এসে বল্লেন, ভয় নাই ভয় নাই, উতলা হইও না, আমি তোমার পুত্রের জীবনদান করিতেছি। এই বলে তিনি বনমধ্যে প্রবেশ করে একটা গাছের শিকড় আন্লেন, এনে বল্লেন, "তিনবার গায়ে বুলিয়ে এই শিকড়টী বেশ করে, বেটে ক্ষতের মুখে প্রলেপ দাও, ছেলে এখনি বেঁচে উঠবে।"

আমরা তাই কর্লেম, খানিক ক্ষণের মধ্যেই আমার ছেলেটী বেঁচে উঠলো। হাত জোড় করে আমি বল্লেম, তুমি ঠাকুর, আমি তোমার কি উপকার করবো? সাধু বল্লেন, "উপকার কিছুই আমি চাই না, আমি ভূত ভবিষ্যৎ গুণিতে পারি, মনুষ্য জীবনের সমস্ত ঘটনা ঠিক ঠিক বলিতে পারি, এইকথাটী স্থানে স্থানে তুমি সকল লোককে জানাইয়া দাও, তাহা হইলে আমার অশেষ উপকার করা হইবে, আমি এই স্থানে অবস্থিতি কর্লাম। কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে এই স্থানে ঠিকানা বলিয়া দিও।"

সাধুর মুখে এই কথা শুনে লোকের কাছে আমি সেই কথা বলে বলে বেড়াচ্চি।

এই কথা বলিয়াই পাহাড়ী লোকটী চলিয়া গেল।

স্থির বুদ্ধি বালক ভাবিল, যে গুণি হয়, নিজ মুখে নিজগুণ প্রচারে তাহার রুচি হয় না; নিজগুণ প্রচারে সেই গণকের এত আগ্রহ কেন? আমার বোধ হয় ইহার মধ্যে কিছু স্বার্থ সম্বন্ধ আছে। দেখা যাক, সখা কি বলেন।

বালককে অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে দেখিয়া যুবক কহিল, " সখা! অমন করিয়া বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছ ? চল শুভাশুভ গণনা করাইয়া আসা যাক।" বালক কহিল, "যাবে, চল, কিন্তু আমার মনে ভাল ঠেকিতেছে না, গণকের ব্যবহারে একটু সন্দেহ জন্মেছে। সে সাধু ব্যক্তি, সাধুর এপ্রকার রীতি নীতি নহে, নিজ-গুণ গরিমা সাধুরা প্রকাশ করিতে চাহেন না, গুণির গুণ আপনা হইতে চারি-দিকে প্রকাশ হয়।"

যুবক তখন অন্য কথা পাড়িল। কথায় কথায় বালকটীকে সেই ঝরনার দিকে লইয়া চলিল। বালক ভাবিল, সখা উন্মাদ। আর এখন কিছু বলা হবে না, হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াইবে।

যদি যায় যাক, যদি বিপদে পড়ে, সাধ্যমত চেষ্টা য় আমি মুক্ত করে আনব। স্রোতের গতি আর রোধ করা হবে না ।

সঙ্কল্প স্থির,একাকী যাইতে না দিয়া, নিজেও সঙ্গে যাওয়া উচিত, বালক ইহা স্থির করিলেন ; একথা ওকথার পর কহিল, "চল সখা! আমিও সেই সাধু দর্শনে যাব।"

উভয়ে সাধু দর্শনে চলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব গণক।

পর্ব্বতের নিম্ন ভূমিতে একটী নির্ঝর। স্থানটী অতি মনোহর, শিলাতল ভেদ করিয়া জল প্রবাহিত হইতেছে, চতুঃপার্শ্বে ছোট ছোট কুঞ্জ, কুঞ্জে বিবিধ প্রকার বিহঙ্গের বাস। এ প্রদেশে বড় বড় বৃক্ষাদি নাই, পাখীগণ এইখানেই বাস করে, ইচ্ছামত আকাশ পথে উড়িয়া বেড়ায় ; সন্ধ্যাকালে বাসায় আসিয়া আশ্রয় লয়। পর্ব্বতের উত্তর পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র ময়দান, সবুজ বন তৃণে আচ্ছাদিত। এখানে নানাবিধ হরিণ বিচরণ।

ইন্দুপ্রভা এই ময়দানের এক প্রান্তে বসিয়া কি ভাবিতেছে। কি ভাবি-তেছে, কেমন করিয়া বলিব ? তবে যদি অনুমাণ করিয়া বলিতে হয়, ইন্দুপ্রভার চিত্ত চঞ্চল, প্রেম চিন্তাই বলবতী। সে চিন্তা এখন না থাকিতেও পারে ; ইন্দু প্রভা হয় ত কাপালিকের নিষ্ঠুরতার কথা ভাবিতেছে ; হয় ত যুবকের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতেছে। ইন্দু প্রভার মানসিক চিন্তার কারণ নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে। চিত্ত চঞ্চল, ইন্দু প্রভা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। বায়ু চরিত্র নারী চরিত্র একই প্রকার সে চরিত্রের পর্য্যালোচনা করিতে সকলের সামর্থ্য নাই।

...রণার সম্মুখে গণ্ডি মধ্যে সেই গণক উপবিষ্ট তাহার সম্মুখস্থ প্রস্তর খণ্ডে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিহ্ন অঙ্কিত গণক আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেছে, মধ্যে মধ্যে ইতঃস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতেছে। সে দৃষ্টি যেন স্বার্থসিদ্ধির নৈরাশ্যবিজ্ঞাপক; ইন্দুপ্রভা দেখিবামাত্র চিনিল, ঐ সেই কাপালিক। ইন্দুপ্রভা অনেক দিন আত্ম গোপন করিতে শিখিয়াছে।

কাপালিককে দেখে, নিজে দেখা দেয় না; ক্ষুধা পাইলে বন ফল আহোরণ করিয়া ভক্ষণ করে, পিপাসা পাইলে নির্ঝরের জল পান করে নিশাকালে কুঞ্জ মধ্যে শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়। যাঁহার চিন্তা সেই তাহা বুঝে। কাপালিকের চিন্তার গুঢ়রহস্য ভেদ পুর্ব্বেই হইয়াছে। গণক বেশী কাপালিককে দেখিয়া যুবক হর্ষোৎফুল্ল মনে তাহার নিকট উপস্থিত হইল।

যুবককে দেখিয়াই গণক চিনিতে পারিল। যুবক প্রেম প্রেম করিয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য; ভবিষ্যতে কি হইবে, প্রতিভা তাহার হইবে কি না, হইল না কেন? এই ভাব অন্তরে গোপন রাখিয়া সে কেবল উপর্য্যুপরি গণককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "বল ঠাকুর আমার মনোগত ভাব কি? তুমি যদি তাহা বলিতে পার, তবে আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া মানিব।"

গণক তখন যুবকের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নখ দর্পণে দেখিতেছে, সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "এ বড় শক্ত কথা! ভাগ্য গণনা বড় কঠিন কার্য্য। তোমার যেরূপ আগ্রহ দেখিতেছি, তাহাতে আমার একবার পরীক্ষা করা উচিত হইতেছে। দেখি গণনায় কি পাওয়া যায়।"

এই বলিয়া গণকঠাকুর সন্মুখের মৃত্তিকায় পাঁচটী রেখা অঙ্কিত করিল, রেখার মধ্যে মধ্যে একটী একটী অঙ্কপাত করিল, তাহার পর যুবার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি শুনতে হবে?

যুবক উত্তর করিল, যৌবনের প্রারম্ভে আমার অন্তরে কিসের ধাক্কা লাগিয়াছিল, কেই বা আমাকে সে ধাক্কা মারিয়াছিল? অগ্রে তুমি ইহাই বল।

শ্রবণ করিয়া অবনত মস্তকে গণক বলিল, ঠিক! ঠিক!! ঠিক!!! এইবার ধরিয়াছি। আপনি কি প্রেমসাগরে পড়িয়াছিলেন? সেই প্রেম সাগরে কি ভাসিয়া বেড়াইতেছেন?

গণক যখন যুবকের মনের কথাটী বলিয়া ফেলিল, তখন যুবকের ধ্রুব বিশ্বাস হইল যে, গণক সাক্ষাৎ দেবতা। দেবতা না হইলে মনের কথা আর কে বলিতে পারে? ভক্তিভাবে গণকের চরণে প্রণাম করিয়া যুবক বলিতে লাগিল, ঠাকুর!

'আপনার গণনা অখণ্ড সত্য। আমি প্রথমে একটী সুন্দরীর প্রেমে পড়িয়াছিলাম, সেই প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, আমি পাগলের মত কেবল স্বদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। বল দেখি ঠাকুর, তাহার নাম কি? তোমার উপর আমার আরো, অধিক বিশ্বাস হউক। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার নাম, তাহার কথা শুনিতে বড় মিষ্ট লাগে। বল ঠাকুর তার নাম কি?"

গণক বুঝিল, শীকার ফাঁদে পড়িবার আর অধিক বিলম্ব নাই। ইহা বুঝিয়াই সে পুনর্ব্বার যুবাকে বলিল " এই রেখার একটী অঙ্কে হাত দাও।"

যুবক একটী অঙ্কে হস্তার্পণ করিল। গণক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল, মুখ ভারী করিয়া বলিল, ও মহাশয়! এতক্ষণে ঠিক ধরিয়াছি। কাজ বড় শক্ত। এ দিক সে দিক কত দিক ঘুরিয়া গণনা করিয়া বাহির করিয়াছি! যাহার প্রেমে আপনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, গণনায় পাইতেছি, সেই সুন্দরীর নাম প্রতিভা। যুবক অবাক। নাম শুনিয়াই ক্রন্দন।

গণক বলিয়া উঠিল, " কেন মহাশয়, কাঁদেন কেন? হইয়াছে কি? আর কি কিছু শুনিবার ইচ্ছা আছে? খানিক ক্ষণ পরে একটু স্থির হইয়া যুবক কহিল, "বল যত পার বল, আমার ত কপাল ভাঙ্গিয়াছে, শুনিতে আর ভয় কি? বিচ্ছেদের পর কি কি হইয়াছে, এক এক করিয়া বল!"

গণক এবারও আর একটী অঙ্কে হাত দিতে বলিয়া, সেইরূপ মন্ত্রউচ্চারণ করিতে করিতে বলিল, "মহাশয়! এ কি? সেই জন্যই যুবকের ভালবাসাকে কবিরা চক্ষের নেশা বলেন। আপনি আবার আর এক জনের প্রেমে পড়িয়াছিলেন। তাহার নাম ইন্দু প্রভা। আপনি ইন্দু প্রভাকেও ভালবাসিয়া ছিলেন। ধিক যুবকহৃদয়কে! শতধিক চঞ্চল মতি মানবকে!!"

ধিকার পাইয়া যুবক বলিল, "মহাশয়, সত্যই বটে দ্বিতীয়া বালিকার নাম ইন্দু প্রভা। আমি তাহাকেও ভালবাসিয়া ছিলাম, এখন কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছি। প্রতিভার আশাতেই আবার এখন পাগল হইয়াছি। বল, সে প্রতিভা আমার কোথায়? কি করিলে কোথায় গেলে প্রতিভাকে পাওয়া যায়?"

একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গণক কহিল, "প্রতিভা পাইতে হইলে যাগ যজ্ঞ করিতে হইবে। ইহাতে যদি আপনি সম্মত থাকেন, তবে শুনুন! আমি একটী উপায় স্থির করিতেছি।"

যুবক আগ্রহ সহকারে কহিল, কি উপায়, শীঘ্র বল।

গণক কহিল, " এমন কিছু নয়, তবে কিনা, একটী সাহসের কার্য্য করিতে হইবে। শ্মশান কালীকে জাগাইতে হইবে। তাহা যদি পারেন আসুন। আগামী কল্য অমাবস্যা বারও শনিবার পুণ্যকার্য্যের প্রশস্ত দিন। শ্মশান কালীকে জাগাইতে পারিলে মা আপনার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন। কল্য গভীর রজনীতে আপনি একাকী আসিবেন, পূজার সামগ্রী আমি আহোরণ করিয়া রাখিব। আপনি যখন আত্মত্যাগী প্রেমিক, তখন আপনার হিত চেষ্টা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

মস্তক নত করিয়া যুবক সম্মতি জানাইল, গণককে প্রণাম করিয়া বালকের নিকট ফিরিয়া চলিল, কূট বুদ্ধি ফাঁসিয়া না যায়, সেই কামনায় জয়তারা জয়তারা উচ্চারণ পূর্ব্বক গণক ঠাকুর উপযুক্ত সময় প্রতিক্ষায় রহিল। অদূরে লুকাইত থাকিয়া বালক সমস্ত দেখিতেছিল, সমস্তই শুনিতেছিল। যুবককে আসিতে দেখিয়া নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সখা কি হইল ? কেমন বুঝিলে, আশা কি পূর্ণ হইবে, কেমন গণক ? গণনা কি সত্য বলিয়া বোধ হইল ?"

যুবক কহিল, "এ কি ? এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? যাইবে বলিয়াছিলে, গেলে না কেন ? তোমার অদৃষ্টে সাধু দর্শন নাই। বড় ভাল লোক তিনি মুখে সর্ব্বক্ষণ হাঁসি লাগিয়াই আছে। গণনা করিয়া যাহা যাহা তিনি বলিলেন, সমস্তই ঠিক ঠিক মিলিয়া গেল।

বালক কহিল, " তাহাতো বুঝিলাম, তার পর ?"

যুবা কহিল, "কল্য রাত্রে তিনি শ্মশান কালিকে জাগাইবার জন্য জাগ করিবেন। আমাকে তথায় যাইতে বলিয়াছেন। প্রতিভাকে আমি পাইব।

বালক মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল, পরক্ষণেই সে হাসি মিলাইয়া গেল, গাম্ভীর্য্য আসিয়া মুখ খানি গম্ভীর করিয়া দিল। বালক বলিতে লাগিল, ভাল হইলেই ভাল, আমিত তাহাই চাই, প্রতিভা প্রতিভা করিয়া তুমি উন্মাদ, ঈশ্বর যেন তোমায় প্রতিভা মিলাইয়া দেন, এখন চল আশ্রমে যাই। উভয়ে আশ্রমে চলিল।

ক্রমশঃ

সাগরসঙ্গমে।

—ঃ০ঃ—

লেখক, শ্রীমৎ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

হিন্দুর পুণ্যতোয়া ভাগিরথী নদী নানা স্থানে নানা নামে অভিহিত হইয়াছে; * যথা—অলকা, ধারা, গঙ্গা, মন্দাকিনী, গায়ত্রী, সাবর্ণী গোমুখী, গঙ্গোত্রী, ত্রিবেণী, হুগলী, বারুণী. জাহ্নবী, মুক্তকেশী, আদি, কাটি, জটেশ্বরী, বিষ্ণুপদী, মেনকা, সুরধুনী, ইত্যাদি। ইহার মধ্যে যে নদী হুগলী নগরীর তলবাহিনী হইয়া হুগলী নামধারণ করিয়া তাহার উৎপত্তি স্থানের নাম গঙ্গাসাগর। সমুদ্রের সলিল ও গঙ্গাজল এতদুয়ের সম্মিলনের মনোহারিত্ব ও পবিত্রতা লইয়া গঙ্গা-সাগর বা সাগরসঙ্গমের মাহাত্ম্য। এইস্থান হিন্দুর অন্যতম মহাতীর্থ সুতরাং ইহার মহাত্ম্য শাস্ত্র সম্মত এবং লোকাচর সঙ্গত। অর্দ্ধশতাব্দীকাল অগ্রে গঙ্গাসাগরে যাইতে হইলে তীর্থ যাত্রীগণ ভূসম্পত্তির ও আত্মশ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া গৃহ হইত নিঃসৃত হইত, তখন শতকরা চল্লিশজন লোকও গঙ্গাসাগর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইত কিনা সন্দেহ। পূর্ব্বকালে মেদিনীপুর জেলান্তর্গত হিজলি কাঁথি বা তমোলুক হইতে সামান্য নৌকাযোগে গঙ্গাসাগরে গমন করিত এবং খাদ্য-দ্রব্যাভাবে, দুর্দ্দান্ত শীতে, ঝড়ে, রোগে, তরণী বাহকদিগের দুরাচারে, দস্যুদিগের উৎপীড়নে, তরঙ্গের ভীষণতায় অথবা অন্যবিধ বহুকারণে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এখন আর সে কষ্ট নাই; এখন কলিকাতায় গঙ্গার ঘাটে কলের জাহাজে আরোহণ করিলে অল্প সময়ে, অল্প কষ্টে এবং স্বল্প ব্যয়ে সাগর সঙ্গমে উপনীত হইতে সমর্থ হওয়া যায়। যাত্রীর ভিঁড় কম হইলে সুবিধা আরও অধিক হওয়া সম্ভব। যখন এত প্রকার বিষম ক্লেশ ও অসুবিধা বর্ত্তমান সত্বেও যাত্রীগণ দুর্দ্দান্ত শীত ঋতুতে এই দুরবর্ত্তী সাগর সঙ্গমতীর্থে দলে দলে আসিতে সম্মত হয়েন, তখন নিশ্চয়ই বিবেচনা করিতে হয়, সাগরসঙ্গমতীর্থের কোন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। পাঠক মহাশয়! আসুন, আমরাও ধীরে ধীরে বাষ্পীয় তরণীতে আরোহন করিয়া গঙ্গাসাগরাভিমুখ প্রয়াণে প্রবৃত্ত হই এবং তথায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে একত্র দেখিয়া কৌতুহল বৃত্তি চরিতার্থ করি। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার যোগ্য; কাশ্মীর, নেপাল, পেশোয়ার, সুদুর ত্রিবাঙ্কুড় ও কোচিন এবং আলমোরা গাড়োয়াল প্রদেশ হইতেও নানা শ্রেণীর,

*"স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে, ব্রহ্মলোকে, সূর্য্যলোকে, দেবলোকে, পতিতপাবনী গঙ্গা, নানারূপে বহুনাম ধারণ করিয়া প্রাণীগণকে পবিত্র করিয়াছেন।"—ব্রহ্মপুরাণ।

নানা বৃত্তির ও নানা প্রকৃতির অগণ্য হিন্দুর একত্র সম্মিলনের এই এক অদ্ভুত স্থান। সৌভাগ্য ক্রমে সময়ে সময়ে প্রকৃত তপঃপ্রভাবশালী মহাপুরুষেরও এখানে শুভাগমন হইয়া থাকে এবং তদ্ভিন্ন রাজা, রাণী, মহারাণী, পণ্ডিত, ধনী, নির্দ্ধনী, মূর্খ, দুশ্চরিত্র, ধার্ম্মিক, ভক্ত, পরিব্রাজক, বণিক প্রভৃতি কত প্রকার পুরুষ ও রমণী যে এখানে আগমন করেন তাহার সংখ্যা করা যায় না।

শীতঋতুতে মকর মাস ভিন্ন অন্য সময়ে সাগরসঙ্গমে উপনীত হইলে এখানে অহোরাত্র বাস করিতেও বোধহয় কেহ অভিলাষী হয়েন না, কারণ তখন এখানে লোক বা লোকালয় থাকেনা; ভীষণ অরণ্য, সমুদ্রের কল্লোল,এবং অরণ্যবাসী শ্বাপদদিগের গর্জ্জন ভিন্ন তখন এখানে আর কিছু দেখিবার বা শুনিবার নাই। নির্জ্জনে নীরবে যাঁহারা তপস্যা করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু এস্থলে আমি মায়া মুগ্ধ সংসারী পুরুষের প্রসঙ্গ লইয়াই আলোচনা করিতেছি। মকরমাসে গঙ্গাসাগরে আসিলে তীর্থযাত্রীরা এখানে কিছুদিন অধিবাস করে, এবং বহুলোকের সংসর্গে থাকিয়া একপ্রকার নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হয়; কিন্তু এই দুরন্ত শীতে যাহাদের উপযুক্ত বস্ত্রাদি থাকে না, অবস্থানের জন্য কুটিরের সুবিধা হয় না অথবা অনিল, সলিল বৃহিলের * নিয়ম সকল ভঙ্গ জন্য রোগে কাতর হইয়া পড়ে, তাহাদের মনে হয়, সিন্ধু জীবনে জীবন রাখিয়া ভাসিতে ভাসিতে অনন্তের ক্রোড়াভিমুখে গমন পূর্ব্বক সকল প্রকার ক্লেশের উপশম করি।

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে যে বৃহতী মেলা হয়, তাহা সাগর-দ্বীপের দক্ষিণ তটে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই তট, বিস্তৃত বালুকা রাশিতে পরিপূর্ণ। ইহার পশ্চিমদিকে একটি অনতিবৃহৎ মন্দির দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরটির একদিকের প্রাচীর, সলিলের এত সমীপবর্ত্তী যে সাগরাম্বু দ্বারা তাহা প্রধৌত হইতে পারে। দক্ষিণ দিকে মহারণ্য, এই অরণ্যের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ক্ষুদ্রপথ দ্বারা গমনাগমন করিতে পারা যায়। অধিক দূরে যাইলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা আছে, কারণ এই ভীষণবন বহু হিংস্র শ্বাপদ পরিপূর্ণ। যে পর্য্যন্ত যাইলে আশঙ্কা নাই, ততটুকু দূরে একটি জলাশয় আছে, তাহা হইতে স্বচ্ছ ও সুস্বাদু পানীয় জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাগর কূলের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অনেকগুলি ছোট ছোট দোকান ও মন্দির, নয়ন পথে পতিত হয়।

দোলযাত্রা পর্য্যন্ত এই সকল দোকান খোলা থাকে, তাহার পরে মনুষ্যের বসতী থাকে না। কয়েক দিবস পর্য্যন্ত মেলায় জনতা দেখা যায় কিন্তু প্রথম তিন দিবসের মত আর কোনদিন ধূমধাম হয় না। প্রথম দিনে যাত্রীরা সাগর সলিলে

* বৃহিল অর্থে খাদ্য।

নারিকেল, পুষ্প, নানাবিধ ফল ও মিষ্টদ্রব্য ফেলিয়া দিয়া সমুদ্রের পূজা করে; ধনবান ব্যক্তিরা স্বর্ণ, রৌপ্য, টাকা, পয়সা, কড়ি, মূল্যবান রত্নাদি সমুদ্রজলে ফেলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। নিকটবর্ত্তী "ঢোলা সমুদ্র" নামক স্থানে পূর্ব্বকালে শিশুসন্তানদিগকে জলে ফেলিয়া সাগরের পূজা করিবার বিধি ছিল, আইন দ্বারা অনেক বৎসর তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন সময়ে পুত্রহীনা রমণীগণ প্রতিজ্ঞা করিতেন, তাঁহাদের পুত্র জন্মিলে, প্রথম পুত্রকে সাগর জলে-নিক্ষেপ করিয়া সমুদ্রের পূজা করা হইবে, বাস্তবিক পূর্ব্ব কালে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য বহুশত শিশু সন্তানকে জলে নিক্ষেপ করা হইত। সুখের বিষয় বর্ত্তমান কালে এবম্প্রকার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ।

মেলার প্রথমদিনে যাত্রীগণ যত প্রত্যূষে পারে, সাগর জলে স্নান ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক মস্তকের কেশ মুণ্ডন করে, তদনন্তর পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া শেষ করিয়া থাকে। তাহার পরে নিকটবর্ত্তী কপিল মুনিরমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক মুনির মূর্ত্তিকে দর্শন করিবার নিয়ম আছে। প্রথিত আছে, ভগবান বিষ্ণু, কপিল রূপে সগর রাজার ষষ্টিসহস্র সন্তানকে বিনাশ করেন। রামায়ণের মতে, সগর রাজার সন্তানগণ অশ্বমেধের ঘোড়া অনুসন্ধান করিতে করিতে এইস্থানে উপনীত হইয়া মুনিকে ধ্যানমগ্ন এবং ঐ মুনির নিকটে অশ্বকে দণ্ডায়মাণ দেখিয়াছিলেন। সন্তানেরা মুনিবরকে দস্যু ভাবিয়া তাহার প্রাণবধের জন্য অগ্রসর হইলে তপস্বীর পবিত্রনয়ন হইতে অগ্নি শিখা নিঃসৃত হইয়া সগর সন্তানবর্গকে ভষ্মিভূত করিয়া ছিল। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এবং তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে ও শাস্ত্রীয় মতে সমাপন জন্য, সগর রাজার প্রপৌত্র (রাজা ভগীরথ) স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে ভূতলে (হিমালয় প্রান্তে) আগমন করেন এবং তথা হইতে এইস্থানে আনাইয়া সাগর জলের সহিত মিলাইয়াদেন। এই জন্য ইহার নাম ভাগিরথী এবং এই সমুদ্রের নাম গঙ্গাসাগর।

কপিল মুনির মন্দির শৈব ও বৈষ্ণবদিগের অধীনে অবস্থিত। মাঘ মাসের মেলায় বৈরাগীগণ এবং কার্ত্তিক মাসের মেলায় সন্ন্যাসীগণ কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। মাঘ মাসে যাহা কিছু আদায় হয়; তাহা প্রায় রামানন্দী সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণববর্গের করতলগত হইয়া থাকে।

মন্দিরের সম্মুখে এক বটবৃক্ষ তলে রামচন্দ্র ও হনুমানের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় এবং মন্দিরাভ্যন্তরে কপিল মুনির বৃহৎ মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। যাত্রীরা মন্দিরে প্রবেশ

করিলে প্রাচীরে আপনাপন নাম লিখিয়া রাখে এবং বটবৃক্ষকে স্পর্শ করিয়া তাহার শাখায় ফল, ফুল কিম্বা ইষ্টক বাঁধিয়া দেয়। লোকের বিশ্বাস, ইহাতে যাত্রীদিগের দারিদ্র দুঃখ নিরাকরণ হয় এবং অনেকের মনস্কামনা সত্বরে পূর্ণ হইয়া যায়। মন্দিরের পশ্চাতে একটি সরোবর আছে, তাহা সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জলে পূর্ণ থাকে; কিন্তু যাত্রীগণ তাহা হইতে সামান্য মাত্র জল লইতে পারে, অধিক পরিমাণে জল তুলিতে অধিকার বা অনুমতি পায় না।

মেলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে সমুদ্রে স্নান, গঙ্গাপূজা, কপিল মুনির সেবা ও আরাধনা এবং ব্রাহ্মণ ও সাধু ভোজনাদি হইয়া থাকে। ধনবান ব্যক্তিরা চাউল, ময়দা, পয়সা, বস্ত্র, কম্বল ইত্যাদি দান করিতে পৃষ্ঠপদ হয়েন না। রাত্রিতে অধিকাংশ যাত্রীকে খোলা ময়দানে বালুকার উপর শুইয়া থাকিতে হয়। অল্পসংখ্যক যাত্রী নৌকায় অবস্থান করে।

গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে অনেক জমিদার, ধনবান সেঠ, রাজা, রাণী প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য দান করিয়া থাকেন, ইহাতে বহুলোকের সুবিধা হয় এবং অসংখ্য লোকের প্রাণ বাঁচে, নতুবা দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতায় অনেকের প্রাণনাশ হইত। হাতী ঘোড়া, উষ্ট্র, অশ্বতর প্রভৃতি পশুর আহার জন্য শস্যাদিও সহজে এবং সুলভে মিলেনা। কোন কোন বর্ষে আমরা একটাকায় সাড়ে চারিসের মোটা চাউল এবং তিন পয়সায় একটা বার্ত্তাকু ক্রয় করিয়াছি। সর্ষপ তৈল, চতুর্দ্দশ আনায় একসের এবং আড়াই টাকা দিয়াও অনেক সময়ে একসের মহিষ দুগ্ধ ঘৃত মিলেনা। এত শীত, নানা প্রকারে এত কষ্ট ও অসুবিধা এবং তৎসঙ্গে আশঙ্কা ও অর্থ ব্যয় স্বত্বেও হিন্দুযাত্রীর সংখ্যা বর্ষে বর্ষে অল্প না হইয়া অধিক হইতে দেখা যায়, ইহা দিব্য চক্ষে দর্শন করিয়াও যাঁহারা কহেন "হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্থা ও বিশ্বাস কমিতেছে," তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ইহা কি সত্য কথা নহে, হিন্দু বিদ্বেষীর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হউক, হিন্দুর হিন্দুত্ব কখন কমিবেনা এবং হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব ও সৌরভ লোপ পাইবেনা, ইহা জ্যামিতির সংজ্ঞার ন্যায় অকাট্য ও অনন্ত সত্য।

হিন্দুর তুলনা হিন্দু
অতুল ভুবনে।
জাহ্নবী পূজন যথা
জাহ্নবীর জলে॥

কবির চক্ষে দেখিলে, গঙ্গাসাগর তীর্থের শোভাও কম নহে। একদিকে ভীষণতা আর একদিকে স্থিরতা,—একদিকে গম্ভীরতা, অন্যদিকে চপলতা—সমস্ত স্থানটিকে এক বিশিষ্ট অপূর্ব্বত্বে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। জলদলপতি প্রচেত এই স্থানে ভাগিরথীর সহিত মিশিয়া উজ্জ্বলে মধুরে মিশিয়াছেন। পূর্ণিমার রজনীতে গঙ্গাসাগর বড়ই সুন্দর দেখায়। শীতঋতু অপেক্ষা শরৎ, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় সাগর সঙ্গম তীর্থ আরও অপরূপ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ থাকে। বাস্তবিক গঙ্গাসাগর তীর্থযেমন পবিত্র, যেমন শোভাময়, যেমন সাধনার উপযুক্ত, তেমনি দর্শনেরসম্পূর্ণ যোগ্য।

—:০:—

সাবিত্রী।

লেখক শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ গুপ্ত।

সাবিত্রী সাধ্বী, সতী পতিব্রতা-তাঁহার পুণ্যময়জীবন কাহিনী অদ্যাপি আমাদের দেশের গৃহেগৃহে শুনিতে পাওয়া যায়। সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের কথা উত্থাপিত হইলে সকলেই বলিয়া থাকেন, "সতী সাবিত্রী।" অতএব সাবিত্রী সতীত্বের আদর্শ বেদব্যাস সংস্কৃত মহাভারতে দেবভাষায় সাবিত্রী চরিত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আর সার্থকজন্মা কবি কাশীরামদাস বঙ্গীয়পাঠকবর্গকে তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। আমরাও এতদুর্ভয় কবির পুরাণ কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

অতিপ্রাচীনকালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে পরমপুণ্যবান এক নরপতি ছিলেন, তিনি শান্ত দান্ত সত্যনিষ্ঠ বলিয়া বিদিত। দেবদ্বিজে তাঁহার অচলা শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। দুঃখের বিষয় তিনি অপুত্রক ছিলেন, বহু যাগযজ্ঞ করিয়াও যখন পুত্রলাভে অসমর্থ হইলেন, তখন সবিত্রী দেবীর নিকট অষ্টদশ বর্ষকাল সংযতভাবে তপস্যা করিয়া দেবীকে প্রসন্ন করিয়া একটী কন্যালাভের বর প্রাপ্ত হইলেন, যথাকালে তাঁহার মহিষী গর্ভধারণ করিয়া এক অসাধারণ সৌন্দর্য্যশালিনী কন্যা লাভ করিলেন, সাবিত্রী দেবীর বর এই সৌভাগ্য সঞ্চারের হেতুভূত বলিয়া মদ্ররাজ কন্যার নাম "সাবিত্রী" রাখিয়া ছিলেন। সাবিত্রী শশীকলার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত যৌবনপূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু রাজা অশ্বপতি বহু অনুসন্ধানেও কন্যার উপযুক্ত পাত্র জুটাইতে না পারিয়া বিষম চিন্তাকুল হইলেন, অবশেষে কন্যাকে পতিনির্ব্বাচনের অনুমতি দিয়া অমাত্যগণ সহ দেশ দেশান্তরে পাঠাইয়া

দিলেন। সাবিত্রী বনে বনে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বহুল ঋষিকুমার ও রাজকুমার দর্শন করিলেন, কিন্তু স্বামিত্বে বরণযোগ্য কাহাকেও দেখিলেন না। নিতান্ত নিরাশ হইয়া তিনি পিতৃরাজ্যে প্রত্যাগমন কালে বনমধ্যে এক কন্দর্পকান্ত-পরমসুন্দর যুবা পুরুষকে দেখিয়া তাঁহার মনে বারিবৃষ্ট মেঘের কোলে ক্ষীণ বিদ্যুতালোকের ন্যায় আশার সঞ্চার হইল। যুবকের স্কন্ধে কুঠার দেখিয়া সাবিত্রী সমভিব্যাহারী অমাত্যগণকে তাঁহার পরিচয় গ্রহণের আদেশ করিলেন। মন্ত্রীগণ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন তাঁহার নাম "সত্যবান" শাল্যদেশাধিপতি দ্যুমৎসেনের পুত্র, অন্ধতা হেতু দ্যুমৎসেন শত্রুদ্বারা হৃতরাজ্য অরণ্য বাস। বন বাসীগণ তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদির কথা শতমুখে বর্ণনা করিলেন, তাহা শুনিয়া সাবিত্রী বিলক্ষণ আশ্বস্তা হইলেন, পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দেবর্ষি নারদ তথায় উপবিষ্ট। সাবিত্রী পিতা এবং দেবর্ষির চরণ বন্দনা করিলে দেবর্ষি মহারাজ অশ্বপতিকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। অশ্বপতি সবিস্তারে সমস্ত কথা তাঁহার সুগোচর করিলে মহর্ষি একে একে দ্যুমৎসেনের সত্যনিষ্ঠা, দানশীলতা, দেবদ্বিজে ভক্তিশ্রদ্ধাদি যাবতীয় সদ্‌গুণের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলিলেন "সত্যবান" সর্ব্বাংশে সৎপাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার একটী প্রধান ত্রুটী এই যে বড়ই অল্পায়ু, অদ্যাবধি বর্ষকালমধ্যে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। এইবাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্বপতির সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, তিনি মনে মনে ইষ্টদেবতাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন, এবং ভাবিলেন যে তাঁহার সৌভাগ্যক্রমেই মহর্ষির আগমন। তিনি উপস্থিত না থাকিলে দুহিতাকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। অতঃপর রাজা প্রিয়দর্শনা কন্যাকে বলিলেন,—মা সাবিত্রি! তুমি সত্যবানকে পাণিদানের প্রস্তাব পরিহার করিয়া পাত্রান্তর মনোনীত কর। সত্যবানের সহিত তোমার পরিণয় হইবেনা। সাবিত্রী অসঙ্কুচিত চিত্তে এই উত্তর দিলেন,—

শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ।
কদাচিৎ নয়নে না হেরি অন্যজন॥
যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবন মরণে সেই সত্যবান স্বামী॥
বৈধব্য যাতনা যদি থাকে মম ভোগে।
খণ্ডন না হবে পিতা দৈবের সংযোগে॥

অনিত্য সংসার এই অবশ্য মরণ।
না মরিয়া চিরজীবী আছে কোনজন ॥
অসার সংসারে, এক সবে মা জ্ঞধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কিমতে করিব অন্য কর্ম্ম ॥
ধিক্ ধিক্ সে ছার সুখের অভিলাষ।
ধর্ম্ম ছাড় অধর্ম্মে যে করে সুখ আশ।
কি করিব সুখে পিতা কতকাল জীব।
কুকর্ম্মে আজন্মকাল নরকে থাকিব ॥

এরূপ না হইলে সবিত্রীচরিত উচ্চআদর্শের হইবে কেন, সাবিত্রীর নাম মাত্র উচ্চারণে ব্যক্তি মাত্রেই দেহ মন পবিত্র জ্ঞান করিবে কেন? সাবিত্রী নারীরত্ন! নারদ তাঁহার উক্তি শ্রবণ করিয়া "ধন্য ধন্য" করিতে লাগিলেন, সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অশ্বপতি কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন, কন্যা কিছুতেই পত্যন্তর নির্ব্বাচনে সম্মত হইলেন না। সাবিত্রীর নির্ব্বন্ধ দেখিয়া মদ্রাধিপতি তাহাতেই সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন, এবং আপনার সৈন্য সামন্ত অমাত্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এবং কুটুম্ব সজ্জন সমভি-ব্যাহারে সাত্রীকে লইয়া সেই আরণ্য প্রদেশে দ্যুমৎসেনের সমীপে যাত্রা করিলেন।

দ্যুমৎসেন সানুচর সমাগত মদ্ররাজের কথা শুনিয়া যথোচিত সমাদর করিলেন, এবং তাঁহার শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপনে সমুৎসুক। দ্যুমৎসেন সুদুঃখিত মনে আপনার দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "আমি রাজ্যচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত, অতি-কষ্টে দিন যাপন করি আপনার কন্যা, শিরীষকুসুমকোমলা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী তিনি নিতান্ত দুঃখিনীর ন্যায় কিরূপে কালযাপন করিবেন, আমাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই, কুটীর মাত্র সম্বল, এরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ তাপস তনয়াগণেরই শোভা পায়, রাজকন্যাগণের পক্ষে নহে। আমি স্বপদে সংস্থাপিত থাকিলে আপনার সহিত এই সম্বন্ধ সংস্থাপন বহু সৌভাগ্যের বলিয়া মনে করিতাম কিন্তু আজি ইহাতে আমি যারপর নাই কুণ্ঠিত।"

অশ্বপতি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, কেবল মাত্র বলিলেন—"আমাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতে হইবে আপনি সম্মতি দান করিয়া আপার উদ্বেগ দূর করুন।"*

* কাশীরাম দাসের মতে অশ্বপতি সত্যবানকে আপন রাজধানীতে আনাইয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন।

অশ্বপতি উত্তর করিলেন—"আপনার কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই, আপনি প্রসন্নচিত্তে সম্মতি দিউন আমার কন্যার অদৃষ্টে সুখভোগ থাকে, সে সুখী হইবে।"

দ্যুমৎসেন আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। সাবিত্রী স্বামীসহ অরণ্যে কালযাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। সত্যবান প্রতিদিন বন হইতে ফল মূলাদি খাদ্য ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করেন, সাবিত্রী নিয়মিতরূপে খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করেন, শ্বশুরশ্বশ্রূ ও স্বামীর যথা বিহিত সেবা করেন। দ্যুমৎসেন রাজ্যচ্যুত হইলেও অশ্বপতি স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার অর্থের অভাব নাই, মনে করিলে অরণ্যেও কন্যার ঐশ্বর্য্য ভোগের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহাতে প্রস্তুত হইলেও কন্যা তাহাতে সম্মত হইলেন না। সাবিত্রী যখন বনবাসী দেখিয়া স্বামী মনোনীত করিয়াছেন, তখন তিনি পিতার নিকট ঐশ্বর্য্যের আবদার করিতে পারেন না, এবং তাহা কোনমতেই ন্যায়সঙ্গত নহে। সাবিত্রীর ন্যায় কন্যা সে পক্ষে আপনাকে ঘৃণিতা বই গৌরবান্বিতা মনে করিতে পারিলেন না। কাজেই রাজ-জামাতা হইয়াও সত্যবানকে কাঠুরিয়াগণের সহিত কাষ্ঠ কাটিতে এবং ঋষিপুত্র-গণের সহিত ফল মূলাদি আহরণ করিবার জন্য প্রতিদিন নিবিড় অরণ্যপথে যাত্রা করিতে হইত।

সাবিত্রী শ্বশুর শ্বশ্রূ ও স্বামিকে যেমন দেবতার ন্যায় সেবা করিতেন, তেমনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি বিলক্ষণ ভক্তিমতি ছিলেন, তাঁহাদের কুটীরদ্বার হইতে কখন অতিথ বেমুখ হইত না। প্রতিবাসিনী ঋষিপত্নি ও ঋষিনন্দিনীরা তাঁহার সদয় ব্যবহারে সদা সন্তুষ্ট ছিলেন, অল্পদিন মধ্যেই সাবিত্রী সকলকেই আপনার করিয়া লইলেন, তাঁহার যশসৌরভ চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইল সকলেই শতমুখে সাবিত্রীর সুখ্যাতি করিতেন। সাবিত্রী কেবলই দিনগণনা করিতেন। দেবর্ষি নারদের ভবিষ্য-দ্বাণী প্রতিদিন তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইত। যখনই তাহা মনে হইত, তখনই তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্র ম্লান হইত, নির্জনে বসিয়া আপনার ভাবী বৈধব্য চিন্তা করি-তেন। দিন দিন করিয়া সপ্তাহ পক্ষ মাস গত হইতে লাগিল। বৎসর পূর্ণ হইতে চারিটী মাত্র দিন বাকী আছে, দেখিয়া সাবিত্রী ত্রিরাত্র করিবার অনুষ্ঠান করিলেন, তিনদিন তিনরাত্রি অনশনে অতিবাহিত হইল। সাবিত্রী ক্ষীণা ও মলিনা হইলেন, চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণগণকে ভূরিভোজনে সন্তুষ্ট করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে

তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন ; ব্রাহ্মণেরা প্রীতি প্রফুল্লমনে "অবৈধ্য হউক" বলিয়া স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। শ্বশুর ও শ্বশ্রূ সাবিত্রীকে পারণা করিবার জন্য অনুরোধ করিলে—তিনি উত্তর করিলেন, "দিননাথ অস্ত হইলে নিশাকালে পারণা করির।" শ্বশ্রূ বড়ই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তিনদিন তিনরাত্রি আহার নিদ্রা নাই, জলবিন্দু উদরস্থ হয় নাই, এরূপ অবস্থায় শারীরিক ক্লেশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, মা একটু জল খাও।"

সাবিত্রী বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "মা—আপনি অনুরোধ করিলে আমাকে নিশ্চিতই খাইতে হইবে, কিন্তু তাহাতে প্রত্যবায় আছে, তিনদিন তিনরাত্রি শেষে দুই এক প্রহরের জন্য আর নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কর্ম্মটী পণ্ড করি কেন।"

শ্বশ্রূ মৌনাবলম্বন করিলেন। বেলা অবসান হইল, আজিই সত্যবানের মৃত্যুর দিন। সতী সাবিত্রী বড়ই চঞ্চলা, এমন সময় সত্যবান কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য বনগমনে উদ্যত—জননীর অনুমতি প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি নিষেধ করিয়া বলিলেন, "বেলা শেষ হইয়াছে এখন বনগমন বিধেয় নহে।" সত্যবান নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,-"সন্ধ্যা না হইতে হইতেই ফিরিয়া আসিব, চিন্তার কোন কারণ নাই, অনুমতি পাইলেই যাত্রা করি।" জননী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সত্যবান বনগমনে অগ্রসর হইলেন. সাবিত্রী তাঁহার নিকটে আসিতেছিলেন, স্বামিকে বনে যাইতে দেখিয়া বলিলেন,—"আজি তোমার একাকী যাওয়া হইবে না, আমাকে সঙ্গে লইতে হইবে।"

সত্যবান। দেখ আজি তিনদিন তোমার আহার নিদ্রা নাই, শরীর ক্লান্ত হইয়াছে. কুটীরে থাকিয়া বিশ্রাম কর, আমি এখনি ফিরিয়া আসিতেছি।

সাবিত্রী। কিছুতেই তাহা হইবে না আমি তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী-চল যেখানে যাইবে সঙ্গে যাইব। ছায়া কখন দেহ হইতে পৃথক হয় না।

সত্যবান। একান্তই যদি যাইবে, পিতা মাতার অনুমতি লইয়া আইস।

সাবিত্রী। একথা সহস্রবার মানি।

সাবিত্রী রাজা দ্যুমৎসেন ও তদীয় সহধর্ম্মিণীর সমীপস্থা হইয়া স্বামীর সহিত বনাগমনের অনুমতি প্রার্থিনী হইলেন।

সাবিত্রী-বলিলেন, প্রায় একবৎসর হইল এই বনে আসিয়াছি, বনের কোথায় কি আছে কিছুই জানি নাই অতএব আজি আমার বনদর্শনে লালসা বলবতী আপনারা অনুমতি করিলেই তাহা পূর্ণ হয়। স্বামী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

প্রিয়দর্শনা মধুরভাষিণী সাবিত্রী বনভ্রমণে একান্ত অভিলাষিনী দেখিয়া শ্বশুর এবং শ্বশ্রূ তাঁহার এই সঙ্গত প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন আরণ্যভূমি দর্শনার্থ তাঁহাকে অনুমতি দিলেন।।

কাশীরামদাস এইস্থানে সাবিত্রীকে সহগামিনী হইবার জন্য প্রকৃত স্ত্রীর ন্যায় এতদুর অধিরা করিয়া তুলিয়াছেন যেন সদাসৎ বিচারবিহীনা সাবিত্রী পতির অনুগামিনী হইবার জন্য শ্বশুর শ্বশ্রূর অনুমতি লইবার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই স্বেচ্ছাচারিত্বে বনগমন করিয়া ছিলেন, শ্বশ্রু নিষেধ করিলে তবে তাঁহাকে বিনয়বচনে তুষ্ট করিয়া অনুমতি লইয়াছিলেন। তিনি নিষেধ না করিলে হয়ত অনুমতির অপেক্ষাও করিতেন না। সাবিত্রীর ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না ললনার পক্ষে এরূপ অবাধ্য সম্ভবপর হইতে পারেনা। স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইবার জন্য তাঁহার সমধিক ব্যাকুলতা জন্মিয়া ছিল, সত্য কিন্তু তাহা বলিয়া অবশ্যগ্রহণীয়া অনুমতির জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয় নতুবা ধৈর্য্যচুতিপ্রযুক্ত নারীজনসুলভ লজ্জার অপচয় ঘটে।

জ্যৈষ্ঠ্য মাসের অপরাহ্ন সময়ে সাবিত্রী স্বামীর সহিত নিবিড় নির্জন বনে প্রবেশ করিয়া মুলাদি ক্রমদলশোভিত বনস্থলিতে যথাতথা ভ্রমণ করিতে লাগিলেন—সাবিত্রী নারদের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে স্বামীর মুখারবৃন্দে সোৎসুক নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, সত্যবান বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে আরোহণ ও ভূগর্ভখনিত করিয়া ফলমুলাদি আহরণ করিলেন, সূর্য্যকে অস্তাচলাবলম্বী দেখিয়া কুঠারদ্বারা কাষ্ঠছেদন করিতে ছিলেন এমন সময় শিরোদেশে তীব্র বেদনানুভব করিয়া তিনি অস্থির হইলেন, বৃক্ষহইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণাধিক প্রেয়সীকে বলিলেন—"প্রিয়ে, আমি শিরোবেদনায় অস্থির হইয়াছি, মনে হইতেছে নিদ্রা হইলে সুস্থ হইতে পারি, তোমার উৎসঙ্গদেশে আমার শিরঃস্থাপনের জন্য একটু স্থান দান কর।"

এই কথা বলিতে বলিতে তিনি প্রায় হৃতচেতন হইলেন, তদ্দর্শনে সাবিত্রী ব্যথিতহৃদয়ে উপবিষ্ট হইয়া স্বামীর মস্তক আপন উরুদেশে সংস্থাপিত করিলেন। সত্যবান যারপরনাই আর্ত্ততা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"অকস্মাৎ একি হইল, যেন আমার মস্তকের ভিতর সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতেছে। বোধ হইতেছে যেন অচিরে আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল, আর বাঁচিব না।"

সাবিত্রী বলিলেন—প্রাণেশ্বর, ধৈর্য্যালম্বন কর, এখনি নিদ্রা আসিবে।

বলিতে বলিতে সত্যবান সংজ্ঞা হারাইলেন। সাবিত্রী বুঝিল ঋষিবাক্য সার্থক হইল, তাঁহার বৈধব্য উপস্থিত। নিবিড় নিস্পন্দ বনস্থলী—সেখানে জনসমাগম

নাই, সূর্য্য অস্তমিত প্রায়, হিংস্রজন্তু সমাকুলস্থানে একাকিনী সাবিত্রী—সময় ও স্থান প্রাধান্যে সহজেই মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে সংজ্ঞাহীন স্বামীর মস্তক উরঃস্থলে সংস্থাপিত। তিনি শঙ্কিতা ও চিন্তিতা হইয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন; এমন সময়ে এক দীর্ঘাকায় বদ্ধমৌলি আরক্তা চক্ষু বিটাকার পুরুষ রজ্জু হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন, তাঁহার দেহদ্যুতি দিবাকরের ন্যায়। তাঁহাকে দেখিয়া সাবিত্রী স্বামীর মস্তক ভূতলে সংস্থাপিত করিলেন এবং সভয় চিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাকে দেবতা বলিয়া বোধ হইতেছে, দয়াময় আপনি কে?"

আগন্তুক মহাপুরুষ উত্তর করিলেন—"আমি মৃত্যুর অধিপতি যম। তোমার স্বামী সত্যবানের আয়ুস্কাল পূর্ণ হইয়াছে, অতএব আমি তাহাকে লইয়া যাইব। কাল পূর্ণ হইলে কেহই ইহলোকে থাকিতে পারে না।"

এই বলিয়া কৃতান্ত সত্যবানের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিতা সূক্ষ্ম শরীর বাহির করিলেন, এবং তাহা পাশে বদ্ধ করিয়া আপন স্থানে অগ্রসর হইলেন। সাবিত্রী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন দেখিয়া যম তাঁহাকে বলিলেন —

কি হেতু কামিনি! তুমি যাও কোথাকারে।
কালেতে হইল তব পতির মরণ।
তার জন্য বৃথা চিন্তা কর কি কারণ॥
সমাজের নিয়ম আছয়ে এইমত।
কাল পূর্ণ হোলে জীব যায় মৃত্যুপথ॥
আমার বচনে ঘরে যাও গুণবতী।
শীঘ্রগতি স্বামীর চিন্তহ ঊর্দ্ধগতি॥

ধর্ম্মরাজের মুখে এই কথা শুনিয়া সাবিত্রী উত্তর করিলেন,—

যে কিছু কহিলে প্রভু সব আমি জানি।
কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার স্বামী॥
সহজে সংসার মিথ্যা বিশেষে আমার।
মায়া পাশে বদ্ধ কেন হইব আবার॥
কাল পূর্ণে মরে পতি দুঃখ নাহি ভাবি।
সকলে মরিবে কেহ নহে চিরজীবী॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতে যতজন।
জনম লভিলে হয় অবশ্য মরণ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ।
নিজ ইচ্ছা নহে কারো বিধির সংযোগ॥
আপনার স্বকর্ম্ম ভুঞ্জয়ে মম পতি।
আমার কি সাধ্য করি তাঁর ঊর্দ্ধ গতি॥
আপনি আপন বন্ধু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম্ম॥
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সদা অনুগত।
পূর্ব্বাপর নিয়মিত আছে শাস্ত্রমত॥
সে কারণ প্রাণপণে করিবেক ধর্ম্ম॥
সতের সঙ্গতি হলে করে নানা কর্ম্ম।
সংসারের সার সঙ্গ বলে জ্ঞানী জনে॥
সঙ্গ দোষে চোর হয় সাধু সঙ্গ গুণে॥

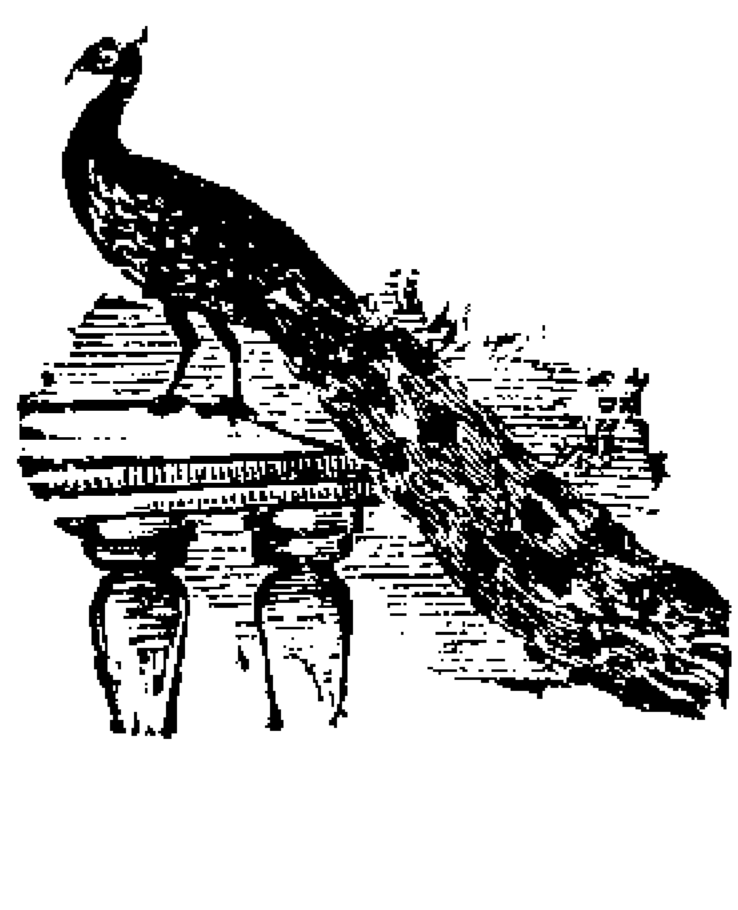
কাশীরাম দাস এস্থলে ইঙ্গিতে সাবিত্রীর পতিসঙ্গে বাসের কামনা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু বেদব্যাস স্পষ্টাক্ষরে সাবিত্রীর স্বামী সঙ্গিনী হইবার প্রার্থনা ব্যক্ত করিয়াছেন। কবিবর ৺ রাজ কৃষ্ণ রায়ের অনুবাদিত মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল ;—

বলিলা সাবিত্রী সতী, শুন ধর্ম্ম অধিপতি,
যথা স্বামী আমিও তথায়।
স্বামীসনে চিরবাস, মোর চির অভিলাষ,
ইচ্ছা মোর বলিনু তোমায়॥
স্বামী রমণীর ধর্ম্ম, স্বামী সেবা নিত্যকর্ম্ম,
স্বামী স্তব, স্বামী সে সকল।
স্বামী বিনা অবলার, সম্বল কি আছে আর,
স্বামী বিনা সকলি বিফল॥
স্বামী লয়ে যাবে যথা, আমি ও যাইব তথা,
স্বামী ছাড়া না রব কখন।
বাসনা আমার যাহা, সকলি কহিনু তাহা,
বাক্য মোর করহ শ্রবণ॥

ইন্দ্রিয়ের দাস যেই, তার কেন ধর্ম্মনেই,
অরণ্য অরণ্য বাস তাঁর।
তাহে ধর্ম্ম নাহি হয়, কর্ম্ম ভোগ সুনিশ্চয়,
ধর্ম্মকর্ম্ম সকলি আমার॥
জিতেন্দ্রিয় যেই জন, আশ্রমে থাকে সে জন,
গার্হ্যস্থ্য কি ব্রহ্মচর্য্য আর।
অথবা সন্ন্যাস ধর্ম্ম, আদি নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম,
সে জন সদাই করে সার॥
গার্হ্যস্থ্য আশ্রম আর, সকল ধর্ম্মের সার,
সম্যক করিলে অনুষ্ঠান।
জ্ঞান ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই কয়,
কভু এই বাক্য নহে আন॥
এই সে কারণে আমি, নহি অন্য ধর্ম্মকামী,
আর আশ্রমে নাহি রবো।
যথা স্বামী লয়ে যাবে, আমি ও এমনি ভাবে,
সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে যাবো॥

ধর্ম্মরাজ যম এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"আমি তোমার কথায় বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি; সত্যবানের জীবন ভিক্ষা ব্যতীত তুমি যে কোন বর চাহিবে তাহাই পাইবে।"

ক্রমশঃ



জীবন ও মৃত্যু।

লেখক, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার ঠাকুর এম, এ, ।

জীবন কি, কর্ম্মজগতে পরিভ্রাম্যাণ জীব তাহা ভাবিবার সময় পায় না; প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যতক্ষণ না রাত্রিকালে বিশ্রামাবকাশ পায়, জীবনিয়তই জীবন স্রোতে ভাসিতে থাকে, এবং কর্ম্মের নিগড় বন্ধনে আবদ্ধ হইতে থাকে—প্রকৃত জীবন কি, তাহা ভাবিবার তাহার একটু মাত্রও সময় হয় না। কর্ম্মবীরের কর্ম্মই উপাস্যদেবতা, সে অন্য বিষয় ভাবিবে কেন? অথবা, দৈবী মায়াবশে তাহা তাহার ভাবিবার অবসর হয়না; কিন্তু এহেন কর্ম্মবীরেরও এমন এক সময় আসিতে পারে, যখন সেবিষয় প্রণিধান করিবার জন্য তাহার মন স্বতই ব্যাকুল হয়। কত শত কর্ম্মবীর এবিষয় ভাবিবারও অবকাশ পর্য্যন্ত পাননা, শেষে জীবন শেষ হইয়া যায়, কিন্তু যাহারা এবিষয়ে ভাবিবার অবসর পান তাঁহারা ধন্য ও তাঁহাদিগের জ্ঞানের ফলে উত্তরকালীন মনুষ্যত্বলাভ করিয়া কৃতার্থমন্য হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক জীবন কাহাকে বলে? জীবন শব্দ উচ্চারিত হইলেই তাহার বিপরীত মরণ কথাটা স্বতই মনে উদয় হয়। যেখানে জীবন সেখানে মরণের ছায়া—। খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মযাজকগণ এই নিমিত্তই নশ্বরপৃথিবীকে Valley of the shadow of death অর্থাৎ মৃত্যুর ছায়া বহুল উপত্যকা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে Environment অর্থাৎ পরিবেষ্টমান দ্রব্যাদির সহিত সামঞ্জস্যই জীবন ও তদভাবই মরণ। যখন এই পঞ্চভৌতিকদেহ পঞ্চভূতের সহিত একসঙ্গে বাস করিতে না পারে তখনই মৃত্যু, তাহা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণই জীবন; কিন্তু এরূপ অর্থে জীবন শব্দকে আবদ্ধ করিতে দার্শনিক দিগের মন চাহেনা। তাঁহারা বলেন, ভাবের সমষ্টির নাম জীবন। আমি যে পূর্ব্বে জীবিত ছিলাম ও এখনও সেই আমিই জীবিত আছি, ইহার ভিতর কি দেখিতে পাই? ভৌতিক নিদর্শন দেখিতে গেলে পূর্ব্বকার আমাতে ও এখনকার আমাতে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা। আমার শৈশব কালের প্রকৃতির সহিত যৌবনের বা বার্দ্ধক্যের প্রতিকৃতির মিল কোথায়? হইতে পারে কিছু সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাই, কিন্তু সেই আমি যে এই আমি তাহা শুধু এই সৌসাদৃশ্যের উপর কেবল মাত্র নির্ভর করিয়া বলা যায় না। ভাবরাজ্যের ভিতর প্রবেশ না করিলে পূর্ব্বকার আমিত্বের সহিত এখনকার আমিত্বের মিল দৃষ্ট হইবেনা। তেমনি

আবার আমি যে উত্তর কালে থাকিব দেহের অবসানের সহিত যে আমিত্বের স্বাতন্ত্র্য ছিন্ন হইবেনা একথা বড় বড় মনীষিগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বজনীন সত্যের লক্ষণ এই যে তাহা দেশ কাল পাত্র ভেদে আবদ্ধ থাকে জগতের যে কোন কালে বা যে কোন জাতির মধ্যে হউক না কেন, যে ব্যক্তি সেই সত্যের অবস্থিতি সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, তিনিই সেই সত্য দেখিতে পান।

অধুনাতন বৈজ্ঞানিকদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের দেশের প্রতিভা-শালী ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানীদিগের কথা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকলেই জীবন স্রোতের অবিরামতার পক্ষপাতী— "অহং দেবো নচান্যোস্মি নিত্য মুক্ত স্বভাববান্" যেমন প্রতিভাশালী ধর্ম্মবীরের বিজয় নিনাদ তেমনি আবার মনীষি কবির কলকণ্ঠে উচ্চারিত বক্ষ্যমান শ্লোক জীবন স্রোতের অবিরাম-তার প্রমাণাত্মক মোহন মুরলী —

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতিযৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ॥
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধ পূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি।

জীবন শব্দের এরূপ অর্থে প্রয়োগ মানিতে হইলে পূর্ব্বজন্ম ও পর জন্মবাদ সম্বন্ধীয় গুরুতর তত্ত্ব আসিয়া পড়ে।

এসকল কথার মীমাংসা করা অল্পায়াসসাধ্য নহে। অতএব ইহা ছাড়িয়া দিয়াও জীবন কি তাহা দেখিলে হানি নাই। কোন এক বিখ্যাত মনীষিকে মৃত্যু কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, অগ্রে আমাকে বল জীবন কি? তাহার পর মৃত্যু কি বুঝান যাইবে। বাস্তবিকই জীবন সমস্যা দুরূহ। জীব আহার করিতেছে, কার্য্যে ঘুরিতেছে, আনন্দ উপভোগ করিতেছে, ইহাই যদি মনুষ্য সম্বন্ধে জীবন বলা যায়, তবে অনেকেই জীবিত সন্দেহ নাই। গভীর জ্ঞানীর জীবনও কুকর্ম্মে নিরত জীবের জীবন জীবন; পশ্বাদিরও জীবন জীবন ও আমাদেরও তাহাই। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী মনীষিগণ বলেন, জীবন উহাকে বলেনা, বহু লোকের জীবন যাহার জীবন যাত্রা দেখিয়া বা যাঁহার আদর্শে গঠিত হইতে থাকে তিনিই প্রকৃত জীবন্ত। বিষয় ভোগে পশ্বাদির সহিত মানবের একত্ব। এই জন্য ভাগবত টীকাকার বলিয়া গিয়াছেন যে ভোগ সম্বন্ধে—" রাজদেহ শূকর-

হে ঘোর বিশেষাৎ ” অর্থাৎ কেবল মাত্র ৫ ভাগ সুখের দিকে চাহিলে চাতুর্ব্বিধান্ন ভক্ষণে রাজার যেমন পরিতোষ। পুরীষাদি ভক্ষণে শূকরের ও তেমনইপরিতোষ। মানব শ্রেষ্ঠ জীব, ভোগসুখই তাহার চরম লক্ষ্য নহে। বাইবল বলেন, Man does not live by bread alone. কিন্তু তাই বলিয়া আহারের উপেক্ষা করিতেও নাই সেই নিমিত্ত শাস্ত্র বলেন,—

আহারার্থং যতেতৈব স্থকংতৎ প্রাণধারণং। ”
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তাথিজগপাংব্রজেৎ ॥

আহারের দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া তত্ত্বাবিষ্কারই মানবের চরম লক্ষ্যই হওয়া চাই। কিন্তু প্রকৃততত্ত্বান্বেষী জীবন কয়টী দেখিতে পাওয়া যায় ? কিন্তু তাই বলিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম জীবনকে উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। এক জীবন অপর একজীবনের ঘাত প্রতিঘাতের সমষ্টীর ফল। পুত্রের জীবন কতক পরিমাণে মাতা পিতা ও তদনুসঙ্গিজনগণের ঘাত প্রতিঘাতে গঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। নীচ ব্যক্তির জীবনের যে কোন মুল্য নাই তাহা বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকদিগের কথা মানিতে হইলে যখনদেখিতে পাই যে একটী মাত্র শব্দ ক্ষীণাদপি ক্ষীণতর হইলেও ব্রহ্মাণ্ডের শেষভাগ পর্য্যন্ত তাহার প্রভাব বিস্তার করে তখন মানব জীবন যাহা ব্রহ্মের স্ফুলিঙ্গে অনুপ্রাণিত তাহা ক্ষুদ্র হইলেও যে মহত্ত্বের জীবনকে ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষুব্ধ করে না কে বলিতে পারে? ব্যক্তিগত জীবনের কথা ছাড়িয়া জাতীয় জীবনের প্রতি লক্ষ্যপাত করিলে ইহাকি বুঝা যায় না যে বর্ত্তমান শতাব্দীর জীবনপূর্ব্বতন কালের জীবন প্রভাবে গঠিত? ইতিহাসের শিক্ষাই এইরূপ। আমরা ইচ্ছা করি বা নাই করি আমাদিগের জীবন পূর্ব্ব পূর্ব্বতন জীবন ও অধুনাতন জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের সমষ্টীর ফল। যতই জীবনের Rceptive Power. পরগুণ গ্রাহিতার ক্ষমতা বৃদ্ধিকরা যায় ততই আমরা অপরের জীবনের উত্তমাংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হই আদর্শ জীবন বিরলপ্রচার। তবে প্রত্যেক জীবনেই কোন না কোন গুণের উৎকর্ষতা দেখিলে তাহাই গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা বিধেয় কবি বলিয়াছেন ঃ—

“দৃষ্টং কিমপি লোকে হস্মিন্ ন নির্দ্দোষং ন নির্গুণং।
আবৃণুধ্বমতো দোষান্ বিবৃণুধ্বং গুণান্ বুধা ॥”

তারশূন্য টেলিগ্রাফ যন্ত্রের ন্যায় আমাদের হৃদয়ের গুণগ্রাহিতার প্রবণতা অক্ষুণ্ণ রাখা চাই, তবেই অপরের গুণের আঘাত তাহাতে পড়িবে। দেশ ও কালের ব্যবধান অগ্রাহ্য মধ্যে গণ্য হইয়া যাইবে। এইরূপেই জাতীয় সমষ্টির উন্নতি সম্ভবে।

কেবল দীর্ঘজীবন লাভ করাই চরম উদ্দেশ্য রাখিলে হইবে না; উত্তম জীবনলাভ করাই চরম উদ্দেশ্য রাখিতে হইবে। ইউরোপীয় কোন জ্ঞানী বলিয়াছেন—

"There appears to exist a greater desire to live long than to live well: measure by man's desires he cannot live long enough: measure by his good deeds and he has not lived long enough; measure by his evil deeds and he has lived too long;"

অর্থাৎ মনুষ্য মধ্যে অনেককেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা দীর্ঘজীবন কামনা করেন; কিরূপে ভালরূপে জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে তাহা তাঁহাদের তত অভিপ্রেত নহে; মনুষ্যের কামনা পরিতৃপ্তির দিকে চাহিয়া বলিতে গেলে মানবজীবন অনন্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষার সাধ মিটে না; কিন্তু মানবের সৎকার্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে গেলে পরিমিত জীবনে সঙ্কুলান হয় না বলিয়া বোধ হয়। আবার মানবের অসৎকার্য্যের দিকে চাহিতে গেলে যত শীঘ্র জীবন নিঃশেষ হয় ততই ভাল বলিয়া বোধ হয়।

প্রতীচ্যদেশের মনীষির ভাব এইরূপ; কিন্তু আমাদের দেশের মনীষিগণ বলিয়া গিয়াছেন—

"রাজপুত্র চিরংজীব মাজীবস্থ নিপুত্রক।
জীব বা মরবাসাধো সাধোমাজীব মামর॥"

যে দেশে কর্ম্মফলের বন্ধন দৃঢ়তর, সেখানে জীবন কর্ম্মফলের ভোগ মাত্র বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু যাঁহারা জীবন্মৃত তাঁহাদিগের জীবন ও মরণ উভয় একই।

অতএব দেখা যায় যে, জীবনে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া তদনুসারে তাহাকে পরিমিত করা প্রত্যেক জীবেরই চরম লক্ষ্য। যাঁহার জীবন সেই আদর্শে যতটা পঁহুছে তিনি তদনুসারে পূজ্য বলিয়া গণিত হয়েন। হিন্দু জাতির রাজভক্তি চিরপ্রসিদ্ধ কিন্তু সেই, রাজভক্তি রাজার বাহ্যিক ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ নহে; নীতিকার শুক্রাচার্য্য বলিতেছেন—

"সৎকৃতান্ নিয়মান্ সর্ব্বান্ যদা সম্পালয়েন্নৃপঃ।
তর্জৈব নৃপতিঃ পূজ্যো ভবেৎ সর্ব্বেষু নান্যথা॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তৌতু নৃপএবহি কারণম্।
সহিশ্রেষ্ঠ তমো লোকে নৃপত্বং যঃ কমাপ্নুয়াৎ॥
ধর্ম্মনীতি বিহীনা যে দুর্ব্বলাঃ আপযেনৃপাঃ।
স্বধর্ম্ম বলযু প্রজ্ঞা দণ্ডাব্যাস্তে, চৌরবৎসদা॥

রাজার গুণ দর্শে প্রজার প্রতিবিম্ব পড়ে ও রাজজীবন প্রজাজীবনকে অনুপ্রাণিত করিতে থাকে।

জগতের নিয়মই এই যে যাঁহার যতটুকু গুণ থাকিবে তাহার বিকাশ অনুশীলন দ্বারা প্রবলতর করা চাই; কবি বলিয়াছেন—

"Nor nature never lends
The smallest scruple of her excellence,
But, like a thrifty goddess she determines,
Herself the glory of a creditor
Both thanks and use,

Shakespeare.

জীবনে জীবনে ঘাত প্রতিঘাতে কিরূপে জীবনগঠিত করা যাইতে পারে, তাহার কতক আলোচনা করা হইলে, জীবনমরণের সঙ্ঘর্ষে কিরূপে জীবন গঠিত হয়, তাহা পরে বিবেচ্য। দৃশ্যতঃ জীবন্ত অনেকেই মৃত; যাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই উৎসাহ নাই, আদর্শ নাই, তিনি মৃতবৈ আর কি? জীবাত্মা অমৃতের পুত্র জানিয়া তাঁহার অবমাননা করা উচিত নহে; ঘোর বিপত্তিতেও জীবাত্মার অবমাননা করিবে না, ভগবান্ মনুর ইহাই উপদেশ। উপদেশ মানিয়া চলিলে অনেকের জীবন সুখাবহ হয়;—

আত্মানং নাবমন্যেত পূর্ব্বাভির সমৃদ্ধিভিঃ
আমৃত্যোবঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছে নৈনাং মন্যেত দুর্লভাং॥

ধন্য সেই মানব, যাঁহার জীবন অপরের আদর্শ ও যাঁহার জীবনাবসানে মহাকবি সেক্ষপীয়রোক্ত বক্ষ্যমান বচন তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে, কারণ তিনি জগতের বা সমতার একটী অঙ্গস্বরূপ ছিলেন ও বিশ্বরাজ্যের উন্নতি সহায়তা Harmony তাঁর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। 'His life was gentle, and the elements so mixed in him, that nature might stand up and say to all the world, "this was a man."



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৬শ বর্ষ। | ১৩১৫ সাল, ফাল্‌গুন। | ১১শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য দেব।

নবম অধ্যায়।

নবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপে আসিলেন। প্রকৃতির সম্পূর্ণ ভাবান্তর আত্মীয়বর্গ ও কুটম্ববর্গ সকলেই দেখিলেন, পূর্ব্বভাবের কোন চিহ্ন নাই। এ গৌরাঙ্গ যেন সে গৌরাঙ্গ নহেন, সর্ব্বদাই চক্ষে জল, সর্ব্বদাই উদাস, কথাকহিতে অনিচ্ছা, সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক। অধরে মৃদু মৃদু হাস্য আছে কিন্তু বদন মলিন। কি ভাবে যে তাঁহার সেই ভাব, কেহই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিল না। কেহ কেহ অনুমান করিল মতিভ্রম। আক্ষেপ করিয়া শচীদেবী বলিয়াছিলেন :—

"গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল।
সেই হতে নিমাই আমার পাগল হইল॥"

চৈতন্য-চরিতামৃত।

জননী ভাবিলেন, নিমাই আমার পাগল; তাঁহার নিমাই কিন্তু তখন ছোট বড় সকলের নিকটেই বিনম্র, সাক্ষাৎ বিনয়ের অবতার।

গৌরাঙ্গ যে দিন গৃহে আসিলেন, সেইদিন বৈকালে বাহির বাটীতে তিনটি সখার সহিত উপবিষ্ট হইয়া তীর্থ কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সখাত্রয়ের নাম গদাধর পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ ও মুরারি গুপ্ত। *

তীর্থ কথা কহিতে কহিতে গদাধরের পাদপদ্মের কথা উঠিল। গৌরাঙ্গ কহিলেন "শ্রীকৃষ্ণ গয়াসুরের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই পদাঙ্ক আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা সমবেত যাত্রীগণকে কৃষ্ণ পাদপদ্মের মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইতে ছিলেন! আমি সেই পাদপদ্ম" * * * বলিতে বলিতে তিনি নীরব হইলেন, মুর্চ্ছিত হইয়া ভুতলে পড়িলেন; চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সখাত্রয় তৎকালে গৌরাঙ্গের যে ভাব দর্শন করিলেন, তাদৃশভাব তাঁহারা আর কখন দর্শন করেন নাই। গদ্ গদ্ স্বরে গৌরাঙ্গ বলিলেন, "ভাই! কল্য প্রাতঃ কালে তোমরা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারির বাড়ী যাইও, আমিও তথায় যাইব, সেই খানেই আমি তোমাদিগকে সকল কথা বলিব।" সখাগণ বিদায় হইলেন, গৌরাঙ্গও গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। রাত্রিকালে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ভাবাবেশ হইল, তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, ভাব বুঝিতে না পারিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া শাশুড়িকে ডাকিয়া আনিলেন, শচীদেবী নিমাইচাঁদকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া আকুল হৃদয়ে স্বস্নেহ বচনে বলিলেন, "নিমাই! বাছা তুমি কাঁদ কেন?"

নিমাই বলিলেন, "না মা আমি কাঁদি না, নয়ন মুদিলেই আমি দেখি নবঘন একটি বালক বংশীধারি হইয়া সম্মুখে দাঁড়ান, সেই মূর্ত্তি দেখিয়াই আপনা হইতে আমার চক্ষে জল আইসে।"

শচীদেবী বিস্ময়াপন্না জননীকে শান্ত করিবার নিমিত্ত নিমাই তখন শান্তভাব ধারণ করিলেন, প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া স্নেহবতী জননী আপন গৃহে ফিরিয়া গেলেন— নিমাই চাঁদ শয়ন করিলেন।

---

* শিশুকালে এই মুরারিগুপ্তের সহিত নিমাইয়ের প্রায়ই কলহ হইত। নিমাই তাঁহার ভোজন পাত্রে মুত্রত্যাগ করিয়া ছিলেন। অথচ এই মুরারি গুপ্ত সর্ব্বপ্রথমে চৈতন্যের বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনার নাম "মুরারি কড়চা।"

মিলন সঙ্গীত। *

লেখক নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

সিন্ধু শৈল গ্রহ জ্যোতি সাকার বা নিরাকারে।
সমভাবে বিভু হেরে ভাবুক হৃদয়াগারে॥
অজ্ঞানতা অভিমানে, বদ্ধ করে নামে স্থানে,
দ্বেষাদ্বেষ ভেদজ্ঞানে, তর্কযুক্তি অহঙ্কারে॥
যথায় বিরাজে শান্তি, দ্বন্দ্ব আসি করে ভ্রান্তি,
সাধু হেরি প্রেমকান্তি, ভাসে প্রেম-পারাবারে॥
মিলে যথা সাধুবর্গ, ধরায় তথায় স্বর্গ,
আজি এ মিলনোৎসর্গ, দ্বেষ দ্বন্দ্ব হরিবারে॥

ইন্দু প্রভা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পাপের পরিণাম।

অমাবস্যার রজনী। ঘোর অন্ধকার। রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। আকাশের স্থানে স্থানে অল্প অল্প মেঘের সঞ্চার। নিশামূর্ত্তি বড়ই ভয়ঙ্করী; অন্ধকারে নিকটের মানুষ চেনা যায় না; বৃক্ষশ্রেণী যেন ভৌতিক আকার ধারণ করিয়াছে; নক্ষত্রপুঞ্জ যেন কুয়াসাচ্ছন্ন হীনপ্রভ; বায়ু স্তম্ভিত, বৃক্ষপত্র পর্য্যন্ত স্থির; নিদারুণ গ্রীষ্ম।

সেই ঘোর অন্ধকার রজনীতে একটি যুবতী একাকিনী দ্রুতপদে কোথায় চলিয়াছে। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বালকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

অপরিচিত পথভ্রমণে কাতরা যুবতী হঠাৎ বালককে সম্মুখে দেখিয়া একটু থতমত খাইল; হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকিল, চপলালোকে যুবতীকে দেখিয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? স্ত্রীলোক, একাকিনী, এই গভীর রজনীতে এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে কোথায় চলিয়াছ?"

যুবতী কহিল, "কোথায় যাইতেছি, সে কথা তোমারে কি বলিব? বলিলেই বা কি হইবে? বালক তুমি, আমি স্ত্রীলোক, বিপিন বাসিনী সংসারের নরচরিত্র কেমন করিয়া জানিতে পারিব? মানুষে মানুষ মারে, দেবতার কাছে বলি দেয়, এ সমস্ত কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? বালক তুমি, পুরুষ বটে, কিন্তু ছেলে মানুষ তোমার বুদ্ধির পরিপক্কতা জন্মে নাই; কেমন করিয়া কঠিন সমস্যা ভেদ করিবে? যদি আমার মত একাকী গৃহত্যাগী হইয়াছ, চলনা একটী কার্য্য করিয়া আসি। আমি এই তোমার সহিত কথা কহিতেছি, এতক্ষণে হয়ত একটা ভয়ানক লোম-হর্ষণ কাণ্ড সমাধা হইয়া গেল। একটী যুবক গতকল্য গণকবেশধারী এক নরপিশা-

---

* বিগত ২৯শে চৈত্র ভারতীয় ধর্ম্ম-সঙ্ঘের অধিবেশনে এই সঙ্গীতটি গীত হয়।

চের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল, আজ রাত্রে সেই পিশাচ সেই যুবকটিকে শ্মশান কালীর নিকট বলিদান করিবে, চল শীঘ্র চল, তোমাতে আমাতে সেই পাষণ্ডের পাপ কর্ম্মের প্রতিফল দিয়া যুবকটীকে উদ্ধার করি!"

বালক আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া চলিল, "চল তবে দেখি কি করিতে পারি।" এই বলিয়া দ্রুতগতি রমণীর সহিত সেই ভীষণ অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে যাহা কিছু দেখা যায়, তাই চক্ষে পড়ে। সেখানে লোকালয় নাই, যাতায়াতের সুগম পথও নাই, সেইদিকে যাইতে যাইতে একস্থানে গিয়া যুবতী হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক বালককে কহিল, "ঐ দেখ, দেখিবার কিছুই নাই, যাহা বলিবার তাহা বলা হইয়াছে, এখন যাহাতে যুবকটীর প্রাণ রক্ষা হয় তাহারই উপায় করা যাউক।"

যুবতীর কথা শুনিয়া বালক কতই ভাবিতে লাগিল। একবার ভাবিল, একেবারে গিয়া পাষাণ্ডকে আক্রমণ করিলে হয় না? আবার ভাবিল, তাহা হইবে না, আমরাই পরাস্ত হইব, আমাদের দশাও সেইরূপ হইবে। পাষাণ্ড বলবান, আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে, অবিলম্বে যুবককে বধ করিবে।

বালককে ভাবিতে দেখিয়া যুবতী কহিল, "ভাবিতেছ কি? কিছু উপায় কি স্থির করিতে পারিলে? কি করা যায়?

বালক কহিল, "উপায় তো তেমন দেখিতেছি না, তবে একটী কাজ করিতে পারিলে হয়, ধাক্কা দিয়া ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পাষাণ্ডটাকে ফেলিয়া দিতে পারিলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে।"

যুবতী কহিল, "হইতে পারে বটে, ধাক্কা দিবে কে? আমি তো পারিব না, আমার গা কাঁপিবে।

বালক বলিল, "তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না, যাহা করিতে হয় আমিই করিতেছি। এস, দূরে দাঁড়াইয়া দেখ।"

এই কথা বলিতে বলিতে বালক দ্রুতগতিতে সেই দিকে ছুটিল, প্রজ্জলিত হোমাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, অগ্নি যেন গগণ স্পর্শ করিতেছে। যোজ্ঞাসনে কাপালিক উপবিষ্ট। নিকটে সেই যুবকটি জোড়করে যেন পুতুলের মত বসিয়া আছে, নয়ন মুদ্রিত। যেন কোন জ্ঞান নাই, কোন চিন্তা নাই, কি যেন উপাসনা করিতেছে। একটু পরে তাহার উপাসনা চিরদিনের মত ফুরাইবে, একটী বার ও তাহা ভাবিতেছে না।

নিঃশব্দে নির্ভীক বালক সেই কালান্তকযমোপম গণকের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। গণকের তাৎকালিক মূর্ত্তি বড় ভয়ঙ্কর। কোন দিকে তাহার লক্ষ্য নাই, কেবল নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মসাধনে স্থির সঙ্কল্প। ক্ষণকালের মধ্যে সে আবার যজ্ঞাগ্নি বাড়াইয়া দিল। গণক ও যুবক উভয়ে বারংবার শ্মশান কালীর সম্মুখস্থ ঘটের নিকট প্রণাম করিল। উভয়ের মুখ দেখিয়া বুঝা যায়, উভয়েরই চিন্তা এক

গণক বেশী কাপালিকের কামনা শীঘ্র শীঘ্র যুবকটীকে বলিদান করা যুবকের কামনা দেবীর কৃপায় প্রাণরক্ষা হওয়া

বালক বুঝিল, ঠিক সময়, আর বিলম্ব নয় বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিতে পারে।

গণক ও যুবক প্রণাম করিতেছিল, বালক তন্মুহর্ত্তে তাহাদের উভয়েরপৃষ্ঠ-দেশে এক একটী সজোরে ধাক্কা দিল। ভীষণ শ্মশান, যুবক ভাবিল ভৌতিক উপদ্রব। সে তৎক্ষণাৎ আতঙ্কে অজ্ঞান অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল, গণক সেই প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিতে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল।

যুবক অজ্ঞান, কাপালিক অগ্নিকুণ্ডে পতিত, বালক সেই সময়ে একপ্রকার সঙ্কেত করিয়া যুবতীকে নিকটে ডাকিল। যুবতীর চিন্তা তখনও পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই; সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া কলের পুতুলের মত ধীরে ধীরে বালকের নিকট গিয়া দাঁড়াইল।

বালক চুপি চুপি যুবতীকে বলিল, "আর দেখিতেছ কি ? শেষ হইয়াছে। আর ভয় নাই। এখন এস যুবকের চৈতন্যসম্পাদনের চেষ্টা করি, দুরাচার গণকের দগ্ধাঙ্গ ঐ খানেই পড়িয়া থাকুক।"

যুবকের চৈতন্যলাভ হইল। হোমাগ্নি জ্বলিতেছে, সেই উজ্জ্বল দীপ্তিতে যুবক দেখিল, সম্মুখে তাহার প্রিয় সখা বালক, দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল মনে ভাবিল করুণা ময়ের করুণা; এই বালক দুষ্ট বুদ্ধিতে নিরীহ গণককে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়াছে।

যুবতী তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে যুবকের সম্মুখে গমন করিল; বদন মলিন, অতিশয় বিষণ্ণ। যুবতীকে দেখিয়া যুবকের পূর্ব্ব কল্পনা অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইল। এক দৃষ্টে চাহিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "এ কি ? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? এই কথা বলিয়াই বালককে সম্বোধনপূর্ব্বক যুবক সহসা জিজ্ঞাসা করিল, বালক ! সত্য করিয়া বল কি হইয়াছে ? এমন কর্ম্ম কে করিয়াছে তুমি কি আমার সেই সঙ্গী ? তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি সে নও; আর যদি হইবে, তবে এ কামিনীকে কোথায় পাইলে ?"

বালক উত্তর করিল, যাহা হইয়াছে, পরে সমস্তই শুনিতে পাইবে। এখন শুনি-বার সময় নাই, চল, গুহার দিকে গমন করি।

যুবক একটু অন্যমনস্ক ছিল, বালকের কথা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া। পুনরায় বলিল, তুমি ব্যথা দাও নাই আমিই ব্যথিত হইয়াছি, গুরুতর ধাক্কা পাইয়াছি, চলিতে পারি ব না।

বালক ভাবিল, এখনও যুবকের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই, ইহারহস্ত ধারণ করিয়া কোন নিভৃত স্থানে লইয়া যাই; ভাবিয়াই যুবতীর সাহায্যে যুবাকে তথা হইতে গুহা মধ্যে লইয়া গেল। গুহামধ্যে গিয়া যুবা ভাবিল, এ সকল কি

ব্যাপার। অনেকক্ষণ চিন্তার পর আপন মনে বলিল, "আবার সেই প্রতিভা! সেই প্রেমময়ী প্রতিভা! গণক ঠিক ধরিয়াছিল! আমার মনের কথা বলিয়াছিল!!"

যুবা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বালককে কহিল, "বালক! তুমি যে কাজ করিয়াছ, তোমাকে আর কি বলিব? না আমার অদৃষ্টে প্রতিভা সম্মিলন নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া এইবার আমি নিশ্চয় মরিব। না মরিব কেন? প্রতিভা! আমি মরিব না। মরিলে তোমাকে ভাবিতে পারিব না। তোমাকে না ভাবিলে তুমি রাগ করিবে। সেই একবার, একবার কেন, অনেকবার, এক যুবতী না সেই ইন্দু আমাকে কাপালিকের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে, ইন্দুপ্রভা পরম দয়াময়ী! তাহার প্রাণ পরের জন্য কাঁদে। ইন্দুপ্রভা আমার প্রাণদান দিয়াছিল। আমিও তাহার লাবণ্যময় মদনমণ্ডল দেখিয়া সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ইন্দুপ্রভা এখন কোথায়? এবার ইন্দুপ্রভা আমাকে উদ্ধার করিতে আসিল না কেন? ইন্দুপ্রভা কি তবে রাগ করিয়াছে? না রাগ করে নাই, বুঝি কোথাও গিয়া থাকিবে। মনে পড়ে, নবসাম্মিলন, মনে পড়ে, সেই উন্মাদিনী মনে পড়ে সেই তাহার চারুরূপ। মনে পড়ে, তাহার সুমধুর কথাগুলি! আহা! জগতে এমন নিষ্ঠুরও আছে! তাহার সেই সুন্দর মুখখানি দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? তাহার মনের কষ্ট বুঝা যায় না। ইন্দুপ্রভা তাহার মনের কষ্ট মনেই চাপিয়া রাখে। কে বুঝিবে? আমি উন্মাদ! বুঝিবার সাধ্য নাই।

গুহায় দুই প্রাণি থাকিত, আজ তিনটী। নির্জ্জন গুহা আজ আনন্দময় যুবক নীরব। এক বিন্দু অশ্রু তাহার নয়ন হইতে গড়াইয়া পড়িল।

আহা! কি গভীর প্রেম! যুবক! ধন্য তুমি! জগতে পরের জন্য যাহার এক বিন্দু অশ্রুপাত না হয় সে নিষ্ঠুর। কঠিন পাষাণ অপেক্ষাও তাহার হৃদয় পাষাণ। পাঠক! যুবকের উদ্ধারকারিনীকে চিনিতে পারিয়াছ?

উদ্ধারকারিনী! তোমাদের সেই বিজন বাসিনী ইন্দুপ্রভা। কেন তাহার এখানে আগমন, তাহা তোমরা জান। যে দিন কাপালিক ইন্দুপ্রভাকে ফেলিয়া যুবকের অনুসন্ধানে বাহির হয়, সে দিন ইন্দুপ্রভাও অলক্ষিতে তাহার অনুসন্ধান করে। যুবকের উদ্ধারই তাহার একমাত্র বাসনা। কিরূপে 'কতদিনে যুবকের দর্শন পাইবে, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা।

যুবক ইন্দুপ্রভার প্রেমার্থী, ইন্দুপ্রভা যুবকের প্রেমার্থিনী; কিন্তু ইন্দুপ্রভার প্রেম এত গভীর, এত গোপনীয় যে, বুঝা বড়ই কঠিন। এরূপ প্রেমিক জগতে বিরল। জগতে কত প্রকার বন্ধু আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু বিপদের বন্ধু কয়টী—? মনে কর, শ্যামের সঙ্গে রামের বড় প্রণয়, রামের ক্ষণবিচ্ছেদ শ্যামের প্রাণে সহ্য হয় না; কিন্তু রামের একটু বিপদ হউক দেখি, শ্যাম আর সে দিকে যাইবে না। বন্ধু পরীক্ষায় সংসারের গতি প্রায় এই প্রকার জগতে অনেক ভালবাসা আছে, স্বার্থের ভালবাসাই তাহার মধ্যে অধিক, নিস্বার্থ ভালবাসা কদাচিত দেখা যায়, ইন্দুপ্রভার ভালবাসা নিস্বার্থ। আশ্রয়দাতা প্রতিপালক কাপালিক

অবশ্য মায়া, দয়া দেখায়, ভালবাসে, ইন্দুপ্রভা তাহা না বুঝিত এমন নয়, কিন্তু যেখানে তাহার প্রেমিকের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন, সেখানে স্বার্থপর কাপালিকের প্রাণ বড় নয়, ইন্দুপ্রভা ইহা বুঝিয়াছিল। ইন্দুপ্রভা নিস্বার্থ পবিত্র প্রেমের আদর্শ।

এ জগতে প্রেমের আদর সকলে জানে না। প্রেমের নাম শুনিলে কেহ কেহ উপহাস করিয়া থাকে, কিন্তু প্রেম কি, কেন প্রেমের সৃষ্টি, তোমাকে আমাকে সকলকে এই প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়িতে হয় কেন, এটী সকলে চিন্তা করেন না। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে সেই দিকেই প্রেম ; প্রেম ব্যতীত কিছুই নাই ; সকল বস্তুতে প্রেমের মধুময় ভাব বিরাজিত। বৃক্ষলতায় প্রেম, নিশির শিশিরে প্রেম, নদীর স্রোতে প্রেম, পাখীর গানে প্রেম, যাহা বলিবে, যাহা দেখাইবে, তাহাতেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ। প্রেমের অর্থ একাত্মা হওয়া। এই প্রেম জগতবাসীকে একত্র করিয়া সংসার পাতান, প্রেম লইয়াই সংসার, নতুবা সকলেই সংসারবিরাগী হয়ে পথে পথে বেড়াইত। সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী পরমার্থ প্রেমে পাগল।

রজনী অবসান ঊষাসতী পূর্ব্বগগনে দেখা দিলেন। পাখিগণ মধুরকূজনে প্রভাত ঘোষণা করিতে লাগিল। ঊষা চলিয়া গেল, প্রভাত হইল। ইন্দুপ্রভা বালকের নিকট বিদায় চাহিল। যুবক তখন পর্য্যন্ত নিদ্রিত। উপকারিনীকে তথায় থাকিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন, ইন্দুপ্রভা কহিল আমার অনেক কাজ আছে, আমি আর থাকিতে পারিব না ; আমিও তোমাদের মত বনে বনে বেড়াই, বনভ্রমণ কালে আবার তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।

যুবককে আর সেখানে যাইতে দিও না, যদি কাপালিক বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে বড় বিপদ ঘটিবে। সাবধান যুবককে সে দিকে যাইতে দিও না, আমি চলিলাম।

ইন্দুপ্রভা প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল, অমনি বালক তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিতে লাগিল, "দাঁড়াও তোমার আরও দুটি কথা শুনিয়া প্রাণ শীতল করি।

যুবকের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাহাকেই বা কি বলিব ? রাত্রে সে বড় কাতর ছিল, কোন কথায় হয় নাই। জাগিয়া সে যখন জিজ্ঞাসা করিবে আমার প্রাণ রক্ষা কারিনী যুবতী কোথায় ? আমি তখন কি উত্তর দিব ?

যুবতী কহিল, "মনে করিলেই আমার দেখা পাইবে, যুবক যখন আমার জন্য জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে বলিও রমণী, নিজ প্রয়োজনে চলিয়া গিয়াছে আর একদিন আসিবে ; বিপদেই তাহার সাক্ষাত পাওয়া সম্ভব।

ইন্দুপ্রভা চলিয়া গেল আকাশ বেশ পরিস্কার। ইন্দুপ্রভা যাইতেছে, বালক এক দৃষ্টে তাহাকে দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিল, "হায় এই যুবতীও আমার মত অনেক কষ্ট পাইয়াছে, উহার মুখখানি দেখিলেই কত কথাই মনে পড়ে।

যেন মেঘে ঢাকা পূর্ণশশী! আমার যে দশা উহারও যদি সেইরূপ দশা হইয়া থাকে, তবে ত যুবতী আমার মত মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়াছে! আহা! যুবতীকে দেখিয়া উহার সহিত কাঁদিতে ইচ্ছা হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মফল।

বিধাতা কর্ম্মের রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু অনেক মানবের কর্ম্মফল বিলম্বে দেন, বলিয়া অনেকে ঠিক ব্যবস্থা বুঝিতে পারে না। হিতাহিত জ্ঞান মানবের সকল সময় থাকে না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যাহা না করিবার অনেক মানব তাহা করিয়া ফেলে, একবারও ভালমন্দ চিন্তা করে না। যদি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটু ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে মন্দকে ভাল ভালকে মন্দ বলিয়া জ্ঞান করা হয় না, পাপের প্রসারতা বৃদ্ধি পায় না; কিন্তু মানব তাহা করিবে কেন? তাহা হইলে তো সংসার রসাতলে যায় না। তাহা হইলে যে দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি হয়। পাপ কি? পাপের কথা বুঝা বড় কঠিন। তবে যতদূর সম্ভব ভাবিয়া দেখা উচিত। দুঃকর্ম্ম করার পরেই স্বভাবতঃ মন বিচলিত হইতে থাকে, মন কেমন কেমন হয়. তাহার নাম পাপ। তুমি এক জনের কিছু অপহরণ করিয়া বাড়ী যাও, হয় ত তুমি খুব চতুর, বেশ কৌশল শিখিয়াছ, লোকের-চক্ষে ধুলা দিতে সমর্থ, তোমার চৌর্য্য কার্য্য কেহই জানিবে না, কেহ তোমাকে ধরিতে পারিবে না, তুমি নির্ব্বিঘ্নে পরস্বপহরণ করিয়া তরিয়া যাইতে পারিবে, চুরি করিবার আগে ইহাই তুমি ভাবো, কিন্তু তাহার পর চুরি করিয়া যখন পলাইবে, তখন ফিরিয়া ফিরিয়া পশ্চাতে চাহিবে, কে যেন তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, তোমার পাপ কার্য্য দেখিয়াছে, এইরূপ মনে হইবে, শরীরে কম্প আসিবে মন অস্থির হইবে, হিয়া দুরু দুরু করিতে থাকিবে। এত হইবে, তবু কে যেন তোমাকে লওয়াইবে, তুমি পাপকার্য্যে বিরত হইতে পারিবে না, স্বভাব তোমাকে বিরত হইতে দিবে না।

একটী কোন কার্য্য করিয়া মনে মনে ঐ প্রকার যে আশঙ্কা আইসে, তাহার নাম পাপ। সেইরূপ কার্য্যের নাম পাপকার্য্য; গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, হিংসা দম্ভ কিম্বা মাৎসর্য্যভরে ক্রোধী পুরুষ ভেদ দর্শনে আমাকে যে ভক্তি করে, তাহা তামস ভক্তি; বিষয়, কিম্বা ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া ভেদ দর্শী হইয়া প্রতিমাতে আমার প্রতি যে ভক্তি, তাহার নাম রাজস ভক্তি; পাপ ক্ষয় মানসে ভগবানের প্রীতিসম্পাদন আকাঙ্ক্ষায় ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ করিবার উদ্দেশে যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় অথবা এইরূপ অন্যান্য উদ্দেশে ভেদ দর্শনে যে যে ভক্তি তাহার নাম সাত্বিক ভক্তি।"

পাঠক! কাপালিকের ভক্তি তামসভক্তি, এ ভক্তিতে দেবতা সন্তুষ্ট হন না। একে ত এক জনের প্রাণ বধ করিয়া দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার আশা করা, ইহাতে দেবতা যত সন্তুষ্ট হন, দেবতাই জানেন; তাহার উপর বধ্য পলাইয়াছে, কত ছল জাল বিস্তার করিয়া সেই পলাইত বধ্যকে পুনরায় ধরিতে চেষ্টা করা, ধর্ম্ম ইহা সহ্য করিবেন কেন? বিধাতার সৃষ্টি যাইবে, তিনি কি স্থির হইয়া তাহা দেখিবেন? কাপালিকের মনকে কর্ম্মফল বর্জ্জিত করিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য তাহার মনে পাপের চিন্তা প্রবল করিয়া দিয়াছেন, তাই কাপালিকের ভক্তি তামস ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে, তাই তাহার ধ্বংশ কাল নিকট বর্ত্তি।

নদাতারে দগ্ধাঙ্গ কাপালিক পতিত, দেহে প্রাণ ধুক ধুক করিতেছে, কতচিন্তাই তার সেই মুমূর্ষু প্রাণের মধ্যে আসিতেছে, যাইতেছে; একটু পরেই প্রাণ বহির্গত হইবে, আর এ সংসারে তাহার মায়া দয়া কিছুই থাকিবে না। মরিয়া কি হইব, তাহার ঠিক নাই, নিজ কর্ম্মফলে হয়, পশু যোনী প্রাপ্ত হইব, ক্ষীণ মস্তিষ্কে এই সব আলোচনা করিতে করিতে কাপালিক জীবন যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। বাহ্যজ্ঞান শূন্য এমন সময় অদূর হইতে একটী বিষাদ সঙ্গীত আসিয়া তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। গীতটি করুণ রস পরিপূর্ণ। কাপালিকের চৈতন্য হইল, কাপালিক আত্মহারা হইয়া সেই গীত শুনিতে লাগিল; বুঝিল বামাকণ্ঠ; কোন প্রেমউন্মাদিনী গাহিতেছে :—

সোহিনী।—মধ্যমান।

কেন তারে ভাল বেসে ছিলাম আমি প্রাণে?
(প্রাণে।)
আমারি প্রাণেরি ব্যথা কারে কব, কেবা জানে?
নয়ন মুদিয়ে থাকি, হৃদয়ে সেরূপ দেখি,
আবার মেলিলে আঁখি আঁধার হেরি দিনমানে॥
শুনিলে পাখীর গান, কেনরে শিহরে প্রাণ।
সে গানে কেন আমার বজ্রবান হৃদে হানে?
যে ব্যথা বাজে অন্তরে কেমনে বুঝিবে পরে,
কে আছে ব্যথার ব্যথি, বুঝিবে সে অনুমানে?
হারাইয়া প্রাণ ধনে, পশেছি গহন বনে,
কে আমারে বলে দিবে, পাব তারে কোন স্থানে?

লতায় লতায় বৃক্ষে বৃক্ষে পাতায় পাতায় জলে স্থলে ব্যোমমার্গে সেই সঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আহা! কি মধুর সঙ্গীত। শুনিলে মন প্রাণ বিগলিত হয়। এমন সঙ্গীত কথনও শুনিয়াই। সুধামাখা সঙ্গীত যতই শ্রবণ করা যায়, চিত্ত ততই উল্লাসিত হয়। মুমুর্ষুর কর্ণে কালীনাম ধ্বনির ন্যায় সুধা বর্ষণ করে। মুমূর্ষুর হৃদয়ও যেন ' নাচি উঠে।

সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে কাপালিক অতিকষ্টে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল, একটু ২ একটু করিয়া নয়ন মেলিল, গীত শ্রবণে তাহার পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হইয়া গেল। কাপালিক দুর্ব্বল হৃদয়ে বল পাইল; ক্ষণকালের জন্য মৃত্যুচিন্তার বিরাম হইল। কাপালিক প্রাণ ভরিয়া সেই মধুর সঙ্গীত শুনিতে লাগিল।

কাপালিক ভাবিল, কিসের ব্যথা? কিসের হওয়া সম্ভব? নিশ্চয় প্রেমের। কাহার প্রেমিক হারাইয়া গিয়াছে। + + +

ইন্দুপ্রভাকে মনে পড়িল। কাপালিক ভাবিল আমার ইন্দুপ্রভাও প্রেমোন্মাদিনী। তাহাকে যদি সঙ্গে আনিতাম, তবে কি আমার এ দশা হইত? ইন্দুপ্রভা অবশ্যই আমাকে রক্ষা করিত। এইরূপ ভাবিয়া সাধ্যমত উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, ইন্দু প্রভা! ইন্দুপ্রভা!

কাপালিক আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু জিহ্বায় জড়তা আসিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না, সে আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল। যুবককে উদ্ধার করিয়া স্ব-স্থানে আসিয়া প্রেমোন্মাদিনী ইন্দুপ্রভার প্রাণ কেমন করিতে লাগিল; নয়নে অশ্রু আসিল, একটী বৃক্ষতলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাপালিককে মনে পড়িল কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া কাতরা বালিকা সমস্ত বন খুঁজিতে খুঁজিতে সেই নদীতীরে আসিল আসন্ন মৃত্যু দগ্ধাঙ্গ কাপালিককে দেখিতে পাইল। কাপালিকের প্রাণ তথনও বহির্গত হয় নাই, কিন্তু সংজ্ঞা হীন।

নদীতীরের স্নিগ্ধ সমীরণ স্পর্শে কাপালিকের আবার একটু একটু চৈতন্যের উদ্রেক হইতেছিল, সে অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ইন্দু! এসেছ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে মা? কেমন করিয়া আসিলে আমি তোমারই অনিষ্টসাধন করিতে গিয়াছিলাম, বেশ প্রতিফল পাইয়াছি। সুখে থাক, যদি ইচ্ছা হয়, যুবককে পাণিদান করিও। এখন আমার এই শুষ্ককণ্ঠে একবিন্দু জল দাও, প্রাণ ভরিয়া একবার এই অন্তিমকালে আমার কর্ণে মায়ের নাম শুনাও।"

কাপালিকের দুর্গতি দেখিয়া ইন্দুপ্রভা আর স্থির থাকিতে পারিল না। কাঁদিয়া উঠিল। আবার অনেক কষ্টে চিত্ত সংযত করিয়া বালিকা নদী হইতে এক অঞ্জলি জল আনিয়া বিন্দু বিন্দু কাপালিকের মুখে চক্ষে সিঞ্চন করিতে লাগিল। কাপালিক অতি কষ্টে অস্ফুট স্বরে বলিল, "ইন্দু— প্র—ভা আ—মি চলিলাম; সু—খে থা—"

বলিতে বলিতে কাপালিক চিরদিনের মত নয়ন মুদ্রিত করিল। ইন্দুপ্রভা সেই নদীকূলে একাকিনী কাপালিকের মৃত্যুদেহ কোলে করিয়া বালিকা রোরুদ্দমানা। তাহার অন্তরে অনন্ত চিন্তা। একটীর পর একটী, তাহার পর আর একটি, জলবিম্বের মত আসিল, আর বিলীন হইল। কেমন করিয়া পিতার অন্তিমের কাজ হয়? অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অসম্ভব বলিয়া যতই মনে হইতে লাগিল, ততই সেই চিন্তা প্রবলা হইয়া উঠিল, যেন মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

আর সেই নয়নে একবিন্দুও অশ্রু নাই। ইন্দুপ্রভা যেন উন্মাদিনী উন্মাদিনী যেন অকুল পাথারে ভাসিতেছে; একবার ভাবিতেছে, সেই বালকের সাহায্য লইলে কি পিতার সৎকার হয় না? না তাহা হইবে না; সেখানে যুবক আছে, বালককে আমি ডাকিলে যুবক কি ভাবিবে? সে হয়ত ভাবিবে, ইন্দুপ্রভা স্বার্থপরায়ণা, প্রেমের জন্য এত দূর আসিয়াছে। না, সেখানে যাইতে পারিব না। তবে কি করি?

যাহার মনে ধর্ম্মবল আছে, তাহার আর ভয় কি? ঈশ্বর তাহার সকল ভয় দূর করেন। ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তির ভয় ভাবনা থাকে না। লোকে হয় ত মনে করিবে ইন্দুপ্রভার বিপদ বুঝি যাইবার নয়; সে ভাবনা ভ্রান্তিমূলক। কোথায় বিপদ? কোথায় ভয়? যাহার মনে ধর্ম্মচিন্তা স্থান পাইয়াছে, সে স্বচ্ছন্দে অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারে, প্রজ্জ্বলিত অনল কুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে, কাল সর্পের মুখে হস্তার্পণ করিতে পারে।

ইন্দুপ্রভার চিন্তার বিরাম নাই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়। বালিকা একাকিনী সেই গভীরা রজনীতে শব কোলে করিয়া নদীতীরে উপবিষ্টা। সময় যেন আর যাইতেছে না, যেন কঠিন বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে। যত রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, ইন্দুপ্রভার চিন্তা ততই দ্বিগুণ মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া ইন্দুপ্রভার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। কোমলাঙ্গী বালিকা বালিকা নিদ্রাবেগে ঢলিতে লাগিল

রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ইন্দুপ্রভা ঢুলিতেছিল, সহসা তাহার নিদ্রাবেশ ভাঙ্গিয়া গেল; সে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে জটাজূটধারী ভস্মবিভূষিত এক সন্ন্যাসী; ভয় পাইয়া ইন্দুপ্রভা বলিয়া উঠিল, "তুমি কে? আমার পিতাকে কি লইতে আসিয়াছ?" সন্ন্যাসী উত্তর করিল, 'ভয় নাহ। পিতা আমি, পিতার কাছে কন্যার কিসের ভয়? শব ক্রোড়ে করিয়া তুমি ভাবিতেছ কেন? মাটির দেহ মাটিতে মিশিয়া যাইবে। চল, অদূরেই চিতা প্রজ্জলিত করিয়াছি, সেই অগ্নিকুণ্ডে এই দেহ ভস্ম হইয়া যাইবে!"

সাহস পাইয়া ইন্দুপ্রভা বলিল, "চলুন।"

সন্ন্যাসী একাকী শব তুলিয়া স্কন্ধে লইয়া ইন্দুপ্রভাকে বলিল, "এসো।"

ইন্দুপ্রভা মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসী সেই চিতানলে মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত করিল।

ইন্দুপ্রভা একটু পূর্ব্বে পিতার যে প্রাণশূন্য দেহ দর্শন করিতে ছিল, সেই দেহের এই পরিণাম। সর্ব্বদেহের এইরূপ পরিণাম স্মরণ করিয়া আমাদের দেশের একজন অমর কবি বলিয়াছেন, "এই দেহের এত অহঙ্কার। অহং জ্ঞানে তৃণ জ্ঞান করে না সংসার।"

ইন্দুপ্রভা ভাবিল, আমিই পিতার কাল হইলাম! আমার পিতৃহত্যার পাপ হইয়াছে! আমার এ পাপ কি মোচন হইবে?

সন্ন্যাসী যেন অন্তর্যামী। তৎক্ষণাৎ ইন্দুপ্রভার মনের ভাব বুঝিতে পারিল, গম্ভীর স্বরে বলিল, "কেন তুমি পিতৃহত্যার পাপ ভাগিনী হইবে? দেবতার ইচ্ছায় তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে; তুমি কেবল উপলক্ষ মাত্র। পাপীর মৃত্যু দেব হস্তে হয় না, সেই জন্য দেবতার ইচ্ছায় তুমি উপলক্ষ হইয়াছিলে, সে জন্য বৃথা দুঃখ করিও না।

এ সব কথা বলিয়া সন্ন্যাসী আবার বলিল।

আমি যেমন সন্ন্যাসী তুমি সেইরূপ সন্ন্যাসিনী; ধর্ম্মের মর্ম্ম তুমি বুঝিয়াছ। তুমি আজীবন সংসারে প্রবিষ্ট হও নাই, অতএব তুমি চিরসন্ন্যাসিনী। বালিকা তুমি, তোমার পদে পদে বিপদের আশঙ্কা, শত্রুও পদে পদে যাহার কথা না শুনিবে সেই তোমার শত্রু হইবে। তোমাকে বিপদে ফেলিতে চেষ্টা করিবে। আরও বনে কালীকার পূজা অর্চ্চনায় তোমার যে টুকু ধর্ম্ম অর্জ্জিত হইয়াছে তাহাও বিসর্জ্জিত হইবে। তাই বলিতেছি বালিকা! তুমি কর্ম্মাকর্ম্ম বেশ চিন্তা করিয়া দেখ। আমি চলিলাম। যদি তুমি মনস্থির করিতে পার, আবার আমার দেখা পাইবে।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। ইন্দুপ্রভা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কথাগুলি মনে মনে আন্দোলন করিল, সারমর্ম্ম বুঝিতে পারিল না।

রজনী প্রভাত হইয়া আসিল, ইন্দুপ্রভা সেইখানে প্রভাতী পক্ষীকুলের সুমধুর কূজন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। প্রভাত দর্শনেও বিহঙ্গধ্বনি শ্রবণে ইন্দুপ্রভার মন একটু প্রফুল্ল হইল। ধীর সমীরণ সেবনে সে তখন যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইল। এক এক করিয়া এ চিন্তা, ও চিন্তা, সে চিন্তা, এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে প্রেমচিন্তা আসিয়া তাহার মনে আশ্রয় লইল। প্রেমবিহ্বল হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য যে মুখ খানি হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিল; সেই মুখে তখন বিষাদের রেখা দেখা দিল। যাহার জন্য চিন্তা, বিষণ্ণ বদনে ইন্দু-প্রভা তখন সেই প্রেমপাত্রের অন্বেষণে চলিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুতাপ।

ভাল হউক, মন্দ হউক, কোন কার্য্য করিবার সময় সকলের মনের গতি ঠিক থাকে না। কেহ ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ করে, কেহ আবার কিছুই করে না। যাহা মনে উদয় হয়, তাহাই করিয়া ফেলে। কিন্তু যাহার মনে ভবিষ্যত চিন্তা স্থান পায় না, সে নির্ব্বোধ। ভবিষ্যতের কথা দূরে থাকুক, দু-দিন যাইতে না যাইতেই তাদৃশ ব্যক্তির অনুতাপ উপস্থিত হয়; সে তখন অবিমৃষ্য-কারিতার ফল ভোগ করে; গত কথা মনে করে, আর নয়ন জলে ভাসিতে থাকে। নিম্নের দৃষ্টান্ত পাঠে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, ইহাও ঠিক তাহাই হইয়াছে।

প্রতিভার মানসিক ভাব বিকৃত। তাহার পিতা তাহাকে তাহার মাতুলালয়ে পাঠাইয়া ছিলেন, কিন্তু কেহই কাহারও মনের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না। মাতুলালয়েও প্রতিভাসুন্দরী প্রেম পিপাসিনী, হরেন্দ্রকুমারের প্রেম চিন্তায় পাগলিনী প্রায়। প্রতিভা দেশত্যাগিনী হইয়াছে, কি করিয়াছে, কি করিতেছে, পাঠক তাহা অবগত আছেন, প্রতিভার পিতা যখন সংবাদ পাইলেন যে, প্রতিভা দেশত্যাগিনী হইয়াছে। তখন তাহার রাগ হইয়াছিল, একটু পরিতাপও উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি একবার ভাবিয়াছিলেন, দূর হউক, মরুক, যাক, অমন কন্যাতে প্রয়োজন নাই। তাহাকে গৃহে আনিলে সমাজ চ্যুত হইতে হইবে। ভাবনার পরে আবার অন্য ভাবের উদয় হইল, জমিদারী ফন্দী তাহার মাথায় আসিয়া জুটিল। তখন তিনি আবার ভাবিলেন, কেমন করিয়া চলিয়া যায়, দেখিব, স্বেচ্ছা-চারিণীর প্রতি আমি কখনই দয়া করিব না, যেমন করিয়া পারি পাপিনী কন্যাকে ধরিয়া আনিয়া অনাহারে শুকাইয়া মারিব, কুলকলঙ্কিনী পাপিনী আপন পাপকর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিবে।

জমিদার মহাশয় এইরূপ আরও অনেক ভাবিলেন, তাহার নশ্বর শরীর রাগ ভরে জ্বলিতে লাগিল, চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ হইয়া আসিল। দন্তে দন্তে পেষণ করিতে করিতে একজন চোপদারকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, রঘুবীর! শীঘ্র যাও। প্রতিভাকে যেখানে পাও ধরিয়া আন। যাও, উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে।

আজ্ঞা পাইবামাত্র রঘুবীর চোপদার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল। প্রতিভা যাহার জন্য প্রেম উন্মাদিনী হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছে, ইতিপূর্ব্বে গ্রাম মধ্যে তাহা প্রচারিত হইয়াছিল। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সেই কথা কাণাকাণি করিতেছে, জমিদারের ভয়ে প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিতে পারিতেছে না। হাটে ঐ কথা, ঘাটে ঐ কথা, মাঠে রাখালের মুখে ঐ কথা, পুষ্করিণীর ঘাটে স্ত্রীলোকের মুখে ঐ কথা; কত জন কত কথাই বলাবলি করিতেছে।

ঘাটের ঘটাই বেশী। ঘাটে ঘাটে স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার চর্চ্চা করে, চর্চ্চার মধ্যে পর নিন্দা ও পর হিংসাই অধিক।

সেইরূপ নাট্যাভিনয়ে অনেক অভিমানিনী রমণী স্নানের ঘাটে আসর জমকাইয়া দেন। বন্দিপুরের ঘাটে ঘাটে এই সময় ঐরূপ রমণী প্রায়ই দৃষ্ট হয়।

মনিবের হুকুম পাইয়া রঘুবীর গোঁফে চাড়া দিয়া দীর্ঘ এক বংশ দণ্ড স্কন্ধে লইয়া বাটী হইতে বাহির হইল, এ দিক সে দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া মনিবের নিকট বিমর্ষ-বদনে কহিল, "হুজুর! খুজিয়া কোন সন্ধান পাইলাম না। একজন ফকির বলিল, "একটী যুবতী স্ত্রীলোককে সহরের নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়াছি, যুবতী একাকিনী দ্রুত পদে চলিয়াছে যুবতীকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, সে কোন ভদ্র বংশ সম্ভূতা।" "ফকিরের মুখে সেই সন্ধান পাইয়া আমি সেই দিকেই যাইতে ছিলাম, ফকির আমাকে নিষেধ করিল। কাজেই আমি বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।" এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জমিদার মহাশয় কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রঘুবীরকে বিদায় দিলেন।

জমিদার মহাশয় অতঃপর নানা স্থানে কন্যার অনেক অন্বেষণ করিলেন, সমস্তই বিফল হইল, কোথাও কিছু সন্ধান পাইলেন না। অনেক দিন গত হইল। সময়ে সকল রিপুর প্রবল বেগ দমিত হয়, দিন গত হওয়াতে তাঁহার ক্রোধ ও ক্রমে কমিয়া আসিল। একটু একটু করিয়া তাঁহার মনে কেমন এক প্রকার উন্মাদ ভাব উপস্থিত হইল, পরিতাপ করিয়া তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন, কেন প্রতিভার জন্য মন আমার এমন হয়, কেন প্রাণ এমন করে? প্রতিভার বিবাহে

কেন আমি সম্মতি দিলাম না? কন্যা আমার, আমি কন্যার, যাহাতে কন্যার সুখ হয়, কেন আমি তাহার দিকে লক্ষ্য করিলাম না? কন্যা স্বেচ্ছাবশে পতি অন্বেষণে গিয়াছে, তাহার উপর কেন আমার রাগ হয়? একমাত্র কন্যা, তাহাকে হারাইয়া আমি থাকিতে পারিব না। নিজে যাইব, দেশে দেশে অন্বেষণ করিব, দেখিব, তাহার দেখা পাই কি না? পুত্র আছে, সে উপযুক্ত হইয়াছে, তাহার উপর সমস্ত বিষয় ভারার্পণ করিয়া, যে দিকে দুই চক্ষু যায় সেই দিকে চলিয়া যাইব।

জমীদারের এক পুত্র মারা যায়, সহসা সেই কথা উদয় হওয়াতে হৃদয় শোকাচ্ছন্ন হইল, পরক্ষণে মনকে একটু প্রবোধ দিয়া তিনি বর্ত্তমান পুত্রকে তাঁহার নিজ শয়ন কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন; পুত্রের নাম রামরঞ্জন।

পুত্রউপস্থিত হইলে, পিতাপুত্রে পরামর্শ হইল, পিতাকে নিরস্ত করিবার জন্য রামরঞ্জন বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, পিতার মন ফিরিল না। পুত্র অবশেষে পিতার মতে মত দিয়া বলিলেন, "প্রতিভার অদৃষ্টে যদি কিছু মন্দ থাকে, তাহা ঘটিয়াছে, তথাপি আশা রাখিতে হয়। আশা কেহ ভুলিতে পারে না, আশায় হৃদয় বাঁধিয়া যখন প্রতিভাকে পাইবার পথ চাহিয়া আছেন, তখন আপনাকে বাধা দেওয়া উচিত হয় না; যান, অন্বেষণ করুন, যদি দেখা পান, যদি বেঁচে থাকে, তবে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আসিবে। তবে কথা এই যে, একাকী যাওয়া উচিত নহে কতিপয় সঙ্গী লইয়া যাওয়া উচিত।

এই বলিয়া পুত্র নীরব হইল। পিতাও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মনে মনে ঐ কথায় আলোচনা করিতে লাগিলেন, পুত্রকে কহিলেন, আমার জীবনের আর কোন সাধ বাকী নাই, সকল সাধ পূর্ণ হইয়াছে, এখন কেবল প্রতিভার জন্য চিন্তা, তাহাকে দর্শন করাই একমাত্র সাধ; বার্দ্ধক্যে এই সাধটি কেন অপূর্ণ থাকে? প্রতিভা আমার বড় আদরের কত অভিমান করিয়া, আমাকে নিষ্ঠুর জ্ঞান করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাই, তাহার সন্ধান করি। আমি নিজের দোষেই প্রতিভাকে হারাইয়াছি, আবার নিজেই অনুসন্ধান করিয়া দেখি, যদি তাহাকে বাটিতে ফিরাইয়া আনিতে পারি।

রামরঞ্জন বিদায় হইলেন। পিতাও একে একে সকলের নিকট বিদায় লইয়া একাকী অশ্রুশিক্ত নয়নে বাটী হইতে বাহির হইলেন। পাঠক মহাশয় জানিয়া রাখিবেন, জমীদারমহাশয়ের নাম বিশ্বরঞ্জন রায়।

বায়ুর গতি ফিরিতে বিলম্ব হয়, কিন্তু মানুষের মনের গতি ফিরিতে বিলম্ব হয় না। নিমিষে নিমিষে মনের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বিশ্বরঞ্জনের মন মুহূর্ত্তের মধ্যে ফিরিল যিনি প্রতিভাকে বিষ নয়নে দেখিতেন, সেই লোক প্রতিভা অন্বেষণে উন্মত্ত হইয়া বাহির হইলেন, পদব্রজে অনেক গ্রাম পর্য্যটন করিয়া, অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের জন্য একটা জনহীন প্রান্তরে বসিয়া পড়িলেন; কোন পথে গেলে লোকের সঙ্গে দেখা হইবে, প্রতিভার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন।

খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া জমীদার আবার নবউৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন, চলিতে চলিতে একটী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। রাত্রি তখন প্রায় চারি দণ্ড।

গ্রামখানি ক্ষুদ্র, ইতর লোক ব্যতীত সেখানে ভদ্রলোকের বাস নাই। জমিদার একজন গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া রাত্রে অবস্থিতির সম্মতি চাহিলেন; গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা?

জমীদার কহিলেন, "ব্রাহ্মণ। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি যদি একটু আশ্রয় প্রদান করেন, তাহা হইলে অদ্য রাত্রে এই স্থানেই অবস্থান করি। আহারাদির প্রয়োজন নাই।"

গৃহস্থ কহিল, "ব্রাহ্মণ? প্রণাম। আপনি থাকিবেন, তাহাতে আর আপত্তি কি? তবে আমরা চাষা লোক, জাতিতে ধীবর, ভদ্রলোকের উপযুক্ত বিছানা নাই, আমাদের বিছানাতে শুতে হবে। আর ব্রাহ্মণ আপনি অনাহারে কেমন করিয়া থাকিবেন? তাহা হইবে না, গরীবের যা কিছু আছে, তাহাই আপনাকে খেতে হবে। অনেক ভাগ্যফলে ব্রাহ্মণের পদধুলি বাড়ীতে পড়ে; আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে।"

গৃহস্থকে যত্নবান দেখিয়া জমীদার কহিলেন, "তোমার ব্যবহারে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম। আহারে প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু তোমার আকিঞ্চনে অবশ্য কিছু ভোজন করিব। যাও আয়োজন কর।"

গৃহস্থের নাম কৃষ্ণদাস, তাহার দুই পুত্র তিন কন্যা। পরিচয় লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া জমীদার আবার বলিলেন, অতি সজ্জন তুমি, সুখে থাক, পুত্র কন্যাগুলি শতায়ু হউক। তোমার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হউক।

আশীর্ব্বাদ শুনিয়া কৃষ্ণদাসের আর আনন্দে ধরে না। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ফলিবেই ফলিবে, এই তাহার বিশ্বাস। কৃষ্ণদাসের মত ব্রাহ্মণভক্ত এখন আর ইতর লোকদিগের মধ্যে অধিক দেখা যায় না। কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণের রন্ধনের আয়োজন করিয়া ডাকিতে আসিল, ব্রাহ্মণ রন্ধন করিতে গেলেন, রন্ধন করিয়া আহার করিলেন, আহারান্তে গল্প আরম্ভ হইল।

গল্পের মধ্যে দুঃখের কথাই অধিক। জমীদারের কর্ণে কৃষ্ণদাসের দুঃখের কথা স্থান পাইল না, যে চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত, সে চিন্তার নিকট অন্য কোন কথাই ভাল লাগে না; প্রতিভাকে চিন্তা করিতে করিতে সামান্য শয্যায় শয়ন করিয়া তিনি নিদ্রিত হইলেন। কৃষ্ণদাস ও নিজ শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বারে অর্গল বন্ধ করিল।

প্রভাত হইল, প্রভাতী পাখীরা গান করিতে করিতে উড়িয়া গেল। কৃষ্ণদাস সুদীর্ঘ হাই তুলিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে নানা কার্যে ব্যাপৃত হইল।

কৃষ্ণদাসের নিকট বিদায় লইয়া জমীদার মহাশয়, পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন, এক এক দিন এক এক স্থানে বিশ্রাম, যেখানে সময় মত উপস্থিত হন, সেইখানেই আহার। এক এক দিন আহারও জুটিয়া উঠে না। ক্রমাগত হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁহার স্থূল শরীর শীর্ণ হইয়া আসিল। কোন স্থানে তিনি প্রতিভার কোন সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে বৈদ্যনাথতীর্থে উপস্থিত হইয়া প্রতিভার উদ্ধার কামনায় তিনি একাগ্রমনে বাবার কাছে হত্যা দিলেন, অনাহারে অনিদ্রায় তিনদিন তিনরাত্রি কাটিয়া গেল, কোনও স্বপ্নাদেশ হইল না। তবুও তাঁহার মন বিচলিত হইল না। তিনি সমভাবে অটল রহিলেন। মৃত্যুপণ করিয়া তিনি বাবা বৈদ্যনাথের শান্তি মন্দিরে পড়িয়া রহিলেন। চক্ষে নিদ্রা নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নিঃস্বার্থ প্রেম।

গিরিগুহার মধ্যে জাগরিত হইয়া সেই যুবক আপন সঙ্গী বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "সখা, সেই উদ্ধারকারিণী কোথায়? তাহাকে আর একটিবার দেখিবার সাধ হইতেছে। ডাকিয়া দাও, জিজ্ঞাসা করি, এ হতভাগ্যের জীবন রক্ষণে তাহার এত যত্ন কেন? সে আমাকে বাঁচাইয়া ভাল কাজ করে নাই। সে না বাঁচাইলে আমি সুখে মরিতে পারিতাম। একদিন ইন্দুপ্রভা আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, দয়াময়ী নামের মহিমা দেখাইয়াছিল। আমি অন্ধ দেখিতে পাইয়াও চিনিতে পারি নাই। এই উদ্ধারকারিণীও কি সেই উন্মাদিনী ইন্দুপ্রভা? না, তাহা

নহে তাহার এখানে আগমন সম্ভবে না। ইন্দুপ্রভা প্রেমোন্মাদিনী সত্য, কিন্তু সে এরূপ দাগা পাওয়া ভালবাসা পছন্দ করে না। সে বনবিহঙ্গের মধু-কূজন ভালবাসে, লতাপাতার ঝোঁপ ভালবাসে, বনফুলের হাঁসি ভালবাসে, স্বভাবের সৌন্দর্য্য ভালবাসে, নির্জ্জন ভ্রমণ ভালবাসে। নিস্বার্থ প্রেম। বিধাতা তাহাকে জগতে প্রেমের আদর্শরূপে মানবী করিয়া পাঠাইয়াছেন। ইন্দুপ্রভা প্রকৃত দেবী, মানবী নয়। এ সমস্ত কার্য্য মানবীতে সম্ভবপর নয়, কাহার প্রাণের জন্য কে ব্যাকুল? আমার প্রাণ যাইলে কাহার মন্দ হয়, থাকিলে কোন হিতৈষী সুখ বোধ করে? প্রতিভা! না, সে বাঁচিয়া নাই, থাকিলে এই এতদিন আমি প্রতিভা প্রতিভা করিয়া পথে পথে বেড়াইতেছি, অবশ্য প্রতিভার কোন সন্ধান পাইতাম। না, প্রতিভা বাঁচিয়া নাই। সখা! এ জীবনে আর প্রয়োজন নাই। আমি আর কিছুই চাহি না, তোমার সঙ্গেও থাকিব না। দেখিব, সে উপকারিণী এবার কেমন করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করে? আমি মরিব, সে আমাকে মরিতেও দিবে না; সখা সে উপকারিণী কে অন্বেষণ করিয়া দেখ, যদি তাহাকে আনিতে পার, সাধ্যমত চেষ্টা কর। দেখা পাইলে, একটিবার তাহার মনোভাব জিজ্ঞাস করিয়া অদ্যই আমি আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিব। যে জীবনে এত জ্বালা, ক্ষণকালের জন্য যে জীবনে সুখ নাই, চিন্তাবিষে অহরহ যে জীবন জর্জ্জরিত হইতেছে, জুড়াইবার স্থান নাই, সে জীবনধারণে প্রয়োজন কি? দেখি, এবার কে বাদী হয়? কে আমার তাপিত হৃদয় জুড়াইতে না দেয়?"

এই বলিয়া যুবা অনেকক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিল, বোধ হইতে লাগিল, কোন গুরুচিন্তা। যুবকের বদন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিতেছে, চক্ষে যেন উন্মাদ চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে।

বালক এতক্ষণ নতমস্তকে মৌন ছিল, সে সময় কি ভাবিয়া বদন উত্তোলন করিয়া যুবককে কহিতে লাগিল, "সখা! সে রমণী চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিবার জন্য আমি কত বিনয় করিয়া বলিলাম, কিছুতেই থাকিল না; যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছে "প্রয়োজন হইলেই আমার দেখা পাইবে।"

বালকের কথা শুনিয়া যুবক পুনরায় কহিল, "প্রয়োজন হইলেই দেখা পাব?" না, আর প্রয়োজন নাই। আমি নিশ্চয়ই এবার মরিব, কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সখা! দুঃখিত হইও না; তুমি আমাকে বড় ভালবাস আমার মৃত্যুতে —"

এবার বালক যেন বালকের মত রোদন করিয়া উঠিল, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিল, "তোমার প্রাণ তাই, তুমি মারিবে; আমি কিন্তু কখন মরিতে দিব না। তোমার প্রাণ এখন তোমার নয়, ও প্রাণ এখন অপরের; তুমি প্রাণ হারাইলে আর একজনের প্রাণে কষ্ট হইবে। প্রতিভার ভালবাসা তোমার পক্ষে কাল স্বরূপ, প্রতিভা মরুক, তোমার প্রাণ রক্ষা হউক। আমি চলিলাম, প্রতিভার দেখা পাইলে যদি তোমার প্রাণরক্ষা হয়, খুঁজিয়া খুঁজিয়া যেখানে পাই, তাহাকে লইয়া আসিব। ভালবাসা! তোমাদের ভালবাসা জন্মিয়াছে, কিন্তু সখা, তোমাদের উভয়ের ভালবাসা কি এক সমান? প্রতিভা যেমন তোমাকে ভালবাসে, প্রতিভাকে পাইলে তুমি কি তাহাকে সেইরূপ ভালবাসিতে পারিবে? আমার বোধ হয়, পারিবে না। তোমার ধৈর্য্য নাই। ধৈর্য্যের ফল অতি মধুর। এখনও আশা, বোধ হয় প্রতিভাকে ধরিতে পারিব। দুদিন তুমি ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাক, প্রতিভার অন্বেষণে আমি চলিলাম। যেখানে পাই সন্ধান করিয়া বাহির করিব।

যুবক মনস্থির করিয়া বালকের কথাগুলি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় যাইবে? মুহূর্ত্তকাল তোমার বিচ্ছেদ আমি সহ্য করিতে পারিব না। তোমাকে না দেখিয়া কতদিন আমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিব? তাহা হইবে না তোমাকে আমি যাইতে দিব না। প্রতিভাকে হারাইয়াছি, এখন কি আবার তোমাকেও হারাইব?"

বালক কহিল, "বড়ই বিভ্রাট! তুমি আমাকে ছাড়িয়া দিবে না? প্রতিভা অন্বেষণে যাইতে দিবে না? আচ্ছা, আমি যাইব না; দিবারাত্রি তোমার কাছেই বসিয়া থাকিব। আমাকে বসাইয়া রাখিয়া তুমি কি করিবে? পাগলের মত সর্ব্বক্ষণ কেবল প্রতিভা প্রতিভা বলিয়া কাঁদিবে আর নিশ্বাস ফেলিবে, আমাকেও স্থির হইতে দিবে না, তাহা আমি সহিতে পারিব না। পাষাণে বুক বাঁধিতে পারিবে? তাহা যদি পার, ধৈর্য্যকে যদি আলিঙ্গন করিতে পার, তবে আমি থাকি। তাহা যদি না পার, তবে অনুমতি দাও, প্রতিভার অন্বেষণে আমি চলিয়া যাই। প্রতিভা সম্মিলন যদি তোমার ভাগ্যে থাকে, অবশ্যই ঘটিবে, অবশ্য আমি প্রতিভাকে খুঁজিয়া আনিতে পারিব; ভাগ্যে যদি না থাকে, প্রতিভা মিলিবে না। আমার আশা হইতেছে, প্রতিভাকে আমি আনিতে পারিব, সেই আশাতেই অন্বেষণে যাইতে চাই।

যুবক এইবার আর কোন আপত্তি করিল না ; সম্মত হইয়া বলিল, "মন তো তোমায় ছাড়িয়া দিতে চায় না, তবে তুমি বলিতেছ, তাহাকে মিলাইতে পারিবে, সেই আশাতেই ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিব। যাও শীঘ্র বিলম্ব করিও না, বিলম্ব হইলে আমি ধৈর্য্যহারা হইব। শীঘ্র ফিরিয়া আসিও।"

"দুই দিনের অধিক বিলম্ব হইবে না," বলিয়া বালক প্রস্থান করিল।

যত চিন্তা আছে, তন্মধ্যে প্রেমচিন্তাই ভীষণ। প্রেমের চিন্তায় মানুষ পাগল হইয়া যায়। প্রেমের খেলায় মানুষ আত্মহারা হইয়া কিম্ভূত কিমাকার জন্তু হইয়া পড়ে।

বালকের প্রস্থানের অব্যবহিত পর হইতেই যুবক উত্তরোত্তর কেমন অস্থির হইয়া পড়িল। বেলা এক প্রহরের সময় বালক চলিয়া গিয়াছে, এখন বেলা তৃতীয় প্রহর। যুবক এতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রস্তরাসনে বসিয়া আছে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছে, বাহ্যজ্ঞান শূন্য। এখন কেবল তাহার সেই নূতন চিন্তা। সখা কোথায় গেল ? সখা আমার কে ? সে আমার জন্য কেন এত করে ? তাহাকে দেখিলে কেন আমি সুখসাগরে ভাসি ? তাহাকে দেখিলে ক্ষণে ক্ষণে আমি প্রতিভাকেও ভুলিয়া থাকি ? সে পুরুষ, বিশেষতঃ বালক, সে আমার চক্ষে এত প্রিয়দর্শন কেন ? কতদিন হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। আমিই যেন প্রতিভার প্রেমে উন্মাদ হইয়া দেশত্যাগী হইয়াছি, নির্জ্জন গিরিগুহায় বাস করিতেছি, সখা বালক প্রেম তত্ত্বের কিছুই জানে না, সে তবে কিসের জন্য উদাসী ? কি জন্যই বা আমার সঙ্গ ছাড়ে না ? একবার তাহাকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব। সে কি জন্য এই অল্প বয়সে পিতামাতার স্নেহ মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছে ? এ কি ! প্রতিভা প্রতিভা বলিতে বলিতে মুখে কেন আজ সখা সখা বাহির হইতেছে ! আমি সখাকে এত ভাল বাসিয়াছি, ইহার কারণ কি ? তবে কি সখা আমার প্রতিভা অপেক্ষা বড় ? হাঁ, ঠিক তাই। সখা আমার প্রতিভা অপেক্ষা বড়। তবে কেন প্রতিভা প্রতিভা বলিয়া উন্মাদ হই ? কেনই বা আত্মকর্ম বিস্মৃত হই। এক একবার মনে করি ভালবাসা ভুলিব, কিন্তু পারি কৈ ? আশা আমায় সব ভুলাইয়া দেয়। প্রতিভা যদি না পাইব, তবে আশা কেন অমন কথা বলে ? প্রতিভা স্বর্গরাজ্যের, প্রতিভার ভালবাসা স্বর্গীয় ভালবাসা। প্রেমময়ী প্রতিভাকে ভাবিবার সময়ে জগত-সংসার মনে থাকে না। তাই বলিতেছি, প্রতিভা স্বর্গকন্যা প্রতিভার প্রেম স্বর্গীয়প্রেম ! সে প্রেম আমি ভুলিতে

পারিব না। যতই চেষ্টাকরি ততই চিত্ত চঞ্চল হয়; বেশ বুঝিতে পারি, প্রতিভাকে ভুলিতে পারিব। প্রতিভার প্রেম আমাকে ভুলিতে দেয় না। কেন আমি এমন স্বপ্ন দেখি? কেন আমি দুরাশার দাসত্ব করি? ঈশ্বর প্রতিভাকে আমার করেন নাই, সে পরের আমি অজ্ঞান তাই সে লীলা বুঝিতে পারি না। কেন তাহাকে, পাইব? সখাই বা তাহার অনুসন্ধানে কেন গেল? আমার মন এখন বেশ দুকথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। আমি ভাবিয়া দেখি, অন্যদিকে মন ফিরাইতে পারি কি না?

যুবকের মন একটু অন্যদিকে গেল। অন্যমন কতক্ষণ? দুইদণ্ড যাইতে না যাইতেই যে সেই প্রতিভাচিন্তা।

যুবক আবার ভাবিল, আচ্ছা, এত ভাবিতেছি, তাহার জন্য দিবানিশি কাঁদিয়া মরিতেছি, সে আমার জন্য ভাবে না? এখন আমাতে আর আমি নাই, তবু কেন প্রতিভার দয়া হয় না? প্রতিভা কি আমার নয়? কেন? কি জন্য সে আমার হইবে না? আহা সেই মুখখানি কেমন করিয়া ভুলিব? কেনই বা ভুলিব? মন বলে, আশা বলে, তোমার প্রতিভা তোমারই হইবে। তবে কেন আমি প্রতিভাকে ভুলিব? প্রতিভা আমার কত ভালবাসার প্রতিভা! প্রতিভা! তোমাকে কি পাইব না?

যুবার বোধশক্তি নাই। এ যুবা প্রেমের হাতের খেলার পুতুল! প্রেমের ভাবে অজ্ঞান, অজ্ঞানের কথা শুনিয়া কোন ফল নাই। পাঠক! চল, আর কোথায় কি হইয়াছে দেখা যাউক। ক্রমশঃ

সাবিত্রী।

লেখক শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ গুপ্ত।

শমনকে সন্তুষ্ট দেখিয়া সাবিত্রী বলিলেন, আমার পিতা অপুত্রক তাঁহাকে পুত্রলাভের বর দিন।

সাবিত্রী কহিল যদি হইলে কৃপাবান্।
অপুত্রক আছে পিতা দেহ পুত্রদান॥
কাঃ দাঃ মহাভারতের বন পর্ব্ব।

সাবিত্রীর প্রথম বর প্রার্থনা বেদব্যাস প্রণীত সংস্কৃতমহাভারতের ৺রাজকৃষ্ণ রায় দ্বারা অনুবাদিত মহাভারতে এইরূপ,—

শ্বশুর নয়নহারা, হ'য়ে হৈল রাজ্যহারা,
আছেন কাননে কষ্ট সয়ে।
পেয়ে পুন সুনয়ন, থাকুন প্রফুল্লমন,
অগ্নিসম তেজশালী হয়ে॥

যমরাজ বলিলেন তাহাই হইবে। তুমি আশ্রমে চলিয়া যাও বৃথা কেন আমার সঙ্গে আসিয়া কষ্ট পাইবে।

সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন।
তব সঙ্গ ছাড়িতে তিলেক নাহি মন॥
সন্তের সঙ্গতি যেন কাশীর নিবাস।
আমাকে করিতে চাহ ইহাতে নিরাশ॥
পূর্ব্ব পিতৃপুণ্যফলে নিজ ভাগ্যবশে।
তোমা হেন গুণনিধি পাই অনায়াসে॥
ইহা হৈতে কর্ম্মবন্ধ না হইল ক্ষয়।
জানিনু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয়॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতি॥
পুনঃ পুনঃ আনন্দ জন্মাহ মম মনে।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবনে॥

বেদব্যাস প্রণীত ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদিত মহাভারতে সাবিত্রীর উক্তি,—

শ্রান্ত হবে অতিশয়, শুনিয়া সাবিত্রী কয়
স্বামী পাশে থাকি যতক্ষণ।
শ্রান্তি কভু নাহি হয়, হেরি সব শান্তিময়,
স্বামী মোর সন্তাপ নাশন॥
স্বামীই আমার গতি, অবলার গতি পতি,
এই সার শাস্ত্রের বচন।
যথা স্বামী লয়ে যাবে, আমিও এমনি ভাবে,
সঙ্গে সঙ্গে করিব গমন॥
বিশেষ তোমার সনে, নানা কথা আলাপনে,
শ্রম মোর কিছুমাত্র নাই।
সাধুসঙ্গ একারণে, শ্রেষ্ঠ বলে বুধগণে,
সাধু সঙ্গে শুভ ফল পাই॥
যম বলে সুভাষিণি, শুনিয়া তোমার বাণী,
বড় সুখ পাইনু হৃদয়ে।
লয়ে বর একারণে সত্যবান প্রাণ বিনে,
ফিরে যাও আপন আলয়ে॥

সাবিত্রীর দ্বিতীয় বর প্রার্থনা,—

সাবিত্রী কহিল যদি কৃপা হৈল মোরে।
শ্বশুর আছেন অন্ধ চক্ষু দেহ তারে॥

শমন কহেন চক্ষু হইবে তাহার ।
রজনী অধিক হয় যাহ নিজাগার ॥
কাঃ দাঃ মহাভারত ।

শুনি সাবিত্রীর বাণী,　　সাবিত্রী রমণী মণি,
বলিলেন যদি কৃপা করি ।
বর দিবে অধিনীরে,　　হৃতরাজ্য পান ফিরে,
শ্বশুর, এ নিবেদন করি ॥
যম বলে সুনিশ্চয়,　　করিয়া ধর্ম্ম আশ্রয়,
রাজ্যলাভ হইবে তাঁহার ॥
ফিরে যাও ফিরে যাই,　　আপন আপন ঠাঁই,
নহে প্রাপ্তি হইবে তোমার ॥
রা, কৃ, রা মহাভারত ।

সাবিত্রী ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তিনি যমকে সহজে ছাড়িবেন না, যম সত্যবানের সূক্ষ্মদেহ লইয়া গমনোদ্যত, সাবিত্রী তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তিনী,—

রাজার নন্দিনী কহে সব জান তুমি ।
সংসার বাসনা কভু নাহি করি আমি ॥
না চাই তনয় বন্ধু নাহি চাই পতি ।
[illegible] সতত ধর্ম্মেতে রহে মতি ॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে কহে দণ্ডপাণি ।
পরম সুশীলা তুমি রাজার নন্দিনী ॥
তব বাক্যে সানন্দ হইল মম মন ।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবন ॥
সাবিত্রী কহিল আর না করিব লোভ ।
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু পাছে হয় ক্ষোভ ॥
সেই কারণে বর নিতে ভয় বাসি মনে ।
শুনিয়া কৌতুকে যম কহে সেই ক্ষণে ॥
সত্যবান জীবন ছাড়িয়া অন্য বর ।
যাহা ইচ্ছা মাগ তুমি আমার গোচর ॥
কাঃ রাঃ মহাভারত ।

বলিলা সাবিত্রী তবে,　　এই সুবিশাল ভবে,
তোমার নিয়মে প্রজাগণ ।
নিজ নিজ কর্ম্মফলে,　　আপন নিয়তি বলে,
নিরন্তর হতেছে শাসন ॥

তোমারি নিয়মফলে সবার কামনা ফলে;
সমস্ত সুখ্যাত তব তাই।
আগ্রহে সবার প্রতি, অনুগ্রহ দানে মতি,
সম সনাতন ধর্ম্ম আর নাই॥
এ বিশাল বিশ্ব মাঝে, যত যত জীব রাজে,
মানবেই ভকতির ঠাই॥
এ বিশ্বে সজ্জনগণ, অরি প্রতি প্রীত মন,
দয়া সম ধর্ম্ম আর নাই॥
যম বলে শুন সতি, সলিল পিপাসু প্রতি,
যেন তব মধুর বচন।
এই হেতু বলি আমি, পুন বর মাগ তুমি,
বিনা সত্যবানের জীবন॥

সাবিত্রীর তৃতীয় বর এই,—

সাবিত্রী কহিল বর মাগি যে শমন।
রাজ্যহীন আছে রাজা দেহ রাজ্যধন॥
যম বলে শুন রাজ্য পাবে নৃপবর।
বিলম্বে নাহিক কার্য্য যাহ নিজ ঘর॥
কাঃ রাঃ দাঃ মহাভারত।

সাবিত্রী বলিল তায়, শুন ধর্ম্ম মহাশয়,
পিতার সন্তান আদি নাই।
শত পুত্র বংশধর, হোক সবে ধর্ম্মপর.
এই বর তব স্থানে চাই॥
যম বলে হোক তাই, যাও শুভে নিজ ঠাঁই,
এবে আমি করিনু প্রস্থান।
যম অতি ভয় ময়, আর ত যাওয়া ভাল নয়,
আসিয়াছ বহু দূর স্থান॥

তথাপি ও সতী সন্তুষ্টা নহেন, যতক্ষণ মৃতপতির জীবনলাভ হইয়াছে, ততক্ষণ তিনি নিরস্তা নহেন, যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। পথে যাইতে যাইতে,—

সাবিত্রী কহিল শুন যম নিবেদন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির লিখন॥
মায়াতে মোহিত সব সত্য পথ ত্যজে।
ঘর ঘেরে বিপদ সাগরে মাত্র মজে॥
আমার আমার করি বলে সর্ব্বজন।
মিথ্যা ঘর পরিবারে মজাইয়া মন॥

নারী পুত্র বান্ধব শ্বশুর পিতা মাতা।
অনর্থের হেতু সব মহা দুঃখদাতা॥
এসব পালন হেতু ত্যজি নিজ ধর্ম্ম।
ভরণ পোষণ করে করিয়া কুকর্ম্ম॥
পশ্চাতে অধর্ম্মভাগী হয় সেই জনা।
নিজ অঙ্গে ভোগ করে বিবিধ যন্ত্রণা॥
নয়ন থাকিতে অন্ধপ্রায় যত লোক।
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ যেন তসরের পোক॥
বিধির নির্ব্বন্ধ সেই বৃক্ষপত্র খায়।
যথাকালে আপনার কর্ম্মফল পায়॥
জানিয়া তথাপি তারা থাকে অনায়াসে।
পাছে বিপরীত বুদ্ধি হয় কর্ম্মদোষে॥
সুখেতে থাকিব হেন ভাবিয়া অন্তরে।
নিজ সূত্রে বেষ্টিত হইয়া পাছে মরে॥
সেইমত পৃথিবীতে ছিল যত লোক।
মায়া মোহে মজিয়া পশ্চাতে পায় শোক॥
সংসার অসার প্রভু সার ধর্ম্মপথ।
তাহা বিনা আমার নাহিক মনোরথ॥
ঘর ফেরে বন্ধনে যাইতে কদাচন।
নিশ্চয় জানিহ দেব নাহি মম মন॥
উৎপত্তিতে তপ্ত জীব চিন্তার হুতাশে।
শীতল হউক দেব তোমার পরশে॥
আজ্ঞা কর মুহূর্ত্তেক থাকিব সংহতি।
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি॥
ধন্য তব চরিত্র আমার চমৎকার।
অগোচর নহে মম অখিল সংসার॥
অল্পকালে ধর্ম্মেতে এতেক তব মতি
তোমার তুলনা যোগ্য নাহি দেখি ক্ষিতি॥
পৃথিবীতে তোমার হইল যত যশ।
মধুর বচনে তব হইলাম বশ॥
সত্যবান জীবন ব্যতীত অন্যবর।
যাহা ইচ্ছা মাগি লহ আমার গোচর॥

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদিত মহাভারতে সাবিত্রীর উক্তি,—

বলে সতী দয়াময়, এ দূর ত দূর নয়,
আছি যবে পতির সদনে।
মন মোর অতি দূরে, গেছে সে তোমার পুরে,
আগে আগে পতির কারণে ॥
বিবস্বনে পিতা তব, তাইতে পণ্ডিত সব,
বৈবস্বত বলয়ে তোমায়।
সংসারের প্রজাগণে, শাসহ ধর্ম্মের সনে,
ধর্ম্মরাজ নাম হৈল তায় ॥
সাধুজনগণোপরি, বিশ্বাসে ভকতি ধরি,
যত তত নহি আত্ম প্রতি।
এই হেতু সর্ব্বজন, সাধু প্রতি প্রীত মন,
তাঁহারে বিশ্বাস করে অতি ॥
যম বলে ভদ্রে শুন, সুন্দর বচন হেন,
কারো কাছে কভু শুনি নাই।
হয়েছি পরমপ্রীত, প্রফুল্ল হয়েছে চিত,
পুনরায় বর দিতে চাই ॥
সত্যবান প্রাণ বিনে, যেই বর ইচ্ছা মনে,
প্রার্থনা করহ মোর পাশে।
এই ক্ষণে দিব তাই, কিছুই সন্দেহ নাই,
বল তাহা যাহা মনে আসে ॥

সাবিত্রী চতুর্থ বরে এই প্রার্থনা করিলেন,—

কন্যা বলে এই সত্যবানের ঔরসে।
হইবেক এক পুত্র পঞ্চম বরষে ॥
হেন মতে দাও মোর শতেক নন্দন।
অঙ্গীকার নিজ বাক্যে করহ পালন ॥
কৃতান্ত কহিল ঘরে যাও গুণবতি।
মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি।
এত বলি শীঘ্রগতি চলিল শমন।
সাবিত্রী তাঁহার পাশে করিল গমন ॥
যম বলে কিকারণে আসিতেছ কোথা।
চারি বর দিলাম জঞ্জাল কর বৃথা ॥
সাবিত্রী কহিলা দেব উত্তম কহিলা।
শত পুত্র হইবে আপনি বর দিলা ॥

অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে পারে লঙ্ঘিতে।
আমার হৈবে পুত্র সত্যবান হৈতে॥
ইহার বিধান আগে কর ধর্ম্মরায়।
তোমার সংহতি মম নাহি কোন দায়॥

সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতি।
পরম লজ্জিত হয়ে কহে মৃত্যুপতি॥
এ তিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা।
পবিত্র হইবে লোক শুনি তব কথা।
বিশেষ করিলে ব্রত চতুর্দ্দশী দিনে।
পাইলে এ চারি বর তাহার কারণে॥
দ্বিতীয় তোমার কর্ম্ম কথনে না যায়।
নতুবা শুনেছ কোথা মলে প্রাণ পায়॥

লভ এই পতি তব রাজা সত্যবান।
কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান॥
যেই ব্রত করিলা বসিয়া অহর্নিশি।
লোকে পরে করিবে সাবিত্রী চতুর্দ্দশী॥

\+ + + +

তোমার গুণেতে বশ হইলাম আমি।
যাও শীঘ্র সহিতে লইয়া তব স্বামী॥

কাঃ রাঃ দাঃ মহাভারত।

৺রা জকৃষ্ণ রায় অনুবাদিত মহাভারতে সাবিত্রীর উক্তি,—

সাবিত্রী বলিলা তবে, যদি মোরে বর দিবে,
দেহ বর অনুগ্রহ করি।
প্রসবিব শত সুত, সবে রূপ গুণযুত;
সত্যবান হৈতে গর্ভ ধরি॥
শুনিয়া শমন কয়, হবে তব সুনিশ্চয়,
শত সুত আনন্দ বর্দ্ধন।
যাও ফিরে নিজ ঘরে, আমি যাই নিজ পুরে,
পুন না করিও আগমন॥

× + + ×

সাবিত্রীর স্তুতি পাঠ শ্রবণ করিয়া যমরাজ পঞ্চম বর দিতে প্রস্তুত, তখন সাবিত্রী বলিলেন,—

পুত্র বর দিয়ে মোরে, স্বামী লয়ে যাও ফিরে,
বাক্য তব পুরিবে কেমনে।
এই হেতু নিবেদন, কর কৃপা বিতরণ,
প্রাণেশ্বরে বাঁচাও জীবনে॥
ধর্ম্মরাজ তাহা শুনি, বলিলা তথাস্তু বাণী,
পাশবন্ধ করিলা মোচন।
বলিলেন যাও সতি, এই লও তব পতি,
প্রত্যার্পণ করিনু জীবন॥

ইহাকে একটী পৃথক করিয়া ধরিলে পাঁচটি নতুবা চারিটী বর হয়। ব্যাস প্রণীত মহাভারত এবং কাশীরাম দাস কথিত মহাভারত এতদুভয়ে সাবিত্রীর গৃহীত বর-চতুষ্টয়ে কোন পার্থক্য দেখা যায় না, কিন্তু প্রার্থনার অগ্রপশ্চাৎ হেতু ব্যাসের সাবিত্রী, কাশীরাম দাসের সাবিত্রী অপেক্ষা উচ্চস্থান পাইয়াছেন। ব্যাসের সাবিত্রী প্রথম বরে অন্ধ শ্বশুরের দৃষ্টি প্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়া কত মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন; আর কাশীরাম দাসের সাবিত্রী আধুনিক স্ত্রীলোকের ন্যায় অগ্রেই পিতার পুত্র লাভের বর চাহিয়া কতকটা সংকীর্ণতা দোষে দূষিতা হইয়াছেন। যদি একাধিক বর প্রাপ্ত না ঘটিত, তাহা হইলে কাশীরামের সাবিত্রীচরিত বড়ই সঙ্কুচিত হইত, সন্দেহ নাই। এসম্বন্ধে কাশীরাম দাসকে ততটা দোষ দেওয়া যায় না, যতটা দোষ দিতে হয় তাহার সময়ের স্ত্রীচরিত্রে—ব্যাসদেবের সময় স্ত্রীচরিত্র সাধারণতঃ যতটা উন্নত ছিল, কাশীরাম দাসের আমলে সাধরণতঃ স্ত্রীচরিত্র অনেকটা সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা ক্রমেই পিতৃকুলের অযথা পক্ষপাতিনী হইতে বসিয়াছেন। পিতামাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতি পিতৃকুলের আত্মীয়গণের দোষের কথা শ্রুতিপথে স্থান দিতে নারাজ হইয়াছেন। সেই কাশী দাসের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় শতাধিক বৎসর মধ্যে এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে বিবাহ নিশা অতিবাহিত হইতে না হইতে তাঁহারা স্বামীগৃহে সর্ব্বেসর্ব্বা হইবার অভিলাষিণী, স্বামীর পিতামাতা ভাইভগ্নীদিগকে স্বতন্ত্র ভাবিবার প্রত্যাশা তাঁহাদের বলবৎ হইয়া উঠিয়াছে, স্বামীর উপর তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী শক্তি পরিচালনার ষোল আনা অধিকার আপনারা একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া স্বামীগণও তাহা মানিয়া লইয়া ধন্য হইতেছেন। সুতরাং শ্বশুর-

শ্যালক শ্যালিকাগণের আত্মীয়তার দাবি বাড়িয়া উঠিতেছে অবশ্য সকল সংসারে এরূপ না হউক, অনেক গৃহস্থেরই এই দশা ঘটিতেছে। "নারী বশ্যাঃ মানবাঃ" শাস্ত্রের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতার জন্যই যেন আমাদের সংসারের পুরুষের প্রাধান্য কমিয়া স্ত্রীজাতির প্রাধান্য বাড়িয়া উঠিয়াছে। যাহাই হউক উপস্থিত সময়ে আর অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থতা প্রযুক্ত আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহতা চলিবে না। এখন সকলকেই আপনার আপনার জীবিকার জন্য প্রস্তুত হইতে হইয়াছে।

অতঃপর দেখা যাউক বরলাভ সম্বন্ধে সাবিত্রীর আচরণ কিরূপ। কাশীরাম দাসের সাবিত্রী বিলক্ষণ চতুরা, ছলে বলে কৌশলে মিষ্ট কথায় যমরাজের মনকে নরম করিয়া তিনি ইষ্টসিদ্ধির জন্য সত্যের অপলাপেও কুণ্ঠিতা নহেন. কেননা পতির জীবন ভিক্ষা হৃদয়ে লুকায়িত রাখিয়া অকাতরে বলিয়াছিলেন, "আমি পতি পুত্র বন্ধুবান্ধব কাহাকেও চাহি না, চাহি কেবল ধর্ম্ম।" অন্যত্র বলিয়াছিলেন,— "বিধির বিধান ব্যর্থ হইবার নহে, ভববন্ধনে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করি না, স্বামী মহাশয় যেরূপ কাজ করিয়াছেন, অবশ্যই আহার ফলভোগ করিবেন। পুনঃ পুনঃ আপনার নিকট বর গ্রহণে ভয় করি।" ইত্যাদি কথায় আপনার মনের সংসার বৈরাগ্য ষোল আনা রকমে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আর তাহার মনও যেন চতুরার চাতুর্য্যজালে জড়িত হইয়া ভ্যাবা চ্যাকা হইয়া বোকা বনিয়া গিয়াছেন। যম বার্দ্ধক্য বশতঃ স্থবির জনক জননীর একমাত্র অবলম্বন অন্ধের যষ্টির ন্যায় শিশু বালক কিশোর যুবা পুত্রের বিয়োগ সাধন হেতু যেমন দুষ্ট দুরাচার তাই তাহার সাবিত্রীর ন্যায় স্ত্রীলোক দ্বারা প্রতারিত হওয়াই উপযুক্ত বোধে সাবিত্রী চরিত্রকে কুটিলতা পুর্ণ করিয়াই আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কাশীরাম দাসের চিত্রিত যমচরিত্রের দৌর্ব্বল্য প্রত্যক্ষ করিয়াই দীনবন্ধু বাবু "যমালয়ে জীবন্ত মানুষ" প্রবন্ধে যমকে নিতান্ত বেকুফ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন; সে যাহা হউক বেদব্যাসের সাবিত্রী সর্ব্বত্রই উদার, অকপট যমকে প্রতারিত করিবার জন্য তাঁহার বাকচাতুর্য্য নাই, পতিসেবা, পতিপ্রাণতা নারী জীবনের সার ও শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, গৃহস্থাশ্রমে না থাকিলে তাহার স্ফূর্ত্তি পায় না, এ জন্য তিনি সংসারধর্ম্মপালনে অভিলাষিণী, তাই যমকে সাধু, সচ্চরিত্র, কৃপালু, ধর্ম্মশীল ইত্যাদি বাক্য বারম্বার স্তব স্তুতি করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থিনী হইয়াছেন। যম আহাতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপর্য্যুপরি চারিটী বর দিয়াছেন। ব্যাসবর্ণিত সাবিত্রী ও যম চরিতে ইহাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। কবি তৎসাময়িক সমা-

জের অবস্থা ও লোকচরিত্র চিত্রিত করিয়া থাকেন। ব্যাস ও কাশীরাম দাস এতদুভয় কবিই সমসময়ের সমাজের অবস্থা ও লোক চরিত্র যেরূপ ছিল তাঁহারা তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে দায়ী করা যাইতে পারে না। ফলতঃ কবি আপনার উদ্দেশ্য সাধনার্থ যমকে দয়ালু প্রতিপন্ন করুন বা নির্ব্বোধই সাজাউন যম চিরদিনই যম। যিনি জীবন মরণের ব্যবস্থাপক যদি তাঁহার বিধান ব্যর্থ হওয়া সম্ভব হয়, তাহাহইলে স্ত্রীলোকের নিকট প্রতারিত হইয়াই হউক বা দয়ারবশবর্ত্তিতা প্রযুক্তই হউক মৃত সত্যবানের পুনর্জীবন প্রাপ্তিতে বিচিত্রতা নাই।

সাবিত্রী পতির নিকট প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিলে তিনি নিদ্রোন্মিলিতের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "রাত্রি হইয়াছে এতক্ষণ আমাকে কেন জাগ্রত কর নাই? চারিদিক অন্ধকারময়ী কোনদিকে দৃষ্টি চলে না, এরূপ অবস্থায় কেমন করিয়া পথ চিনিয়া আশ্রমে যাই।"

সাবিত্রী বলিলেন,—"যদি তোমার শ্রান্তি না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে চল কষ্টে সৃষ্টে পথ দেখিয়া এ স্থান হইতে চলিয়া যাই; নতুবা ঐ দেখ অদূরে একটি বৃক্ষ রহিয়াছে তাহা হইতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া এই স্থানেই রাত্রি যাপন করি।"

সত্যবান বলিলেন,—"তাহা হইবে না, আশ্রমে ফলমূল আহার করিয়া বেলা থাকিতে বনে আসিয়াছি, শিরোবেদনায় অস্থির হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, মনে হইল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একজন বিকটাকার মনুষ্য আমাকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, তাহার পর কি হইল কিছুই আমার মনে নাই।"

সাবিত্রী বলিলেন,—"আজি রাত্রিতে সে সকল কথা শুনিয়া কাজ নাই, রাত্রি প্রভাত হইলে কালি শুনাইব।"

সত্যবান আশ্রমে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, আর সাবিত্রীকে বলিলেন, —"দেখ প্রিয়ে আমি বৃদ্ধ পিতামাতাকে আশ্রমে রাখিয়া কখনও কোথাও রাত্রি যাপন করি নাই, তাঁহারা আমার জন্য যে কতদূর ব্যাকুল হইতেছেন, বলিতে পারি না। আর এখানে বিলম্ব করা হইবে না, আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে যতই কষ্ট হউক তাহা সহ্য করিতে হইবে। পিতামাতার প্রবল স্নেহ মন, তাঁহাদের দুঃখকথা স্মরণ করিয়া সত্যবান রোদন করিতে লাগিলেন, সাবিত্রী তাঁহার নয়নজল মুছাইয়া এক হস্তে স্বামীর হাত ধরিলেন ও অপর হস্তে ফলমূলগুলি গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন।

এখানে অন্ধ দ্যুমৎসেন দৃষ্টিলাভ করিয়া পুত্রকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—গিরিগুহা, নদীতট, ঋষিগণের আশ্রম সর্ব্বত্র পত্নীকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন, ঋষি ও ঋষিপত্নিগণ সকলেই আশ্বাস বাক্যে তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না; উভয়ে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। গৌতম ভরদ্বাজ আপস্তক প্রভৃতি ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ বলিলেন,—"সাবিত্রী সত্যবানের কোথাও কোন বিপদ নাই। ঋষিবাক্যে দ্যুমৎসেন অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, মনে ভাবিলেন, ইহার সত্যবাদি ত্রিকালদর্শী ইহারা কেনই বা মিথ্যা বলিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সাবিত্রীর সহিত সত্যবান আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। দ্যুমৎসেন ও তদীয় সহধর্ম্মিণী পুত্র ওবধূকে দেখিয়া মৃতদেহে যেন জীবনলাভ করিলেন। দ্যুমৎসেনের আশ্রমে আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ বহিল।

কাশীরাম দাস পর দিন প্রাতঃকালে সাবিত্রী সহ সত্যবানের আশ্রম প্রত্যাগমন বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে সত্যবানের মনে পিতামাতার ঐকান্তিকতার ক্রটী হয়। সেই নিবিড় অন্ধকারময়ী শ্বাপদ সঙ্কুল নীরব নির্জ্জন অরণ্যপথে পিতৃমাতৃ দুঃখ ভাবিয়া যত কেন কষ্ট হউক না, আশ্রমে প্রত্যাগমন সুপুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে উপেক্ষা করিলে পুত্রের ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। সৎপুত্র এরূপস্থলে ব্যাকুলতা প্রযুক্ত আপনার দুঃখের ভাবনা ভাবিবার অবকাশ করিতে পান না।

ঋষি ও ঋষিপত্নীগণ দ্যুমৎ সেনের আশ্রমে সমবেত হইয়া তাঁহার অন্ধত্ববিমোচন ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য বিবরণ শ্রবণেচ্ছু হইলে সাবিত্রী আপন পরিণয়ের পূর্ব্বে আপনার বৈধব্যের কথা মহর্ষি নারদের মুখে শ্রবণাবধি পূর্ব্বদিবসের যাবতীয় ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করিলে ঋষিগণ সাবিত্রীকে সামান্য স্ত্রীলোক বলিয়া মনে করিলেন না। অতঃপর তাঁহারা তাঁহাকে দেবকন্যার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী পতির ভাবিমৃত্যু খণ্ডাইবার জন্য যে ত্রিরাত্র ব্রত করিয়াছিলেন, তাহা জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে পরিসমাপ্ত হয় বলিয়া অদ্যাপি এদেশের স্ত্রীলোকেরা পতির দীর্ঘজীবন কামনায় ঐদিন ব্রতোপবাস করিয়া থাকেন। সতীর পুণ্যময় ব্রতানুষ্ঠান স্মরণার্থ ঐ চতুর্দ্দশী সাবিত্রীচতুর্দ্দশী নামে খ্যাত।

অতঃপর শমনদত্ত সমস্ত বরই সফল হইল। সাবিত্রীর পিতা রাজা অশ্বপতি শতপুত্র লাভ করিলেন, শ্বশুর রাজাদ্যুমৎসেন হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, তিনি আপনি রূপগুণশালী শত পুত্র প্রসব করিলেন, সত্যবানও সুখ স্বচ্ছন্দ শরীরে চারিশত বর্ষ পরমায়ু ভোগ করিয়া সুখে সুনিয়মে প্রজাপালন করিয়া ছিলেন।

—:•:—

সমালোচনা।

আত্ম রামায়ণ। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্ত বাগীশ বিরচিত, বাশিষ্ঠ মহারামায়ণ যন্ত্রে মুদ্রিত, শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য বার আনা।

প্রাচীন অধ্যাত্ম রামায়ণ যে পদ্ধতিতে বিরচিত, আর্য্যধর্ম্মানুরাগী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন; তদবলম্বনে স্বামী শঙ্করানন্দ হেত্যাতি হিন্দি ভাষায় একখানি রামায়ণ রচনা করেন, তাহার নাম আত্ম রামায়ণ। ভক্ত জনের চিত্তরঞ্জন ও ঈশ্বর উপাসনার প্রণালী সাধন উদ্দেশে শ্রীযুক্ত বেদান্ত বাগীশ মহাশয় ঐ দুই গ্রন্থের আদর্শে এই আত্মরামায়ণ সম্পাদন করিয়াছেন। বেদান্ত বাগীশের বাক্য প্রমাণে ইহা একখানি বেদান্ত। যাহাতে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ থাকে, তাহাই বেদান্ত নামে বাচ্য। উপনিষদের গর্ভে ব্রহ্মজ্ঞানকে দেবরাজ ইন্দ্র ও অজ্ঞানকে অসুর বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; অলঙ্কার শাস্ত্র প্রমাণে উ হা রূপক; রামায়ণে বিশুদ্ধ জ্ঞানকে দশরথ আত্মজ রামচন্দ্র ও জ্ঞান মূলক সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে লক্ষ্মণ ও ভরতশত্রুগণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, অধ্যাত্ম রামায়ণে ইহাও রূপক। ইতিহাসের সারকে রূপকৃত করিলে মূল ইতিহাসের বর্ণনার সত্যতা অস্বীকৃত হয় না, অধ্যাত্ম রামায়ণে ও আত্মরামায়ণে বাল্মীকি রামায়ণের মর্য্যাদা নষ্ট হয় নাই, বিশেষ বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বেদান্তবিৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্ত বাগীশ মহাশয় তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসুপাঠক মহাশয়েরা এই আত্মরামায়ণ পাঠে বিস্তর সদ্-উপদেশ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। রূপকৃত হইলেও আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি বুঝিতে পাঠকবর্গের কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। পণ্ডিতবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় আমাদের সাহিত্য-সমাজে বহু দিবসাবধি সুপরিচিত; তাঁহার অবলম্বিত বঙ্গভাষা সর্ব্বাংশে সুমার্জ্জিত, প্রাঞ্জল ও সুললিত, তিনি অতি বিষদ রূপে এই আত্মরামায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে পরিচয় প্রদান করাই বাহুল্য এই আত্মরামায়ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আদর্শ, বেদান্তবাগীশের গৌরব রক্ষার্থ এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। বাবু নন্দলাল পাল মহাশয়ের অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে এই আত্মরামায়ণ পাঠ করিবেন, তাঁহারা আমাদের এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

—:o:—



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৬শ বর্ষ। | ১৩১৫ সাল, চৈত্র। | ১২শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুচৈতন্য দেব।

দশম অধ্যায়।

পরদিন প্রভাতে গৌরাঙ্গদেব পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাটীতে গমন করিলেন। তাঁহার উপস্থিতির অগ্রে মুরারিগুপ্ত, শ্রীমান্ পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত ও সদাশিবকবিরাজ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ সেখানে গয়াধামের কাহিনী কীর্ত্তন করিতে করিতে কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ভূমিতে গড়া গড়ি দিয়া ছিলেন, বাহু তুলিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, ভাবাবেশে তিনি একবার মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

গৌরাঙ্গের ভাব দেখিয়া ভক্তগণের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সেইদিন প্রভাতেই তাঁহার কৃষ্ণভক্তির কথা নবদ্বীপের পল্লী তে পল্লীতে প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে পুষ্প চয়ন করিতে গিয়া শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীবাসকে বলিয়াছিলেন, "আমাদের নিমাইচাঁদ গয়া হইতে শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত হইয়া আসিয়াছেন, নিমাই চাঁদের তুল্য বৈষ্ণব নবদ্বীপে নয়ন গোচর হয় না।"

বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপে বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। শ্রীবাস পণ্ডিত কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের চূড়ামণি ছিলেন। নিমাইচাঁদ বৈষ্ণব হইয়া আসিয়াছেন, এই সুসংবাদশ্রবণে তাঁহার মহানন্দ হইয়াছিল, "কৃষ্ণবিদ্বেষী মহাশয়গুলিকে এইবার আমরা দেখিয়া লইব।"

মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই পণ্ডিতের টোল ছিল, তীর্থ হইতে প্রত্যাগমনের—তৃতীয় দিবসে ছাত্রগণ সেই টোলে উপস্থিত হইলেন, নিমাই পণ্ডিত যতদিন নবদ্বীপে ছিলেন না; ততদিন তাঁহাদের অধ্যয়ন বন্ধ ছিল, অনেক দিনের পর অধ্যাপক আসিয়াছেন, সুতরাং ছাত্রগণের অধ্যয়ন স্পৃহা নূতন বলবতী।

নিমাই পণ্ডিত টোলে উপস্থিত হইয়া অধ্যাপনার দিকে চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, ভাবাবেশে কখন ক্রন্দন কখন নৃত্য কখন গড়াগড়ি। ছাত্রেরা সে ভাব দেখিয়া তুষ্ট হইলেন না, কৃষ্ণপ্রেম তাহাদিগকে ভাল লাগে না, তাহারা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে গিয়া অধ্যাপকের নামে অভিযোগ করিলেন, গঙ্গাদাসপণ্ডিত নিমাই পণ্ডিতের বাল্যগুরু তাঁহার নিকটেই নিমাইয়ের ব্যাকরণশিক্ষা। গঙ্গাদাস পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞানে পণ্ডিত ছিলেন, লৌকিক ব্যবহারে তাঁহার প্রকৃতিতে নাস্তিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইত। ছাত্রগণের অভিযোগশ্রবণে গৌরাঙ্গদেবকে আহ্বান করিয়া অনেক বুঝাইয়া তিনি বলিলেন, "বৎস! শুনিলাম তুমি কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হইয়াছ, অধ্যাপনায় মন দাওনা, তোমার ছাত্রেরা তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছে, কৃষ্ণনাম করিয়া কি ফল? শাস্ত্র অধ্যায়ন করাই মনুষ্য-জন্মের প্রথম সাধন, অতএব তুমি পূর্ব্ববৎ অধ্যাপন কার্য্যে মনোযোগ প্রদান কর।"

তাহাই করিব, বলিয়া গুরুদেবের চরণ বন্দন পূর্ব্বক গৌরহরি চতুষ্পাঠিতে আগমন করিলেন, কিন্তু গুরুর উপদেশ পালন করিতে পারিলেন না. তিনি যেন দশদিক্ কৃষ্ণময় দর্শন করিতে লাগিলেন; কৃষ্ণপ্রেমে ঘন ঘন নয়নযুগলে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে অচৈতন্য, ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্যলাভ, ক্ষণে ক্ষণে হরিনামকীর্ত্তনে চিত্ত বিভোর।

ক্রমাগতই এইভাব; হরিপ্রেমে গৌরহরি এত উন্মত্ত যে, স্নান, আহারও মনে থাকে না। এই ভাব দেখিয়া অতত্ত্বদর্শী অজ্ঞলোকেরা কাণা কাণি করিতে লাগিল,—সত্য সত্যই নিমাই পণ্ডিত পাগল হইয়া গিয়াছে।

দিন যায়; চৈতন্যদেব প্রতিদিন টোলে উপস্থিত হন, কিন্তু পাঠ দিতে পারেন না। ছাত্রগণ হরি হরি বলিয়া গ্রন্থ উন্মোচন করেন, হরি ধ্বনি শুনিয়া চৈতন্যের অঙ্গ পুলকিত হয়, তিনি তখন পরমার্থ কথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

ছাত্রেরা পণ্ডিতের মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হন, যিনি ভক্ত, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির তরঙ্গ খেলে, যিনি কাব্যানুরক্ত, তাঁহার হৃদয়ে কাব্য-রসের লহরী ক্রীড়া করে, যিনি প্রেমিক, তাঁহার হৃদয়ে প্রেম তরঙ্গের ক্রীড়া হয়, পরমার্থ কথায় অধিকাংশ ছাত্রের হৃদয় গলিল, কেবল কতিপয় বিদেশী ছাত্র অসন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহারা বলিলেন, বিদ্যাশিক্ষার অভিলাষে আমরা দূর দেশ হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছি. কৃষ্ণকথা শুনিতে আসি নাই। পণ্ডিত বলেন, কৃষ্ণভক্তিলাভ করাই ইহসংসারের পরম পুরুষার্থ।

দিন দিন নিমাই পণ্ডিত শিষ্যগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণ প্রেমে মাতাইয়া তুলিলেন। সকলে মিলিয়া একসঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করেন, ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন করেন।

নিমাই যখন গৃহে থাকেন, তখনও সেইভাব! তখনও কৃষ্ণ কৃষ্ণ রব, তখনও ক্রন্দন, ভাবাবেশে তখনও মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত।

শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত, নবদ্বীপে কৃষ্ণভক্ত অধিক ছিল না, অনেকেই কৃষ্ণনামে বিদ্রূপ করিত, অনেকে কৃষ্ণবিদ্বেষী ছিল, শ্রীবাস পণ্ডিত তাহাতে অন্তরে বড় বেদনা পাইতেন।

যে দিন তিনি শ্রীমান্ পণ্ডিতের মুখে শ্রবণ করেন, গয়াধাম হইতে আসিয়া নিমাই পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন, সেইদিন তাঁহার পরমানন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠে। তিনি বলিয়াছিলেন, "নবদ্বীপের সৌভাগ্য; এইবার আমি কৃষ্ণদ্বেষী মহাশয়গণকে দেখিব।"

সেইদিন অবধি শ্রীবাসের মনে মনে ইচ্ছা হইয়াছিল যে, পরমভক্ত চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। এই সময় চৈতন্য দেবের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণকীর্ত্তন, ও সর্ব্বক্ষণ রোদন দর্শন করিয়া প্রতিবেশীরা কেহ কেহ শচীদেবীকে বলিতে লাগিল,—"তোমার নিমাই পাগল হইয়াছে।" শচীদেবী সেই কথা শ্রবণ করিয়া যেন বিবশা উন্মাদিনীর ন্যায় শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "লোকে বলিতেছে, আমার নিমাইচাঁদের বায়ুরোগ হইয়াছে। তুমি যদি একবার গিয়া আমার নিমাইকে দেখিয়া আইস, তাহা হইলে আমার আশঙ্কা দূর হয়। নিমাই সর্ব্বদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন করে, ভূমিতলে গড়াগড়ি যায়, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা হয়। দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছি।" এই সকল কথা বলিয়া শচীদেবী কাঁদিতে লাগিলেন।

এতদিন পরে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাসনা পূর্ণ হইল; কৃষ্ণভক্ত নিমাইকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। প্রবোধ-বাক্যে বুঝাইয়া শচীদেবীকে গৃহে পাঠাইয়া তিনি উপযুক্ত অবসরে নিমাই পণ্ডিতকে দেখিতে গেলেন; দেখিলেন, নিমাই তখন করজোড়ে তুলসী বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিতেছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতকে দর্শন করিবামাত্র চৈতন্যদেব অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। সেই অচেতন মূর্ত্তি দর্শনে শ্রীবাসের প্রেমসিন্ধু উথলিল; চৈতন্যচন্দ্রের চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন, "আহা! কি সুন্দর বদনমণ্ডল! এমন বদন কি মনুষ্যে সম্ভবে? নিশ্চিতই এ বস্তুতে ভগবানের কৃপা আছে।"

চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া চৈতন্যদেব গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রেমগদগদচিত্তে শ্রীবাসের চরণধূলি লইয়া প্রগাঢ় প্রেমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; সাশ্রুনয়নে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "গোঁসাই! আপনার চরণদর্শনে আমি চরিতার্থ হইলাম। ভবার্ণবে পতিত হইয়া আমি কূল প্রাপ্ত হইতেছি না, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।"

বিস্ময়ান্বিত হইয়া শ্রীবাস বলিলেন, "পণ্ডিত! তুমি পরম বস্তু লাভ করিয়াছ। তোমার জননীর মুখে শুনিলাম, লোকে তোমায় বায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছে। পণ্ডিত! তোমার বায়ুর কিঞ্চিৎ অংশ আমাকে দাও, তাহা প্রাপ্ত হইলে, আমি কৃতার্থ হইব। এখন অবধি প্রতিদিন তুমি আমার বাটীতে যাইও, আমরা সকলে তোমার সঙ্গে মিলিয়া প্রেমানন্দে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিব।"

এই সকল কথা যখন হয়, শচীদেবী তখন নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন, শ্রীবাস পণ্ডিতের বাক্যে তিনি অনেক দূর আশ্বস্ত হইলেন, নেত্রজল মার্জ্জন করিয়া মুক্ত-কণ্ঠে সন্তানের মঙ্গল কামনা করিলেন। তদবধি শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে সশিষ্য গৌরাঙ্গদেব উপস্থিত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, ক্রমে ক্রমে আরও কতকগুলি ভক্ত, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। সেই সময় হইতে নবদ্বীপে হরিসঙ্কীর্ত্তনের আরম্ভ।

গৌরাঙ্গসঙ্কীর্ত্তনবার্ত্তা সমগ্র নবদ্বীপে প্রচার হইয়া পড়িল। প্রভু অদ্বৈতা-চার্য্য সেই বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার ভাবনা হইল, নিমাই পণ্ডিত যদি কৃষ্ণভক্ত হইয়াছে, তবে আমাকে দেখা দেয় না কেন? শিশুকালে নিমাই যখন আমার আশ্রমে তাহার দাদাকে ডাকিতে আসিত, তখনই সেই দিগম্বর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম, এ বালক সামান্য বালক নয়, পরম বস্তু। সেই

বস্তু অবশ্য আমাকে দেখা দিতে আসিবে; আমিও স্বপ্ন দেখিয়াছি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইবেন, স্বপ্নই তবে সত্য হইল, গৌরাঙ্গরূপে পূর্ণব্রহ্ম সনাতনকে আমি এই স্থানে দর্শন করিব।

অদ্বৈত্য প্রভুর এইরূপ আশা। একদিন গদাধরপণ্ডিতকে সমভিব্যবহারে লইয়া চৈতন্যদেব অদ্বৈতাশ্রমে দর্শন দিলেন। রূপ দর্শন করিয়া আচার্য্য মহাশয় আত্মবিস্মৃত হইলেন, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। অদ্বৈত্যপ্রভুর বয়ঃক্রম তখন সপ্ততিবর্ষ; চৈতন্য বালক, ইহা বিস্মৃত হইয়া অদ্বৈতঠাকুর চৈতন্যদেবের চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন। কি করেন, কি করেন বলিয়া চৈতন্যদেব সরিয়া দাঁড়াইলেন, অতঃপর তিনিও আচার্য্যদেবের চরণে প্রণিপাত করিলেন।

গদাধরপণ্ডিত নিমাইপণ্ডিতের প্রিয় সখা, তিনিও কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক; বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য বালক নিমাইকে প্রণাম করিলেন, তদ্দর্শনে গদাধরের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তিনি ভাবিলেন—নিমাই তবে কে? সাধারণ মনুষ্য কদাচ এত বড় প্রেমিক আচার্য্যের প্রণম্য হইতে পারেন না।

গদাধরের মনের ভাব মনেই রহিল, কিয়ৎক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা আলোচনা করিয়া গৌরাঙ্গদেবের সহিত তিনি অদ্বৈত-সভা হইতে বিদায় হইয়া আসিলেন।

গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত হইবার পর অবধি চঞ্চল নিমাই চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব ধারণ করিয়াছিলেন, ভাবদর্শনে ভক্তেরা তাঁহাকে বিনয়াবতার বলিয়া অভিনন্দন করিতেন। বাস্তবিক প্রেমিকের হৃদয়ে বিনয়ের আধিপত্য হইয়া থাকে। চৈতন্যদেব যখন গঙ্গাস্নানে যাইতেন, তৎকালে পথিমধ্যে বহিরঙ্গ লোক দেখিলে পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইতেন, অন্তরঙ্গ লোকদিগের চরণ বন্দনা করিয়া আনুগত্য করিতেন, কাহার ফুলের সাজি, কাহার শুষ্ক বস্ত্র, কাহার পূজার দ্রব্য নিজে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহারা নিষেধ করিতেন, নিমাই তাহা শুনিতেন না।

অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত চৈতন্যদেবের সাক্ষাতের পর কিছুদিন গত হইয়া গেল। "নিমাই যদি যথার্থ পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবানের অবতার হন, তবে অবশ্য আমি গৃহে বসিয়া দর্শন পাইব। মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া অদ্বৈতপ্রভু নবদ্বীপ হইতে স্বীয় জন্মভূমি শান্তিপুরে প্রতিগমন করিলেন। ক্রমশঃ

ইন্দুপ্রভা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ইনি কে ?

রাত্রি গভীর ; জগৎসংসার স্তম্ভিত। পশু পক্ষী যে যেখানে, সকলেই নিদ্রিত, ব্যোমমণ্ডল তরল মেঘাচ্ছন্ন, সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, সেই ধীর সমীরে ছোট বড় তরুলতা একটু একটু কাঁপিতেছে। শুক্লপক্ষীয় রজনী, কিন্তু জোৎস্না তত পরিস্ফুত হয় নাই। দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। স্তিমিত আলোক-প্রভায় দৃষ্ট হইল, ধবলবসনাবৃতা একটী মূর্ত্তি।

এত রাত্রিতে বনমধ্যে এ মূর্ত্তি কাহার ? স্ত্রীলোক ! তবে কি অভিসারিকা ? তাই বা কিরূপে সম্ভব ? এ অরণ্যপ্রদেশে মানবসঞ্চার নাই, যে দু একটি দেখা যায়, তাহারা সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীদের স্ত্রীকন্যা থাকা অসম্ভব ; তবে এ রমণী কে ? এ কি তবে বনদেবী ? ব্যাপারটা দেখিতে হইল।

রমণী পরমা সুন্দরী। একটী বালক সহসা বাহির হইয়া সেই সুন্দরীর দিকে ছুটিয়া আসিল। এ বালক সেই গুহাবাসী যুবকের সখা। বালক অনেকক্ষণ পরে সেই রমণীকে মানবী বলিয়া চিনিতে পারিল ; ধরিবার অভিলাষে হস্ত প্রসারণ করিল

রমণী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "ও কি ? কর কি ? আমাকে ধরিতে চাও ? ধরিবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন ? তোমরা তো মনে করিলে আমার দেখা পাইতে পার। আমি সর্ব্বদাই তোমাদের কথা ভাবিয়া থাকি। তোমরাই আমার ধ্যান জ্ঞান, তোমরা যখন তখন আমার দ্বারা কিছু না কিছু উপকৃত হও, ইহাই আমার ইচ্ছা। এখন বল, তোমার সখাকে একাকী ফেলিয়া কোথায় যাইতেছ ?"

বালক বুঝিতে পারিল যে, এই সেই উপকারিণী রমণী ; একটু লজ্জিত হইয়া কামিনীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "দেবি ! আমার ভ্রম হইয়াছিল, আমি বুঝিতে পারি নাই। আর কেহ মনে করিয়া তোমার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলাম। তুমি মানবী নও, তুমি দেবী। দেবি ! আমি বড় সঙ্কটে পড়িয়াছি। সখা আমার একেবারে উন্মাদ। সে প্রতিভাকে ভালবাসিয়াছে, সে প্রতিভা প্রতিভা করিয়া উন্মত্ত হইয়াছে। প্রতিভা কোথায় ? প্রতিভাকে লইয়া যাইব, তবে তাহার সহিত দেখা করিতে পারিব।

শীঘ্রই যাইতে হইবে ; অধিক বিলম্ব হইলে সখা হয়তো কোথায় ছুটিয়া যাইবে। কথায় কথায় তাহার ঔদাস্য, কথায় কথায় অভিমান, কথায় কথায় নৈরাশ্য ! তাহার জন্য আমি কি করিব ? আজীবন ধর্ম্মার্জ্জনে অতিবাহিত করিব, এই ভাবিয়া আমি শৈশবে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সখার জন্য আমার ধর্ম্মার্জ্জন হইল না ! আমি এই এক রকম নূতন ধর্ম্মার্জ্জন করিতে বসিয়াছি ! আমার প্রাণ মরুভূমি,

নৈরাশ্যের প্রস্রবন উদাসীনতার আকর! আমিও জগতে ভালবাসিয়া বেদনা পাইয়াছি! আমার আর সে ভালবাসায় কাজ নাই। যদি ভালবাসিতে হয়, যেখানে সেখানে থাকিয়া, পর্ণকুটীরে বাস করিয়া কিম্বা পথে পথে ভ্রমণ করিয়া, মনের ভালবাসাকে ভালবাসিব, হায়! আমি সখাকে উন্মাদ বলিতেছি, হায়! আমিও যে তাহার অপেক্ষা ভয়ানক উন্মাদগ্রস্থ! দেবি! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, জনপদ ছাড়িয়া নির্জ্জন বাসেও কি শান্তিলাভ হয় না? যদি না হয়, তবে কি করিলে হৃদয় জুড়াইতে পারি? আমি সখার জন্য বড় দায়ে ঠেকিয়াছি। কে সখা? কেন সে আমার সুখপথের কণ্টক হইয়া আসিল? সখাকে দেখিলে আমার মন কেন এমন হয়! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সখার কাছে প্রতিভাকে লইয়া যাইব, প্রতিভাকে কোথায় পাইব? প্রতিভা কোথায়?

এই সব কথা বলিতে বলিতে বালক নিস্তব্ধ হইল। রমণী চিন্তা করিতে লাগিল কি আশ্চর্য্য! ভালবাসায় তো এমন দেখা যায় না? ভালবাসিয়া ভালবাসার পাত্রকে একাকী রাখিয়া কে অন্য স্থানে যাইতে পারে? এ তবে কেমন প্রেম? ভালবাসার অসীম ক্ষমতা!

এই সব ভাবিয়া রমণী তখন বালককে কহিল,—"দেখ, এক কাজ কর। তুমি ফিরিয়া যাও, যুবককে গিয়া বল, আজ আর হইবে না, আজ প্রতিভার দেখা পাওয়া যাইবে না; দোলপূর্ণিমার দিন শ্রীচৈতন্যের মেলা হয়। কত দেশ হইতে কত লোক আসে, যেমন স্ত্রীলোকের, তেমনই পুরুষের জনতা হয়; সেইদিন তুমি প্রতিভার দেখা পাইবে। বালক সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "দেবি! কোথায় সে মেলা? সেখানে যে প্রতিভাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি?"

রমণী উত্তর করিল, কারণ থাকিলেই কার্য্য হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিভা-সম্মিলনের কারণ আছে, সেই কারণেই সম্মিলন হইবে। এখান হইতে তিনক্রোশ উত্তরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির, সেইখানে মেলা। বহুলোক আসিবে, প্রতিভাও আসিতে পারে। যাহাতে প্রতিভার সহিত যুবকের সম্মিলন হয়, আমিও তাহার জন্য সবিশেষ যত্ন করিব।

পর্ব্বতে পর্ব্বতে শূণ্যে শূণ্যে প্রতিধ্বনি হইল, "সবিশেষ যত্ন করিব।" কে যেন শূন্যমার্গে বলিয়া গেল, "নিশ্চয় হইবে"। চেষ্টায় কি না হয়? যত্নে কি না, হয় নিশ্চয় দেখা হইবে।

এ রমণী ইন্দুপ্রভা। ইন্দুপ্রভা যথার্থই যেন দেবী। যে যুবক প্রতিভার প্রেমাকাঙ্ক্ষী, সেই যুবককে এই দেবীটিও ভালবাসে; অথচ প্রতিভাকে মিলাইয়া দিবার জন্য এই দেবী বিশেষ যত্ন করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা। কে এমন নিস্বার্থভাবে আপনার ধন অপরের করে তুলিয়া দিতে পারে?

পাঠক! এই বনবিহারিণী দেবিটি সেই কাপালিকপালিতা দয়াময়ী ইন্দুপ্রভা! ইন্দুপ্রভা জানে, ভালবাসিতে হইলে এইরূপ স্বার্থকে বলি দিতে হয়। তাই ইন্দুপ্রভা সহাস্যবদন। সহাস্যবদনে বালকের সহিত ইন্দুপ্রভা অনেকক্ষণ অনেকপ্রকার কথোপকথন করিল। ইন্দুপ্রভাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বালক কহিল, "শুনিয়াছি স্বর্গেই দেবদেবীগণের বাস, এখন দেখিতেছি মর্ত্ত্যেও দেবদেবীর আবির্ভাব হয়। আজি আমি দিব্যজ্ঞানলাভে বুঝিতে পারিলাম, ভালবাসা চিরনূতন। স্বার্থ বলিদান না করিলে এ ভালবাসা পাওয়া যায় না। জগতের ভালবাসা যে স্থায়িত্বলাভ করে না, তাহার কারণ আছে। এক একজন মানব নূতন অনুরাগে অনুরাগী হইয়া, নূতনের প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া জীবনে শান্তি একেবারে বিসর্জ্জন দেয়। দেবী কৃপা করিয়া বলিয়া দাও, কবে আবার তোমার দেখা পাইব?"

ইন্দুপ্রভা আবার উত্তর করিল, দোলপূর্ণিমার দিন দেখা হওয়া সম্ভব। আমি কে, আর কি জন্য যে বনভ্রমণ করি, সে দিন সমস্ত বলিব।

বালক একবার ইন্দুপ্রভার আপদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "কি পবিত্র মূর্ত্তি! ইহাকে দেখিয়া বোধ হয়, বিধাতা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত এই রমণীকে ধরাধামে পাঠাইয়াছেন, এমন মধুর কথা তো কখন শুনি নাই। ইনি কি প্রেম-সন্ন্যাসিনী? ভাবে বোধ হয়—তাই; কিন্তু আকৃতিতে ত সে ভাব কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।" ইঁহার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

বালক এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে ইন্দুপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "বালক, অমন করিয়া নীরব হইয়া কি ভাবিতেছ? ছদ্মবেশ পরিত্যাগ কর। সম্মুখে তোমাদের জন্য নবীন আনন্দময় সুখের দিন আসিতেছে। সেই দিনেই অসম্ভব সম্ভব হইবে। তোমাদের সুখের পথ পরিষ্কার হইলে, আর বিলম্ব নাই। এখন যাও, তোমার সখাকে গিয়া দেখ।"

বালক কহিল, "দেবি! তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমার কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না, কিন্তু সখাকে একাকী রাখিয়া আসিয়াছি, তাই যাইতে হইল, নতুবা আর যাইতাম না। চলিলাম, পাগলকে বুঝাইয়া রাখিতে হইবে, তাই আমি তোমার কাছে মন রাখিয়া দেহ লইয়া তাহার কাছে চলিলাম।"

সহাস্যবদনে ইন্দুপ্রভা কহিল, "যাও কোন চিন্তা নাই, আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, তাহাই করিব

বালক চলিয়া গেল, ইন্দুপ্রভা অল্পক্ষণ সেইখানে থাকিয়া গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ত্বরিতা-নন্দের প্রিয় সেবক। ত্বরিতানন্দের প্রসাদে তাহারা সর্ব্বসুখ অনুভব করে। তাহারা শ্মশানের ভস্ম গায়ে মাখে; উদার হইয়া যথাতথা বিচরণ করে, মাথায় জটাভার বহন করিয়া থাকে, তাহাদের মুখে সর্ব্বদা হাসি দেখিতে পাওয়া যায়। রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা প্রকৃত সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করিতে পারে না। পরমার্থপ্রাপ্তিই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা। তাঁহারা লোকালয়ে বাস করেন না। দুর্গম গিরিগুহায় দিন অতিবাহিত করেন। প্রকৃত সন্ন্যাসী শ্মশান পাইলেই তুষ্ট হইয়া থাকেন।

একদিন এক পর্ব্বতে শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া একজন সন্ন্যাসী ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেছিলেন। শিষ্যেরা একমনে সেই অত্যাশ্চর্য্য অতি গূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে ছিলেন। সাধু শিষ্যদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইতেছেন, হঠাৎ তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন কিসের অভাব বোধ হইল। তিনি একবার ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া একজন শিষ্যকে কহিলেন, 'দেখ আজ আমি কোন বিশেষ প্রয়োজনে যাইব, তোমরা এইখানে থাকিও; এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন।"

সাধু চলিয়া যাইবার পর শিষ্যেরা গাঁজার উপাসনা করিতে লাগিল, তাহাদের তখনকার আনন্দ অনির্ব্বচনীয়।

এদিকে সাধু পর্ব্বত হইতে নামিয়া আপন মনে মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। পথিমধ্যে তাঁহার সঙ্গে একটী যুবকের সাক্ষাৎ হইল। যুবক ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল, "পিতঃ! আজিও আমি সেইরূপ অজ্ঞান রহিয়াছি, কোনও জ্ঞান হয় নাই। বুঝি এই অজ্ঞানতায় এইবার আমার প্রাণ যাইবে। আশা অপূর্ণ রহিল। নিরাশানীরে আমি ভাসিয়া চলিলাম। আজি আমার মৃত্যু হইবে। আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম, এ জন্মে আর আপনাকে দেখিতে পাইব না। পিতঃ! মৃত্যুকালে আমাকে ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করুন।

সাধু বলিলেন, "কখন কি হইবে, বুঝিতে পারা যায় না। এই তুমি আছ, পরে কেমন হইবে, তোমার জীবনের আর কোন অভাব থাকিবে কি, না থাকিবে, তুমি তাহা অবগত নও, কিন্তু বোধ হয় আর তোমার কষ্ট থাকিবে না। চিরদিন সমান যায় না। কাল তুমি মহারত্ন পাইতে পার, সেই রত্নই হয় ত তোমার জীবনের মহা

অভাব পূর্ণ করিতে পারিবে, তুমি হয়ত অতুলানন্দ উপভোগ করিবে। চিত্ত স্থির কর,—তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বোধ হইতেছে, শীঘ্রই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। উতলা হইও না, উতলা হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়াছ কেন?

সন্ন্যাসীর কথা শুনিতে শুনিতে যুবক অধীর হইয়া তাহার চরণ যুগল জড়াইয়া ধরিল। "কি কর, কি কর, যাও উতলা হইও না, তোমাদের মিলনের সময় আমার দেখা পাইবে। আমি তোমাদের মিলন করিয়া দিয়া যাইব।"

এইরূপ আশা দিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। যুবক আর তাঁহাকে একটী কথা বলিবার অবকাশ পাইল না। সে ভাবিল, বহু পুণ্যে এমন যোগীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি।

যুবক সেই হরেন্দ্রকুমার। প্রেমময়ী প্রতিভাকে পাইয়া সুখী হইব, ভাবিতে ভাবিতে হরেন্দ্রকুমার এবার অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। তাহার মনে আবার সেই আনন্দময়ী ইন্দুপ্রভা জাগিয়া উঠিল। সে প্রতিভা বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে যায়, তাহার মুখ দিয়া সখা শব্দ বাহির হয়। সখাতে প্রতিভাতে যেন অভেদ, এক একবার এইরূপ তাহার মনে হয়, কখন সখা আসিবে, কখন সেই মধুমাখা কথা শুনিয়া, সব ভুলিতে পারিব। যুবক তাহাই ভাবিতে লাগিল, সে আর প্রতিভাকে চায় না, প্রতিভার অভাব যেন সখা হইতে পূর্ণ হইবে, ইহাই তাহার মনে হয়। সন্ন্যাসীর প্রবোধ বচনে তাহার চিত্ত যে একটু স্থির হইয়াছিল, তাহা আর থাকিল না। কখন সখা আসিবে, তাহার মন শান্ত হইবে, আর আমি প্রতিভার কথা বলিব না। সখা! তুমি এস, তোমার অদর্শনে আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। কেন তোমাকে ছাড়িয়া দিয়া ছিলাম? আর আমার চিত্ত সন্তোষে তোমার কেন এত যত্ন হয়? তুমি এস, আমি আর কাহাকেও চাহি না। যদি আমার মুখে আর কখন প্রতিভার নাম শুনিতে পাও, তবে আবার চলিয়া যাইও, আমি সহস্র অনুনয় করিলেও আর আসিও না। আমি যে তোমাকে না দেখিয়া মরিতেও পারিতেছি না। যখন তুমি আসিবে, তখন আমি আনন্দে প্রাণ বিসর্জ্জনের উপায় করিতে পারিব। আমি মরিলে যেখানে ইচ্ছা সেইখানে তুমি চলিয়া যাইও। আর আমি তোমাকে দেখিতে আসিব না! আর ভাবিব না, সখা আমাকে রাখিয়া কোথায় গেল। সখা কে? তুমি কে? আমি কে? কোথায় ছিলাম কেহ কাহাকে জানিত না। বোধ হয়, তোমাতে দেবভাব পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত নতুবা তোমার দর্শনে প্রাণ এত মোহিত হয় কেন? অভাবেও তোমাকে দেখিয়া আমি অভাবের অভাব মনে করি কেন?

যুবা এইরূপ আরও কত কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের বিচিত্র গতি।

মন তুমি পরের দাস। পরের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত তোমার সৃষ্টি। তুমি ভাব যাহার পরদুঃখ মোচনে প্রয়াস নাই, তাহাতে আর পশুতে প্রভেদ কি? কিন্তু তুমি কি বাতুল? এ ধারণা তোমার কেমন ভ্রান্তিজনক। নিজের সুখের দিকে তোমার লক্ষ্য নাই, আত্মোন্নতি তোমার অভিপ্রেত নয়। তুমি যাহা চাও, সেইটি তোমার অভিলষিত মনে হয়। তোমার সুখ রত্ন কহিনুর প্রভৃতি রত্ন ভাণ্ডারের অমূল্য মণি, জহরত তোমার এ রত্নের তুলনায় প্রস্তর খণ্ড অনুমিত হয়। তোমার সুখের আশা তোমাকে নাচায়। তুমি আশার হস্তে বালকের খেলনা, দর্পণের প্রতিবিম্ব। তাই পরম সুখী হইয়াও তোমার সুখলাভ হয় না। অবশ্য তোমার স্বার্থজড়িত সুখ নিস্বার্থের ছায়া সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু সে ছায়া ক্ষণকাল অন্তর দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াই সরিয়া পড়ে। তুমি ধরিয়া রাখিতে পার না।

তোমার গতি বক্র, এই বক্র গতিতে তুমি বিভ্রান্ত হইতেছ, তুমি বল, আমি সুখ চাই না, সুখী লোক দেখিতে চাই, সে সুখী, তো তোমাকে লইয়া! তবেই তোমার সুখ স্বার্থমিশ্রিত। মনে স্বর্গ নরক উভয়ই থাকে, কিন্তু তোমাতে স্বর্গের সেই পবিত্র অংশ সম্পূর্ণভাবে রহিয়াছে, তাই তোমার ধনুর্ভঙ্গ পণ হইলেও তোমার সে কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। প্রেমে মানব গঠিত হইয়া থাকে, আবার প্রেমের ঘোর তাড়নে সেই মানবকে খখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতে হয়।

মানব মাত্রেই প্রেমের দাস। প্রেমের সেবা শৈথিল্যে আবার অনেকের দাসত্ব জন্মের মত ঘুচিয়া যায়। প্রেমে পড়িয়া অনেকে বড় হইয়াছে, কিন্তু আবার কত জনকে অকালে সাধের জন্ম বিসর্জ্জন দিতে দেখা যায়। প্রেমের বন্ধনে জগৎ বাঁধা। স্বামী স্ত্রী, পুত্রকন্যা, পিতামাতা সকলেই এই প্রেমের উপাসক। প্রেমকে পূজা না করে ত্রিলোকে এমন কেহ নাই। প্রেম সবার উপর আধিপত্য করিয়া থাকে, প্রেমের উপর কেহ আধিপত্য করিতে পারে না। এই প্রেমের অনেক গুণ; এইমাত্র যে একমাত্র পুত্রকে যমের করে তুলিয়া দিতেছে, তাহার সেই যন্ত্রণাময় হৃদয়েও প্রেমের অধিপত্য। প্রেম তাহার সমস্ত সন্তাপ হরণ করে, সমস্ত ভুলাইয়া দেয়, সে অচিরেই শান্তিলাভ করিয়া আবার নূতন সংসারে মন দিয়া থাকে। প্রেমের গুণ অনেক, কিন্তু যদি বিচ্ছেদটি না থাকিত, তাহা হইলেই প্রেম নির্ম্মল হইত, বিচ্ছেদকে তুমি দূর করিতে পার না, তুমি বল,

বিচ্ছেদ না থাকিলে প্রেমের মধুরতা মানব আস্বাদন করিতে পারিত না। এক জন বিরহিণী বলিয়া ছিল ;—

"আয়রে বিচ্ছেদ, রাখি তোরে যতনে হৃদি মাঝারে।
এ জনমের মতন তোরে সে সঁপে গেছে আমারে॥"

প্রেম বড় নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর যদি না হইবে. যে যাহা চায়, সে তাহা পায় না কেন? আর একজন প্রেমিক কবির একটি গীতাংশ এইরূপ :—

"বিচ্ছেদান্তে মিলনে অতি সুখোদয়।
হিমান্তে বসন্ত যেমন, মেঘান্তে চন্দ্র উদয়॥"

বালক অনন্যোপায় হইয়া সখার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। যুবক একটি প্রস্তর খণ্ডের উপরে শায়িত, নয়ন নিমীলিত, ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন। বালক ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। যুবক তাহাকে দেখিতে পাইল না, তাহার পদশব্দ যুবকের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল না। সহাস্যবদনে সখা সখা বলিয়া বালক ডাকিল ; বলিল, "সখা! আমি আসিয়াছি, একবার চাহিয়া দেখ, একবার সখা সম্বোধনে হৃদয় জুড়াও।"

যুবকের কর্ণে,যেন সুধা বর্ষণ হইল। সে যাহা চাহিতেছিল, তাহাই পাইল। বালকের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া যুবক ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিল ; ব্যস্তভাবে কহিল, "কই, কই, কই আমার প্রতিভা? সখা! আমার প্রতিভাকে দেখাও!"

পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বালক কহিল, "সখা. প্রতিভার সহিত দেখা হইয়াছিল। প্রতিভা বলিয়াছে, এত উতলা কেন? যাহার ধন তাহারই হইবে, ভগবান মিলাইয়া দিবেন। উন্মাদিনী হইয়া ভাল বাসিয়াছিলাম, আজিও উন্মাদিনী আছি। প্রতিভা আরও বলিয়াছে—যাও, তাহাকে বল, অভাব ব্যতীত জগতে কোন বস্তুর সুখলাভ করা যায় না। সেই অভাব অপূর্ণ যত দিন, ততদিনই সুখ। সেই অভাব পূর্ণ হইলে সম্মিলন বল, আর যাহাই বল, কিছুতেই তাদৃশ সুখ থাকে না। নিত্য কোন বস্তুরই আস্বাদন ভাল নয়।

দুঃখান্তে যে সুখ তাহাই প্রকৃত সুখ। বহু কষ্টাবসানে নিত্য নিরঞ্জনকে পাওয়া যায়। পিপাসাতুরকে তৎক্ষণাৎ জল না দিয়া, দিতেছি, দিতেছি, বলিলে তাহার কাছে জলের কত আদর হয়। জলপানে যখন পিপাসা যায়, তখন কি তাহার জলের উপর আর তত টান থাকে?

যুবক বলিল, "সখা আমি যে আর সহ্য করিতে পারি না।"

বালক বলিল, "প্রতিভার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল তোমার প্রতিভা আমার সঙ্গে আসিল না।"

"উঃ, উঃ, এত নিষ্ঠুর! বল সখা কবে দেখা পাইব? কোথায়? তাহার সঙ্গে মিলন হইবে, তোমার কথায় বোধ হয়, তুমি যেন কি মতলবে বেড়াইতেছ। প্রতিভার সঙ্গে আমার মিলন হইলে পাছে তোমার এ সুখ-লীলা ফুরাইয়া যায়, তাই তুমি আমার প্রতিভাকে আনিয়া দিতে যেন ইতস্ততঃ করিতেছ।

বালক কহিল, "সখা! সে কি সত্য নয়? তুমি কি ভাব, আমি নিঃস্বার্থভাবে বেড়াইয়া থাকি? তাহা নহে, আমার স্বার্থ আছে। যাহাতে অভাব পূরণ হয়, তাহাই আমার স্বার্থ। অভাব স্বার্থ ভালবাসে। আমার অভাব আছে, অতএব আমি স্বার্থ ভালবাসি। স্বার্থ ভালবাসি বলিয়া আমি তোমার প্রেমের বিরুদ্ধচারী নহি। যাহাতে তুমি সুখী হও, আমি তাহারই চেষ্টা করিয়া বেড়াই। যখন তোমার সুখলাভ হইবে, যখন তুমি প্রিয় বস্তু পাইবে, তখন আমার এ স্বার্থ নিঃস্বার্থে পরিণত হইবে। তখন তুমি ও আমি নিঃস্বার্থের দাসত্বে বাঁধা পড়িব। তোমার সুখের জন্য আমি কি কি করিয়াছি, পরে তুমি তাহা অবগত হইবে। তখন তোমার মনে আর এরূপ অন্যায় ধারণা থাকিবে না। আমি ভিখারী [illegible]। যদি তোমার সঙ্গ না পাইতাম, হয় তো এতদিন কোথায় চলিয়া যাইতাম, কি করিয়া বেড়াইতাম, তার নিশ্চয়তা নাই। তোমার সংসর্গে আমি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছি। তুমি প্রতিভাকে পাও, প্রতিভা তোমার হৃদয়-রাজ্যের রাণী হইয়া স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করুক, ইহা দেখিয়া আমি নয়ন ও মনের স্বার্থকতা সম্পাদন করি।"

যুবক নিস্তব্ধ হইয়া বালকের ঐ সকল কথা শুনিতেছিলেন, শুনিয়া শুনিয়া তাহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, আহ্লাদে বালকের হস্তধারণপূর্ব্বক বলিল, "সখা! যদি তুমি আমার সহিত মিলিত না হইতে, আমাকে বিপদে ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা না শিখাইতে, তবে কি আজ পর্য্যন্ত গতে আমার অস্তিত্ব থাকিত? তুমি আমার পরম হিতৈষী। জগতে তোমার মত বন্ধু আমার নাই। তুমি যে হিত-ব্রতে ব্রতী হইয়া রহিয়াছ, সে ব্রত যথার্থই দেবব্রত। সে ব্রতের উদযাপনে পবিত্র পুণ্যের সঞ্চয়। আমি কোথায় তোমার উপকারের প্রত্যুপকার করিবার চেষ্টা পাইব, তাহা না করিয়া কতবার তোমাকে আমি কত কর্কশ বাক্য বলিয়াছি। তুমি তাহা সমস্তই সহ্য করিয়াছ এখনও করিতেছ।"

যুবক বলিল, "সখা ! তুমি চলিয়া গেলে আমি এখানেই ছিলাম, সর্ব্বদা তোমার নাম করিয়া কাঁদিতাম, কখন প্রতিভা বলিয়া ডাকিতাম, কখন সখা বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতাম, এইরূপে আমি দিনাতিপাত করিয়াছি। একদিন ঐ শিলাসনে বসিয়া তোমাদের জন্য ঘোর চিন্তায় মগ্ন আছি, বেলাও যায় যায় হইয়াছে, পাখীরা উড়িয়া উড়িয়া কুলায়ে যাইতেছে, পাপিয়ার কলকণ্ঠে চোখ গেল বলিয়া বেদনা জানাইতেছে। বায়ু মৃদু মৃদু সঞ্চারে বৃক্ষের পাতায় পাতায় বিহার করিতেছে, এমন সময়ে একটী শান্তমূর্ত্তি জটাবল্কল ধারী যোগী আমার সম্মুখে উপস্থিত হন। যোগীর সঙ্গে আমর অনেক কথা হইল, তিনি বলিলেন, "দোলপূর্ণিমার দিনে চৈতন্যচন্দ্রের মেলায় তীর্থ যাত্রীর সহিত প্রতিভা আসিবে, সেইদিন তোমাদের সম্মিলন হইবে।" যোগীর কথায় আমার খুব ভক্তি হইল ; সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। যোগী থাকিলেন না, আশা দিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি আমি দিন গণনা করিতেছি, কবে দোলপূর্ণিমা আসিবে, কবে আমি প্রতিভাকে দেখিতে পাইব, সেই আশাতেই দিন গণনা। গণনায় জানিতে পারিয়াছি, আগামী কল্য দোলপূর্ণিমা। সখা ! চল আমরা উভয়ে সেই মেলা দেখিতে যাই, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যুগল রূপ দর্শন করিয়া নয়ন সফল ও হৃদয় পবিত্র করি।"

"চল তবে যাই!" এই বলিয়া বালক উঠিয়া দাঁড়াইল, যুবকও উঠিল ; উভয়ে হাত ধরিল, মহোৎসহে দেব দর্শনে চলিল।

পাঠক ! যাহার যাহা প্রার্থনা, সে কি তাহা পায় ? আমি যদি চাঁদ ধরিবার ইচ্ছা করি, চাঁদ কি আমায় ধরা দেয় ? অসম্ভব আশা কদাচ পূর্ণ হয় না। হয় না সত্য, কিন্তু এ যুবকটীর আর এই বালকটীর আশা আকাশের চাঁদ ধরিবার আশার মত নয়, পৃথিবীতে সেরূপ আশা অবশ্যই পূর্ণ হওয়া সম্ভব ; কেমন সুন্দররূপে তাহাদের আশা পূর্ণ হয় দেখুন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

ফাল্গুন মাস। আজ দোলপূর্ণিমা, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মদিন। ঠিক সন্ধ্যাকালে পূর্ণচন্দ্রের উদয় ; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরের নিকটে বেগবতী নদী ; সেই নদীর জল তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ চন্দ্রের সুন্দর ছবি নৃত্য করিতেছে, নীল জলে নীলাকাশের ছায়া পড়িয়াছে, বসন্তকাল, আকাশে বিন্দুমাত্রও মেঘ নাই ; বসন্তকালের চন্দ্র যেন নির্ম্মল শরৎ চন্দ্রের ন্যায় হাস্য করিতেছে, চমৎকার শোভা। নদীতীরে সুরেন্দ্রকুমার।

প্রেম উন্মাদ হরেন্দ্রকুমার সুপবিত্র তীরভূমিতে উপবেশন করিয়া, একদৃষ্টে চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া আপন মনে বলিতেছে, "আমি পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিতেছি, আহা চাঁদ কি সুন্দর! নক্ষত্রমালা ঐ চাঁদের চারিদিকে ঘেরিয়া টিপি টিপি হাসিয়া হাসিয়া খেলা করিতেছে, চাঁদও হাসিতেছে। আয় চাঁদ তোকে বক্ষে ধারণ করিয়া আমি আমার নিজের প্রাণের চাঁদকে বক্ষে পাই। চাঁদ! তোমার সুধা আছে, আমার প্রতিভার মুখেও সুধা আছে। এসো চাঁদ, তোমারই সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করি। তুমি আমার সখা হও; তুমি আমার সকল সুখের বস্তু, তুমি আমার উন্মাদ মনের শান্তি।

হরেন্দ্রকুমারকে নদীতীরে বসাইয়া বালক কোথায়? বালক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, সন্ন্যাসীর কথা সত্য কি না, তাহা জানিবার জন্য উৎসাহে উৎসাহে চেষ্টা করিতেছে।

দেবু মন্দিরে মহাজনতা। রজনী ক্রমশই অগ্রসর, জনতাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দেবমন্দির নির্জ্জন হইয়া আসিল। যুবক নদী তীরে; তাহার নিকট একটী যুবতী আসিল। যুবতীর অধরে মৃদু মৃদু হাস্য; সহাস্য বদনে যুবককে সম্বোধন করিয়া মধুর বচনে যুবতী কহিল, "এসো আমার সঙ্গে এসো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন কর।"

যুবক উঠিল। যুবতীকে কোন কথা বলিবার সময় হইল না। যুবক ধীরে ধীরে যুবতীর সঙ্গে মন্দিরাভিমুখে চলিল, ক্ষণমধ্যে মন্দির সম্মুখে আসিয়া উভয়ে দাঁড়াইল। যুবক জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে?

যুবতী উত্তর করিল, "আমার পরিচয়ে কোন প্রয়োজন নাই! মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ মন্দিরের মধ্যে তুমি তোমার অভীষ্ট রত্ন প্রাপ্ত হইবে। স্থির হও, এইখানে দাঁড়াও, আমি অন্য পথ দিয়া যাইয়া মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করি; কিম্বা যদি ইচ্ছা কর আমার সঙ্গে আইস।"

শেষের কথাতেই যুবক সাহ্লাদে সম্মত। উভয়ে একসঙ্গে মন্দিরের বারাণ্ডায় উঠিল। যুবককে তথায় রাখিয়া যুবতী অন্য দ্বার দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, সম্মুখের দ্বার উদ্ঘাটন করিল। প্রসন্নবদনে যুবককে প্রবেশ করিতে বলিল, যুবক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল, শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি; এক ধারে একটী ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতেছে। যুবতী বলিল, যুবক! আর কিছু দেখিতে পাইতেছে?"

যুবক উত্তর করিল, "আর ত কিছুই দেখিতেছি না। তুমি বলিয়াছিলে, মন্দির মধ্যে আমি আমার অভীষ্টরত্ন দেখিতে পাইব, তাহা কৈ?

যুবতী বলিল, "ভাল করিয়া নিরীক্ষণ কর।" যুবক এইবার যাহা দর্শন করিল, তাহাতে তাহার উল্লাসের সীমা রহিল না; প্রতিভা প্রতিভা বলিতে বলিতে উন্মাদের মত বাহু বিস্তার করিয়া সম্মুখ দিকে ছুটিল। সত্যই প্রতিভা! বিস্ময় চকিত নয়নে চাহিয়া প্রতিভা বলিল, তুমি? তুমি কি আমারে চিনিতে পারিয়াছ? এই প্রশ্ন করিয়াই প্রতিভা তৎক্ষণাৎ হরেন্দ্রকুমারের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। হরেন্দ্র শশব্যস্তে সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া তুলিল; উভয়ের নয়নে দর-দর অশ্রুধারা।

অকস্মাৎ একজন জটাধারী সন্ন্যাসী সেই মন্দির মধ্যে দর্শন দিলেন; যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ কি? তোমরা কর কি? বিষাদ আনয়ন কেন কর? এ দেব নিকেতন পবিত্র ভাব আবশ্যক, শ্রীরাধাকৃষ্ণের কৃপায় আজ তোমাদের শুভ সম্মিলন হইল।

এ সন্ন্যাসীটি কে? ইনি অপর আর কেহই নহেন, পূর্ব্বে যিনি হরেন্দ্রকুমারকে সৎপথে ভ্রমণের পরামর্শ দিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে প্রতিভার সঙ্গে দেখা করিয়া যিনি তাহার মনে আশ্বাস দিয়াছিলেন এই সেই মহাপুরুষ।

হরেন্দ্রকুমার ভক্তিভাবে সেই মহাপুরুষের চরণে প্রণাম করিল। যে যুবতী তাহাকে শিবমন্দিরে আনয়ন করিয়াছে, সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিবার পর সে যেমন সেই যুবতীকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল, অমনি তাহার হাত দুখানি ধরিয়া যুবতী বলিয়া উঠিল, "কি কর? কি কর? আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না? আমি ইন্দুপ্রভা। আমি সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছি, আমি তোমাকে চিনিতেছি, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না। আমি তোমাকে কাপালিকের হস্ত হইতে বার বার রক্ষা করিয়াছি। কিসে তুমি সুখী হও, সর্ব্বদা আমি সেই সুখের সামগ্রী খুঁজিয়া বেড়াই। আমি তোমারে ভালবাসি, সেই ভাল বাসার মহিমায় আজ তুমি প্রতিভাকে প্রাপ্ত হইলে, প্রতিভা লইয়া তুমি সুখী হও। আমি সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছি, সন্ন্যাসব্রতেই, এই বেশেই, আমি জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিব। আর আমার অন্য আকাঙ্খা নাই। তোমার সুখেই আমার সুখ। তুমি ভাল থাকিলেই আমার ভাল, তোমার ভালবাসা স্মরণ করিয়া সহাস্য বদনে সুখে আমি মরিব।"

হরেন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রতিভার নিঃস্বার্থ ভালবাসার কথা চিন্তা করিতেছিল, ইন্দুপ্রভার কথা সমাপ্ত হইলে ভক্তিভাবে কহিল, 'ইন্দুপ্রভা আমাকে ক্ষমাকর!

আমরা পুরুষ, ঘোর স্বার্থের দাস; তুমি দেবী, দেবীর কার্য্যই করিয়াছ। তুমি আমাকে ভালবাস, এক দিনও তাহা আমি বুঝি নাই; বুঝিবার কারণ কিন্তু অনেক ছিল। যখন তুমি নিষ্ঠুর কাপালিকের করাল অসি মুখ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছ, তখনই তোমার ভালবাসা আমার বুঝা উচিত ছিল।"

আমি অজ্ঞান, বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই। আমি তোমার সামান্য রূপ-মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া ছিলাম, কিন্তু চক্ষের ভালবাসায় চঞ্চল তরলমতি যুবকের যে দশা ঘটে, তাহাই আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। এখন আমি ঠিক ভালবাসা শিখিব, এখন আমি এক হৃদয় উভয়কে সমান ভাগ করিয়া দিব।

এই বলিয়া হরেন্দ্র কুমার একহস্তে প্রতিভার ও আর এক হস্তে ইন্দুপ্রভার হস্তধারণপূর্ব্বক আগ্রহে কহিল, এস, চল, বাহিরে যাই। রাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া ছুটী নবীনাযুবতীর কর ধারণ পূর্ব্বক, হরেন্দ্রকুমার মন্দির হইতে বাহির হইল, সন্ন্যাসীও বাহির হইলেন, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধহইল।

অতঃপর তাহারা সেই নদীর বাঁধা ঘাটে গিয়া বসিলেন। সেই সময় হঠাৎ এক খানি নৌকা আসিয়া সেই থানে লাগিল, নৌকা হইতে একজন বৃদ্ধ নামিয়া-আসিয়া প্রতিভাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মা! এমন করিয়া কি কাঁদাইতে হয়?"

বহু দিন পরে পিতার দর্শন পাইয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন "বাবা বাবা"।

বিশ্বরঞ্জনের পরমানন্দ। অনেক দিনের পর কন্যাকে পাইলেন, সে আনন্দ অনির্ব্বচনীয়। যে হরেন্দ্রকুমারের প্রতি তিনি জাত-ক্রোধ ছিলেন, সেই হরেন্দ্রকে প্রতিভার নিকটে দেখিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে নূতন আনন্দের সঞ্চার হইল। ইন্দুপ্রভাকে দেখিয়া তিনি কৌতূহলে তাহার পরিচয় লইলেন; পরিচয় পাইয়া ভাবিলেন, একন্যা সামান্যা নহে, রমণীরত্ন; এবয়সে এমন আত্মত্যাগিনী আমি কোথাও দেখি নাই। ভাবিতে ভাবিতে ঐ তিনটীকে তিনি প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সন্ন্যাসীও সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ইন্দুপ্রভার বিশেষ বিশেষ গুণের পরিচয় দিলেন।

এইস্থানে বিশ্বরঞ্জনের নিকট প্রতিভার ভ্রমণপরিচয়। প্রতিভা এত দিন কেমন করিয়া কোথায় কোথায় দিনাতিপাত করিয়াছে, কেমন করিয়া নিজপ্রিয় বস্তু অন্বেষণে পরিভ্রমণ করিয়াছে সে সকল কথা সন্ন্যাসী বলিলেন। বিদায় কালে তিনি ইন্দুপ্রভাকে এই শেষ কথা বলিয়া গেলেন যে ইন্দুপ্রভা! রমণী কুলের আদর্শ সতী তুমি। যাও,

মনোমত পতিসহ সম্মিলনে শান্তিলাভ কর। স্থায়ীভাবে চিরদিন প্রতিভাকে ভালবাসিও; জগৎ যেন চিরদিন তোমাদের ভালবাসার সুপবিত্র মধুর গাথা কীর্ত্তন করে; তোমাদের এই ভালবাসার পবিত্র গাথা যেন জগৎবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হয়।

সন্ন্যাসী আরও বলিলেন, "স্বার্থ বলি দান করিয়া ভালবাসিতে না পারিলে ভালবাসার মধুরতা বুঝা যায় না। ভালবাসা কি? জগৎ পিতা যে জন্য এই ভালবাসার সৃজন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অতি গূঢ়, অতি গভীর ভাবময়; সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইতে পারে না; জগতে যদি কিছু মধুময় থাকে তবে সেই মধুময় বস্তুই ভালবাসা; এই ভালবাসা ব্যতীত জগৎ চলিতে পারেনা; এক দিনেই সংসার বন্ধন ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যায়।

পুনর্ব্বার সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সন্ন্যাসী অদৃশ্য হইলেন। প্রভাত হইয়া আসিল, প্রত্যূষে প্রতিভা ইন্দুপ্রভা ও হরেন্দ্রকুমারকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া বিশ্বরঞ্জন বাবু স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কাপালিক পুড়িয়া মরিল, ইন্দুপ্রভার প্রেম সজাগ হইয়া উঠিল। ইন্দুপ্রভার প্রেম উচ্চ, কি প্রতিভার প্রেম উচ্চ, কি উভয়ের প্রেম সমান, বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা তাহার বিচার করুন। আমাদের বোধ হয়, প্রতিভার প্রেমে কিছু কৃত্রিমতা আছে। প্রিয় বন্ধুর অন্বেষণে বালক বেশ ধারণ করিয়া বুদ্ধিমতী প্রতিভা কতদিন হরেন্দ্রকুমারের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছিল, বালক বেশে হরেন্দ্রকুমারের সখা হইয়াছিল, হরেন্দ্র তাহাকে চিনিতে পারে নাই। ভগবানের আশীর্ব্বাদ! প্রতিভা যাহার জন্য পাগলিনী, তাহাকে পাইল; মনমধ্যে ইন্দুপ্রভা যাহাকে ভালবাসিয়াছিল, ইন্দুপ্রভা তাহাকে পাইল; যথাশাস্ত্র বিধানে তাহাদের উভয়ের পাণিগ্রহণ করিয়া প্রেমিক হরেন্দ্র কুমার পরম সুখ সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

সমাপ্ত।

উপসংহার।

অনেকদিন ইন্দুপ্রভা ও প্রতিভার সহিত হরেন্দ্রকুমার একত্রে বসবাস করিলেন; মানব ভাগ্যে যতদূর সুখসচ্ছন্দতা সম্ভব, তাহা হইয়াছে, ইন্দুপ্রভার গর্ভে হরেন্দ্রকুমারের একটি পুত্র জন্মিয়াছে, প্রতিভা আপন তনয়ের মত সেই সন্তানের লালন-পালন করেন। ইন্দুপ্রভা ও প্রতিভা উভয়েই জগতের অপূর্ব্ব অভিনব প্রেমের আদর্শ দেখাইলেন।

পাঠক পর্ণকুটীরে অনেক সময় যে সুখ নিহিত থাকে, তাহা স্বর্ণপ্রাসাদেও পাওয়া যায় না। হরেন্দ্রের সৌভাগ্য দর্শনে তাহা শিখিয়া লও। বিশ্বরঞ্জন রায় তাঁহার স্নেহময়ী প্রতিভাকে একজন পর্ণকুটীরবাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া কত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। একটী কন্যা ছিল, ইন্দুপ্রভাকে লইয়া দুইটী হইল; রূপে গুণে দুটিই লক্ষ্মী-সরস্বতী।

পুণ্যবান আর্য্যসন্তানেরা বৃদ্ধ বয়সে তীর্থবাসে অভিলাষী হন, কিন্তু বিশ্বরঞ্জন সে অভিলাষ রাখেন না; তিনি বলেন, সকল তীর্থ আমার এইখানে।

পাঠক মহাশয়! ধর্ম্মপিপাসা, প্রেমপিপাসা ও সংসার-পিপাসার পরিণামে কি প্রকারে শান্তিবারি বর্ষিত হয়, দৃষ্টান্তসহ এই পুস্তকে তাহা চিত্রিত হইয়াছে। কাপালিকের উপাখ্যান অনেক পুস্তকে দৃষ্ট হয়, এই আখ্যায়িকায় সে বিষয়ের চর্ব্বিতচর্ব্বণে আমার ইচ্ছা ছিল না; প্রসঙ্গের আনুসঙ্গিক ঘটনা মধ্যে আসিয়া পড়াতে কাজে কাজেই যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতে হইয়াছে। এক্ষণে এই আখ্যায়িকা পাঠে আপনাদের যদি কিঞ্চিৎমাত্র প্রীতিলাভ হয়, তাহা হইলে আমার উদ্যম সফল হইবে। আপনারা বিচার করুন, আমি বিদায় হইলাম।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

গীত।

মালকোষ,—আড়াঠেকা।

কি মায়া মা মহামায়া, কে তাহা বুঝিতে পারে।
বর্ণাতীত মসীবর্ণা বর্ণিবারে বর্ণ হারে॥
ওমা কুল-কুণ্ডলিনী, মায়া পদ্ম বিহারিনী,
বিরাজিছ নাভিপদ্মে, প্রসুপ্ত ভুজগাকারে॥
ধ্যান-যোগে মুদি আঁখি, মায়ান্ধ হয়ে থাকি,
তোমারে মা নাহি দেখি, মায়া অন্ধকারে;
নয়ন মেলিয়া চাই, কিছু না দেখিতে পাই,
মায়াতে রেখেছ ঢেকে বিপুল ভবসংসারে॥
সতত বাসনা মনে, ছেদিয়া মায়া-বন্ধনে,
মা তব রাঙ্গা চরণে পূজি ষোড়শোপচারে।
দেহিমে জ্ঞান নয়ন, হেরি যুগল ওচরণ,
তোমাতে সঁপিয়া মন, ঠকাইয়া দিব মায়ারে॥

জীবন ও তাহার সাধন।

লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এল।

অনন্ত সাগর-তীরে বসিয়া, অজস্র, অসীম, অক্লান্ত, নিত্য, তরঙ্গ-ভঙ্গী নয়ন-গোচর করিলে,—কল্লোলশীলা উর্ম্মিমালার অপূর্ব্ব নৃত্য-কৌশল সন্দর্শন করিলে, বীচিমালার নিত্যমুখরিত বাণীর মধ্যে, লবণাম্বুরাশির গভীরতা হইতেও গভীরতর গভীরতা ও সমুদ্র-নির্ঘোষ অপেক্ষাও গম্ভীরতর নিনাদ হৃদিরত্নাকরের অগাধ জল-মধ্যে দৃষ্ট ও শ্রুত হয়।

কত অসংখ্য লোকেই, এই পবিত্র শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথকে, পুরুষোত্তমকে, রথস্থ দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিতে, আগমন করেন। সকলেরই বিশ্বাস যে, রথস্থ বামনকে দর্শন করিলে, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। আমরা কি, অসীম, অনন্ত জগতের নাথকে আমাদের দেহ-রথে আরূঢ় দর্শন করিয়া, অশেষ বাধাবিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক পুরুষোত্তম মহাতীর্থে আগমন সার্থক করিতে পারিব না?

অকূল জলধির সৈকতে দণ্ডায়মান হইয়া, যদি জড়ে ও চৈতন্যে, ব্যক্তে ও অব্যক্তে একটী নিত্য যোগ অনুভব করিয়া, অসীমেতেই সসীমের স্থিতি, হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারি, তবে কি প্রকারে, আমরা অ-প্রমত্তচিত্ত ও ক্ষীণদোষ হইয়া, রথস্থ পুরুষোত্তমকে দর্শন পূর্ব্বক হৃদয়গ্রন্থি সমূহ ছিন্ন করিব, সকল সংশয় ছিন্ন করিব, সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় করিব? পরাবরকে দর্শন না করিলে, কি প্রকারেই বা, এই মলিন জীবন বিশুদ্ধ হইবে,—জরা-মৃত্যু-শোক-দুঃখ-পূর্ণ জীবনের প্রয়োজনীয়তা সমাপ্ত হইবে, আমরা শাশ্বত, অক্ষয় আনন্দ লাভ করিব?

অনন্ত-প্রসারিত, নিত্য অশেষ-লহরী-লীলা-রস-রঙ্গে, মহৎসুল্লোলে সুমত্ত সরিৎপতি হৃদয়-সাগরের লহরী জাগ্রত করিয়া দিতেছে! জলধি-নির্ঘোষ প্রাণ-মধ্য হইতে সুদূরশ্রুত অনাহত সেই নাদীকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শুনাইয়া দিতেছে!

সেই দিল্-দরিয়ার আজব্ লহর দেখিতে যাইয়া, সম্মুখস্থ পারাবারের ও উর্দ্ধস্থ সুনীল নভের সহচর, সহোদর হইয়া পড়ি! তখন আমাদের সসীমতা অসীমতায় পরিপূর্ণ হয়,—আমাদের নশ্বরত্ব অমরত্ব লাভ করে, আমাদের বয়স অনন্ত যৌবনে প্রবেশ করে! তখন অনুভব করি, যে আমরা অমৃতের সন্তান,—আমরা রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর অতীত।

কি প্রকারে সেই জীবন লাভ করা যায়, যাহাতে জগন্নাথদেবের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠটী আর পুনর্ব্বার অভ্যাস করিবার নিমিত্ত, পুনরায় এই কষ্ট ত্রিগুণ ভোগ আবৃত্তি করিতে না হয়, ইহাই আমাদিগের বিচার্য্য।

জীবন কি? জীবের যাহা কিছু আছে, তাহার মধ্যে, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা আদরের, সর্ব্বাপেক্ষা যত্নের ও সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিষই তাহার জীবন। গুরুজনেরা আশীর্ব্বাদ-কালে বলেন, "শতং জীব".—অর্থাৎ শত বৎসর বাঁচিয়া থাক! ইহাই যদি জীবন হয়, অর্থাৎ কাল-সাগরের ঢেউয়ের উপর ক্ষুদ্র বা বৃহৎ একটী রেখাই যদি জীবন হয়,—এবং জলের রেখার মত, বালুকার রেখার মত, সমুদ্র ফেনের মত, যদি জীবন অস্থিরই হয়,-তবে এত দুঃখ জ্বালা, এত রোগ শোক, এত হা হুতোস্মিৎ বৃথাই বলিয়া মনে হয়! যাহা থাকিবে না, যাহা নিতান্তই পদ্মপত্র-গত জলের ন্যায়, সমুদ্র তরঙ্গস্থিত বুদ্বুদের ন্যায়, চঞ্চল ও অস্থায়ী, তাহার জন্য এত দৌড়াদৌড়ি, এত ছুটাছুটি, এত মারামারী কেন? সত্যই কি আমরা থাকিব না? মরিয়া যাইব? এখনকার এত প্রণয়, এত স্নেহ, এক মুহূর্ত্তে, এক নিশ্বাসে ফুরাইবে? কখনই না। আমদের হৃদয় চতুর্দ্দিকে মরণ দেখিয়াও, মরণের কথা শুনিয়াও, মরণের উপকথায় বিশ্বাস করে না। এইমাত্র মৃতদেহ ঐ শ্মশানের চিতানলে দগ্ধ করিয়া আসিলাম। সংসার জুরিয়া চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের রোল! তথাপি, যেন, প্রাণের ভিতর হইতে সমুদ্রের বায়ুর ন্যায়, অজস্রধারে অমৃতের হিল্লোল বহিতেছে, অমরত্বের মঙ্গল-বাণী প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। প্রাণ মরণের কথা শুনিয়াও শুনে না, মানিয়াও মানে না। প্রাণ বলে "আমি অমর, অনন্তে আমার উৎপত্তি,—অনন্তেই আমার স্থিতি, অনন্তেই থাকিব। কেহ আমাকে অনন্তের বক্ষ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। মানব একবার জীবনে দখল প্রাপ্ত হইলে আর সে বেদখল হইতে চাহে না,—পারে না!

হিন্দু সাধকগণ দেহতত্ত্বের বড়ই জারি করেন। আসুন দেহতত্ত্ব কি বলেন একবার দেখা যাউক। দেহতত্ত্ব বলেন যে, পিতৃবীর্য্যের মধ্যে সূক্ষ্ম সূচ্যগ্রে যতটুকু বীর্য্য থাকে, তাহারই মধ্যে কোটী কোটী সজীব পদার্থ রহিয়াছে! তাহাদিগকে "প্রোটোপ্লাসম্" বলে। একটী সূচিকার অগ্রভাগে,—একবিন্দু বীর্য্য মধ্যে, কোটী কোটী যে জীবাণু থাকে, তাহারই একটী মাত্র, মাতৃজরায়ুতে প্রবেশ করিয়া বাঁচিয়া ও লাগিয়া এক একটি মানব ভ্রূণরূপে পরিণত হয়। প্রথমে কতই ক্ষুদ্র! কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার অপূর্ব্ব কারীগুরিতে, ক্রমশঃ ইন্দ্রজালে, ঐ জীবাণু পরে লালা, মাংস, অস্থি ও লোমযুক্ত হইয়া মানব শিশু আকারে দশম মাসে ভুমিষ্ট হয়। এক একটী কীটাণুকীটই এক একটী নরনারীরূপে অবতার হয়। এক ফোঁটা শুক্রে যতগুলি কীটাণু থাকে, তাহাতেই একটী দেশের সমুদায় লোক সৃষ্টি হইতে পারে! এমনই স্রষ্টার অপূর্ব্ব কৌশল!

এইরূপে দেখা যায়, এক বিন্দু শুক্রের মধ্যে, কতই ব্যাস বাল্মিকী, কতই কৃষ্ণ বিষ্ণু কতই আকবুর নেপোলিয়ান, লীন সুগুপ্ত ও রহিয়াছেন। এক বিন্দুর ভিতরে কতই মায়াজাল! কতই শক্তি! কতই সুখ দুঃখের, কতই বুদ্ধি, স্মৃতি, কল্পনা ও প্রেমের বীজ নিহিত রহিয়াছে! যেমন, একটী বীজমধ্যে সমগ্র অরণ্যের অস্তিত্ব গুপ্ত থাকে, একটী বীজ মধ্যে বটবৃক্ষের সমুদায় শাখাপত্র প্রভৃতি অব্যক্ত থাকে, তেমনই!! এই প্রকারে দেখা যাইতেছে যে মাতৃগর্ভে মানব প্রথমতঃ এই দেহ গ্রহণ করিয়া, তৎপর, এই পৃথিবীর লীলাক্ষেত্রে হস্ত-পদ, হিংসা-দ্বেষ-বিশিষ্ট জীব হইয়া অবতীর্ণ হয়। অতি ক্ষুদ্র হইতে মানব এত বড় হইয়াছে বলিয়া, এতই অহঙ্কারে স্ফীত হয়।

এই প্রকারে তো, দেহ জন্মিল। কিন্তু জীবন কি, মরণ কি, জীবন কি প্রকারে হয় ও যায়, দেখিতে হইবে।

জীবন অনন্ত। মানব অমর। আমি আছি। আমি ছিলাম। আমি থাকিব। সমুদায় সংসার একত্র হইয়া,—সমুদায় সাহিত্য, পুরাণ, কবি, শাস্ত্র একযোগে, সমবেত চেষ্টা করিয়াও, আমাদিগকে জীবন হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। মানবের অমরত্ব,—অনন্ত জীবন সম্বন্ধে জনক, যীশু, যাজ্ঞবল্ক্য, মৈত্রেয়ী, সক্রেটীস প্রভৃতি নানা উপদেশ করিয়াছেন।

আমি কেন মরিব? এই দেহ রোগে, শোকে জীর্ণ হইলে, জীর্ণ বসনের ন্যায়, ইহাকে একদিন না একদিন, ত্যাগ করিতেই হইবে। হইলেই বা ক্ষতি কি? দেহ ত্যাগ বা ক্ষয় হইলেই বা আমি মরিব কেন?

আমি কে? আমি কি? আমার জীবন কি? আমার মরণ কি?

দেহ ত্যাগ হইলে, আমার মরণ কেন হইবে? এই তো কিছুদিন পূর্ব্বে মাতৃগর্ভে, এই দেহ গ্রহণ করিয়াছি। তৎপূর্ব্বে পিতৃ শোণিতে জীবাণু আকারে ছিলাম। কিছুদিন পরে না হয়, শ্মশানের চিতায় ভস্মীভূত হইব। নচেৎ, সমাধিতে কীটদষ্ট হইব। ধূলীর দেহ ধূলীতে মিশাইবে। আমার চৈতন্য, আমার আত্মা, তো ধূলী হইতে পারে না,—হইবে না,—হইতে চাহে না! মাটির দেহ মাটি হইবে, তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি মরিব কেন?

(১) এই দেহ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, যদি, আমি ছিলাম, তবে, এ দেহ-ত্যাগের পরেও কেন না আমি থাকিব?

(২) আমি তো দেহ নহি। দেহ আমার। আমার বলিলেই, আমার সম্পত্তি, আমার স্বামিত্ব, আমার অধিকার ও দখলীভূত বস্তু বুঝাইল। আমার ভোগ দখলের সামগ্রী ও আমি কি পৃথক বস্তু নহি? আমার আবাস, আমার বস্ত্র,

আমার মন, হৃদয়, স্মৃতি, ইচ্ছা আমার আত্মা হইতে ভিন্ন। আমার শরীর ও আত্মা বহুকালএকীভূত হইয়া অবস্থান করায়, ঘনিষ্ঠতাজনিত একতা অনুভূত হয় মাত্র। কাজেকাজেই দেহের ধ্বংশকে মরণ বলিলেও, উহাকে আমার জীবনের নাশ বলিতে পারি না। ইহা জীর্ণ বস্ত্রত্যাগ, বাসাবাড়ী ত্যাগের ন্যায় আমার নাশ সূচক নহে।

(৩) আমি ও আমার দেহ পৃথক। কাজে কাজেই আমার আত্মার ও আমার দেহের জীবন ও মরণও এককথা নহে।

(৪) আমি ও আমার দেহ, যদি, এক হইতাম, তবে মৃত দেহটী পড়িয়া থাকিলেও প্রিয়জনেরা, আমি নাই বলিয়া আক্ষেপ করেন কেন? দেহই যদি আমি হইতাম, তবে ঐ তো, দেহ সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, আমার না থাকার ও চলিয়া যাওয়ার জন্য, আত্মীয় স্বজনেরা এত ক্রন্দন করেন কেন?

(৫) আমার আত্মপ্রত্যয় বলিতেছে যে, আমি নষ্ট হইব না। চতুর্দ্দিকে নিত্য দেহত্যাগের ও তজ্জনিত শোকের অভিনয় দেখিতেছি,—সকলের মুখেই মরণের বিভীষিকাময়ী কাহিনী শুনিতেছি,—তবুও প্রাণের ভিতর অমরত্বের ভাব গূঢ়ভাবে, অব্যক্তভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(৬) আমার অমরত্বের কথা,—মৃত্যুর পরপারের জীবনের কথা,—সকল দেশীয় পুরাণাদিতে কীর্ত্তিত। প্রেতলোক ও প্রেততত্ত্বে মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাস।

(৭) দেহের পরমাণুর ক্ষয় নাই, বিজ্ঞান বলেন। জড়ের বিনাশই যখন প্রমানীকৃত হইল না, তখন, চৈতন্যের, আত্মার বিনাশের তো, কোন কথাই নাই! বরং উহার অবিনাশত্বের পক্ষেই প্রমান অধিক। আমরা মরণের বিভীষিকাময়ী ছায়া কল্পনা করিয়া অকারণ কাঁদিয়া মরি,—পরলোকের ভয়ানক চিত্র দ্বারা মনের প্রকোষ্ঠ সজ্জিত করিয়া, বৃথাই মনকে অজ্ঞান, দুঃখের, তমোজালে আচ্ছন্ন করি!

তত্ত্বদর্শী মৃত্যুকে উপহাস করেন,—যথা সক্রেটীস! প্রেমিক মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করেন,—কণ্ঠাভরণ করেন,—আলিঙ্গন করেন,—যথা সাবিত্রী। বিশ্বাসী মৃত্যুকে নবজীবনের ভূমিকা জ্ঞান করেন,—যথা গুরুগোবিন্দ। ভক্ত মৃত্যুকে প্রভুর দান বলিয়া গ্রহণ করেন,—যথা ঈশা। ঈশা, সক্রেটিস, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতিকে মরণ হিরণ্ময় মুকুটে শোভিত করিয়াছে! তবে মরণের ভয় কেন? কোথায়?

"মরণ, মরণ" করিয়া লোকে ভয়ে জড়সড়। মরণ যদি না থাকিত, তবে এই জরা-রোগে-শোকময় জীবন কি অসহনীয় ও কষ্টকরই হইত? মীশরদেশীয় লোকগণ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমক্ষে ভোজনান্তে নর-কঙ্কাল প্রদর্শন করিত। ইহার তাৎপর্য্য এইযে, খাও, দাও, নাচ কোঁদ, ভুলিও না যে এই দেহ অনিত্য!

মৃত্যু ভয়াবহ নহে। ভেষজ্ঞেরা বলেন যে, মৃত্যু কষ্টশূন্য। যতক্ষণ কষ্টবোধের ক্ষমতা থাকে,—শীরা ও ইন্দ্রিয় গণের চেতনা ও অনুভূতি থাকে, ততক্ষণ মৃত্যু হয় না,—দেহ হইতে আত্মা সরিয়া পড়ে না। ইন্দ্রিয়গণ চেতনাশূন্য না হইলে,—স্নায়বিক ইশারা বাহির হইতে ভিতরের দিকে, এবং ভিতর হইতে বাহিরের দিকে, বৈদ্যুতিক সংবাদের মত গ্রহণ ও প্রেরণ করিতে না পারিলে মৃত্যু ঘটে না। যতক্ষণ সে ক্ষমতা আছে, ততক্ষণ দেহ ও তাহার চেতনা বা জীবন আছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুনর্জীবিত মৃতপ্রায় ব্যক্তির সাক্ষ্যাতেই ইহার প্রমান।

জড় দেহই নষ্ট হয় না, তবে প্রকৃত মরণ হইবে কি প্রকারে? বিজ্ঞান বলিতেছে যে, জড় অবিনাশী। জড়কণার ধ্বংশ নাই। কেবল পরিবর্ত্তন আছে মাত্র। জড়কণার চেতনা আছে ও সাড়া পাওয়া যায়, কেহ কেহও বলেন। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন "পর্ব্বৎগণ ধ্যান করিতেছে।"

মরণ এত ভয়ানক, তাহার কারণ, আমরা জানি না যে, জীবন কি, এবং মরণ কি। সংসারের ছাই ভস্মগুলিকে লইয়া, ভস্মান্ত দেহের ক্ষণিকের সুখচেষ্টা ও কল্পনাকে লইয়া, এই সংসারের এমনই একটী আকাশ কুসুমের মত স্থায়ী সুখের কল্পনা করিয়াছি, যে সে সমুদায় হইতে মরণ আমাদিগকে হঠাৎ সরাইয়া লয় বলিয়া, মরণকে এত ভয়। আমরা যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদের হইতে দূরে যাইতে হইবে, এই সংস্কার থাকায় মৃত্যু এত ভয়ঙ্কর। আমরা জানি না যে, জড়-ইন্দ্রিয়, জড়-প্রাচীর দূর হইলে, আমরা আরও উত্তমরূপে পরস্পরের আত্মার সহিত যুক্ত হইতে পারিব।

জড়কণারই যখন ধ্বংশ নাই, তখন চিৎকণা, জীবাণুর ধ্বংশ কি রূপে সম্ভবে হইতে পারে? আমি জড় দেহের সঙ্গে দগ্ধ হইতে পারি না। আমি স্বর্গদ্বার হইয়া, অমরধামে চলিয়া যাইব, মৃত্যু আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না! মৃত্যু আমার একটি কেশকেও স্পর্শ করিতে পারিবে না!

প্রিয় বস্তু হইতে অন্তর করিবে বলিয়াই মৃত্যুকে আমরা ডড়াই। প্রিয় বস্তু এত মিষ্ট হয় কেন? প্রেমে। প্রেম তো দেহের গুণ বা শক্তি নহে। উহা অতীন্দ্রিয়, অজড় বস্তু। তবে জড়দেহটী সরিয়া গেলেই,—প্রেমটী নষ্ট হইবে কেন? মৃত্যু প্রেমকে নষ্ট করিতে পারে না,—বৰ্দ্ধিত করে। প্রেম উজ্জলতর প্রিয়তর, সুমিষ্টতর ভাবে প্রিয় বস্তুর স্মৃতিকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া রাখে।

বরং, প্রেম যেখানে, মরণ সে স্মৃতিকে গভীরতর, মধুরতর করে, এবং প্রেমের অতীন্দ্রিয় অনুশীলনের সহায়তা করে। প্রিয় বস্তু চক্ষের অন্তরাল হইলেও, সে আছে। নয়নাতীত হইলেও, সে আছে। তাহার দেহক্ষয়ের, দেহ বিয়োগের প্রমান, না হয় পাওয়া গেল। দেহের জীবাণু ও আত্মার নাশের কোনও প্রমান পাওয়া যায় নাই।

বাস্তবিক ভাবে দেখিতে গেলে, মৃত্যুর ভয়কে বিশ্লেষণ করিয়া, একটী জিনিষ দেখিতে পাই,—সেটী অন্তর হওয়া,—যোগ ভগ্ন হওয়া,—চারিদিকের বিষয়ের সহিত যোগ ও বনিবনাও না থাকা। সমুদ্রের তারা মৎস্যকে পুলিনে উত্তোলন কর, সে মরিয়া যাইবে। উত্তোলনান্তর, জীবন থাকিতে থাকিতে, উহাকে পুনরায় তাহার চিরাভ্যস্ত, পার্শ্ববর্ত্তী বিষয়ের মধ্যে, তোয়রাশিতে তাহাকে নিক্ষেপ কর, সে বাঁচিয়া উঠিবে।

প্রেম, যোগ, মিলনই জীবন। অপ্রেম, অমিলই মৃত্যু, বি-যোগ, বিয়োগ। বিচ্ছেদই মরণ। তাই কবিরাজ গোস্বামী গাহিয়াছেন,—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জম্বু নদ হেম,
হেন প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে, কেহ না জীয়ায়॥"

শীতপ্রধান দেশের গাছগাছড়া ও জীবজন্তুকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জল হাওয়ার মধ্যে আনয়ন কর, মরিয়া যাইবে! সেই জল হাওয়ার সঙ্গেই তাহাদের মিল। সেই দেশেই হয়েছে, রয়েছে, বাঁচিছে, অন্য স্থানের জল হাওয়ার সঙ্গে মিল না থাকিলে, স্থানান্তরিত হইলেই, তাহারা সেখানে মরিয়া যাইবে!

মিল, সামঞ্জস্য, যোগ, প্রেমই জীবন। তদভাবই মরণ। জড় জীবন, পশু জীবন, মানব জীবন, সকলই ঐ নিয়মের অধীন।

জীবনের অভাবই মরণ। যাহা জীবনের, মিলের, যোগের বিঘ্নকর, তাহাই বিষবৎ বর্জ্জনীয়।

মানুষ, নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না করিয়া লইতে পারে, বলিয়াই, অ-মিল, অ-সামঞ্জস্য ঘটিলেও বাঁচিতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ অ-মিল হইলে তিষ্টিতেই পারে না, মরিয়া যায়। জল হাওয়া সহ্য না হইলে, বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে হয়। দুর্ভিক্ষ হইলে,—মহামারী রোগ ইত্যাদি হইলে স্থানান্তরিত হইতে হয়,—জীবনের বিঘ্ন সমূহ বুদ্ধি ও বিবেচনা পূর্ব্বক দূর করিতে হয়।

জড় জড়ের মত রহিয়াছে। পশু পশুর মত রহিয়াছে। শালগম গাজরের মত, কুকুর শৃগালের মত, জীবন হইলে তো মানব জীবন হইল না। মানবের অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় নামক, পেঁয়াজ লশুনের কোষের মত, সাতটী কোষ রহিয়াছে। একের মধ্যে অন্য এক সূক্ষ্মতর শক্তি রহিয়াছে, যদ্দ্বরা মানুষ সমুদায় জীব চেষ্টা করিতেছে,—জীবন যাপন করিতেছে। জড় জীবন, পশু জীবন ও মনুষ্য জীবন পৃথক হইলেও কতদূর পর্য্যন্ত মনুষ্য জীবনের সঙ্গে একধর্ম্মতা রহিয়াছ। প্রাণ, মন, হৃদয় ও আত্মার শক্তি অনুশীলন দ্বারা মানব জড় ও পশু হইতে উন্নত। তাই মানবের এত গৌরব।

আমি যদি, বলি যে, অমুক ব্যক্তি জড়-ভরৎ বা পশু, অমনি তিনি আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিবেন। তাহার কারণ আমরা জানি যে, জড়জীবন ও পশুজীবন, মনুষ্য জীবন হইতে অনেক নিকৃষ্ট। অতএব পশুবৎ বা জড়বৎ জীবন যাপন করা না করা একই কথা। উহা মনুষ্যের পক্ষে মরণ, বা তদপেক্ষাও মন্দ অবস্থা।

প্রকৃত পক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে, মরণ নাই। মরণ একটী উপকথা, কুসংস্কার মাত্র। প্রকৃত মরণ অর্থে প্রকৃত জীবনের অভাব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জড় জীবন, পশুজীবন, মানবের পক্ষে মরণ।

মানবের যে কয়টী কোষের কথা উপরে বলিয়াছি, তাহার মধ্যে উদ্ভিদেরও অন্নময় ও প্রাণময় কোষ আছে। অতএব অন্নময় দেহ ও তন্মধ্যস্থিত প্রাণ-শক্তির পরিচালনাই, যে জীবনের একমাত্র সার লক্ষ্য, সে জীবন কদাচই মানবের লক্ষ্য হইতে পারে না। মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, হিরণ্ময় কোষ এক একটী উজ্জলতর ও শ্রেষ্ঠতর অবস্থা। ঐ ঐ কোষের বিষয়ীভূত সামগ্রীগুলির সহিত মিল ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাই মানবের জীবন। কেবল মনোময় কোষের মনন্বং জীবনের লক্ষ্য অনুশীলন করিলেই চলিবে না। সংসারে যাহারা কেবল বেণিয়াগিরী এবং নানা কুক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহারাও মনের ঔৎকর্ষ সাধন করিতে পারে। তদপেক্ষা উন্নততর জীবনই আমাদের লক্ষ্য। যতক্ষণ মানব বিজ্ঞানময়ের চিদাভাস নাপায়, ততক্ষণ তাহাকে জীবিত কেমনে বলিব? কোন ইন্দ্রিয় কর্ম্মক্ষম না হইলে, ইংরাজিতে তাহাকে "মৃত" বলে,—কেহ কোন বিষয়ে উদাসীন হইলে, তৎপ্রতি সে "মৃত" বলে।

এই জড় দেহ যেমন, আকাশের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তেমনি তো, আর আমাদের আত্মা ও চৈতন্য চৌদ্দপোয়ার মধ্যে লহিত বিষয় নহে। আত্মা চৈতন্য পদার্থ। উহার উৎপত্তি, স্থিতি, গতিও চৈতন্যের মধ্যে।

দর্শন ও বিজ্ঞান একবাক্যে বলিতেছেন যে, জগতের তাবৎ পদার্থ একই অনন্ত শক্তি হইতে উৎপন্ন। শাস্ত্র ও ভক্ত বলিতেছেন, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা এক। উপনিষৎ বলেন "প্রাণো হ্যেষ য সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি, বিজ্ঞানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতি ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।" (মুণ্ডক। ৩।১।৪।)

হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান, এই শক্তিতে বিশ্বাস করেন। ওষধি বনস্পতি, পশু মানব, আকাশ ও বারিধি, গ্রহ, নক্ষত্র সকলেই, সেই অজ্ঞাত শক্তির চালনায় চলিতেছে।

কেন উপনিষৎ মানব আত্মার ভগবৎসম্বন্ধীয় প্রশ্ন অতি মঞ্জুল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥" (১)

মন কাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিজ বিষয় প্রতি গমন করে? প্রাণ কাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে? কাঁহার ইচ্ছাতে লোকে এই বাক্য উচ্চারণ করে? কোন দেবতাই বা চক্ষু ও কর্ণকে নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন?

ঐ উপনিষৎই উহার উত্তর করিতেছেন,—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥" (১২)

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, ইহা জানিয়া, অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, আত্মা ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে, মানব অমর হয়।

যিনি প্রাণ, যাঁহাতে হইয়াছি, রহিয়াছি ও থাকিব, তাঁহার সঙ্গে আমাদের নিত্যযোগ,—তাঁহার সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ যোগ এ রূপ আর কাহার সঙ্গে ও নহে। অন্য যোগ দুদিনের, সুখের পায়রার যোগের মত।

আত্মা পরমাত্মাতেই জাত, জীবিত, স্থিত। অতএব তাঁহার সঙ্গে মিল, যোগ, সামঞ্জস্যই জীবন। যত পরিমাণে যোগ, ততই জীবন। তদভাবেই মরণ। যাহাতে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলের সামঞ্জস্যের, যোগের, প্রেমের ব্যাঘাত ঘটায়, তাহাই মরণ,—মরণের কারণ,—হলাহল।

কি প্রকারে এই মরণ-বিষধরের, এই যমের হস্ত এড়াইয়া জীবন স্বরূপের অনন্ত লহরী-লীলার অন্তরঙ্গ, অন্তর্ভূত হওয়া যায়, তাহারই নাম সাধন,—অনুশীলন, যোগ।

সাধন।

জীবন নিশ্বাস লওয়া নহে,—ষাঁড় হস্তির মত মোটা হওয়া নহে,—শালগাছের ন্যায় বাড়া নহে, সমুদ্রতরঙ্গ বা পবনের ন্যায় বহিয়া যাওয়া নহে। অট্টালিকা ও অর্থস্তূপ নির্ম্মাণ করা, বা, সংসারের জয়ঢকা নিনাদিত করাও জীবন নহে। অশ্বমেধ রাজসূয় যজ্ঞ করা, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করা,—লক্ষ্য লক্ষ্য লোককে ভোজন, দান বা শাসন করাও জীবন নহে।

চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছাই জীবন। জীবন নিজেকে গড়িয়া তোলা, মানুষ করা,—আত্মার ভিতরে নিহিত শক্তি সমূহকে ফুটাইয়া তোলা,—যে জন্য স্রষ্টা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য সফল করা।

জীবন গঠন করিতে হয়। জীবন সাধনের বস্তু। সকল সুকুমার শিল্পের মধ্যে, জীবনকে সুন্দর করিয়া তোলা, গঠন করাই, সর্ব্বোত্তম সুচারু শিল্প,—সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যা।

জীবন-শিল্প অঙ্গুলির অনুশীলন নহে,—কণ্ঠের অনুশীলন নহে,—দেহের বা মনের বা কোন অঙ্গের অনুশীলন নহে, উহা দেহ-মন-প্রাণ যোগানুশীলন।

শিল্পী তাঁহাকেই বলা যায়, যিনি বর্ণ, শব্দ বা অন্য কোন উপকরণের প্রাকৃতিক বিধি অবগত হইয়া, তদনুসারে বর্ণ পরিধারের বা অন্য বিষয়ের এমনই মিল ও সামঞ্জস্য করেন, যে উহা ঠিক প্রকৃতির হস্তরচিত মনে হয়, এবং সুখের নিদান হয়।

কাল সমুদ্রের বুদ্‌বুদের মত, তরঙ্গোত্থিত ফেনরাশির মত, ক্ষণিক, চঞ্চল, অস্থায়ী ও মরণশীল দেহ লাভ করিয়া, যদি অসত্যের মধ্যে সত্যকে, অজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞানকে, মরণের মধ্যে জীবনকে, গরলের ভিতর অমৃতকে চিনিতে ও ধরিতে পারি, তবেই এই জীবনকে সার্থক বলা যায়, নচেৎ ইহাই মরণ। অনিত্য, অস্থির-শীল বিষয়ে মগ্ন থাকাই মরণ। তদতীত হওয়াই জীবন।

এই অস্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল, মরণশীল দেহকে, যদি, আত্মা বলিয়া ভ্রম করি,—দেহের সুখের জন্যই, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্যের সাধন ও অনুশীলনই, মানব জীবনরূপ এই ক্ষণস্থায়ী মহা সুযোগকে হারাই, তবে কত পরিতাপের বিষয় হইবে? যাহা যাহা জানা উচিত, তাহা যদি না জানিলাম,—যাহা করা উচিত তাহা যদি না করিলাম, তবে জগন্নাথের এই বিশ্বধামে, এই পুণ্যধামে, আসা ও অশেষ ক্লেশ ভোগ করা বৃথাই। আমরা কেবল ভ্রান্ত ও শ্রান্ত হইলাম। এই মহাতীর্থে ধর্ম্ম করিতে আসা, অ-ধর্ম্ম করিতে আসা নহে। এই পবিত্র শ্রীক্ষেত্রে স্থান লাভ করিয়া, জীবনলাভ করিয়া, যদি জীবন সাগরের লহরী-লীলা দর্শনই না করিলাম, তবে জীবন বৃথাই হইল, জীবন লাভ করিয়াও হারান হইল। তবে আত্মপ্রতারিত হইলাম!

যাঁহারা জীবনের জীবনকে না জানিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হয়েন, তাঁহারা আত্মঘাতী,—"আত্মহনো জনাঃ। (ঈশোপনিষৎ। ৩।) উপনিষৎ বারম্বার বলিতেছেন যে "ইহাকে জানিলে অমৃত লাভ হয়।" "প্রতিবোধ বিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।" (কেনোপনিষৎ। ১।২) তাঁহাকে সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শীতরূপে জানিলেই প্রকৃত জানা হয়। এ রূপ জ্ঞানে অমৃত লাভ হয়।

এই জীবন গঠন, অমৃতলাভ বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা সাপেক্ষ। তাই উহাকে সর্ব্বোত্তম সুচারু শিল্প বলিয়াছি। Finest art বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই। কেবল একটী সাধারণ কলা বিদ্যা নহে। উহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও সুন্দর বিদ্যা।

মানুষ কেবল দেহই নহে। দেহ তাহার গৃহ,—বাঁসাবাড়ী,—কর্ম্মেন্দ্রিয়,—অফিস্। ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিলেও, আমি অনুভব করি যে, আমি হস্ত নহি, পদ নহি, চক্ষু নহি, কর্ণ নহি, অন্য কোন ইন্দ্রিয় নহি। আমি নিশ্বাস নহি। শ্বাস কার্য্যের আরম্ভ বা শেষও আমার ইচ্ছার অধীন নহে। কাজে কাজেই যাঁহার দত্ত এ প্রাণ, এ নিশ্বাস, তাঁহার সঙ্গে জানা চিনা, ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা, সামঞ্জস্য করা আমার কর্ত্তব্য। যাঁহার ঘরে থাকিলাম, যাহার খাইলাম, পরিলাম, যাহার ইচ্ছায় সমুদায় সুখসম্ভোগ করিলাম, বাঁচিলাম, তাঁহার সঙ্গে মিল না করা, পরিচয় না কর,—তাঁহাকে না জানা, না মানা কি উচিত? তাঁহার বিরোধিতাই পাপ,—জীবনের অন্তরায়,—মৃত্যুর কারণ।

এ জীবন যাঁহাতে হইয়াছে, রহিয়াছে ও থাকিবে, তিনি জীবনের জীবন, জীবন-সমুদ্র। মেঘেতে যে বিজুলি চিকুরের মধ্যে প্রকাশিত হয়, তাহার প্রকাশ ক্ষণকালের জন্য, তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, এই অনন্ত তড়িত- ভাণ্ডারেই। যন্ত্রস্থ বা ঘটস্থ বিদ্যুৎ তাহার একটী প্রকট ভাব। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত পৃথকভূত, ঘটস্থ বদ্ধ। তাহা বই আর কিছুই নহে।

আমাদের আত্মা ও জীবন তেমনি। আমাদের চৈতন্য অনন্ত চৈতন্য হইতেই উৎপন্ন। অতএব এই, আমাকে সেই পরমাত্মার বিধির,—প্রকৃতির নিয়মের,—ব্রহ্মের ইচ্ছার অনুরূপ, বশবর্ত্তী করাই, জীবনশিল্পের শ্রেষ্ঠ অনুশীলনের উপায়।—তৎবিরুদ্ধ হওয়াই মরণের উপায়,—পাপ,—নরক।

জীবনকে এই ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে, যাহাতে তাহার ব্যাঘাৎ হয়, তাহা যত্ন পূর্ব্বক বর্জ্জন করিতে হইবে, তাহাকে অহিতকর, গরলরূপে শত্রুবৎ, জ্ঞান করিতে হইবে।

সংসারের লোকের মত অনুসারে উকিল, বণিক বা হাকিম হওয়াই জীবন নহে। যে ব্যক্তি বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন ও ব্যয় কার্য্যে জীবনের সমুদায় শক্তি অপচয় করে, সকলেই তাহাকেই করতালি দেয়। সংসারের করতালি, সংসারের প্রশংসা-পত্র লাভ করিলেই, যেন আমরা মনে না করি যে, আমরা বেশ লোক হইয়াছি,—কারণ দশজনে আমাদিগকে ভাল বলিতেছে।

যতটা আমরা সংসারে অগ্রসর হই, সংসারের উন্নতি ও তজ্জনিত প্রশংসা এবং আত্মপ্রসাদে ডুবিয়া থাকি, তত পরিমাণেই আমরা জীবনের পথে, বাঞ্ছনীয় ভাবে উপযুক্ত মাত্রায় অগ্রসর হইতে পারি না। এককালে দুইটী বিষয়ে ঔৎকর্ষলাভে সুকঠিন। স্বর্গ নরক, জীবন মরণ, সংসার ও ভাবনা লাভের পথ বিভিন্ন।

শিল্পবিদ্যার ঔৎকর্ষলাভ করিতে হইলে, যেমন, সকল বিষয় ত্যাগপূর্ব্বক, এক অনুশীলনীয় বিষয়েই মনোনিবেশ করিতে হয়, তেমনি জীবনগঠনে উত্তম কৃতিত্ব করিতে হইলে,—সফলতা লাভ করিতে হইলে,—অন্য দিকে মন, হৃদয় ও আত্মার শক্তি ব্যয় না করিয়া, বরং সঞ্চয় করিয়া, একই অনুষ্ঠিতব্য বিষয়ে, সমুদায় শক্তি, সময় ও চেষ্টা নিয়োগ করিতে হয়। তজ্জন্যই মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন যে যদি, পূর্ণ ফল লাভ করিতে চাহ, সিদ্ধ হইতে চাহ, তবে যাও, যাহা কিছু আছে বিক্রয় করিয়া আমার সহিত আইস। (Math. 19, 16.")

সংসার তবলায় চাটি মারিয়া কেহ কখনও পূর্ণজীবন গঠন করিতে,— সিদ্ধ হইতে পারে নাই। তবে আমাদিগকে সংসারে থাকিতেই হইবে। যতটা অধ্যাত্ম জীবন গঠনের দিকে দৃষ্টি রাখা যায়, ততটাই সফলতা লাভ করিতে পারা যায়।

আ-জীবন,—আ-যৌবন কোন বিষয় অভ্যাস ও সাধন না করিলে, তাহাতে তেমন সিদ্ধিলাভ করা যায় না। একদিন দা, দ্রি, দারা, করিয়া, কেহ সুরবাহার ও বীণা যন্ত্রের অমৃত-লহরী-উত্তোলন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। বহুকাল ধরিয়া লৌহ ও কাষ্ঠে অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিলে পর, তবে, যন্ত্রমধ্য হইতে অশেষ মাধুর্য্যরাশি বর্ষিত হয়। তেমনি জীবনকে অমৃতের প্রস্রবণ, দুঃখের চিরসমাধি করিতে হইলে, অনন্তের সঙ্গে প্রাণের সুর বাঁধিতে হয়,—সুর মিলাইতে হয়।

ব্রহ্মবান হইতে হইলে, ব্রহ্মবৎ ও ব্রহ্মবিৎ হইতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞ হইতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য্যহীন হইয়া ব্রহ্মসাধন ও জীবনসাধন যা,—আর নরকের পথে চলিয়া, স্বর্গ কামনা করাও তা। যদি স্বর্গদ্বার দিয়া, অমৃতধামে প্রবেশ কামনা থাকে, তবে সেই প্রকার জীবন যাপন করিতে হইবে। সুন্দর হইতে হইলে,

বড় হইতে হইলে, সুন্দর, মহৎ, চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা ও কর্ম্ম চাই। অনিত্য সুখের চেষ্টা ও সম্ভোগ করিলে, নিত্য সুখ, নিত্য জীবন মিলে না। নিত্য সুখলাভের পথে চলিলে, তবে, নিত্য সুখের অধিকারী হওয়া যায়। পশুবৎ আচরণ করিব, অথচ, উচ্চ জীবনলাভ করিব, অমৃতের অধিকারী হইব, এ কেমন কথাও আব্দার?

যা করিবে, তাহাই ভুগিবে। যাহা রোপন করিবে, তাহাই অর্জন করিবে। আঁব লিচুর বীজে, আঁব লিচুই হয়। তেঁতুলের বীজে তেঁতুল হয়। পাপের ফল মরণ। পুণ্যের ফল জীবন।

স্বর্গ ও নরক আমাদের হস্তে,—আমাদের মধ্যে,—বাহিরে নহে,—দূরে নহে পরকালে নহে,—ইহকাল এইক্ষণে,—আমরাই আমাদের স্বর্গ ও নরক, জীবন ও মরণ,— আমাদের নিজের জন্যও রচনা করি,—সংসারের জন্যও করি।

এই সংসারটা গোলকধাঁধা। ইহাই গোলকধাম। তবে উহা হইতে মুক্ত হইবার গোলকধামে পৌছিবার একটা হেঁয়ালির মত পথ, সমস্যা করিয়া, জীবকে তন্মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা ছাড়িয়া দিয়াছেন,—নিক্ষেপ করিয়াছেন, নিজ ইচ্ছা, বুদ্ধি ও চেষ্টার অনুশীলন দ্বারা, স্রষ্টাকে খুঁজিয়া পাইবার জন্য। খুঁজিয়া পাইলেই ধাঁধা মিটিল, সর্ব্ব ভ্রম ও সংশয় দূর হইল,—বিপথগামী সন্তানের পিতৃ চরণে প্রত্যাগমন হইল। খুঁজিয়া পাইলেই আত্মা বড় হইয়া গুটি পোকার মত নিজের বন্ধন ভেদ করিল,—মুক্ত,—জীবন্মুক্ত,—ব্রহ্ম-মঙ্গলযুক্ত,—নির্ব্বাণযুক্ত হইল,—উত্তম পুরুষ হইল!

যতক্ষণ হৃৎপিণ্ডে ধুক্‌ধুকুনি টুকু রহিয়াছে, ততক্ষণ নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, জীবনস্বরূপ স্বয়ং আমার জীবনে ও মঙ্গলে স্বার্থযুক্ত রহিয়াছেন। আমাদের উত্তম স্বার্থ ও মঙ্গল কি, তিনিই জানেন। আমাদের সম্বন্ধে প্রভুর ইচ্ছা করযোড়ে অবনত মস্তকে, ভক্তিভরে, জানিয়া, তাহাই কার্যে পরিণত করাই শ্রেষ্ঠ জীবন-সম্ভোগের উপায়,—মানবের পক্ষে পুরুষোত্তম হইবার উপায়। তা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

সেই অনন্ত মঙ্গল ইচ্ছাকে বাধা দিতে নাই। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা কি ধীরভাবে শ্রদ্ধাবানভাবে অনুধ্যান করিলেই, জানা যাইবে। উপনিষৎ বলেন,—"তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।" শ্রীচৈতন্য বলেন,—"ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরিবে অন্তরে।" শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—"শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং।" এবং "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্, দদাতি বুদ্ধিযোগং তান যেন মাম্ উপযান্তি তে।" ঈশা বলেন,—"চাও, তবেই পাবে,—খোজ তবেই মিলিবে,—আঘাত কর তবেই খুলিবে॥" (Math. 7, 7,) জানিবার পাইবার, দেখিবার, আর অন্য কোন উপায় নাই। মহম্মদ বলেন, "তিনিই বিশ্বাসীদিগকে জ্ঞান ও শাস্ত্র শিক্ষা দেন।"

ভগবৎ ইচ্ছা জানা এবং জানিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করা, অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বা ডিগ্‌বাজির মত একটা আশ্চর্য্য ও কৌশলের কার্য্য নহে। উহা অতি স্বাভাবিক, নিশ্বাস লওয়ার মত সহজ কার্য্য। সহজ হইলেই সহজ। বিকৃত হইলেই কষ্ট।

জীবন জীবের প্রকৃত ও বাঞ্ছিত অবস্থা। জ্ঞান, শিক্ষা ও সমাজ জনিত অনেক বিকৃতি আমাদের প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়াছে। তাই আমাদের আত্মা এতই বিকৃত ও মলিন,—ইন্দ্রিয়ের দাস। আত্মাকে সুস্থ করিতে হইলে, রোগমুক্ত করিতে হইলে, পথ্যাপথ্য, জলবায়ু প্রভৃতির কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়।

আত্মসংযম ও বিধিপালন, অসৎসঙ্গবর্জ্জন ও সৎসঙ্গলাভ প্রভৃতি চিরপ্রচলিত সর্ব্ববাদী সম্মত সদানুষ্ঠানগুলি কত হয়।

বীরভূমির কবি চণ্ডিদাস গাহিয়াছেন। "সহজ ভজন, করহ যাজন, ইহা ছাড়া কিছু নয়।" এ কথা বড়ই সত্য। প্রকৃতির পথে চলাইপ্রকৃতির বিকৃতি হইতে মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন যে, 'বনভূমি হইতে নির্গত বসন্তপবনের একটী হিল্লোল সংসারের সমুদায় জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও অধিক উপদেশ দিতে পারে।" আত্মার মধ্যে বসন্তবায়ুর মুক্ত হিল্লোলপ্রবেশ করিলে,—পর্ব্বত, আকাশ ও সমুদ্রের অশেষ শোভারাশি হৃদয়ে স্তুপীকৃত হইলে, হৃদয় মলিন থাকিতেই পারে না!

নাক টিপিয়া দম্‌ আটকাইয়া, দণ্ডী ও উর্দ্ধবাহু হইয়া, সাধন করাতে আমার বিশ্বাস নাই। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা জীবনলাভের অন্তরায় সমূহ বিদূরিত হয়, তাহা প্রাণায়াম নহে। উহা "বাসনায়াম"। বাসনা-সংযম, ভোগবাসনা নষ্ট করা,—ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ চেষ্টা,কামাদি রিপু দমন করিলেই, জীবনপথে সহজে অগ্রসর হওয়া যায়।

নানা দেশে, নানা সাধন প্রণালী ও গুরুকরণের প্রথা প্রচলিত আছে। সাধারণ লোক গুরু ব্যতীত নিজ চেষ্টায় অধ্যাত্ম মার্গে গমন করিতে পারে না। যাঁহারা অনেক আধ্যাত্মিক চিন্তা করেন, ও ভগবানে একান্ত বিশ্বাসপরায়ণ, তাঁহারা অন্য গুরুর অপেক্ষা করেন না। "মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কানে, জগৎগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।"—জগৎ-গুরুর মন্ত্রে জীবন, ও শক্তি সঞ্চার হয়। মনুষ্য-গুরু নিজেই সমুদ্রতরঙ্গ-তাড়িত নৌখণ্ডের ন্যায় ভব-জলধির মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছে, সে আর অন্যকে পারে গমনের সাহায্য করিবে কে? নিজেই যাহারা অসিদ্ধ, তাহারা অপরকে সিদ্ধি দিবে, কি প্রকারে? বৌদ্ধ যোগশাস্ত্র বলেন, "সিদ্ধ ব্যক্তি নিজেই, সিদ্ধিলাভ করেন,— কেহ করাইয়দিা তে পারে না।" নিজেই, নিজের মুক্তি, স্বর্গ, সিদ্ধি

সাধন, যদি, করিলাম, তবে, গুরুর কি করিবেন ? যিনি, নিজেই সিদ্ধির পথ-বুঝিয়া, লইতে পারেন,—সেই পথে চলি তে পারেন, তাঁহার পক্ষে গুরুর প্রয়োজন নাই। নচেৎ আছে। ক, খ, গ, ঘ শিখিতে হইলে, গুরু চাই—সা, রি, গাম. শিখিতে হইলে, গুরু চাই, আর অরগুলি যেমন, রথনাভিতে অর্পিত, তেমনি, সকল কলাবিদ্যা, যে বিদ্যাতে, প্রতিষ্ঠিত, সেই পরা বিদ্যারই, গুরুর প্রয়োজন নাই, কে বলিবে ? একটী ইমনের ধ্রুপদ আছে,—"গুরু বিনু গুণ ক্যায়সে আওবে। গুণীয়নমে বে-গুণী—গুণ কাঁহাসে আওবে॥" আমার স্বর্গীয় দেবোপম পিতৃদেব সর্ব্বদাই গাহিতেন,—"সাধুসঙ্গ কর, সাধুবাক্য ধর, সহজে মিলিবে, সে বিভু দরশন।" সাধু গুরুর সহবাসে মানব আত্মা অনেকটা এগ্নারগারী ও সাহায্য পায়। কবিরাজগোস্বামী বৈষ্ণবের লক্ষণ, এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"যাঁহারে দেখিলে হয়, হরিনাম স্ফূর্ত্তি," যে ব্যক্তির দর্শনে হরিনামের স্ফূর্ত্তি হয় তাহার সহবাসেই স্বর্গ। শঙ্করাচার্য্য এই নিমিত্তই বলিয়াছেন,—"সৎসঙ্গঃ স্বর্গঃ।" মিল্টন বর্ণিত, শয়তান একস্থলে বলিয়াছেন,—"আমার মধ্যে নরক। আমি যেখানে, সেইখানেই নরক।" এমনই কুলোকের সহবাস! "সঙ্গদোষে, শতগুণ নাশে," বাঙ্গালায় প্রচলন আছে। আমি বলি, উহার বিপরীতটিও সত্য। অর্থাৎ সঙ্গগুণে শতগুণ বাড়ায়। তবে, ব্যবসাদার, অর্থলোলুপ, দুশ্চরিত্র, বেণিয়া-গুরু কেবল প্রয়োজন নাই, তাহা নহে, বিশেষ অনিষ্টকর।

পৃথিবীর সকল দেশের অধ্যাত্ম দীক্ষার ইতিহাস, যদি কেহ লিখিতে পারিতেন, তবে উহা একটী অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইত।

গুরু, ওস্তাদ, পীর, মাষ্টার, স্থপিনিয়ার, রাবি, থাকিলেও, অধ্যাত্ম মার্গে চলিতে হইলে, মানুষকে "সম্ভু,"—"স্বয়ম্ভু" হইতে হইবে,—নিজেকে, নিজেই গড়িয়া তুলিতে হইবে। একদিনেই, অধ্যাত্ম ব্যায়ামে ভোগমুক্ত হইয়া, পহেলোয়ান হওয়া যায় না। "গেড় তে পড় তে হাজার মেহন্নৎমে," আত্মা বলীয়ান হয়,—রোগমুক্ত হয়,—মরণকে ছাড়াইয়া উঠে।

মানুষ ছাইভস্ম লইয়া, সংসারে মত্ত থাকে। আবার সাধন-ক্ষেত্রে জীবন উপার্জ্জন করিতে যাইয়াও, ছাইভস্ম মাখিয়া মরে। বাঘাম্বর পরিধান করিয়া, গঙ্গা, জর্ডন, ও জেম্‌জেম্ করিয়া, নিজেকে আরও, ভ্রান্তিতে জড়িত করে। বৈষ্ণবগণ বলেন, "মনেতে দিয়ে ডোড, কপীন, হতে হবে দীনের অধীন।" যীশু বলেন, "হৃদয়ের শুদ্ধি চাই,—আত্মার অভিষেক চাই।" পশ্চিমের লোকেরা বলেন, "যোগী মন্

না রঙ্গার কাপড়, থায় দায়কে মোটায়কে ভদ্র বক্‌রা।" ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সকল দেশের অধ্যাত্ম-মার্গ-গামী লোকমাত্রই, বুঝিয়াছেন যে, বাহিরের ব্যাপারগুলি কিছুই নহে। বাহ্য কিছুই নহে, অন্তরই সত্য। ব্যক্ত কিছুই নহে, অব্যক্তই সব,—দৃষ্ট কিছুই নহে, অদৃষ্টই সব। দেহের রোগ নাশ করিবার, দেহকে নিরাময় করিবার, নানা উপায় আছে। এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, হাইড্রোপ্যাথী, হাকিমি, কবিরাজী প্রভৃতি চিকিৎসাপ্রণালী, বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিত্য নবপ্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়কার, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকেরা বুঝিয়াছেন যে, দুরারোগ্য ব্যাধির একমাত্র আরোগ্যের উপায়, মুক্ত বায়ুতে বাস। সেই প্রকার আমার মনে হয়, হিন্দু, বৌদ্ধ, মিশরীয়, ইহুদী, খৃষ্টীয়ান, মুসলমান, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি নানা সাধন প্রণালী ব্যর্থ হইলেও, মুক্ত-বায়ু-চিকিৎসা-প্রণালী আত্মার নিরাময়তার ও স্বাস্থ্যের জন্য নিতান্ত প্রশস্ত।

জীবন যখন, কিছুতেই সুন্দর ও সুস্থ হয় না ও পাপ প্রবণতা খুব বাড়ে,—জীবন যখন, যায় যায় হয়,—তখন সব ছাড়িয়া ব্রহ্মনিশ্বাসে, নিজেকে নিত্য ছাড়িয়া দাও। প্রাণ বাঁচিয়া যাইবে। আত্মা চিররক্ষা পাবে। উৎপত্তি-স্থল অখণ্ড ও সৎ-চিৎ-আনন্দ-সাগর। তাঁহারাই কূলে, মুক্তভাবে থাকিয়া,—সেই সচ্চিদানন্দ-ঢেউ দেহেতে লাগাইতে হয়,—তাঁহার দুঃখহর, সুখময়, পবিত্র পবন হিল্লোলে নিত্য আশ্বাসে, নিশ্বাসবান রাখিতে হয়,—প্রাণ ভরিয়া সেই চিৎ-সলিলে নিমগ্ন হইতে হয়। তাহা ভিন্ন জরজীর্ণ আত্মার, আর অন্য উপায় নাই। সেই, অমৃত-সাগরের তীরেই, জীবন হিল্লোল। কিন্তু, আমরা অকারণ, মোহবশতঃ অমৃত-সাগরের তীরেতে বসিয়া, হলাহল পান করিতেছি। আহা! কি মোহ?

সচ্চিদানন্দকে,—ব্রহ্মকে, চিন্তা ও ভাবনা করিলেই, যথেষ্ট হইল না। তাঁহাকে নিশ্বাস লইতে হইবে ও তাঁহাতেই, নিশ্বাস লইতে হইবে। তাঁহাতেই হইয়াছি, রহিয়াছি ও থাকিব, ইহা সদা অনুভব করিতে হইবে। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, রসনা, নাসিকা তাঁহারই ইচ্ছাতে, কার্য্য করিতেছে, ইহা অনুভব করিয়া, আমিত্ব বর্জ্জন করিতে হইবে, ভুলিতে হইবে, তাহাতে আমাদিগকে মিশাইতে, ডুবাইতে, মিলাইতে হইবে। তবে, জীবন লাভ হইবে, জীবন রক্ষা হইবে।

সমুদ্রকূলে যেমন, আমরা আত্মহারা হইয়া, লবণাম্বুরাশির লহরী-লীলা নিরীক্ষণ করি, তরঙ্গ-আস্ফালন ও নিত্য নিনাদ, শ্রবণ করিতে করিতে এবং ওজোনবাহী সমীরণের ঢেউয়ে দেহমনকে, তরঙ্গায়িত হইতে দি, তেমনি, অমৃতোদধির পাড়ে

বয়সয়া, নিজ অহঙ্কার, মোহ, পুরস্কার ভুলিয়া, ব্রহ্মের নিশ্বাসে, নিজকে চালিয়া দিতে হয়। নিশ্বাস যে, কখন আসে ও, কখন যায়, তাহা, কেহ জানে না। তাই নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টা বিসর্জ্জন দিয়া, তাঁহার ইচ্ছার অভিপ্রায়ে বসিয়া থাকিতে হয়।

সকল ধর্ম্ম, সকল সাধন, সকল চেষ্টা ছাড়িয়া, তাঁহারই চরণে শরণ লওয়া, ভিন্ন, আর আমাদের উপায় নাই। তাঁহার শরণ লইয়া, কেহ কি, কখনও ডুবিয়াছে, প্রবঞ্চিত, হতাশ হইয়াছে? শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি শুচঃ।"

(গীতা। ১৮।৬৬)

শরণাগত জীবের প্রতি ইহাই ব্রহ্মবাণী।

"সর্ব্বধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক কেবল আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে, পরিত্রাণ করিব। তুমি ভাবিও না, সন্দেহ করিও না। খেদ করিও না।" তবে, আর ভব-পারাবারের পারে যাইবার ভয় কি? স্বয়ং জীবন জীবন-সাগরে স্বরূপই কাণ্ডারী সাজিয়াছেন! পারে যাইবার, আর ভয় কি, ভাবনা কিসের? নিজের পাপ ও অহংকারের ভঙ্গিটিতে, ভয় করিলে, এই দুস্তর উদধিতে চরণ-তরণী অবলম্বনে,—পিতার, স্রষ্টার কৃপা-ভেলার সাহায্যে, পারগ হইতে হবে,—মুক্তি, জীবন, পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে। আমার বন্ধু স্বর্গীয় সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, তাহার নিজ রচিত এই গীতটী সদাই স্বকণ্ঠে গাহিতেন,—
"বাঁধহ তরণী তব সেই মৈনাক ভূধরে।"

আমাদের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। তাঁহাতে নির্ভর করিতে, এত ভয় কেন? দুইখণ্ড কাষ্ঠের ভেলা অবলম্বন পূর্ব্বক, সিন্ধুকূলবাসী, যদি অগাধ তোয়রাশির মধ্যে, নিজেকে নিক্ষেপ করিতে পারে, তবে, সংসার-সাগরের ভেলা যিনি, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া, এই তমসনঘোর গহন রজনীতে, তরঙ্গ-তুফান কেনই বা, না অতিক্রম করিতে পারিব?

ভক্তি ও বিশ্বাস, জ্ঞান ও প্রেম সহকারে, তাঁহাকে ধরিতে পারিলে, আমরা অচিরে, ধর্ম্মাত্মা হইতে পারি,—মৃত্যুর হস্ত, এড়াইতে পারি,—মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারি, ব্রহ্মই জীবন। জীবনই ব্রহ্ম। তাঁহাকে ছাড়িয়া, জীবন সম্ভবে না, জীবন থাকে না। সেই জীবন হইতে, দূরে থাকা, বঞ্চিত হওয়াই মরণ। অন্য মরণ নাই, অন্য জীবন নাই।

তাঁহাকে ধরিতে না পারিলে, কাম, ক্রোধাদির যম-হস্ত এড়াইবার যো নাই। পল বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়াসক্তিই মরণ।" উহা জীবনলাভ করিতে দেয় না,—বিলম্ব ব্যাঘাৎ ঘটাইয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণগীতায় বলিতেছেন,—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপ জায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"
(গীতা।২।৬২।৬৩)

বিষয়চিন্তা করিতে করিতে, পুরুষের আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, সঞ্জাত হয়; ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিনাশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ,—বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শ্রেয় হইতে ভ্রষ্ট হইলে, উচ্চস্থান হইতে পতনের ন্যায়, মানব ক্রমশঃ এক এক নিম্নে, গড়াইয়া আইসে, এবং বিষয় মোহ হইতে, ক্রমশঃ পাপের ও মৃত্যুর গভীরতম আবর্তে, হৃদয়, মন, আত্মা জড়িত হইয়া পড়ে,—উত্থানের ইচ্ছা, চেষ্টা ও ক্ষমতা হারায়। ইহাই নরক,—ইহাই মরণ।

অনুতাপিত চিত্তে, অবনত মস্তকে, করযোড়ে বিশ্বপিতা, জগন্নাথের চরণে, উপস্থিত হইলে, অবশ্যই, অনন্ত দয়ার ঢেউয়ে, আত্মা বিগতক্লেশ হইয়া,—সচ্চিদানন্দের চরণে, আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হয়। অনুতাপ ও তৃণাদপি ভাব অবলম্বন করিলেই, ব্রহ্ম কৃপাপবন আপনাপনিই, আত্মার মধ্যে, প্রবাহিত হয়।

তাঁহার কৃপা-পবন নিত্য বহিতেছে। উহার ঢেউগ্রহণ করিলেই হইল। তাঁহার শক্তির ঢেউ আত্মাতে, কল্লোল করিতেছে। উহা শুনিলেই হইল। উহাতে নিমগ্ন হইলেই হইল। যতক্ষণ প্রাণটী ধুক্ ধুক্ করিতেছে, ততক্ষণ তিনি নিশ্চয়, হৃদয়ে বিদ্যমান ও আমাদের জীবনে ও মঙ্গলে প্রত্যক্ষ ভাবে স্বার্থবান। জীবন তিনিই। উহা তাঁহারই দান। উহার সুযোগ, সুবিধা, বাঁচিবার উপায়, তিনিই করিয়া দেন ও দিবেন। আমরা সেই আশায়, তাঁহারই চরণ ধরি, তাঁহারই সেই অতল, অসীম, অশেষ, অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগরে, "ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" বলিয়া, সাঁতার ভুলিয়া ডুবিয়া যাই।

সাগরতীর। লাহিড়ী আশ্রম পুরী।
৭ই আষাঢ়। ১৩১৬।

ষোড়শ বর্ষ সম্পূর্ণ।